# মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ : মানিকগঞ্জ জেলার উপর একটি সমীক্ষা

**এম.ফিল . ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ**


**গবেষক**

মুহাম্মদ রিদওয়ানুল কাদির

এম.ফিল. গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নং-৫২

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**তত্ত্বাবধায়ক**

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়


**নভেম্বর, ২০১৯**

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এম.ফিল. গবেষক মুহাম্মদ রিদওয়ানুল কাদির কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য পেশকৃত **"মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ : মানিকগঞ্জ জেলার উপর একটি সমীক্ষা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের নিজস্ব এবং একক গবেষণা কর্ম। এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতিপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে বা এ বিষয়ে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ লিখিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

**তত্ত্বাবধায়ক**

**ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ**
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, **"মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ : মানিকগঞ্জ জেলার উপর একটি সমীক্ষা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার এই অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও আমি প্রকাশ করিনি এবং অন্য কোথাও ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

(মুহাম্মদ রিদওয়ানুল কাদির)
এম.ফিল. গবেষক
রেজিস্টেশন নং: ৫২
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। দরুদ ও সালাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা:) এর প্রতি যিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রিয় হাবীব এবং মানব জাতির মহান শিক্ষক রুপে প্রেরিত মহাপুরুষ। স্মরণ করছি তাঁদেরকে যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে বিরচণ করে। তাঁর সন্তুষ্টি নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আরো স্মরণ করছি তাঁদেরকে যাঁরা সীমাহীন ত্যাগ ও শ্রম ব্যয় করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদকে দৃঢ় মজবুত ভিত্তির উপর দাড় করিয়েছেন। এ গবেষণা কর্মের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ, অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ, আন্তর্জাতিক ইসলামী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুযোগ্য শিক্ষক, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। অত্র অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ যাঁর আন্তরিকতা, ভালবাসা আর প্রেরণার স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় এ অভিসন্দর্ভকে সম্ভব করে তুলেছে।

কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে, সংশ্লিষ্ট অনুষদ ও বিভাগের মান্যবর শিক্ষক কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার রুহানী চিকিৎসক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, অন্যতম মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গবেষক  চার তরিকার কামিল পীর আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুফতী ড. মুহাম্মদ মনযুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবকে, যিনি আমার প্রতিটি কর্ম ও গবেষণার অনুপ্রেরণা, কর্মব্যস্ততার হাজারো ভীড়ে যিনি আমার গবেষণা পত্রের খোঁজ নিয়েছেন, দিয়েছেন উপযুক্ত ও মূল্যবান তথ্য, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সময়োপযোগী পরামর্শ। এ জন্য তাঁর নিকট আমি চিরঋণী; চির কৃতজ্ঞ। আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আধ্যাত্মিক উস্তাদের সহধর্মিণী মোসাঃ লিনা সিদ্দিকা এর প্রতি। যার নির্দেশে আমি এ দুঃসাধ্য কাজে নামার শক্তি সঞ্চয় করেছি। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা মুহাম্মদ মিকদাদ সিদ্দিকী সাহেব মহোদয় এর প্রতি। যার প্রতিটি দিক নির্দেশনা আমার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক, ঢাকা ল কলেজের সম্মানিত লেকচারার মুহাম্মদ সেলিম-উল ইসলাম ছিদ্দিকী সাহেব এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যিনি এ অভিসন্দর্ভটি সমাপ্তির জন্য বিভিন্নভাবে আমাকে পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়েছেন।   অভিসন্দর্ভটিকে তথ্যবহুল করতে তাদের পরামর্শের জন্য আমি চিরঋণী।

আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সম্মানিত পিতা জনাব মো: আব্দুল কাদের ও পরম শ্রদ্ধেয় মাতা মোসা: মমতাজ কাদের এর প্রতি। যদের ছাড়া আমার জীবন চলার পাথেয়, আন্তরিকতার সাথে অক্লান্ত শ্রম ব্যয় করে এই অভিসন্দর্ভটিকে অতি অল্প সময়ে নিঁখুত, ঝকঝকে কম্পিউটার কম্পোজ করার কৃতিত্বের জন্য আমি মো: আকবর আলী ভাই এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

অভিন্দর্ভটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে আমি বিভিন্ন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠান ও সম্মানিত বহু পরিচিত-অপরিচিত গ্রন্থকাদের গ্রন্থ হতে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সহায়তা গ্রহণ করেছি; তাদের প্রতি রইল আন্তরিক মুবারকবাদ। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি মাদরাসা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মো: আব্দুল নুর সাহেব ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক, ড. ইব্রাহীম' খলিল স্যার এর নিকট ঋনী। মাঠ পর্যায়ে গবেষনা পরিচালনায় জনাব সাইফুদ্দিন বকুল ভাই ও মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান মামুন ভাই ও জনাব আ: হালিম ভাই এর প্রতি আমি বিশেষভাবে ঋণী। তাদের জনাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

পরিশেষে আমার সুহৃদ, শুভাকাংখী ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন যাদের অপরিসীম ত্যাগ ও অনুপ্রেরণায় এ গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন হয়েছে। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার সহধর্মিনী মোসা: কামরুন নাহার এর প্রতি যিনি বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে কাজের গতিবেক সঞ্চার করেছেন। অবশেষে মহান আল্লাহর নিকট সকলের উত্তম প্রতিদানের আর য রেখে এবং অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে এ অভিসন্দর্ভটি মহান আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্যতার ফরিয়াদ করছি। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুত তাওফীক। আমীন!

-গবেষক।

Dhaka University Institutional Repository

**সংকেত বিবরণী**

| সংকেত | বিবরণ |
|---|---|
| অনু. | অনুবাদ |
| খ্রি. | খ্রিস্টীয় সন |
| হি. | হিজরী সন |
| আ. | আলাইহিস্ সালাম |
| র./রহ. | রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি |
| রা. | রাদিয়াল্লাহু আন্হু |
| সা. | সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম |
| মৃ. | মৃত/মৃত্যু |
| জ. | জন্ম |
| ইং | ইংরেজী |
| পৃ. | পৃষ্ঠা |
| খ. | খণ্ড |
| সং | সংস্করণ |
| খৃ. পূ. | খৃষ্টপূর্ভ |
| তা. বি. | তারিখ বিহীন |
| ড. | ডক্টর |
| ডা. | ডাক্তার |
| দ্র. | দ্রষ্টব্য |
| ই.ফা.বা | ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ |
| সম্পা | সম্পাদনা/সম্পাদক/সম্পাদিত |
| বাং | বাংলা |
| Ed. | Edited by |
| OP. Cit. | Opere Citato |
| P. | Page |
| Trs. | Translation |
| Vol. | Volume |
| Pub. | Publisher / Publication |

# প্রতিবর্ণায়ন
## (আলবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়ন সমস্যাটি বহু প্রাচীন। সমস্যাটি এ যাবতকাল কোন সুপরিকল্পিত ও সার্বজনীন সমাধানের মুখ এখনো দেখেনি। আশা করা যায়, অচিরেই বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ পন্ডিতদের স্বার্থক পদক্ষেপে এর সমাধানের সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করবে। তবে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের গবেষকগণ আরবী বর্ণমালার বৈচিত্রময় উচ্চারণের প্রতি লক্ষ রেখে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যিনি যেটাকে যথাপোযুক্ত মনে করেছেন। তিনি তার গবেষণাকর্মে সে নিয়ম অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমি নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করেছি। তবে বহুল প্রচলিত আরবি বা উর্দূ শব্দসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা বানান রীতিতে লেখা হয়েছে।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ا - | অ | ط - | ত | ـِـ -- | ি | يَا - | ইয়া |
| ب - | ব | ظ - | য | ـُـ -- | ু | يِ - | য়ি |
| ت - | ত | ع - | ' | ـَـا -- | া | يِيْ - | য়ী |
| ث - | ছ | غ - | গ | ـُـوْ -- | ূ | يُ - | ইয়ু |
| ج - | জ | ف - | ফ | ـِـيْ -- | ী | يُوْ - | ইউ |
| ح - | হ | ق - | ক | أ -- | আ | عَ - | 'আ |
| خ - | খ | ك - | ক | ا -- | আ | عَا - | 'আ |
| د - | দ | ل - | ল | اِيْ -- | ঈ | عِ - | 'ই |
| ذ - | য | م - | ম | اُ -- | উ | عِيْ - | 'ঈ |
| ر - | র | ن - | ন | اُوْ -- | ঊ | عُ - | 'উ |
| ز - | য | و - | ও | وَ - | ওয়া | عُوْ - | 'ঊ |
| س - | স | ه - | হ | وِيْ - | বী,ভী | | |
| ش - | শ | ء - | ' | وُ - | উ | | |
| ص - | স | ى - | য় | وُوْ - | ঊ | | |
| ض - | দ | ـَـ -- | --া | يَ - | ইয়া | | |

*Dhaka University Institutional Repository*

## সূচিপত্র


| অধ্যায় | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| **প্রথম অধ্যায় :** | **শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা পরিক্রমা** | |
| | **প্রথম পরিচ্ছেদ** | **১-৯** |
| | ১.১ শিক্ষা পরিচিতি | |
| | দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | ১০-২৭ |
| | ১.২.১ ইসলামী শিক্ষা পরিচিত | |
| | ১.২.২ আল কুরআন ও আল-হাদীসে ইসলামী শিক্ষা | |
| | ১.২.৩ ইসলামী শিক্ষার পরিধি | |
| | **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** | **২৮-৬৭** |
| | ১.৩.১ ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ | |
| | ১.৩.২ ইসলামী শিক্ষার উৎস ও বিষয়সমূহের বিস্তার | |
| | ১.৩.৩ উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা | |
| | ১.৩.৪ দেওবন্দ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস | |
| **দ্বিতীয় অধ্যায় :** | **বাংলাদেশে আলিয়া মাদারাসা শিক্ষাধারা** | |
| | **প্রথম পরিচ্ছেদ** | **৬৮-৭৬** |
| | আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস | |
| | ২.১ বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার সূচনালগ্নে আউলিয়া কিরামগণ | |
| | **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** | **৭৭-৯১** |
| | **বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানিক কার্যক্রম** | |
| | ২.২.১ কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা | |
| | ২.২.২ আলিয়া মাদরাসায় ইংরেজি ভীতি | |
| | **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** | **৯২-১০৭** |
| | ২.৩.১ মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা | |
| | ২.৩.২ সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট | |
| | ২.৩.৩ সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা, বগুড়া | |
| | ২.৩.৪ তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা | |
| | ২.৩.৫ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা | |
| | ২.৩.৬ গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদরাসা | |
| | ২.৩.৭ কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা, নোয়াখালি | |

*Dhaka University Institutional Repository*

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১০৮-১১৮

২.৫ মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে সরকারি পদক্ষেপসমূহ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১১৯-১৫৬

২.৫.১ মাদরাসা শিক্ষার নবযুগ : পূর্ণাঙ্গ বিকাশ

২.৫.২ সরকার নিয়ন্ত্রিত মাদরাসা সমূহের বিভিন্ন পরিসংখ্যান

২.৫.৩ বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া-বাংলাদেশ

তৃতীয় অধ্যায় : ইসলামে নারী শিক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন ধর্মে নারী শিক্ষা ১৫৭-১৬৪

৩.১.১ ইয়াহুদী ধর্মে নারী

৩.১.২ খৃষ্ট ধর্মে নারী

৩.১.৩ হিন্দু ধর্মে নারী

৩.১.৪ বৌদ্ধ ধর্মে নারী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৬৫-১৭৮

৩.২.১ ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব

৩.২.২ নারী শিক্ষা সম্পর্কে আল কুরআন ও আল হাদীস

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৭৯-১৮৩

৩.৩.১ শিশুর শিক্ষার অধিকার

৩.৩.২ শিশুর বর্ধন ও বিকাশ

৩.৩.৩ শৈশবে শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক বিকাশ

৩.৩.৪ বাল্যকালের শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক বিকাশ

৩.৩.৫ কৈশোর/বয়:সন্ধিকালের শারীরিক বিকাশ

৩.৩.৬ কৈশোর /বয়:সন্ধিকালের দৈহিক পরিবর্তন

৩.৩.৭ কৈশোর বা বয়:সন্ধিকালে আবেগি বিকাশ

৩.৩.৮ সরকারের মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : মানিকগঞ্জ জেলায় মাদরাসা শিক্ষা

**প্রথম পরিচ্ছেদ** **১৮৪-২০৬**

৪.১.১ মানিকগঞ্জ জেলা পরিচিতি ও ইতিহাস

৪.১.২ মানিকগঞ্জ জেলায় ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে কতিপয় মনীষী

৪.১.৩ একনজরে মানিকগঞ্জ জেলার শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** **২০৭-২৬৪**

৪.২.১ মানিকগঞ্জ জেলার মাদরাসা সমূহ

৪.২.২ মানিকগঞ্জ জেলার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) মাদরাসা সমূহ : **পরিচিতি ও ইতিহাস**

৪.২.৩ মানিকগঞ্জ জেলার মাদরাসা সমূহের প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ : একটি সমীক্ষা

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ** **২৬৫-২৭১**

৪.৩.১ মানিকগঞ্জ জেলার ইবতিদায়ী সমাপনী পরীক্ষা

৪.৩.২ ইবতিদায়ী (১ম-৫ম) শ্রেণীর সিলেবাস ও মানবন্টন

৪.৩.৩ ইবতিদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল (২০১৫-২০১৮ খি.)

৪.৩.৪ ইবতিদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ হার

**চতুর্থ পরিচ্ছেদ** **২৭২-৩০১**

৪.৪ ইবতিদায়ী শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষায় মানিকগঞ্জ জেলার অংশ গ্রহণকারী সকল মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ফলাফল (২০১৫-২০১৮)

**পঞ্চম পরিচ্ছেদ** ৩০২-৩০৪

**৪.৫ ইবতিদায়ী শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ**

পঞ্চম অধ্যায় : মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব

প্রথম পরিচ্ছেদ ৩০৫-৩০৯

৫.১.১ বাংলাদেশের সমাজ জীবনে মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব

৫.১.২ ইবতিদায়ী শিক্ষার্থীদের নৈতিক ভিত্তি

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৩১০-৩২৬

৫.২.১ মানব জীবনে মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব

৫.২.২ শিক্ষা বনাম কর্ম সংস্থা ও মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব

৫.২.৩ বিদআত প্রতিরোধে মাদরাসার অবদান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩২৭

৫.৩.১ ইসলামী শিক্ষার সম্ভাবনা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
উপসংহার
গ্রন্থপঞ্জি
ছক ও আলোকচিত্র

# ভূমিকা

পরম করুনাময় অসীম দয়ালূ আল্লাহ তা'য়ালা জন্য সকল প্রশংসা নির্ধারিত ও নবী করীম হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম। বিশ্বনবী (সা:) এর প্রেমিক সাহাবীবৃন্দের (রা:) উপর বর্ষিত হোক অশেষ শান্তি ও রহমন। 'মাদরাসা শিক্ষার' প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ : মানিকগঞ্জ জেলার উপর একটি সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণাটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কেননা একটি জাতি তখনই মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যখন শিক্ষার আলো যে জাতিকে আলোকিত করে। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাই হলো মানব জাতির সারা জীবনব্যাপী মনুষত্য নিয়ে চলার পাথেয়। মাদরাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য উদ্দেশ্যই হলো দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা। এ লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে তরান্বিত করাই এ অভিসন্দর্ভের কাজ।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস ঐতিহ্য সুদীর্ঘ। এর উৎপত্তি হয় মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। যাঁর পবিত্র পরশে সারা জাহান অন্ধকার, অজ্ঞতা ও মূখর্তার অভিশাপ হতে মুক্তি লাভ করে মাত্র ২৩ বছরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ায় আহরোন করে। আজ ও জ্ঞান পিপাসু হাজার হাজার শিক্ষার্থী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় অধ্যায়ন ও গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন "তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দিব।" মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় এই একই উদ্দেশ্য নারী শিক্ষার দ্বারকে উন্মুক্ত করেছে। আজ হতে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে, যখন পুরুষরাই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। তখনই রাসূলুল্লাহ (সা.) নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হন নি বরং তিনি (সা.) সপ্তাহে একদিন মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ মজলিশের ব্যবস্থা করতেন। ইসলামে নারী শিক্ষার জয় যাত্রা তখন থেকেই শুরু হয়।

উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে আসার পর ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা তার গৌরব হারাতে থাকে। ইংরেজদের ২০০ বছরের শোষণ নির্যাতনের পরও 'ইসলামী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা টিকে ছিল তার ঐতিহ্যকে নিয়ে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আত্ম প্রকাশের পর থেকে ধীরে ধীরে ইসলামী শিক্ষা আবার তার হারানো গৌরব ফিরে পাবার সংগ্রাম আরম্ভ হয়। স্বাধীনতার ৪৯ বছর পার হওয়ার পর ও মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও নানান সমস্যায় জর্জরিত। এর ফলশ্রুতিতেই' মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ : মানিকগঞ্জ জেলার উপর একটি সমীক্ষা' গবেষণা কর্মটি সময়ের দাবী ছিল।

গবেষণা কর্মটি সুন্দর ও পাঠক দৃষ্টি বিবেচনা করে আলোচনা সমূহকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা পরিক্রমা' শিরোনামে শিক্ষার ধারণা অর্থ পরিধি, ইসলামী শিক্ষার ধারণা পরিধি উৎস, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও ইসলামী শিক্ষার অবদান রাখা মনীষীদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'বাংলাদেশের আলিয়া মাদরাসা শিক্ষাধারা'। এ শিরোনামে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের পটভূমি, আলিয়া নিসাবের ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা সমূহের বিবরণ, মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপের আলোচনা করা হয়েছে।
তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'ইসলামে নারী শিক্ষা'। এতে ইসলাম ধর্মে নারী শিক্ষার গুরুত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মে নারী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে' মানিকগঞ্জ জেলার মাদরাসা শিক্ষা'-এতে মানিকগঞ্জ জেলার সরকার নিয়ন্ত্রিত মাদরাসা' সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা, মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন কারণে মেয়ে শিশুদের ঝরে পড়ার উপর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) সমাপনী পরীক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব'। এই অধ্যায়ে মানবজীবনের প্রতিটি ধাপে মাদরাসা শিক্ষার সুদূর প্রসারী প্রভাব, মাদরাসা শিক্ষার সম্ভাবনা ও মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে।
অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার পরে অভিসন্দর্ভে একটি উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে এবং সবশেষে পরিশিষ্ট শিরোনামে মানিকগঞ্জ জেলার মাদরাসা সমূহের কিছু আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে।

"মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ : মানিকগঞ্জ জেলার উপর একটি সমীক্ষা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভে ভাষার দুর্বোধ্যতা পরিহার করার সাথে সাথে চলতি রীতি ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে শিক্ষাবিদ, গবেষক ছাড়াও সাধারণ পাঠক মহল উপকৃত হতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক মাত্রই জানেন যে, অভিসন্দর্ভে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি দূষনীয়। আমিও সচেতনভাবে এ বিষয়টি পরিহার করার চেষ্টা করেছি। তারপরও আলোচনার ধারাবাহিকতা ও অপরিহার্য প্রাসঙ্গিক হিসেবে দু এক স্থানে পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

পরিশেষে এ অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী কোমল মতি ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রীক কল্যাণ, দুনিয়া ও আখিরাতের নাজাতের উছিলা হিসেবে মাদরাসা শিক্ষার ভূমিকার প্রশংসা করছি। এ গবেষনা কর্ম দ্বারা মুসলিম শিক্ষার্থীগণ সামান্য উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে ইনশা আল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সকলকে দ্বীন ইসলামের পথে কবুল করুন। আমীন!

## অধ্যায় এক

## প্রথম পরিচ্ছেদ : শিক্ষা পরিচিতি

### ১.১ শিক্ষার ধারণা, অর্থ ও পরিধি :

"শিক্ষা" পৃথিবীর সকল দেশেই অতি পরিচিত একটি প্রত্যয়। তবে শিক্ষার বিশেষ কোন একটি 'ধারণা' কখনই সর্বজনগ্রাহ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। শিক্ষা চিন্তাবিদগনের দৃষ্টিভঙ্গি, অনুসন্ধান পদ্ধতি ও কৌশল এবং সিদ্ধান্ত গঠনে ভিন্নতার কারণে শিক্ষার ধারণা হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক। 'শিক্ষা' বলতে কী বোঝায় অর্থাৎ শিক্ষার ধারণা বা সংজ্ঞার ক্ষেত্রে কখনই শিক্ষাচিন্তাবিদগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ধর্ম, সমাজ ও কালভেদে যেমন তাতে পার্থক্য বিরাজমান, তেমনি একই সমাজ ও কালে রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা। তবে শিক্ষার 'ধারণা' ক্রমশ সামাজিক উপাদানসমূহের সাথে অধিকতর সম্পৃক্ততা লাভ করেছে।

সাধারণ ধারণা অনুযায়ী মানুষ বা ব্যক্তি যা কিছু শেখে তাকেই 'শিক্ষা' নামে অভিহিত করা হয়। এদিক থেকে মানুষের জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের বিবর্তনধারার সাথে শিক্ষার বিবর্তন ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কালক্রমে 'শিক্ষা' মানুষের মূল্যবোধসম্পৃক্ত প্রপঞ্চে রূপলাভ করেছে। এক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত 'শিখন' অংশকে 'শিক্ষা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তবে ধর্ম, কাল ও সমাজভেদে এই মূল্যবোধের ভিন্নতা ও বহুমাত্রিকতার কারণে শিক্ষার ধারণা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেও বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার কিছু কিছু দিক সর্বজনীন হলেও বহুলাংশেই তা সমাজকেন্দ্রিক আপেক্ষিকতা ও ভিন্নতা লাভ করেছে।

কারো কারো মতে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে ইংরেজী "Education" প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটেছে ল্যাটিন শব্দ "Educare" থেকে, ইংরেজিতে যার ভাবার্থ হচ্ছে "to lead out" বা "to draw out". এক্ষেত্রে 'শিক্ষা' বলতে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জের বিকাশ সাধন বা তার অভ্যন্তরীন ক্ষমতা 'বহিঃপ্রকাশ ও বাস্তবায়ন" বোঝায়। আবার কেউ কেউ বলেছেন ইংরেজি "Education" শব্দটি ল্যাটিন শব্দ "Educere" থেকে উদ্ভুত হয়েছে যার ভাবার্থ হলো "to bring up" অথবা "to train" অথবা "to mould". অর্থাৎ 'শিক্ষা' বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীকে 'লালন করা' অথবা 'প্রশিক্ষণ দেওয়া' অথবা 'কোন কিছুর আদলে তৈরি করা"।[১] আবার ল্যাটিন শব্দ ~Educo"- কে কেউ কেউ ইংরেজি "Education" শব্দের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। এখানে "E" অর্থ "Out" এবং 'duco' অর্থ 'to lead' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে কোন কিছু পরিচালিত করা বা বের করা বা প্রতিভাত করাকে শিক্ষা বলা হয়েছে।[২] এসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত

---

১ অমরনাথ ও ঋতেন্দ্র কুমার রায়, *শিক্ষা বিজ্ঞান*, প্রকাশ ১৯৮৭ ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃ : ১

২ মঞ্জু শ্রী চৌধুরী, *সুশিক্ষক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশ ১৯৮৩, পৃ : ৩

অর্থের দিক থেকে বলা চলে যে, ব্যক্তির সহজাত বুদ্ধি বা সম্ভাবনাকে বিকশিত ও পরিচালিত করাই হচ্ছে শিক্ষা। ব্যক্তির, বিশেষত শিশুর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধণ করে তাকে প্রতিষ্ঠিত জীবনের দিকে পরিচালিত করাই শিক্ষার কাজ। মূল ল্যাটিন শব্দসমূহের ভিত্তিতে ইংরেজি Education শব্দটির ব্যাপক অর্থ করা যায়, "কোন জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত করাই শিক্ষা। যেমন, আদিমকালে কেউ যখন তার পিতা বা মাতা অথবা সমাজের অন্যান্য বয়ঃপ্রাপ্তদের নিকট থেকে শিখেছিল কেমন করে পশু শিকার করতে হয় বা ফল আহরণ করতে হয় অথবা কেমন করে কুটির তৈরি করতে হয়, সেটাকে শিক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার আধুনিককালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে রোগ চিকিৎসা অথবা বিমান চলানোর কৌশলও শিক্ষা হিসেবে পরিগণিত। ইউরোপে যেমন ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষাকে অন্যান্য ভাষার মূল হিসেবে গণ্য করা হয় তেমনি উপমহাদেশের ভাষাসমূহের বিশেষত 'বাংলা ভাষার ভিত্তি হিসেবে 'সংস্কৃত' কে ধরা হয়। 'শিক্ষা' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে সংস্কৃত ধাতু 'শাস্' থেকে, যার অর্থ 'শাসন, নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশ বা উপদেশ দান'। সার্বিক অর্থে শাস্ ধাতু কঠোর কাঠামোগত পরিচালনমূলক উদ্দেশ্যের অধিকারী হলেও ব্যাপক অর্থে তা 'যথাযথ নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন' অর্থে প্রয়োগ করা যায়।

এসব শব্দিক ও বুৎপত্তিগত অর্থকে কেন্দ্র করে 'শিক্ষা'র সংজ্ঞা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ধারা, প্রকৃতি ইত্যাদি দিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষাচিন্তার সূত্রপাত ঘটেছে। কালক্রমে তা নানা ধারায় বিকশিত হয়েছে। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্টবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, নীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি বহুবিধ দৃষ্টিকোন থেকে 'শিক্ষা'র স্বরুপ অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসবের কিছু দিকের প্রতি নিচে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

'শিক্ষা'কে একটি বিশেষ সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসাধিত হয়। শিখন প্রণালীর দিক থেকে শিক্ষার বিভিন্ন ধরণ চিহ্নিত করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (formal education), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (nonformal education) এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (informal education) কে আধুনিককালে শিক্ষার প্রধান প্রধান ধরণ হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩]

শিক্ষার ধারণার ক্রমবিকাশের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে 'আত্মবিশ্বাসী হওয়া', আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়া' এবং 'মুক্তি' বা মোক্ষ লাভের উপায় হিসেবে 'শিক্ষা'কে দেখা হয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে ঋকবেদে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং আত্ম-অভ্যাস ব্রতে উদ্বৃদ্ধ করে। উপনিষদে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা হল এমনই একটি প্রক্রিয়া যার চুড়ান্ত অর্থ 'মানুষের মুক্তি'।[৪] ভারতীয় দর্শনে শিক্ষাকে আত্মা-পরিতৃপ্তি লাভের উপায় হিসেবেও দেখা হয়েছে। দার্শনিক

৩ আব্দুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম, শেখ শাহবাজ রিয়াদ, *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১২, পৃ: ৩
৪ মঞ্জু শ্রী চৌধুরী, *সুশিক্ষক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশ ১৯৮৩, পৃ: ৩

কণ্বাদ এ অর্থেই শিক্ষাকে বিবেচনা করেছেন। আবার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষাকে মানুষের চরিত্র গঠন এবং পৃথিবী তথা সমাজ উপযোগী করার প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করেছেন। চাণক্য বা কৌটিল্য শিক্ষাকে দেশসেবার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভ ও জাতির প্রতি যথার্থ ভালবাসা প্রদর্শন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আর শঙ্কারাচার্যের মতে 'শিক্ষা হলো আত্মোপলব্ধির উপায়মাত্র'।

প্রাচীনকালে ভারতের বাইরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও শিক্ষাচিন্তাবিদগণ ও শিক্ষা বলতে প্রধানত মানুষ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর নৈতিক ও নান্দনিক জীবনবিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা হলো শিক্ষা নানাগুণে গুণান্বিত উন্নত চরিত্রের "ভদ্রলোক" তৈরি করবে, 'যে' হীনতা জয় করে সত্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকবে।[৫] তবে এ ক্ষেত্রে তিনি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে শিক্ষাকে পেশা ও জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন করে তুলেন। প্রাচীন চীনের অপর দার্শনিক লাঁচাঁ (কনফুসিয়াসের সমসাময়িক) প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে ছকবাঁধা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বদলে প্রকৃতির উদার পরিবেশে শিক্ষা লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি বিধানের কথা বলেছেন। প্রাচীন চীনের শিক্ষায় কুনফুসিয়াসের মানবতাবাদী দর্শনের সঙ্গে লাঁচাঁর প্রকৃতিবাদী ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটেছিল।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমাজ-দার্শনিক মতবাদের বিকাশ ঘটেছিল। বিশেষ করে গ্রীসের শিক্ষাক্ষেত্রে সফিস্টদের মতবাদ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । এ মতবাদে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এমনকি, সমাজের সব কিছুর ওপর মানুষকে স্থান দেওয়া হয়েছে। সফিস্টরা মানুষের বিকাশ ও উন্নতিকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। সক্রেটিস ও প্লেটোর শিক্ষাদর্শনেও ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা শিক্ষাকে ব্যক্তির ভেতর সততা ও ন্যায়বোধ সঞ্চালনের অবলম্বন হিসেবে গণ্য করেছেন। শিক্ষা আদর্শ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তিকে প্রস্তুত করবে এবং তার সুসমন্বিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করবে। এরিস্টটলীয় শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি তথা নাগরিককে তার প্রজ্ঞা ও মেধা অনুশীলনের সাহায্যে বিবেকবান ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন করে তোলা, যার জীবন হবে একান্তভাবে বাস্তব চিন্তাসম্পৃক্ত। এরিস্টটল শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে 'প্রজ্ঞা ও অভ্যাস উভয়েরই সমন্বিতভাবে ক্রিয়াশীল হওয়া অত্যাবশ্যক' বলে মন্তব্য করেছেন।[৬] অর্থাৎ প্লেটো ও এরিস্টটল ভিন্নমুখী দর্শনের প্রবক্তা হলেও শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধনের ওপর উভয়ই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে রোমান দার্শনিকরা গ্রীকদের তুলনায় বেশি বাস্তববাদী ছিলেন। প্রাচীন রোমান শিক্ষাব্যবস্থায় এর প্রতিফলনও লক্ষ করা যায়। রোমানরা যুদ্ধপ্রিয়, কর্মনিপুন, উচ্চভিলাষী ও বলিষ্ট জাতি হিসেবে অতীত ও ভবিষ্যত  অপেক্ষা বর্তমানকে প্রাধান্য দিতেন। এজন্য প্রাচীন রোমান

---

৫ শরীফা খাতুন, *দর্শণ ও শিক্ষা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশ ১৯৯৯, পৃ: ১৪

৬ সরকার ফজলুল করিম, *এ্যারিস্টটল*, (T.A. Sinclair কৃত ইংরেজি ভাষান্তর অনুসারে বাংলা অনুবাদ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ঢাকা ১৯৮৩, পৃ : ৩৪৫

শিক্ষাব্যবস্থায় ফলিতবিজ্ঞান ও কারিগরি শিল্প ইত্যাদির উপস্থিতি রয়েছে। আসলে বাস্তব প্রয়োজনে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ও নৈতিক গুনসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করাই ছিল রোমান শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার স্বর্ণ যুগের পর মধ্যযুগে ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ পর্যায়ে খ্রিস্ট ধর্মের নীতি ও আদর্শ সঞ্চালনই ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। আর 'চার্চ' শিক্ষা পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় কালক্রমে সনাতন (হিন্দু) ধর্মের নীতি-প্রথা, আচাররীতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রাধান্য বিস্তার করে। মধ্যযুগে হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থার এটিই ছিল প্রধান ধারা। উচ্চ বর্ণের হিন্দু শিশুরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সন্তানেরা (অবশ্যই ছেলে শিশু) এ ধারার শিক্ষায় অংশ নিত।[৭] তবে পাঠশালা শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু পার্থিব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। অব্রাহ্মণ সন্তানেরা পাঠশালায় পড়তো। কিছু কিছু মুসলমান ছাত্রও পড়তো। পঞ্চানন মন্ডলের নিম্নোক্ত মন্তব্যে এর প্রমান মেলে-"পাঠশালা শিক্ষা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতির ছেলেরাই গ্রহণ করিত। মুসলমান ছেলেরাও এই পাঠশালায় পড়িতে যাইত"।[৮] কিন্তু মধ্যযুগে সংস্কৃততে উচ্চশিক্ষার চর্চা শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে এ ধারাটির বিস্তার ঘটে। ফলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য প্রসার লাভ করে। এতে শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নন্দনচর্চা পাশাপাশি চলতে থাকে। পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চার সঙ্গে ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, সংখ্যা, মহাযান শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, যোগশাস্ত্র প্রভৃতিও চর্চা হতো।

শুরু থেকেই ইসলাম ধর্ম বৈষম্যহীন সমাজের ভাবধারা প্রচার করে এবং শিক্ষাগ্রহণকে সকল মানুষের অবশ্য কর্তব্য কাজ বলে ঘোষণা করে। এই প্রসঙ্গে কবি গোলাম মোস্তফা তার বিখ্যাত গ্রন্থ "বিশ্বনবী' তে উল্লেখ করেছেন- 'যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে মহাসত্যের জন্য ধরণী প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিল, যে বাণী প্রেরণ করিবেন বলিয়া আল্লাহ্ বহুযুগ পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতেছিলেন, সেই বাণী আজ অবতীর্ণ হইল। যে বাণীর আরম্ভই হইলঃ পাঠ কর- অর্থাৎ জ্ঞান লাভ কর। সমগ্র কুরআনের সর্বপ্রথম বিষয়বস্তুই হইল জ্ঞান'।[৯] Introduction to Islamic Culture and Philosophy' গ্রন্থে ইসলাম ধর্মে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেবার দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে বলেছেন- Though himself unlettered (ummi) Muhammad (sm) was the first to realise the necessity of literacy. He made the pursuit of knowledge incumbent upon all his followers, irrespective of sex and rank. He regarded the acquisition of knowledge as a religious necessity. "Seeking knowledge is obligatory for all Muslims, male and female". so goes the tradition. The following utterances of the prophet bear amble testimony to his encouragement of

---

৭ প্রবীর মুখোপাধ্যায়, *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা-১*, দীপায়ন, কলকাতা, প্রকাশ বাংলা ১৪০৩, পৃ : ১২

৮ পঞ্চানন মন্ডল, *চিঠিপত্র সমাজচিত্র* (দ্বিতীয় খণ্ড) কলকাতা, পৃ : ১০১

৯ গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯তম মুদ্রণ, ২০০০, ঢাকা, পৃ : ৭৯

learning. "The ink of scholar is holier than the blood of the martyr., "Pursue Knowledge though it is be in China." To listen to the words of the learned and instil into other the lessons of science (ilm) is better than religious practice." ।[১০] মধ্যযুগের অনেক মুসলমান দার্শনিক জীবন ও জগত সম্পর্কে উচ্চস্তরের চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। শিক্ষাচিন্তাতেও তাঁদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মধ্যে আবু ইবন রুশদ (র.), ইমাম আবু হানিফা(র.), আবু নাসের আল ফারাবী(র.), ইবনে সিনা(র.), ইমাম গাজ্জালী(র.), শেখ সাদী(র.), জালালউদ্দিন রুমি(র.), আব্দুর রহমান(র.)ইবনে খালদুন(র.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগে শিক্ষা সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে আধুনিক যুগে শিক্ষা সাধারণ মানুষের জীবনসম্পৃক্ত হতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তাদের দুয়ারে পৌছাতে থাকে। পনের শতকে ইউরোপে সংগঠিত রেনেসাঁসের মাধ্যমে এর সূত্রপাত ঘটে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিকাশ, উদারনৈতিক আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দর্শন প্রসার লাভের সাথে সাথে ব্যাপকভাবে শিক্ষার বিস্তারও ঘটতে থাকে। ইউরোপের প্রভাব ভারতবর্ষসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সঞ্চালিত হয়। ফলে এসব অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন ঘটে এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা ও চেতনার বিকাশ শুরু হয়। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশে বিশেষত ভারতবর্ষে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যোহান হেনরিক পেস্তালৎসী, ফ্রেডারিক ফ্রোয়েবেল, জন ফ্রেডারিক হারবার্ট, মারিয়া মন্তেসরী প্রমুখ এক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। এর ফলে 'শিক্ষা' সামাজিক মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষিতে 'শিক্ষা' বলতে ব্যক্তির আচরণের কাঙ্খিত পরিবর্তনকে বোঝায়। অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণের যে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় শিখন (Learning) । শিখন প্রকাশ পায় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা হল জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশিত আচরণের সেই পরিবর্তন যা ব্যক্তি ও সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য, কল্যাণকর এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। অধ্যাপক রেমন্ট এর মতে "Education means the process of development in which consists the passage of the human body from infancy to maturity, the process whereby the gradually adapts himself in various ways to the physical social and spiritual enviroment" ।[১১] অর্থাৎ 'শিক্ষা হল ক্রমবিকাশের এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং

১০ Syedur Rahman, *Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, Mallick Brothers, Dhaka, Pub : 1969, P. 70
১১ T Raymont, *The Principles of Education*, Orient Longman Limited, 1994, Hyderabad, P.17

এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি তার প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের সঙ্গে ক্রমশ সঙ্গতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।' আধুনিক সমাজবিজ্ঞানেও 'শিক্ষা' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছে। ' এক্ষেত্রে ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এলিম ডূর্খাইমের অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি 'শিক্ষা'কে সামাজিক বস্তু (social thing) এবং 'সামাজিক ঘটনা' (social fact) হিসেবে অভিহিত করেছেন। সাথে সাথে তিনি শিক্ষাকে সামাজিকীকরণের বাহন হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে, "Education is the influence exercised by adult generation on those who are not yet ready for social life. Its object is to arouse and to develop in children those physical, intellectual and moral states which are required of them both by their society as a whole and by the milieu for which they are especially destined"।[১২] অনুরুপভাবে কার্লম্যানহাইম 'শিক্ষা'কে সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সমাজপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে 'শিক্ষা'র ধারণা নির্মাণ এবং শিক্ষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। আমেরিকার সমাজদার্শনিক জন ডিউই দর্শন, মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার একটি সমন্বিত 'ধারণার বিকাশ ঘটান। তাঁর ধারণা মতে, "Education is not a preparation of life, rather it is living"।[১৩] 'শিক্ষা' শুধু জীবন প্রস্তুতের উপায় নয়, তা জীবন যাপন প্রণালীও বটে'। এ জন্য তিনি শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন এবং 'অভিজ্ঞতা' (experience)- কে শিক্ষা লাভের স্বাভাবিক কৌশল হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে তিনি এ কথাও বলেন যে, ".....all human experience is ultimately social"। [১৪] বস্তুত, 'শিক্ষা' ও শিক্ষা অর্জনের কৌশল যে সমাজভিত্তিক একটি প্রক্রিয়া সেটাই তাঁর উক্ত মন্তব্যে সুস্পষ্ট। 'বিদ্যালয়'কে তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান তথা সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য করেছেন। ঐ দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে সমাজকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলেও বিবেচনা করেছেন।

মানুষের সমাজ অতীত থেকে যতই ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, 'শিক্ষা' ততই সমাজকেন্দ্রিক হয়ে ওঠেছে। শিক্ষার 'ধারণা' ও এভাবে মানুষের বাস্তব জীবনের প্রস্তুতি ও জীবন যাপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অধিকতর সম্পৃক্ততা লাভ করছে। শিক্ষা বিষয়ে এমনি একটি সংজ্ঞা বা ধারণা হলো "ব্যক্তির দেহ ও মনের সকল ক্ষমতা বিকশিত, বিবর্তিত, মার্জিত করে তাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপযোগী সকল ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, নৈপুণ্য, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করে তোলার সহায়ক ব্যবস্থাদির নাম শিক্ষা"।[১৫]

---

১২ Emile Durlehiem, *Education Sociology*, The Free Press, New York, Pub. 1956, p : 24
১৩ John Dewey, *Democracy and Education*, The Macmillar Company, New York, Pub. 1916, p : 24
১৪ John Dewey, *The School and Society*, (2nd Edition), Chicago, University Press, Chicago, p : 32
১৫ শামসুল হক, শিক্ষা প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশ : ১৯৮৩., পৃ : ১

শিক্ষাকে সমাজ উন্নয়ন, মানব অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রের ধারক হিসেবে কেউ কেউ গণ্য করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, “Education is the single most critical element in combating poverty, empowering women, protecting children from hazardous and exploitive labour, sexual exploitation and promoting human right and democracy.” ।[16] জাতিসঙ্ঘও শিক্ষার ‘ধারণা’য় মানুষের জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক জাতিসঙ্ঘের সংস্থা ইউনেস্কো (UNESCO) শিক্ষাকে মানুষের সর্বজনীন গুণাবলীর বিকাশ ও মানব উন্নয়নের উপায় হিসেবে গণ্য করে বলেছে, Education is “the means for bringing about desired changes in behaviours, values and life styles, and for promoting public support for the continuing and fundamental changes that will be required if humanity is to alter its course... Education, in short, is humanity’s best hope and most effective means to the quest to achieve sustainable human development” ।[১৭] সাথে সাথে ইউনেস্কো জীবন যাপনের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও উপলব্ধি অর্জনের নির্দেশনা হিসেবেও শিক্ষাকে গণ্য করেছে। এ প্রেক্ষিতে ইউনেস্কোর ভাষ্য হচ্ছে, Education is “Organized and sustained instruction designed to communicate a combination of knowledge, skills and understanding valuable for all the activities of life” ।[১৮]

একুশ শতকের শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন রিপোর্ট (১৯৯৭) বা দেলর কমিশন রিপোর্টে শিক্ষাকে মানব জীবন সম্পৃক্ত একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ব্যক্তির “জীবনব্যাপী শিখন” (Lifelong Learning)-এর উপর কমিশন রিপোর্টে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এটিকে একুশ শতকের শিক্ষার প্রধানতম কৌশল হিসেবে গণ্য করে শিক্ষার চারটি স্তম্ভ (four pillars of education) নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে (ক) জানতে শেখা (Learning to know) (খ) করতে শেখা (Learning to do), (সা.) মিলেমিশে বসবাস করতে শেখা (Learning to live together), এবং (ঘ) বিকশিত হওয়ার জন্য শেখা (Learning to be)। [19]

১৬ মুহাম্মদ হোসেন, যুগোপযোগী শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ, ’৯৮, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রকাশ ১৯৯৯, পৃ : ৯
১৭ আবু হানিফ লতিফ, বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংস্করণ, বাফেড, ঢাকা প্রকাশ : ২০০৫, পৃ : ৮-৯
১৮ UNESCO Report, Paris, 2002.
১৯ কমিশন রির্পোট, ১৯৯৬, পৃ : ২০

জীবনব্যাপী শিখন ধারণার তাৎপর্য প্রসঙ্গে আগারওয়াল মন্তব্য করেছেন, 'The concept of learning throughout life is the key that gives access to the twenty first century. It goes beyond the traditional distinctions between initial and continuing education. It links up with another concept, that of learning society, in which every thing affords an opportunity for learning and fulfilling one's potential. [20]

বস্তুত: শিক্ষা একটি পরিবর্তনশীল প্রপঞ্চ। 'শিক্ষা' সংক্রান্ত কোন 'ধারণা'ই সর্বজনীন ও চিরস্থায়ী হতে পারে না। প্রতিনিয়ত শিক্ষার 'সংজ্ঞা' বা 'ধারণা' বহুমাত্রিক রূপ লাভ করছে। পরিবর্তনমান সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের জীবনই এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে।

## ব্যাপক অর্থে শিক্ষা

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল ব্যক্তির ওপর পরিবেশের সার্বিক প্রভাব। অর্থাৎ শিক্ষা হল একটি উন্নতিমূলক পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতি বিধানে সমর্থ হয়। শিক্ষা মানেই জীবন আর জীবনই শিক্ষা। শিক্ষায় কখনও ছেদ পড়ে না, আর কেউ এ কথা বলতে পারেনা যে 'এখান থেকে শিক্ষার শুরু আর সেখানে শেষ।' শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষার শুরু হয়, আর তা চলতে থাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এ অর্থে প্রত্যেক ব্যক্তিই শিক্ষিত, 'অশিক্ষিত' ধারণাটি এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হচ্ছে-

- শিক্ষা হল জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।
- শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুন:সৃজন।
- শিক্ষা একটি মানবীয় প্রচেষ্টা।
- শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মানব জীবনের বিকাশ সাধন।
- শিক্ষা হচ্ছে নির্দেশনা।
- শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া।
- শিক্ষা হচ্ছে বাস্তব সমস্যার সমাধান।
- শিক্ষাই সঙ্গতি বিধান।
- শিক্ষাই সমাজ সংরক্ষণ।

২০ J.C. Aggarwal, Education Reforms in India for the 21st Century, Shipra Publications, New Delhi, Pub, 2010, p : 21

- শিক্ষা একটি লক্ষ্যমুখী প্রক্রিয়া।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ সামনে রেখে বিভিন্ন যুগের অনেক শিক্ষাচিন্তাবিদ শিক্ষাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিচে এরূপ কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হল:

- "শিক্ষা হচ্ছে সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারার ক্ষমতা বা শক্তি" (Education is the capacity to feel pleasure and pain in the right moment)-প্লেটো।
- "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নামই শিক্ষা" (Education is the creation of sound mind in a sound body) - এরিস্টটল।
- "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের স্বাভাবিক, সুষম ও প্রগতিশীল বিকাশ" (Education is natural, harmonious and progressive development of man's innate power)- জোহান হেনরিক পেস্তালৎসী।
- "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন" (Education is the development of moral character)- জন ফেডারিক হারবার্ট।[২১]

শিক্ষার ধারণা, অর্থ ও পরিধির সামগ্রীক আলোচনার আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শিক্ষা এমন একটি প্রপঞ্চ যার ব্যবহার মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। সুশিক্ষা মানুষের মনুষত্যকে এমনভাবে জাগিয়ে তোলে যে তার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ সম্পাদন হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

---

২১ আব্দুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম, শেখ শাহবাজ রিয়াদ, *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০১২, পৃ : ৮ - ৯

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ১.২.১ ইসলামী শিক্ষার পরিচয় :

ইসলামী শিক্ষা বলতে মূলতঃ তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষাকে বোঝায়। এ শিক্ষার মূল উৎস দু'টি আল-কুরআন ও আল-হাদীস। এ দু'টি নীতি অনুসারণের মাধ্যমে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে, এরই নাম ইসলামী শিক্ষা। এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তণকারী মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমন্বয় সাধনের এ ধারাবাহিকতাও তখন থেকেই শুরু হয়। মহানবী  (সা.) এর জীবদ্দশায় স্বয়ং তিনিই শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। আর সাহাবায়ে কিরাম তাঁর ছাত্র হিসেবে আল-কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞান গরিমা ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হন।

ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানিক রূপই হচ্ছে 'মাদরাসা শিক্ষা' ব্যবস্থা। 'ইসলামী শিক্ষার অনানুষ্ঠানিক উপ-আনুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারা পার হয়েই মাদরাসা শিক্ষার পূর্ণতা আসে। মাদরাসা শব্দটি 'দারসুন' বা শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ থেকে এসছে। এর একবচন মাদরাসা এবং বহুবচনে মাদারিস। এই হিসেবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্থানকে মাদরাসা বলা হয়।' [২২] 'মাদরাসা শিক্ষা বলতে বুঝায় কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক শিক্ষা' ।[২৩] 'মাদরাসা শিক্ষায় 'ইলম' হচ্ছে তাক্বওয়ার জন্য ভিত্তি এবং আল্লাহকে ভয় করার জন্য শর্ত' ।[২৪] 'মাদরাসা শিক্ষার সার্বিক অর্থ দারস বা বক্তৃতা দেওয়া ও শুনা (উভয় অর্থই প্রকাশ পায়) 'মাদরাসা' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ব্যাপক সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে, উস্তাদ কর্তৃক ছাত্রদের সুনির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে শিক্ষা দানের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে মাদরাসা বলা যায়। তবে বর্তমানে প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষার মূল কথা হলো : উক্ত নিয়মে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে শিক্ষার প্রচলন হয়েছে, তাই মাদরাসা শিক্ষা'। [২৫] মাদরাসা শব্দটির শাব্দিক বিশ্লেষণ আরবি বিভিন্ন অভিধানে পাওয়া যায়। সামান্য পার্থক্য ব্যতিত সকল অভিধানবেত্তাগণই প্রায়ই একই অর্থ প্রকাশ করেছেন :[২৬]

تعريف ومعنى مدرسة في قاموس المعجم الوسيط

اللغة العربية المعاصرة، المرائد، لسان العرب، القاموس

---

২২ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৭শ খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ ইং, পৃ.২৬৫
২৩ আল কুরআন, ৪ঃ ১১৩
২৪ হযরত মাওলানা, আশরাফ আলী থানভী (র.), *আল এলমু ওয়াল উলামা*, রশিদিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, ২০১৬, পৃ : ১১
২৫ ড. মো. আব্দুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, ই.ফা.বা.,, প্রকাশ ২০০৪, ঢাকা, পৃ : ৮
২৬ www.almaany.com

المحيط. قاموس عربي عربي

1* مدرسة الإحياء والبعث (المعجم عربي عامة)

مدرسة أدبية عربية ساعدت على نهضة الأدب،

رائدها البارودي.

* مدرسة فكرية (المعجم عربي عامة)

مجموعة من الفلاسفة والفنانين والكتاب الذين تعكس

أفكارهم وأعمالهم وأساليبهم أصلاً مشتركًا أو تأثير....

* مدرسة (المعجم الغني)

جمع: مدارس. (درس) يتعلم في المدرسة: مُؤَسَّسَةٌ تَعْلِيْمَةٌ.....

مدرسة (المعجم اللغة العربية المعاصر)

مدرسة: جمع مدارسُ: مكان الدَّرسِ والتعليم: مدرسة إعداديَّة/ ثانويَّة

المدرسة الإشراقية (المعجم عربي عامة)

مدرسة ترى أن المعرفة تتم عن طريق ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضاتها بالإشراقات على النفوس...

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদরাসার ধারণা বর্ণিত হয়েছে এভাবে : [২৭]

---

[২৭] মাদরাসা গমনে অনিচ্ছুক শিশু-কিশোরদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মানোর জন্য সৌদি আরব ভিত্তিক সংস্থার ওয়েব পেইজ হবে। https://ar.m.wikipedia.org

المدرسة هي مؤسسة تعليمية يتعلم فيها التلاميذ الدروس بمختلف العلوم وتكون الدراسة بها عدة مراحل وهى الابتدائية والمتوسطة أو الإعدادية والثانوية وتسمى بالدراسة الأولية الإجبارية فى كثير من الدول.... خلال هذه المرحلة يكتسب الطفل أسس تعلم القراءة والكتابة والحساب.

শিক্ষাকে আরবী ভাষায় 'ইল্‌ম' বলা হয়। 'ইল্‌ম' অর্থ জ্ঞান, বিশ্বাস, কোন জিনিসকে তথ্যসহকারে জানা ইত্যাদি। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে ইলম এমন জ্ঞানকেই বুঝায় যা নবীর মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং যাকে মানুষের বুদ্ধি আবিস্কার করতে পারে না।

'ইলম দুই প্রকারে লাভ হতে পারে। প্রথম প্রকার চর্চা বা শিক্ষার দ্বারা লাভ করা যায়। একে 'ইলমে হুসলী বা 'ইলমে কসবী বলা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার 'ইলম আল্লাহর পক্ষ হতে সরাসরি প্রাপ্ত। একে 'ইলমী ওয়াহবী বলে।

'ইলমে ওয়াহবী আবার দুই প্রকারে হাসিল হতে পারে। প্রথমত, ফেরেশতার মারফত অহী দ্বারা। একে 'ইলমে নববী বা ইলমে নবূওত বলা হয়। আর দ্বিতীয়ত ইলহাম দ্বারা। এর নাম ইলমে লাদুন্নী। ইলমে লাদুন্নী নবী ও অলী উভয়েই লাভ করতে পারেন। অহীর ইলম নিঃসন্দেহে পরিস্ফুট কিন্তু ইলহামের ইলম তদ্রুপ নয়। সুতরাং ওহী যে ইলহাম হতে উত্তম তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। নবীর ইলহাম ব্যতীত অপর কারও ইলহাম শরীয়তের দলীল হতে পারে না।

ইলম চার প্রকার। ফরয, মুস্তাহাব, মুবাহ এবং হারাম। 'ফরয ইলম আবার দু'ভাগে বিভক্ত' : ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া। যা নর ও নারী প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য তাই ফরযে আইন। যেমন ঈমান, নামাজ, রোযা প্রভৃতির ইলম। বালেগ হওয়ার পরই প্রত্যেকের জন্য কালেমা ও ঈমান সম্পর্কীয় জরুরী বিষয়গুলোর ইলম অর্জন করা ফরয। অতঃপর যখনই দ্বীনের যে বিষয়ের আবশ্যক হবে সে বিষয়ের ইলম লাভ করা ফরয। আর যে ইলম সকলের মধ্যে কতক লোকে শিক্ষা করলেই চলে তাই ফরযে কিফায়া। আর যে ইলম সকলের মধ্যে কতক লোকে শিক্ষা করলেই চলে তাই ফরযে কিফায়া। যেমন কুরআন ও হাদীস হতে আহকাম বের করার উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীসের ইলম লাভ করা। এছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে সকল বিদ্যার প্রয়োজন তা অর্জন করাও ফরযে কিফায়া। যেমন চিকিৎসা বিদ্যা এবং আবশ্যকীয় শিল্প বিদ্যা। আবার ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে, সময়, সুযোগ ও সুবিধা থাকলে আবশ্যকতা দেখা দেয়ার পূর্বেই সে সম্পর্কে ইলম অর্জন করা মুস্তাহাব। আর যে বিদ্যার মধে ভাল দিকও নেই, মন্দ দিকও নেই, তা অর্জন করা মুবাহ। আর যে সমস্ত বিদ্যা মানুষকে আল্লাহ হতে দূরে

সরিয়ে রাখে এবং অন্যায়ের প্রতি প্রলুব্ধ করে, তা অর্জন করা হারাম। যেমন- যাদুবিদ্যা, ভোজবাজি ইত্যাদি। [২৮]

ইলম অর্থ সমস্ত মূল বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন, অনুভূতি লাভ। ইলম শব্দটি আলামত হতে নির্গত। আলামতের দু'ধরনের অর্থ হতে পারে। (ক) 'দালালাত' তথা কোন বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে বুঝানো আর ও (খ) 'ইশারাত' তথা কোন জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করা। আল ইলম হলো একটি পরিভাষা। এর দ্বারা ইসলাম সম্পর্কিত ইলম বুঝায়। অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে জরুরী 'ইলম অর্জন না করলে কোন লোকই ইসলাম পালন করতে পারে না। ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করা সম্ভব হয় না।[২৯]

### ১.২.২ আল-কুরআন ও আল-হাদীসে ইসলামী শিক্ষা :

#### শিক্ষা সম্পর্কে আল কুরআন

শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধির মূল উৎস হলেন মহান আল্লাহ। নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর তরফ হতে মানুষের কাছে শিক্ষা ও জ্ঞান পৌঁছে। আল্লাহ হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে। এভাবে বিকশিত বুদ্ধি দ্বারা মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে থাকে। মানুষের সামনে তখন আল্লাহর সৃষ্টি রাজ্যে লুক্কায়িত অনেক রহস্যের দ্বারা উদঘাটিত হয়। অজানা বহু বির্ষ সম্পর্কে মানুষ জ্ঞান লাভ করে। সে অনেক কিছু আবিস্কার করে এবং পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলে। অতএব, আল্লাহ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান বলেই মানুষ পৃথিবীকে সুশোভিত, সুসজ্জিত এবং সৌন্দর্যমন্ডিত করতে সক্ষম হয়েছে।

মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি রাজ্যের যাবতীয় জীবজন্তু, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-তরু, আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, বস্তু-পদার্থ প্রভৃতি সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান দান করেছিলেন। তাঁর মগজে আল্লাহ সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানের বীজ রোপণ করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় আদম সন্তানেরা তাদের আদি পিতার মগজে রোপিত জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে এ জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। আল্লাহর নিকট হতে সরাসরি প্রাপ্ত এ জ্ঞানের কারণেই আদম ও বনী আদম, ফেরেশতামন্ডলী এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে।[৩০] এ মর্মে মহান আল্লাহ কালামে পাকে ইরশাদ করেছেনঃ

---

[২৮] মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, *মেশকাত শরীফ*, ২য় খণ্ড, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৭, পৃ. ৩-৪

[২৯] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩, পৃ. ১৯৭।

[৩০] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আখলাকে ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ . ৯৮।

* وَعَلَّمَ اٰدَمَ الۡاَسۡمَاۤءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى الۡمَلٰٓـئِكَةِ فَقَالَ اَنۡۢبِـئُوۡنِىۡ بِاَسۡمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ–

قَالُوۡا سُبۡحٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَلِيۡمُ الۡحَكِيۡمُ–

"আল্লাহ আদম (আ) কে সবকিছুর নামধাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের সামনে তা পেশ করলেন। তারপর বললেন, তোমরা যদি তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকে; তাহলে আমার কাছে এ সবগুলো নামধাপ বল দেখি। ফেরেশতারা বললেন, হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যে জ্ঞানদান করেছেন, তাছাড়া আমাদের আর কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী।[৩১] লেখাপড়া বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান অর্জনের আদেশ দান করে ঘোষনা করেছেনঃ

* اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِىۡ خَلَقَ–خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ – اِقۡرَاۡ وَرَبُّكَ الۡاَكۡرَمُ الَّذِىۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِ–عَلَّمَ

الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ–

"পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন এক বিন্দু জমাট রক্ত হতে। পাঠ কর, আর জেনে রাখ যে, তোমার প্রভু মহামহিম। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। তিনিমানুষকে সে সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।[৩২]

বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হলেন নবী ও রাসূলগণ। যুগে যুগে মানুষেরা তাঁদের মাধ্যমেই পকৃত শিক্ষা লাভ করেছে। নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহ তাঁকে সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর শিক্ষাদানের পাঠ্যসূচিও আল্লাহ পাকই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো, তাদেরকে পবিত্র করা এবং কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া। এ মর্মে কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

* هُوَ الَّذِىۡ بَعَثَ فِى الۡاُمِّيّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيۡهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ–

[৩১] আল কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াত ৩১-৩২
[৩২] আল কুরআন, সুলা আলাক, আয়াত ১-৫

তিনিই মহান আল্লাহর যিনি উম্মী লোকদের মাঝে তাদের মধ্য হতেই একজনকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শোনান, আর তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দান করেন।[৩৩]

লেখাপড়া, বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য কিতাব বা গ্রন্থ অপরিহার্য। তাই মহান আল্লাহ বিশ্বনবী (সা.) কে এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘোষনা করলেনঃ

*كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ –

“এটা একটি কিতাব। যা আমি আপনার কাছে নাযিল করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, এর মাধ্যমে আপনি মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোর দিকে বের করে আনবেন।”[৩৪]

নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য লেখাপড়া করা, বিদ্যা শিক্ষা করা এবং জ্ঞান অন্বেষণ করা অপরিহার্য। কেননা এ ছাড়া মানুষের পূর্ণতা লাভের জন্য আর কোন বিকল্প পথ নেই। সুতরাং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি তা আর ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মহান আল্লাহ কালামে পাখে ইরশাদ করেছেনঃ

*يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا –

“আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা করেন, জ্ঞান দান করেন। আর যাকে জ্ঞান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়ে থাকে।”[৩৫]

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্যে। আর ইবাদতের সারবস্তু হলো আল্লাহর ভয়। যাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় আছে, তারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইবাদত করে। আর যারা জ্ঞানী, কেবল তারাই আল্লাহকে ভয় করে থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেনঃ

*اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓءُ –

“আল্লাহকে কেবল তাঁর সেই বান্দারাই ভয় করে থাকে যারা জ্ঞানবান।”[৩৬][২২]

---

[৩৩] আল কুরআন, সূরা আল জুমু'আ, আয়াত-২

[৩৪] আল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, আয়াত-১

[৩৫] আল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ্, আয়াত-২৬৯

[৩৬] আল কুরআন, সূরা ফাতির, আয়াত-২৮

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা দান করেছেন। আর সমগ্র মানবজাতির হেদায়েতের জন্য তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর কুরআন নাযিল করেছেন। আর নিঃসন্দেহে এটা বান্দার প্রতি তাঁর অপর করুণার নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদ ইরশাদ হয়েছেঃ

*اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ – خَلَقَ الْاِنْسَانَ – عَلَّمَ الْبَيَانُ –

"পরম করুণাময় আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাকে বর্ণনা রীতিও শিক্ষা দিয়েছেন।"[৩৭]

যারা বিদ্যা শিক্ষা করে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে কেবল তারাই সৃষ্টি রাজ্যের রহস্য উপলব্ধি করতে পারে। তারা অনেক অজানা বস্তুকে জানতে পারে। আর যারা বিদ্যা শিক্ষা করে না, তারা এ থেকে চিরবঞ্চিত। কাজেই বিদ্বান ও মূর্খ কখনও সমান হতে পারে না। আল্লাহ পাক বলেনঃ

*قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ –

"হে রাসুল! আপনি বলে দিন, যারা জ্ঞান লাভ করে আর যারা করে না, তারা কি কখনও সমান হতে পারে?"[৩৮]

যারা শিক্ষা অর্জন করে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাদের সম্মুখে সৃষ্টি রাজ্যের রহস্যাবলীর দ্বারা উন্মোচিত হয়। একমাত্র বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যাক্তিরাই এর সন্ধান পেয়ে থাকে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে ঘোষনা করেছেনঃ

*اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ –

"নিশ্চয়ই আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যে এবং দিন ও রাতের আবর্তনের মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।[৩৯]"

*وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ –

[৩৭] আল কুরআন, সূরা আর রহমান, আয়াত-১-৪
[৩৮] আল কুরআন, সূরা যুমার, আয়াত-৯
[৩৯] আল কুরআন, সূরা আল ইমরান, আয়াত-১৯০

"মহান আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যসমূহের মধ্যে একটি হলো আসমান ও যমীন সৃষ্টি এবং তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞান-সাধকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।"[৪০]

* فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ -

"ঐ তো তাদের ঘরবাড়ি সবই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে। এ হলো তাদের জুলুমের পরিণাম। নিঃসন্দেহে এতে এক বড় নিদর্শন রয়েছে ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা জ্ঞান-সাধনা করে।"[৪১]

* هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ -

"তিনি সূর্যকে তেজস্কর এবং চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন এবং তারা কক্ষপত নির্ধারিত করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময় নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ করতে পার। আল্লাহ এ সব অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। এ সকল নিদর্শন আল্লাহ ঐ সম্প্রদায়ের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করেন যারা জ্ঞানচর্চা করে।"

মহান আল্লাহ উল্লেখিত আয়াতসমূহে বিদ্যা শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। জ্ঞান অন্বেষণের জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার পর মানুষকে তিনি জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করারও নির্দেশ দান করেছেন। তিনি বলেনঃ

* وَقُلْ رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا -

"তুমি বল, হে পরোয়ারদেগার! আপনি (মেহেরবানী করে) আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।"[৪২]

কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার পর অনেক শিক্ষার্থী গবেষনাকর্মে আত্মনিয়োগ করে। এ শ্রেণীর গবেষক শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষন করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

* وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

---

[৪০] আল কুরআন, সূরা রূম, আয়াত-২২
[৪১] আল কুরআন, সূরা নামাল, আয়াত-৫২
[৪২] আল কুরআন, সূরা তা-হা, আয়াত-১২৪

"আর আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য হতেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে সেই সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তা ভাবনা ও গবেষনা করে।"[৪৩]

*وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ -

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আর একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখিয়ে থাকেন, যাতে ভয়ও থাকে আবার আশাও থাকে। আর তিনি অসমান হতে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে এর মৃত্যুর পর সজীব করেন। এতে ঐসব লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে যারা জ্ঞান রাখে।"[৪৪]

মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল ও শিল্প নৈপুণ্যের প্রতি গবেষণায় লিপ্ত বিদ্যার্থীদের মনোযোগ আকর্ষন করে কুরআন মজীদে আরও ইরশাদ করেনঃ

*اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ - وَاِلَى السَّمَاۤءِ كَيْفَ رُفِعَتْ - وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ - وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ -

"তারা কি উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কি বিচিত্ররূপে তা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আসমানের দিকে যে, কেমন করে তা উঁচু করা হয়েছে? আর পর্বতমালার দিকে যে, কিরূপে তাকে দাঁড় করানো হয়েছে? আর যমীনের দিকে যে, কিভাবে যমীনকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে?"[৪৫]

---

[৪৩] আল কুরআন, সূরা রূম, আয়াত-২১
[৪৪] আল কুরআন, সূরা রূম, আয়াত-২৪
[45] আল কুরআন, সূরা গাশিয়াহ, আয়াত-১৭-২০

*اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا – وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا – وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا – وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا – وَّجَعَلْنَا
الَّيْلَ لِبَاسًا – وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا – وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا – وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا – وَّاَنْزَلْنَا
مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاۤءً ثَجَّاجًا – لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا – وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا –

"আমি কি যমীনকে বিছানাস্বরূপ এবং পবর্তসমূহকে পেরেকস্বরূপ নির্মাণ করি নি? আমি তোমাদেরকে নর-নারীরূপে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আর আমিই তোমাদের নিদ্রাকে আরামের উপকরণ করেছি। আর রাত্রিকে আরবণের বস্তু বানিয়েছি এবং দিনকে জীবিকা অর্জনের সময় করে দিয়েছি। আর তোমারে উপর সাতটি মজবুত আসমান তৈরি করেছি। আর সূর্যকে এক উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রস্তুত করেছি। আর আমিই পানিভরা মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টিপাত করেছি। সে পানি দ্বারাই আমি শস্য, শাক-সবজী, বৃক্ষ-তরুলতা এবং ঘন উদ্যানসমূহ উৎপন্ন করে থাকি।"[৪৬]

কুরআন মজীদ এবং অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহে তাওহীদ বা মহান আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে যে শাহাদাতে কুবরা বা সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষৎ বর্ণিত হয়েছে, তাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই তার একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ফেরেশতামণ্ডলীও এ সাক্ষ্য দিয়েছেন। সাথে সাথে সর্বকালের জ্ঞানীগণও সত্যনিষ্ঠভাবে এ সাক্ষ্য প্রদানে শরীক হয়েছেন।"[৪৭]

এ মর্মে মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

*شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰۤئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَاۤئِمًا بِالْقِسْطِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ –

"আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আর ফেরেশতামণ্ডলী এবং জ্ঞানীগণও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে একই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী-মহাজ্ঞানী।"[৪৮]

## <u>ইবাদতের উপর ইলমের প্রাধান্য</u>[৪৯]

আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতারাং মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর ইবাদত করা। এই ইবাদত বিশুদ্ধভাবে করার জন্য ইলম অপরিহার্য। কেনান ইলম ব্যতীত ইবাদত করা সম্ভব নয়। তাই হাদীস শরীফে ইবাদতের উপর ইলমের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেনঃ

---

[৪৬] আল কুরআন, সূরা নাবা, আয়াত-৬-১৬
[৪৭] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, মদীনা মোনাওয়ারাঃ ১৪১৩ হিঃ পৃ ১৬৮
[৪৮] আল কুরআন, সূরা আল ইমরান, আয়াত-১৮
[৪৯] ইমাম আবূ হানিফা, *মুনসাদ*, ১ম খণ্ড, অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক, ঢাকাঃ শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ ৫৫

*تدراس العلم ساعة من اليل خير من احيائها -

"রাত্রিতে এক ঘণ্টা ইলম চর্চা করা সারা রাত্রি জেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।"[৫০]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেনঃ

*فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد -

"একজন ফিকহবিদ আলিম শয়তানের বিরুদ্ধেচরণে এক হাজার আবিদের চেয়েও বেশী শক্তিশালী।"[৫১]

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, রাসূলৈ করীম (সা.) বলেছেনঃ

*ان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب -

"পূর্ণিমার রাতে নক্ষত্রমালার উপর পূর্ণ চন্দ্রের যেরূপ মর্যাদা, আবিদের উপর আলিমের মর্যাদা ঠিক তদ্রুপ।"[৫২]

হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) এর নিকট দু'ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। তাদের একজন আলিম এবং অপরজন আবিদ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ

*فضل العالم على العابد كفضلى على ادنا كم -

"তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদা যেরূপ, আলিমের মর্যাদাও আবিদের উপর ঠিক তদ্রুপ।"[৫৩]

হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) এর কাছে বীন ইসরাঈলের দু'ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাদের একজন ছিলেম আলিম। তিনি ফরয ইবাদত করার পর লোকদিগকে শিক্ষা দানরত থাকতেন। আর অপরজন ছিলেন একজন আবিদ। তিনি দিনে রোযা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদত করতেন। রাসূলে করীম (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো এ দু'জনের মধ্যে কে বেশী উত্তম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ

*فضل هذا العالم الذى يصلى المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذى يصوم النهار ويقوم الليل كفضلى على ادنا كم -

"এই যে আলিম ব্যক্তি, যিনি ফরয ইবাদত করার পর বসে যান এবং লোকদিগকে সুশিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকেন, তার মর্যাদা ঐ আবিদ ব্যক্তির উপর যিনি দিনে রোযা রাখেন এবং সারারাত্রি নফল ইবাদত করেন, ঠিক তদ্রুপ যেরূপ তোমাদের সাধারণ লোকদের উপর আমার মর্যাদা।"[৫৪]

---

[৫০] দারেমী, সুনান, ১ম খন্ড, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭
[৫১] ইমাম তিরমিযী (র.), *জামিউত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৭
[৫২] প্রাগুক্ত
[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮
[৫৪] ইমাম দারিমি (র.) *সুনানুদ দারিমি*, ১ম খন্ড, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ১১০

## শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দীন ইসলামকে সঞ্জীবিত রাখা, ইবাদতের নিয়ম-কানুন জানা এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ উদ্ধার করা, নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করা এবং অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা বৈধ নয়।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন :

*من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحى به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة فى الجنة–

"যে ব্যক্তি দীন ইসলামকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে বিদ্যা শিক্ষা করে এবং এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়, বেহেশতে তার এবং নবীগণের মধ্যে মাত্র একটি ধাপের ব্যবধান থাকবে।"[৫৫]

হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন :

*من طلب العلم ليجارى به العلماء او ليمارى به السفهاء و يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار–

"যে ব্যক্তি ঐ উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করে যে, আলিমদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে, অথবা বোকা ও মূর্খ লোকদের সাথে বিতর্ক করবে এবং লোকদের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ করবে, আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।"[৫৬]

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন :

*ان اشر الناس عند الله منزله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه–

"কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত হবে সেই আলিম, যার ইলমের দ্বারা কোন কল্যাণ সাধিত হয় না।"[৫৭]

## শিক্ষার প্রকার

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন :

*العلم علمان فعلم فى القلب فذالك العلم النافع وعلم على اللسان فذالك حجة الله عز و جل على ابن ادم–

---

[৫৫] তদেব, পৃ ১১২

[৫৬] তিরমিযী, জামিউত তিরমিযী, ২য় খণ্ড, আবওয়াবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪; মুফতী ফয়জুল্লাহ, ফয়জুল কালাম, চিটাগাং কুতুবখানায়ে ফয়জিয়া হাটহাজারী, ১৩৯৯ হিঃ পৃ ১৬২

[৫৭] দামেরী, সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪

"বিদ্যা দু'প্রকার। একটি হলো হৃদয়ের বিদ্যা, এটাই উপকারী বিদ্যা। আর অপরটি মৌখিক বিদ্যা, এটা হচ্ছে মানব জাতির জন্য আল্লাহর দলীল।"[৫৮]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলে, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন :

–العلم ثلثة اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل* "বিদ্যা তিন প্রকার। এক ঃ আয়াতে মুহকামাহ অর্থাৎ কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানাবলী। দুইঃ সুন্নাতে কায়েমাহ অর্থাৎ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাত। তিনঃ ফরীযায়ে আদিলাহ অর্থাঃ কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিষয়াদি। এছাড়া আর যা কিছু তা অতিরিক্ত।"[৫৯]

প্রকৃত ইলম ও আলিমের পরিচয়

যে 'ইলমের দ্বারা দীন ও সমাজের কল্যাণ হয়, তাই প্রকৃত ইলম, আর যে আলিম তার ইলম মোতাবেক আমল করে, তিনি হলেন প্রকৃত আলিম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন :

*مثل علم لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه في سبيل الله–

"যে ইলমের দ্বারা কোন কল্যাণ সাধিত হয় না তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ ধনভান্ডার যা থেকে আল্লাহর পতে কিছুই খরচ হয় না।"[৬০]

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেন, হযরত উমর (রা.) হযরত কা'ব আহবার (র.)-কে জিজ্ঞেস করলেন :

*من ارباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء قال الطمع–

"প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী আলিম কারা? উত্তরে তিনি বললেন, যারা নিজেদের ইলম মোতাবেক আমল করেন। হযরত উমর (রা.) আরও জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস আলিমদের দিল হতে জ্ঞান বের করে দেয়? উত্তরে তিনি বললেন, লোব-লালসা।"[৬১]

আহওয়াস ইবনে হাকীমের পিতা বলেন :

*وسأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال لا تسألونى عن الشر وسلونى عن الخير–

يقولها ثلثا ثم قال الا ان شر الشر شرار العلماء وان خير الخير خيار العلماء–

[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ ১১৪
[৫৯] আবূ দাউদ, সুনান, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৯
[৬০] দারেমী, সুনান, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮
[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ ১৫২

"এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.) কে জিজ্ঞেস করেন যে, সবচেয়ে খারাপ মানুষ কে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা আমাকে খারাপ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, বরং ভাল লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর তিনি বললেন, আলিমদের মধ্যে যারা খারাপ তাই হলো সবচেয়ে খারাপ মানুষ। আর আলিমদের মধ্যে যারা ভাল, তারাই সবচেয়ে ভাল মানুষ।"[৬২]

**শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া**

মহানবী (সা.) নিজে শিক্ষা করা এবং অপরকে শিক্ষা দেয়ার প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমিও মরণশীল। এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে আমাকেও একদিন বিদায় নিতে হবে। তোমরাও সকলেই মরণশীল। সুতরাং তোমরা নিজেরাও বিদ্যা শিক্ষা কর এবং অপরকেও শিক্ষা দান কর। কেননা একমাত্র এ প্রক্রিয়াতেই বিদ্যা শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখা সম্ভব। সাথে সাথে তিনি কোথা হতে, কার কাছে থেকে এবং কি কি বিষয় শিক্ষা করতে হবে সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন :

*تعلموا الفرائض والقران وعلموا الناس فانى مقبوض –

"তোমরা অবশ্য করণীয় ফরয আমলসমূহ এবং কুরআন শিক্ষা কর এবং অপর লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও। কেননা আমি মরণশীল।"[৬৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন :

*تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس – وتعلموا القران وعلموه الناس فانى امرء مقبوض والعلم سينقبض ويظهر الفتن –

"তোমরা বিদ্যা শিক্ষা কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও; তোমরা অবশ্য করণীয় ফরয কাজ ও বিষয়গুলো শিক্ষা কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও আর তোমরা কুরাান শিক্ষা কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও। কেননা, আমি তো মরণশীল। আমার পর শীঘ্রই ইলম বিলীন হতে থাকবে এবং তখন ফিতনা-ফাসাদও প্রকাশ পাবে।"[৬৪]

হযরত উসমান (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন :

---

৬২ প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬
৬৩ ইমাম তিরমিযী (র.), *জামিউত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, আবওয়াবুল ফারায়িড, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯
৬৪ দারে আল কুতনী, *সুনান*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত, দারুল মা'রিফা, ১৯৬৬, পৃ ৮১

*خيركم من تعلم القران وعلمه-

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে, কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।"[৬৫]
হযরত ইবনে সিরীন (র.) বলেন :

*ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم -

"প্রকৃতপক্ষে ইলমই হলো দীন। অতএব তোমরা লক্ষ্য রাখবে যে, কার নিকট হতে দীন গ্রহণ করতেছে।"[৬৬]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন :

*كلمة الحكمة ضالة الحكيم - فحيث وجدها فهوا حق بها-

"জ্ঞানপূর্ণ কথা বিজ্ঞানী হারান ধনস্বরূপ। অতএব, সে যেখানেই এটা পাবে, তা গ্রহণ করার জন্য তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"[৬৭]

হযরত উবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন :

*لاحسد الافى اثنين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها-

"দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারও প্রতি হিংসা করা সঙ্গত নয়। একজন সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তা সত্য পথে খরচ করার জন্য তাকে তওফীক দিয়েছেন। আর অপরজন সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ দীন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তদানুযায়ী বিচার-আচার করে এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দেয়।"[৬৮]

## শিক্ষা প্রচারের গুরুত্ব

নবী করীম (সা.) শিক্ষা প্রচারের জন্য জোর তাকীদ দিয়েছেন। কেননা, অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে, যার কাছে শিক্ষণীয় বিষয় প্রচার করা হয়, সে ব্যক্তি প্রচারকের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বের সাথে তা সংরক্ষণ করে থাকে।

---

[৬৫] ইমাম বুখারী (র.), *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, কিতাবু ফাযাইলির কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫২
[৬৬] ইমাম মুসলিম (র.), *সহীস মুসলিম*, ১ম খণ্ড বৈরুত : দারু ইহইয়াউত তুরাসিন আরাবী, তা.বি, পৃ ১৪
[৬৭] ইমাম তিরমিযী (র.), *জামিউত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, আওয়াবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮
[৬৮] বুখারী, সহীহ, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেনঃ

*بلغوا عنى ولو اية–

"তোমরা আমার পক্ষ হতে একটি আয়াত হলেও অপরের কাছে তা পৌছে দাও।"[৬৯]

হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেনঃ

*نضر الله امرأ سمع منا شيأ فبلغه كما سمعه– فرب مبلغ اوعى له من سامع–

"আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির মুখ সজীব ও উজ্জ্বল করুন, যে আমাদের নিকট হতে কোন কিছু শুনলো এবং যেভাবে শুনলো ঠিক সেভাবেই তা অন্য লোকের কাছে পৌছে দিল। কেননা, অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম শ্রোতার চেয়ে পরে যার কাছে তা পৌঁছান হয়, সে-ই এর বেশি সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে।"[৭০]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেনঃ

*من سئل عن علم علمة ثم كتبه الجم يوم القيامة بلجام من نار–

"কোন ব্যক্তি এমন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হল যা সে জানে, কিন্তু সে তা গোপন করলো। কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পেরিয়ে দেয়া হবে।"[৭১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেনঃ

*ان مما يلحق المؤمنين من علمه وحسناته بعد موته علما علمة ونشره–

"কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ইলম ও নেক আমল হতে যা কিছু তার নিকট পৌঁছায় তার মধ্যে একটি হলো ঐ ইলম যা সে শিক্ষা করেছিল এবং অপরের কাছে তা প্রচার করেছিল।"[৭২]

**শিক্ষাদান পদ্ধতি**

শিক্ষাদান কালে সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীর মেধা এবং বোধশক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার সামনে শিক্ষণীয় বিষয় যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে। যার বোঝার ক্ষমতা নেই, এরূফ অনুপযুক্ত ব্যক্তির কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ করা উচিত নয়। শিক্ষার্থীর নিকট প্রত্যেকটি বিষয় তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করবে। তাহলে তার পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। প্রতি সপ্তাহে তিনবারের বেশী শিক্ষাদান করা বাঞ্ছনীয় নয়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি হতে পারে।

---

[৬৯] ইমাম বুখারী (র.), *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৭৫

[৭০] ইমাম তিরমিযী (র.), *জামিউত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪

[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩

[৭২] *বায়হাকী*, শুআবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৮

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন :

*علموا و يسروا ثلاث مرات–

"তোমরা শিক্ষাদান কর এবং এতে সহজ পন্থা অবলম্বন কর। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।"[৭৩]
হযরত আনাসক (রা.) বলেন :

*كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه–

"নবী করীম (সা.) যখন কোন কথা বলতেন, তিনি তা তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে তাঁর কথা ভালভাবে বোঝা যেত।"[৭৪]

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন :

*وضع العلم عند غير اهله كمقلد الخنازير واللؤلؤ والذهب–

"যে ব্যক্তি কোন অনুপযুক্ত লোকের কাছে ইলম উপস্থাপন করে, সে যেন শূকুরের গলায় মণিমুক্তা এবং স্বর্ণের মালা ঝুলায়।"[৭৫]
হযরত আ'মাশ (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেনঃ

*افة العلم النسيان واضاعته ان تحدث به غير اهله–

"ইলমের আপদ হলো ভুলে যাওয়া, আর অনুপযুক্ত ব্যক্তির কাছে ইলমের কথা বলা হচ্ছে ইলম ধ্বংস করা।"[৭৬]
হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন :

* حدث الناس كل جمعة مرة فان ابيت فمرتين فان اكثرت فثلاث مرات ولاتمل الناس بهذا القران–

"লোকদেরকে সপ্তাহে একবার নসীহত কর। এতে তৃপ্ত না হলে দু'বার কর। যদি আরও বেশী করতে চাও, তাহলে তিনবার পর্যন্ত করতে পার। সাবধান, এ কুরআনের দ্বারা লোকদেরকে বিরক্ত করো না।"[৭৭]

[৭৩] ইমাম বুখারী (র.), *আল আদাবুল মুফরাদ*, ৩য় খন্ড, বৈরুতঃ দারুল বাশায়েরিল ইসলামিয়া, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃঃ ৪৪৭
[৭৪] ইমাম বুখারী (র.) *সহীহুল বুখারী*, ১ম খন্ড, কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০
[৭৫] ইবনে মাজাহ (র.), *সুনান*, ১ম খন্ড, কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১
[৭৬] দারিমী, *সুনান*, ১ম খন্ড, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৮
[৭৭] ইমাম বুখারী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৩৪

### ১.২.৩ ইসলামী শিক্ষার পরিধি :

ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে স্বীয় ঐতিহ্যে পরিচালিত পরিপূর্ণ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিচালিত সকল বিষয় এখানে বিদ্যমান। তবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কারণ অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থায় যে শক্তিকে 'প্রকৃতি ' বলে উল্লেখ করা হয়, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় তাকে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহ' (Almighty Allah)বলে উল্লেখ করা হয়।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মুল দর্শন "ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান" (Islam is a compleate code of life) এর আলোকে বিন্যস্ত। ফলে তাওহীদ রিসালত, আখিরাত, খিলাফত ইখওয়াত, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, নিরাপত্তা, সৎকাজে আদেশ,অসৎ কাজে নিষেধ এবং পরস্পরকে জ্ঞান দানের ব্যবস্থা এখানে বিদ্যামান রয়েছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করে মানুষকে বস্তুবাদী দর্শনের দিকে ধাবিত করে। ফলে তারা ধর্ম ও ভাল মন্দের তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্রের গোলামে পরিণত হয়। এতে শ্রেণী বৈষম্য তৈরি হয়। ব্যক্তি স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়ে এক ধরণের হতাশাপূর্ণ ও একঘেয়েমীপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দেয়। এমনিভাবে গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নামেও পৃথিবীতে আরেকটি ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয় না। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা উপেক্ষিত হয়ে মানুষ জাতিগত ও দেশগত শ্রেণী বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়। অথচ ইসলামী শিক্ষা মানবিক মূল্যবোধ ও বিশ্বভাতৃত্বের অনুপম আদর্শ দ্বারা দুনিয়ার জীবনে সাফল্য লাভের পাশাপাশি পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভের জন্য পথ নির্দেশ করে। অন্য কথায়, ইসলামী শিক্ষা মানবীয় গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর সৎ বান্দা হিসেবে তৈরি করে দেয়।

তাছাড়া বিজ্ঞানের যত শাখা অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থায় নির্ণয় করা হয়েছে, ইসলামী শিক্ষায়ও তা যথাযথ রয়েছে। রসায়ন, জীব, পদার্থ, তড়িৎ বিদ্যাসহ বিজ্ঞানের সকল শাখার বিষয়ে কুরআন হাদীসে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানুষের সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরিচালনার জন্য কলা ও সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনা 'ইসলামী শিক্ষায়' যথাযথ ভাবে আলোচিত হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামীর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ইসলামী শিক্ষায় ইতিহাস বিষয়কে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ১.৩.১ ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ :

ইসলামী শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান তথা মাদরাসা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠান দারুল আরকাম[৭৮]। এ প্রতিষ্ঠানে মহানবী (সা.) শিক্ষা দিতেন এবং পরবর্তীকালে নিয়মিত ভাবে শিক্ষাদানের জন্য তিনি কতিপয় সাহাবীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক এ অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষার অবস্থা আলোচনার পূর্বে ইসলাম পূর্ব শিক্ষা ব্যবস্থা আলোচনা পেশ করা প্রয়োজন।

মহানবী'র (স.) নবুওয়াত লাভের পূর্বের প্রায় পাঁচ শতাব্দী কালকে আইয়্যামে জাহিলিয়াত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ সময়ও আরবদের মাঝে যোগ্যতা ও দক্ষতার অসাধারণ সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে ইসলামের অভ্যুদয়ের পর তাদের এ অসাধারণ যোগ্যতা মহানবী (স.) কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিত হয়ে মূল্যবান নৈতিক মানসম্পন্ন ও উন্নত মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের সে শিক্ষা শুধু পুঁথিগত শিক্ষা বা বিদ্যা হিসেবেই বিবেচিত হয়নি বরং তা সমাজ, সংস্কৃতি এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগের বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। যা ছিল বিশ্বাবাসীকে হতবাক করার জন্য এবং দলে দলে ইসলামে আকৃষ্ট করার জন্য এক বিস্ময়কর অবস্থা। শতধা বিভক্ত, পাপ পংকিলতায় নিমজ্জিত এবং চারিত্রিক অধপতনে চরম বিপর্যস্থ আরব বেদুঈনরা সেদিন এ শিক্ষা লাভের ফলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

ইসলাম পূর্ব আরবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন খুব একটা ছিলনা। মহাগ্রন্থ আল-কুরাআন ও আল-হাদীস এদেরকে উম্মী হিসেবে অভিহিত করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিলনা, তেমনি গোটা দুনিয়ায় মুদ্রণ যন্ত্রেরও প্রচলন ছিল না তারপরও আরব কবিগণের কাব্য শৈলী ও ভাষার উচ্চাঙ্গতা লক্ষ্য করলে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। তাদের সাহিত্য ভান্ডারের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সাধারণ যে কোন বিষয়ের উপমা উপস্থাপনার দিক বিচারে আধুনিক ভাষা সাহিত্য তাদের সাহিত্য কর্মের কাছে হার মানতে বাধ্য।

জাহিলী যুগে পরিমাণে কম হলেও কিছু বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। সে সময়কার সর্ববৃহৎ 'ওকায' মেলায় সাহিত্য সমাবেশ হতো। বাল্য বয়সে মহানবী (সা.) একবার ইয়াহুদীদের

---

[৭৮] দারুল আরকাম : মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । বিশিষ্ঠ সাহাবী হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকাম (রা.) এর বাড়িতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মক্কায় নব দীক্ষিত মুসলিমদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য তিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ডঃ আব্দুস সালাম হারুন, *সিরাতে ইবনে হিসাম* (সংক্ষিপ্ত) কুয়েত দারুল বহুছ আল ইসলামিয়াহ্ ১৯৮৪ খৃ. পৃ.৪৯

একটি বিদ্যালয়ে গমন করেছেন বলে হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎকালীন আরবে নামী দামী কবিদের কবিতা গুচ্ছ দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা হতো। আল-সাবউল মুয়াল্লাকাত বা 'ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তক' আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে। তখনকার তায়েফের অধিবাসী গায়লান ইবন সালমাহ আল-সাকাফী সপ্তাহে একদিন সাহিত্য সভার আয়োজন করতেন। হারিছ ইবন কালদাহ (মৃ. ১৩ হিজরী) নামক জনৈক চিকিৎসা বিজ্ঞানী চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত একখানি গ্রন্থ সে সময়েই রচনা করেন। ইবন আবি রুমিয়্যাহ আল-তামিমী এবং নযর ইবনুল হারিছ, ইবনুল কালদাহ তখনকার চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিংবদন্তী ছিলেন। সে সময়ে নারী শিক্ষার যৎসামান্য প্রচলন ছিল। উম্মুল মো'মেনীন হযরত হাফসা (রা.) ও হযরত উম্মে সালমাহ (রা.) লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁদের এ শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক ছিল না; ব্যক্তি উদ্যোগেই তাঁরা শিক্ষা লাভ করেছিলেন।[৭৯]

মহানবী (সা.) বাল্যকালে পিতা-মাতা হারানোর কারণে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। কিন্তু চারিত্রিক মাধুর্যতার বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে বয়স চল্লিশ পৌছালে মহানবী (সা.) এর উপর অহী[৮০] নাযিলের যে ধারা শুরু হয়, তার প্রথম কথা ছিল 'ইকরা' (পড়ুন)। কালামে পাকের এ সম্পার্কিত বাণীর (অর্থ) "পড়ুন ( হে নবী) আপনার প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তবিন্দু থেকে পড়ুন, আপনার বর বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। যিনি মানুষকে এমন সর্ব বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন, যা সে জানতো না [৮১]।" প্রথম অহী নাযিলের পর পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাকে এ শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্যও আদেশ দান করেন। এরশাদ হচ্ছে, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এভাবে যে, তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। [৮২]

রিসালতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পর দ্বীন প্রচার করার অংশ হিসেবে মহানবী'র উপর শিক্ষা ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা দানের বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়। ফলে তিনি শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান গরীমা, সত্যতা ও সংস্কৃতিতে উন্নয়ন সাধনের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি মক্কার নও-মুসলিমদের শিক্ষার জন্য হযরত আরকাম ইবনুল আবিল আরকাম (রা.) এর বাড়ীটি নির্ধারণ করেন। মুসলিমগণ এখানে প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে বাড়ী ফিরে যেতেন। যেখানেই মুসলমানগণ ইসলাম গ্রহণ সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন সেখানেই তিনি শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আরকাম শপথের সময় কিছু

---

৭৯ ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশ ২০০৫, পৃ : ১৪-১৫

৮০ অহীঃ অর্থ ইশারা করা, কিছু লিখে পাঠানো, কোন কথাসহ লোক প্রেরণ, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাহাকেও কিছু জানিয়ে ইসমলামী পরিভাষায় মোহাম্মদ (স) উপর আল্লারহ'র পক্ষ থেকে উীব্রাঈল (আ)এর মাধ্যমে নাযীলকৃত ঐশীবাণীকে অহী বলা হয়। ইবনে হাজার আসকালানী, *উমদাতুল ক্বারী* (প্রথম খন্ড) (দিল্লী তা.বি) পৃ.১৪।

৮১ আল-কুরআন, ৯৬ঃ১-৫

৮২ আল্-কুরআন, ৩ঃ১৬৪

সংখ্যক মদীনাবাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে তাঁদরে শিক্ষা দানের জন্য মহানবী (সা.) হযরত মুস'আর ইবন 'উমাইর (রা.) -কে প্রেরণ করেন। তিনি মদীনায় (ইয়াসরিব) এসে মুসলমানদেরকে কুরআন সুন্নাহ ও ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান শিক্ষা দানের মহান দায়িত্ব পালন করেন। একই সাথে তিনি তৎকালীন ইসলাম বিদ্বেষীদের নানা যুক্তি তর্কের জবাব দিয়ে ইসলামকে শাশ্বত জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও পালন করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওতের প্রথম দিকে তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামের বুনিয়াদী জ্ঞান ও ইবাদাতের শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ সময়কার পাঠ্যসূচিতে আল কুরআনই অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাছাড়া কিছু সংখ্যক সাহাবীকে তিনি আল-কুরআনের লিপিকার নিয়োগ করার ফলে তাঁদেরকে হস্তলিপিবিশারদ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। হযরত উমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ কালে তার বোন ফাতিমার নিকট সূরা ত্বাহা'র লিখিত হস্তলিপি পাওয়া গিয়েছিল। অর্থ্যাৎ ইসলামী শিক্ষার পাঠ্য বইয়ের পরিবর্তে কুরআনের খন্ডগুলোকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

মহানবী (সা.) এর ঐতিহাসিক হিযরতের পরবর্তী সময়ে মদীনায় মসজিদে নববী নির্মাণ করার পর একে ইবাদতখানার কাজে ব্যবহার করার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেন। প্রথমত হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (রা.) মসজিদে শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে আরও শিক্ষক নিয়োজিত হন। হযরত 'উবাদা ইব্ন ছামিত তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইসলামী শিক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্নভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কিছু যুদ্ধবন্ধী মুসলমানদের হাতে আসে। মহানবী (সা.) তাদের মুক্তির জন্য শর্ত জুড়ে দেন। তিনি "প্রতিজন যুদ্ধবন্দীর মুক্তির জন্য দশজন মুসলমানকে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। হযরত যায়িদ বিন ছাবিত (রা.) এ পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন।

মদীনায় হিযরত পরবর্তী সময়ে মহানবী (সা.) বাইরে থেকে আগত মুহাযির এবং মদীনার বাস্তহারা লোকদের জন্য মদীনার মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় একটি শিক্ষালয় গড়ে তোলেন। এ শিক্ষালয়ে আবাসিক ব্যবস্থাও চালু করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'সুফফা'[৮৩] নামে পরিচিতি লাভ করে। এখানে অবস্থান করে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীগণ কুরআন, হাদীস, তাজবীদ ও দ্বীনের বুনিয়াদী শিক্ষা লাভ করতেন। এই শিক্ষালয়ে আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয়াবলীর উপর শিক্ষা দেয়া হতো। কারণ কুরআনে পাকে মানুষের ইহকাল ও পরকালের সকল দিকের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। কুরআনে পাক বিশুদ্ধভাবে পড়ায় যাঁরা পারদশী হতেন তাদেরকে 'ক্বারী' বলে অভিহিত করা হতো। সুফ্ফার এই শিক্ষালয়ের আবাসিক শিক্ষার্থীদের খাওয়া দাওয়ার জন্য শহরের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের উপর দায়িত্ব অর্পণ

৮৩ সুফ্ফঃ ধাতুগত অর্থে রেশমী কাপড় বা পরিচ্ছন্ন অর্থে গ্রহণ করা হয়। মহানবী (স) এর সময়ে মসজিদে নব্বীর প্রাঙ্গনে কিছু সাহাবী সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করতেন, যাঁরা আহলে সুফ্ফা নামে পরিচিত। ইসলামের ইতিহাসে এখান থেকেই সুফীবাদ শব্দটির উৎপত্তি। কেননা সুফীগণ পবিত্র আত্মার অধিকারী। আল-কাওানী, *আল-তারতীব*, ইদারীয়া, ১ম খ, পৃ-৪৮২

করা হয়। সেখানকার শিক্ষার্থীদের অনেকেই নিজের উপার্জনের অর্থ দ্বারাই খাওয়া দাওয়ার ব্যয় নির্বাহ করতেন। অন্যের সাহায্য নিতে তারা পছন্দ করতেন না। কাঠ কাটা, পানি সরবরাহ করা, ব্যবসা করা ইত্যাদি কাজ করার মাধ্যমে তারা অর্থ উপাজন করে আবাসিক শিক্ষার্থীদের খরচ নির্বাহ করতেন। শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল। ফলে তারা একজন আয় করে অন্য জনের খরচ চালাতেন।

মহানবী (সা.) মানুষের সকল কর্মকান্ডের আদর্শ। তাই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রথম পর্যায়ে তিনি যে সব নিয়ম ও কানুন প্রবর্তন করেছেন তাও ছিল বিস্ময়কর। শিক্ষা লাভের উপায় ও উপকরণের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তিনি বাস্তবতার নিরীখে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 'সুফ্ফার' আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করণের জন্য রাসূল (সা.) একজন আরিফ বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) ও মা'আয বিন জাবাল (রা.) কে আ'রীফের দায়ত্ব প্রদান করেন। মহানবী (সা.) যুগের যে কয়জন ক্বারী, মুফাস্সির, মুহাদদিস, মুফতী ও শিক্ষাবিদ সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যায়। তারা এ শিক্ষায়তনের ছাত্র ছিলেন। প্রথম দিকে এখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল বিশ থেকে পঁচিশ জন, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী প্রতিনিধি দল বা বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এই বিদ্যালয় হতে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হাসিল করে নিজেদের এলাকায় গিয়ে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করতেন।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিভিন্ন এলাকায় আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। যে সব এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া বা শিক্ষক ও প্রশিক্ষক প্রেরণ করার সুবিধা ছিল না, তাদেরকে মদীনায় এসে শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হতো। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মহানবী (সা.) কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ছিল উন্নত । তাই লোকেরা আগ্রহ সহকারেই দ্বীনের নানা বিষয় নিখুঁতভাবে শেখার জন্য মদীনায় চলে আসতেন। মহানবী (সা.) নিজেই ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত মহান শিক্ষক।

তিনি শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের কাজকে অধিকহারে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। জ্ঞানার্জনের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান মদীনা বা তার আশে পাশে গড়ে উঠেছিল, তিনি এগুলোকে নিজে নিয়মিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করতেন। মসজিদে কুবায় তিনি প্রতি সপ্তাহে গমন করে খোঁজ খবর নিতেন। এছাড়াও তিনি নব প্রতিষ্ঠিত মসজিদসমূহে ইমাম নিয়োগকালে ধর্মীয় বিধি জ্ঞান সম্পন্ন লোকদের নিয়োগ দানে অগ্রাধিকার দিতেন। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মহানবী (সা.) বিশেষ কয়েকজন সাহাবীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি মুসলমানাদের সংখ্যা, নাম ঠিকানা রাখার জন্য, সেনাবাহিনীর নাম ও ঠিকানসহ লেখার জন্য এবং রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট চিঠি পত্র লেখার জন্য হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রা.) কে নিয়োগ করেন।

আরবী বর্ণমালা লেখার নানা সমস্যাদি মহানবী (সা.)-এর যুগেই স্থায়ীভাবে সমাধান করা হয়। বর্ণমালা উচ্চরণের জন্যও নিয়ম কানুন তাঁর আমলেই নির্ধারিত হয়। আল্লাহর নবীর (সা.) সাহাবীগণের মধ্যে কতিপয় সাহাবী অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অবস্থার আলোকে বিদেশী ভাষার পাণ্ডিত্য অর্জন প্রয়োজন হয়ে পড়ায় কয়েকজন সাহাবীকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেন। হযরত যায়িদ বিন সাবিত গ্রীক, কিবতী, ফারসী, হিব্রু, ইথিওপীয় ভাষা জানতেন। এক সময় মহানবী (সা.) তাঁকে দোভাষী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন। হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) ফারায়িজ শাস্ত্রের জন্য (Law of Inheritance) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে তাফসীর শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

মহানবী (সা.) এর যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে লক্ষণীয় কিছু ব্যাপার ছিল, তা হচ্ছে আল-কুরআনকে ঘিরে শিক্ষার ব্যবস্থা, যা নির্দিষ্ট নিয়মে ও নির্দিষ্ট শিক্ষকের নিকটেই সম্পন্ন হতো। তবে নানা দিকের উপর কিছু কিছু সাহবী ব্যুৎপত্তি অর্জন করায় লোকেরা তাদের কাছে ঐ সকল বিষয় শেখার জন্য যেতেন। আর শিক্ষার্থীদের শেখার যেমন অসাধারণ আগ্রহ ছিল, শিক্ষকদেরও শিক্ষা দানের অধীর উৎসাহ ছিল। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে কুরআনুল কারীম শিক্ষার সাথে সাথে উত্তরাধিকার আইন, চিকিৎসা বিদ্যা, ফিকহ, ইতিহাস, তাজবীদ, দর্শন বিদ্যায় শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যবহারিক বিষয়ের শিক্ষা দানের বিষয় ছিল, সন্তরণ বিদ্যা, লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানার বিদ্যা, চামড়া পাকা করার বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার বিষয়েও তখন শেখানো হতো।[৮৪] আরবগণ বাকপটু ও ভাষার স্বচ্ছতা সম্পন্ন জাতি হওয়ায় তারা শিক্ষা লাভে সহজেই সফল হতো। সাহাবীগণের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়নি। প্রয়োজন ও পরিবেশের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি উদ্দ্যেগে শিক্ষা লাভের বিষয়ও আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যবসায়িক জ্ঞান লাভ করা এবং বহিঃর্দেশে আচার আচরণ শিক্ষা করার প্রথা বিদ্যমান ছিল। পুথিগত বিদ্যার পাশাপাশি হাতে কমলে তাঁরা শিক্ষা লাভ করতেন।

মহানবী (সা.) শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করতেন। বাল্যবয়স থেকেই সন্তানদের কুরআনুল কারীম শিক্ষা দেয়া, নামাযের বিধি বিধান শিক্ষা দেয়া এবং বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার জন্য শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি নিদের্শ জারী করেন। সাত বছর থেকে নামায পড়ার জন্য তাগিদ করেছেন এবং দশ বছর হলে শাস্তি প্রদান করে নামায পড়াতে তিনি পিতা মাতাদের নিদের্শ জারী করেন।

নারী শিক্ষার জন্য মহানবী (সা.) সমভাবে গুরুত্ব প্রদান করেন। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের জন্যও জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক করে দেন। মদীনায় হিজরতের পর তিনি সপ্তাহে একদিন মহিলাদের

৮৪মুহাম্মদ মুসা, মহানবীর (স) আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা, (ঢাকাঃ১৯৭৮ খৃ-২৪)।

শিক্ষা দীক্ষার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেন। মহিলাদের সমাবেশ স্থলে গমন করে নিজে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন।[৮৫] মহিলাদের মধ্যে ক্রীতদাসী, বিধবা ও এতিমদের লেখা পড়ার জন্যও মহানবী অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এরশাদ করেন "তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ পুরষ্কার পাবে, একজন হচ্ছে, এমন ব্যক্তি যার অধীনে একটি ক্রীতদাসী রয়েছে, যাকে সে সৎগুণে বিভূষিত করে। উত্তম শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দিয়েছে। অতঃপর তার সম্মতি নিয়ে স্বাধীন করে দিয়ে তাকে বিবাহ করেছে।[৮৬] নারী শিক্ষর ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে।

মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করার কারণেই উম্মুল মো'মিনিন আয়েশা (রা.), হাফসা (রা.) ও উম্মে সালমা (রা.) ছিলেন উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত। মহানবী (সা.) এর ইন্তিকালের পর তাঁরা দ্বীন প্রচার ও প্রসারে তাঁদের এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে অবদান রাখেন। মহানবীর (সা.) যুগে মহিলারা কুরআন হিফজ করতেন। তাঁরা শিক্ষা দীক্ষায় এতটা অগ্রসর ছিলেন যে, তারা ইমামদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম ছিলেন। উম্মে ওরফা নামে জনৈক মহিলা কুরআনের পূর্ণ হাফিজা ছিলেন। উল্লেখ্য, মহানবী (সা.) ও প্রথম খলীফার আমলে মহিলাদের মসজিদে নামায পড়ার সুযোগ ছিল।[৮৭]

ইসলামের বিস্তৃতি মক্কা মদীনার বাইরে ছড়িয়ে পড়ার পর নবদীক্ষিত মুসলমানদের শিক্ষা দানের জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মুসলমানদের মধ্য থেকে 'সুফ্ফার' বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হতো। সুফ্ফার এই শিক্ষা কেন্দ্র তখন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। কালক্রমে বিভিন্ন এলাকার গভর্ণরগণ এ কাজের আঞ্জাম দিয়েছিলেন। পারস্য উপসাগরীয় আব্দুল কায়েস গোত্রের কথাতো সর্বজন স্বীকৃত তারা মদীনায় এসে শিক্ষা গ্রহণ করে এলাকায় ইসলাম প্রচার করতেন।

ইয়েমেনের গর্ভণর আমর ইব্ন হাযম (রা.) শিক্ষার জন্য পৃথকভাবে লোক নিয়োগ করেন। তিনি নিয়োগ পত্রে জনগণকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, দ্বীনিয়াত ও চারিত্রিক গুণাবলী শিক্ষা দানের কথা উল্লেখ করে দিতেন। বিভিন্ন এলাকার গর্ভণরদের নিয়োগকৃত শিক্ষকগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন কিনা তা তদারকির জন্য মহানবী (সা.) কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুয়ায ইবন জাবাল (রা.) ও আলী (রা.) কে পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন।

মহানবী (সা.) এর যামানায় কবি সাহিত্যিকদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। জাহেলী যুগের কবিরা মুসলমান হওয়ার পর তাঁরা অশ্লীল কাব্য রচনা পরিত্যাগ করে ইসলামী ভাবধারায় কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। ফলে তারা কবিতা রচনায় মাধ্যমে মহানবী'র (সা.) হৃদয় আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। হযরত

৮৫*On Islamic Education: Islamic Education Society* (Dhaka: 1985) p.30.
৮৬*মেশকাত শরীফ*, কিতাব-আল বির আল সিলাহ, (১ম খন্ড) পৃ.-২৫০
৮৭কাতবা আল মজীদী, *সুনানে আবু দাউদ*, ১৯৫৫ খৃ. ১ম খ. পৃ.-৮৭

হাসসান বিন সাবিত (রা.) [৮৮] কাব বিন মালিক (রা.) এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) প্রমুখ কবি সাহাবীগণ ছিলেন মহানবী (সা.) এর সভাকবি। তাদের কবিতা হিকমত ও পাণ্ডিত্যের জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল। যাদুর মত কাজ করতো তাঁদের কবিতা। মহানবী (সা.) তাঁদের কবিতায় এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, তিনি মন দিয়ে দীর্ঘ সময় তাঁদের কবিতা শুনতেন।

কাফির মুশরিকদের ইসলামের বিরুদ্ধে এবং মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে রচিত কবিতাসমূহের তাঁরা ব্যঙ্গাকারে কবিতার মাধ্যমে জবাব দিতেন।[৮৯]

মহানবী (সা.) এর যুগে দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প, কারিগরী ও সামরিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। শিক্ষার পাশাপাশি এসব বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা ছিল।  মোটকথা, যে কোন বিষয় শিক্ষার পাশাপাশি তিনি পারদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের প্রতিও জোর তাগিদ করতেন।[৯০]

## ১.৩.২ ইসলামী শিক্ষার উৎস ও বিষয় সমূহের বিস্তার :

ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস হচ্ছে, আল-কুরআন ও আল-হ্দীস। এছাড়া এর শাখা  উৎসমূল হিসেবে ইজমা[৯১] ও কিয়াসকে[৯২] অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইসলাম যেমন সার্বজনীনে, ইসলাম অনুমোদিত  শিক্ষা ব্যবস্থাও তেমনি সার্বজনীন। আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে উপলক্ষ করে গড়ে উঠা 'ইলমে তাফসীর' এবং আল-হাদীসকে কেন্দ্র করে ইলমে হাদীস ইসলামী শিক্ষার মৌলিক দিক। এ দুটো ধারাই একটি অন্যটির পরিপূরক। অপর দিকে এ দুটোর বিধি বিধানমত, বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে বিশাল পরিধি নিয়ে গড়ে উঠেছে 'ইলমে ফিকহ'। ফিকহ শাস্ত্রকে নীতি বদ্ধ রাখার জন্য সৃজিত হয়েছে ইলমে 'উসুলে ফিকহ'। যা ফিকহ শাস্ত্রকে কষ্টি পাথরে সত্যতা যাচাই করে প্রবর্তন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমনি ভাবে কুরআন ও হাদীসের নির্ভুলতা ও মনগড়া ব্যাখ্যা করার প্রবণতাকে চিরদিনের মত তিরোহিত করার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে 'ইলমে উসুল' তাফসীর ও ইসূলে হাদীস'।

---

৮৮হাসসান ইব্নে সাবিত (রা)ঃ আ,ত,ম, মুসলেহ উদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, (ই.ফা.বা.,, ১৯৮২ খৃ) পৃ.১৫২-১৫৬)

৮৯ *কিতাব আল সি'র ওয়াল বয়ান* ১ম খ. পৃ-১৮৭

৯০অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, *ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি*, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ. পৃ. -২৫।

[৯১] ইজমাঃ অর্থ একমত হাওয়া রাসূলের ইন্তিকালের পর র্ধমীয় যে কোন ব্যাপারে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুজতাহিদগণের একমত হাওয়া পরিভাষা গত ভাবে ইজমা বলা হয়। ইসলামী শরীয়াতের চার মূলনীতির মধ্যে একটি। *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খন্ড, ই.ফা.বা.,, ১৯৮২ খৃ.

[৯২] কিয়াস ঃ কা'সা হতে বাবে মুফাআলার মাসদার । অর্থ সাদৃশ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত। এই শব্দটি আরো কয়েকটি অর্থে ব্যবহিত হয়। হিজরী প্রথম শতাব্দীতে হাদিসের সঙ্গে সঙ্গে ফিকহ শাস্ত্রে উন্নতি হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইলমে শরীয়তের ফিকহি মাসআলার বা সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন ও হাদিসের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণ জরুরি হয়ে পরে। পরবর্তিতে একে মূল চার নীতির অন্তরভূক্ত করা হয়। ইমাম আবু হানিফা (র) সহ কতিপয় ইমাম ও মুসতাহিদ এর বিরোধীতা করেন। *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খন্ড, ই.ফা.বা., ১৯৮৬ খৃ.

বিভিন্ন সময়ে পরিবেশে পরিস্তিতি ও চাহিদার আলোকে এগুলোকে গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে । ইসলামী শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নে এ সব শাস্ত্র ও গ্রন্থাবলী যুগ যুগ ধরে বিকশিত হয়ে হাজারো গ্রন্থ সৃষ্টি করেছে । জন্ম নিয়েছে লক্ষ লক্ষ মনষী যাদের অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের বদৌলতে ইসলামী শিক্ষা একটি শক্তিশালী ও অপ্রতিদন্দি শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে রূপায়িত হয়েছে। সাথে সাথে দুনিয়ার তাবৎ শিক্ষা ব্যবস্থা ও সভ্যতা ও সংস্কৃতি- মোকাবেলায় পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে এ শিক্ষা ব্যবস্থা আকৃষ্ঠ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যেকটি উৎস ও এদেরকে উপলক্ষ্য করে যেসব শাস্ত্র জন্ম নিয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলঃ

## ১. আল-কুর'আনুল কারীম

কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'য়ালা ওহী মারফত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর ২৩ বছরে অবর্তীন হয়। কুরআনুল কারীম রাসূলের জীবদ্দশায় সাহাবীগণের 'হিফজ' করার মাধ্যমে এবং কাঠখন্ড, চামড়া, গাছের পাতা ইত্যাদিতে লিখে রাখা হতো। অহী লিখার জন্য রাসূল (সা.) কাতিবে অহীগণকে নিয়োগ করেন। প্রায় চল্লিশজন সাহাবী কুরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে ছিলেন। তারা যথাযথভাবে তা লিখে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকলের পর প্রথম খলীফা আবু বকর (রা.) এবং দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) এর খিলাফতকালে কুরআনুল কারীমকে গ্রন্থকারে একত্র করার কাজ শুরু হয়। তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান (রা.)- এর শসনামলে তা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। তিনি এ মহান দাগ়িত্ব পালনের মাাধ্যমে 'জামি'উল কুরআন' নামে ইসলামের ইতিহাসে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। সে থেকে কুরআনুল কারীমকে সারা বিশ্বে মুসলমানদের নিকট গ্রন্থকারে পেশ করা শুরু হয়। আজও তা চলমান গতিতে অব্যাহত রয়েছে। কুরআনুল কারীম 'আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সেজন্য দুনিয়ার মুসলমানদের স্বাভাবিক চাহিদার আলোকে এর প্রয়োজনীয় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সাথে সাথে কুরআনুল কারীমকে নানা ভ্রান্ত মতবাদ ও ভূল ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত রাখার জন্য সাহাবায়ে কিরাম উদ্যগ গ্রহণ করেন। তাঁরা রাসূল (সা.) এর হাদীসের নিরীখে কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা করার ব্যবস্থ্ করেন এবং সর্বসাধারণের নিকঠ পেশ করেন। খলীফাগণ কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা দৈনন্দিন জীবনের মাসাআলা-মাসায়িল এবং বিধানাবলী ঘোষণা করতেন।

পরবর্তী সময়ে কুরআনুল কারীমের বিশুদ্ধতাকে পবিত্র ও নির্ভূল রাখার জন্য নীতি মালা গ্রহণ করা হয়। যা ইলমে তাফসীর হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

প্রাথমিক পর্যায়ের এই নীতিমালার মধ্যে ছিল, কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রকে সমস্ত বিতর্কের উর্দ্ধে রেখে শুধুমাত্র হুযুর (সা.) সাহবায়ে কিরাম এবং তায়েবীনগণের বাণী ও মতের উপর বিশ্বাস করা হবে;

যাতে সংস্কার বা বিদ'আতের মাধ্যমে আল্লাহ'র কালামের অপব্যাখ্যার কেউ সুযোগ না পায়। এই নীতিমালার আলোকে সর্ববৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয় আল্লামা ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.) কর্তৃক রচিত 'তাফসীর আত-তাবারী' ও ইমাম জাসসাস (র.) এর 'আহকামুল কুরআন'। তিনি তার রচিত তাফসীরে প্রতিটি আয়াতের অধীনে পূর্ববর্তীদের উদ্ধৃতি ও মতামত লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তাফসীর শাস্ত্রে যে বিরাট লেখনি সম্ভার সঞ্চায়ন করেন তা তার জীবনের মোট সময় হিসেবে দিনে গড়ে চল্লিশ পৃষ্ঠা ছিল।

এরপর রচিত দ্বিতীয় তাফসীর ইব্ন কাছীর, যা ইবনে জারীর এর তাফসীরের সার-সংক্ষেপ। এরপর ইমাম রাযী (র.) রচনা করেন অপর একটি তাফসীর। অবশ্য তিনি দার্শনিক মতাবাদকে প্রাধান্য দেয়ায় তার কৃত তাফসীর সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। আল্লামা যামাখশারী (র.) তাফসীরে কাশ্‌শাফ নামে আপর একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন।

পরবর্তীকালে তাফসীরের মূলনীতি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। উক্ত মূলনীতিকে উপলক্ষ্য করে 'উসুলে তাফসীর' নামে অপর একটি শাস্ত্র প্রণয়ণ করা হয়। এর উপর গ্রন্থাবলীও রচিত হয়। আল্লামা সয়ুতী (র.) 'এতকান ফী 'উলুমুল কুরআন' রচনা করেন। এর পূর্বে আল্লামা আবু জা'ফর ইব্ন জুবাইর আবু হায়ান কুরআনের বিন্যাস সম্পর্কে একটি বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার নাম রেখেছেন 'আল-কুরআন ফী মুনসিবাতি তারতীবে সুরাতিল কুরআন'।

এক কথায় বলতে গেলে লাওহে মাহফুজের এ শাশ্বত বাণীকে বিশুদ্ধ রাখার যাবতীয় সকল ব্যবস্থা মনীষীগণ গ্রহণ করেছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ঘোষণা করেন–

"কোরআন হাকীম লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত রয়েছে।"[৯৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

'নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষণ কারী।'[৯৪]

সে কারণে আল কুরআনুল কারীম ইসলামী শরীয়াত তথ্য ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের আঁধার হিসেবে 'অতন্দ্র প্রহরীর' মতো দন্ডয়মান রয়েছে। আল কুরআনের আলোক বর্তিকা দ্বারা প্রদীপ্তমান রয়েছে মুসলিম জাতি।

## ২. আল-হাদীস

কুরআনুল কারীমের পর ইসলামী শরী'য়াত তথা ইসলামী শিক্ষার দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে, আল-হাদীস। এটি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবদ্দশায় শাস্ত্র বা গ্রন্থকারে রচিত হয়নি। তখন রাসূল (সা.) কুরআনুল কারীমের বিশুদ্ধতা ও স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য হাদীসসমূহ লিখতে বা গ্রন্থাকারে একত্র করতে নিষেধ

৯৩ আল্-কুরআন, ৮৫:২১-২২
৯৪ আল্-কুরআন,৪৯:৯

করতেন। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীগণকে বলতেন; এরূপ লেখার নিয়ম তোমরা ত্যাগ কর; কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ কর। এর সাথে অন্য কিছু মিলিও না। তদুপরী সাহবীগণের তীক্ষ্ম মেধা ও হিফজের ক্ষমতা গ্রন্থাকারে রক্ষিত রাখার মতই হাদীসের ভান্ডার রক্ষিত থেকে যায়। তাছাড়া কতিপয় সাহাবী নবীপ্রেমের অংশ হিসেবে গোপনে বহু হাদীস লিখে রেখেছেন, যেগুলোর সংখ্যা ও পরিমান ছিল বিপুল। হযরত আলী (র.) আবু হুবায়রা (রা.) নিকট এরূপ অনেক হাদীসের ভান্ডার সুরক্ষিত ছিল।

রাসূল (সা.) সাহবায়ে কিরামকে হাদীস শ্রবণ ও তা মুখস্থ করতে জোর তাগিদ করেছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেন-

আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে আলোক উদ্ভাসিত করে দেবেন, যে আমার কথা শুনে তা স্মরণ করে নিল, পুনরায় তাকে হিফাজত করল অপরের নিকট তা পৌছে দিল। অনেক জ্ঞান বহনকারী লোক এমন ব্যক্তির নিকট উহা পৌছে দেয় যে, সে বহনকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। [৯৫]

অপর হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, 'যে ব্যক্তি মুসলিম উম্মতের দ্বীন সম্পর্কে চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে একজন ফিকহবিদ বানিয়ে দেবেন এবং আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো'।[৯৬]

ইসলাম প্রচার ও প্রসার করার নিমিত্তে সাহাবীগণ ব্যাপক সাধনা করেন। কুরআনের সাথে সাথে হাদীসের প্রচার করতে দেশে দেশে তারা বের হয়ে পড়েন, হাদীস শিক্ষা দানের জন্য বিভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠানিক রূপদান করেন। হযরত আবু ইদরীস খাওলানী (রা.) হিমস শহরে হাদিস শিক্ষা দেন। নসর ইব্নে আসিমূল রাইসী বলেন, কুফা নগরীতে হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান হাদীস শিক্ষাদান করেন। হযরত আয়শা (রা.) মদীনায় হাদীস শিক্ষা দান করতেন। বহু মহিলা ও সাহাবী তার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও শিক্ষা গ্রহণ করেন। হয়রত আবু মুসা আশ'আরী (রা.) আবদুল্যাহ ইবনে 'আববাস (রা.) 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) এবং হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ তার নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন।

হযরত 'আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) কুফা নগরে নিয়মিত হাদীস শিক্ষা দিতেন। তার নিকট চার হাজার শ্রোতা ও ছাত্র হাদীস শিক্ষা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা.) ইলমে হাদীসের বিরাট ভান্ডার আয়ত্ব করেছিলেন। রাসূলের (সা.) ইন্তিকালের পর তিনি তা লক্ষ লক্ষ জ্ঞান পিপাসুর নিকট পৌঁছিয়েছেন। এভাবে হাদিসের দারস ও প্রচার  কাজ আরব অনারব এলাকায় খোলাফায়ে রাশিদার সময়কালেই পৌঁছে যায়।

৯৫ *বায়হাকী*, ১ম খন্ড. দিল্লী (তা. বি.) পৃ : ৩৫০
৯৬ *মিশকাতুল মাসবীহ*, দিল্লী (তা. বি.) পৃ : ৩৬

সাহাবায়ে কিরাম যেমনিভাবে নবী করীম (সা.) এর কাছ থেকে কুরআন ও হাদীস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো লাভ করেছিলেন, সাহাবীগণও তাদের পরবর্তীদের জন্য এমন ধরণের ইল্‌ম চর্চার ধারাবাহিকতা রেখে গেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমাগণ তাবেয়ী নামে খ্যাত হন। তাবেয়ীগণ বিভিন্ন সাহাবীগণের ছাত্র হিসেবে হাদীস শিক্ষা করতেন। হাদীসের লিখন ও পঠন উভয় পদ্ধতিতে তারা শিক্ষা গ্রহন করতেন।

বশীর ইবন নুহাইক (র.) হাব্বান ইবন মুনাব্বাহ ইয়ামীনী (র.), সায়াদ ইবন জুবাইর তাবেয়ী'(র.), সুফিয়ান ইবন 'উয়াইনাহ (র.), হুযুর ইবন 'আদী (র.), আবদুল 'আলা ইবনে আমর (র.), ইমাম জ'ফর সাদিক (র.) ইমাম বাকির (র.), আল-মারওয়ান ইবন হাকাম (র.), সায়ীদ ইবনুল মুসায়িব(র.), উরওয়া ইবনে যুবাইর(র.), আবু বকর ইবন আবদুর রহমান ইবনুল হারিছ (র.), 'উবাদুল্লাহ ইবনুল হারিস (র.), 'ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু বকর(র.), ইকরামা মাওলা আবনে আব্বাস(র.), আতা ইবন আবু রিবাহ (র.), ইব্রাহিম নাখয়ী'(র.), আলকামা ইবন কায়েস ইব্‌ন আবুল হাসান বসরী (র.), মুহাম্মদ ইব্‌ন সারিন(র.), কাতাদহ ইব্‌ন দা'আমাতা আদ দওসী (র.), উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র.), ইয়াজীদ ইব্‌ন আবু হাবীব (র.), ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (র.) তাবেয়ী'গণের মধ্যে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন।

তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ী'নগণের যামানায় ব্যাপকভাবে হাদীসের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সুনানে আহমদ ও মসনদে ইমাম আযম এর সময়কালে রচিত বিখ্যাত ৩টি হাদিসগ্রন্থ। এর পরবর্তী সময়ে সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থ মুসলিম জাহানে সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। এগুলোর বর্ণনা হচ্ছে :

১. সহীহুল বুখারী : ইমাম বুখারী [৯৭] (র.) কর্তৃক সংকলিত। এতে মোট ৭২৭৫ টি হাদীস রয়েছে যা ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাচাইকৃত।
২. সহীহুল মুসলিম : ইমাম মুসলিম[৯৮] (র.) কর্তৃক সংকলিত। এতে ৪০০০ হাদীস সংযোজিত হয়েছে যা তিনি লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করেছে।

---

৯৭ ইমাম বোখারী (র)ঃ তার পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। তিনি বর্তমান মধ্য-এশিয়ার অন্তর্ভূক্ত বুখারা নগরে ১৯৪ হিজবী সনে ১৩ শাওয়াল শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়স হওয়ার আগেই গ্রামের মকতবে লেখাপড়া করার সময়েই তিনি হাদীস মুখস্থ করণের অভস্থ হন। ষোল বছর সয়সে তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক ও ইমাম অকী'র নিকট হাদীস মুখস্থ করেন। একাধারে ছয় বছর কাল তিনি হিজায এলাকায় হাদীসের সন্ধানে কাটানো। আঠারো বছর বয়সে তিনি হাদীসের জটিল সমস্যার সমাধানে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২১০ হিজরী সনে হজ্বে গমন করে রাসূলুল্লাহ (স)- এর রওজার পাশে বসে বসে 'আত-তারীখূল কাবীর নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীসের সন্ধানে বহু মুহাদ্দিসের নিকট এবং বহু এলাকায় গমন করেন। হিজরী সনের ৩০ রজব ৬২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ই.ফা.বা.,, ১৯৮৬ খৃ. পৃ : ৪৭৭-৪৭৯

৯৮ ইমাম মুসলিম (র)ঃ তাঁর পুরো নাম আবুর হুসাইন মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন্‌-নিশাপুরী। ২০৪ হিজরীতে খুরাসান অন্তর্বতী নিশাপুর জন্ম গ্রহণ করেন। ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে তিনি নিশাপুওে ইন্তিকাল করেন। মুফতী আমিমুল ইহসান, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ইসলামী একাডেমী (ঢাকা-১৪১১ হি.)

৩. সুনানে নাসায়ী : ইমাম নাসায়ী[৯৯] (র.) কর্তৃক সংকলিত। প্রথম তিনি সুনানুল কুবরা, পরে আস সুনানুস সুগরা এবং সর্বশেষ 'মুজতবা' রচনা করেন।

৪. সুনানে আবু দাউদ : ইমাম আবু দাউদ[১০০] (র.) কর্তৃক সংকলিত এ হাদিসের সংখ্যা ৪৮০০টি।

৫. জামে তিরমিয়ীঃ ইমাম তিরমিয়ী[১০১] (র.) কর্তৃক সংকলিত। তার এ গ্রন্থে ১৬০০ হাদীস স্থান পেয়েছে, যা পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাইকৃত এতে তিনি ব্যবহারিক হাদীস বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন, তা ব্যাপক ভাবে মুহাদ্দিসগণের নিকট সমাদৃত হয়। একে জামে' ও সুনান দু'নামেই অভিহিত করা হয়।

৬. সুনানে ইব্ন মাযাহঃ ইমাম ইব্ন মাযাহ[১০২] কর্তৃক ৪০০০ হাদীস সম্বলিত এ গ্রন্থ প্রণীত। অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক নিয়ে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে, যেমনঃ সঞ্চায়ন সৌন্দর্য, পুনরাবৃত্তিহীন, একের পর এক বর্ণনা, সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ ৩২ টি পরিচ্ছেদ;. ১৫০০ অধ্যায় দ্বারা অতি সুনিপুণভাবে তিনি একে বিন্যাস্ত করেছেন।

হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ভারত বিশেষ করে উত্তর ভারত ও লাহোরসহ ভারত উপমহাদেশের কয়েকটি এলাকায় হাদীসের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়, সপ্তম ও অষ্টম হিজরী সালে তা পূর্ণতা লাভ করে। ভারত উপমহাদেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ হচ্ছেন, শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (র.), কাজী মিনহাজুস সিরাজ জুযানী(র.), বুরহান উদ্দিন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল খায়ের আসাদ বলখী(র.), কামালুদ্দীন জাহিদ(র.), শরফুদ্দীন বুদায়ানী (র.) অন্যতম। তবেয়ী' ও তাবে' তাবেয়ী'নগণের অনেকেই হাদীসের উপর ছোট বড় গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া হাদীসের জাল করণ, সহীহ হাদীস বের করার পদ্ধতি, আ'সমাউর রিজাল, বর্ণনাকারীর শ্রেণী

---

৯৯ ইমাম নাসায়ী (র)ঃ তাঁর পুরো নাম আবদুর রহমান আহমদ ইব্ন শোয়াইব ইব্ন আলী ইব্ন বাহর ইব্ন মান্নান ইব্ন দীনার আন নাসায়ী, খুরাসান এর অন্তর্গত নাসা নাামক শহরে ২১৫ হিজরী সনে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ৩০৩ হিজরী সনে ৮৯ বছর বয়সে তিনি দামেশকে ইন্তিকাল করেন।

১০০ ইমাম আবু দাউদ (র)ঃ তাঁর পুরো নাম সুলাইমান ইবনুল আশযাম ইবনে ইসহাক আল আজাদী আল সিজিস্তনী । কান্দাহার এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শিক্ষার মহান লক্ষ্যে মিশর সিরিয়া হিজায এবংতৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল উসমান ইব্ন আবু সাইবা, কুতাইবা , কুতাইবা ইবনে সায়ীদ তার হাদীস শিক্ষা দানের উস্তাদ। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী হাদীস শিক্ষায় তাঁর্ ২৭৫ হিজরী সনের ১৬ শাওয়াল বসরা নগওে তিনি ইন্তিকাল করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত পৃ : ৪৭৯

১০১ ইমাম তিরমিযী (র) ঃ তার পুরো আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ইসা ইব্ন সাওরাতা ইব্ন মুসা ইব্ন জুহাকুস সুলামী আত্-তিরমিযী। তিনি জীহুল নদীর বেলাভূমে অবস্থিত তিরমিয় নামক প্রাচীন শহওে ২০৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী তার হাদীস, চর্চা প্রশংসা করেছেন। তিরমিযী শরীফ ছাড়াও তার রচিত গ্রন্থ কিতাবুল আসমা, শামায়িলুত তিরমিযী, তাওয়াবীখ ও কিতাবুল জুহদ অন্যতম। শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। ২৭৯ হিজরী সনে তিরমীয শহরেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

১০২ ইমাম ইব্ন মাযাহ (র.) তাঁর পুরো নাম আবু 'আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মাযাহ আল কাজভীনি। তিনি একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস ও মুফাসসির ছিলেন। ২০৯ হিজরী সনে (৮০৮) কাশভান শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার ছাত্র সংখ্যা প্রচুর। হাদীস গ্রন্থ ছাড়া তিনি তাফসীর গ্রন্থও রচনা করেছেন। ২৭৯ হিজরী সনে ৬৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। -মুফ্তি আমিমুল ইহসান, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত।

বিভাগ, বিভিন্ন প্রকার হাদীস ও গ্রহণ যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর গ্রন্থ প্রণীত হয়। ফলে হাদীস শাস্ত্র মুসলমানদের মধ্যে একটি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতির পাথেয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলা বাহুল্য, হাদীস শাস্ত্রের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের এই দিনগুলোতে মুসলিম উম্মহ'র সামাজিক জীবন এবং সামাজিক রীতিনীতি, লেনদেন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতির হিফাজতের প্রয়োজন ছিল। ভবিষ্যতে এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকার জন্য এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়তার প্রয়োজন ছিল। ভবিষ্যতে এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকার জন্য। এ ক্ষেত্রে ও নিশ্চয়তার প্রয়োজন ছিল, এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের কিয়াদংশ স্পেন ইসলামের সুশীতল ছায়ার অধীনে চলে আসে। তৎকালীন দুনিয়ার মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল সর্ববৃহৎ ফলে নিত্য নতুন অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হচিছল 'মুসলিম উম্মাহ'। ব্যবসায় বাণিজ্যে, কৃষির খাজনা ও রাজস্ব আদায়,জিযিয়া খিরাজ আদায় নিয়ে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রাচীন রীতি নীতির স্থলে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজন দেখা দেয় ফলে ইসলামী আইন সম্বলিত ধারা ও নিয়ম নীতিকে একত্রিত করে একটি শাস্ত্রের জন্ম দেয়া মুসলিম উম্মহ'র সামনে জরুরী হয়ে উঠে। ইসলামী হুকুমতের বিস্তারিত বিধি বিধান এবং পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় আইনের প্রণয়ন মুসলমানদের জন্য সময়ের দাবী হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে তৎকালীন মুসলিম মনীষী ও বিজ্ঞ 'ওলামায়ে কিরামের সামান্যতম অলসতা ছিল না। বরঞ্চ নিরলস প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে তাঁরা এ সম্পর্কিত গ্রন্থ ও আইন কানুন প্রণয়ণ করেন। তাঁদের এ ধরনের ত্যাগ-তিতীক্ষা না হলে মুসলিম উম্মাহ ও তাদের হুকুমতের ইতিহাস ভিন্নভাবে লিখিত হতো ।

### ৩. আল-ইজমা

'ইজমা' ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা তথা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের তৃতীয় প্রধান উৎস। কুরআন ও হাদীসদ্বারা ইজমার গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা প্রমাণিত। নিচে ইজমার পরিচয় তুলে ধরা হলো :

আভিধানিক অর্থ : 'ইজমা' শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ ঐকমত্য ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া। বলা হয়ে থাকে, "উম্মাত অমুক বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে।" ইজমা" শব্দটি দৃঢ় সংকল্প অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে-"অমুক ঐ বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প রাখেন।" এ অর্থেই কুরআন মাজীদে ইজমা শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

فاجمعوا أمركم وشركائكم

"তোমরা নিজেদের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে নাও এবং নিজেদের শরীকদের জমায়েত করো।" [১০৩]

'ইজমা' শব্দটি উপরোক্ত অর্থে হাদীসেও ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ আছে: "যে ব্যক্তি রাত থেকে রাত রোযা রাখার সংকল্প প্রকাশ করবে না তার রোযা হবে না। [১০৪]

---

[১০৩] আল-কুরআনুল কারীম, ১০ : ৭১

[১০৪] ইমাম আবূ দাউদ, সুনানু আবূ দাউদ, অধ্যায় : আস-সিয়াম, অনুচ্ছেদ : আন-নিয়্যাতু ফিস-সাওম

'ইজমা' শব্দটি হাদীসে ঐকমত্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেননা হাদীসে উল্লেখ আছে:
"আমার উম্মাত কখনো পথভ্রষ্টতার উপর ঐকমত্য ঘোষণা করবে না। যখন তোমরা উম্মাতের মাঝে মতপার্থক্য দেখতে পাবে তখন বড় জামাআতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।[১০৫]

অপর এক হাদীসে আছে, "যে (মুসলিম) ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যাবে সে যেন তার নিজের ঘাড় থেকে ইসলামের রশি (বন্ধন) ছিন্ন করে ফেললো।[১০৬]

পারিভাষিক অর্থ : ইজমা-এর সংজ্ঞা নিরূপণে উসূল ফিক্‌ইবদগণের একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। যেমন :

(১) একই যুগের উম্মাতে মুহাম্মাদীর সকল সৎকর্মশীল মুজতাহিদ কর্তৃক কোন বাচনিক কর্ম সূচক ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়।[১০৭]

(২) "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মাতের মধ্যে যারা বিশেষজ্ঞ ও সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতাসম্পন্ন, তেমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কোন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছার নাম ইজমা।[১০৮]
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের প্রতি যে অগাধ আস্থা স্থাপনের কথা ব্যক্ত করেছেন, উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে তা প্রমাণিত হয়। তবে আস্থা সর্বজনীন হতে পারে না। এ কথাই ফকীহগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, "ইজমার ক্ষেত্রে পক্ষে-বিপক্ষে সাধারণ মানুষের বক্তব্য মূল্যহীন-গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সবাই শরী'আতের ব্যাপারে গভীর দূরদৃষ্টির অধিকারী নয়, তাদের দলীল-প্রমাণ অনুধাবনের ক্ষমতাও সবার থাকার কথা নয়।[১০৯]

(৩) ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন "কেবল মদীনাবাসী ফিক্‌হবিদগণের ইজমাই গ্রহণযোগ্য, অপর কারো ইজমা নয়।"

(৪) ইমাম দাউদ যাহিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "কেবল সাহাবা কিরামের ইজমা-ই ইসলামী শরী'আতের উৎস, অপর কারো ইজমা নয়।"

তিনি আরো বলেন, সাহাবা কিরামের ইজমার বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুসলিম মেয়েকে অমুসলিম পুরুষের নিকট বিয়ে দেয়া জায়েয নয়, দাদীকে মীরাসের এক-ষষ্ঠাংশ দিতে হবে এবং যাকাতদানে অস্বীকারকারী মুসলিমের বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে যুদ্ধের ঘোষনা দিতে হবে।

### ৪. আল-কিয়াস

[১০৫] ইমাম ইবনে মাজাহ, সুনানু ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : আস-সাওয়াদুল আযাম
[১০৬] ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২৩৭৯, পৃ. ১৬২৬
[১০৭] মুল্লা জিউন, *নুরুল আনওয়ার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

[১০৮] মুহাম্মদ তাকী আমীনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
[১০৯] ইমাম শাওকানী, ইরশাদুল ফুহুল লি তাহকীকিল হক মিন ইলমিল উসূল, তা.বি. পৃ. ৯৭

কিয়াস-ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ও আইন বিজ্ঞানের ব্যাপকতর ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে স্বীকৃত। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার পরে কিয়াস হলো ইসলামী আইনের অন্যতম একটি উৎস। উদ্ভূত কোন বিষয়ের সমাধান কুরআন, সুন্নাহ কিংবা ইজমায় পাওয়া না গেলে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করে তৎসম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করা হয়। কিয়াস-এর একাধিক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো :

(১) কিয়াস শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ অনুমান করা, সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, সমন্বিত করা, যুক্ত করা, শুরু করা ইত্যাদি। উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে হুকুমকে মূল হতে শাখার দিকে স্থানান্তরিত করাকে কিয়াস বলা হয়। যেমন, এমন কতগুলো বিষয় উদ্ভূত হয়েছে যেগুলো সম্পর্কিত বিধান শরী'আতের উপযুক্ত উৎসসমূহে বিদ্যমান নেই বটে কিন্তু উক্ত বিষয়গুলো সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কতগুলো বিষয় সম্পর্কিত আইন আছে। এরূপ অবস্থায় প্রথমে বিদ্যমান বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলীর কারণসমূহ নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর উক্ত কারণসমূহ উদ্ভূত বিষয়সমূহের মধ্যেও বিদ্যমান পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে ঐ একই বিধান প্রযোজ্য হবে। [১১০]

(২) বিচারপতি শহীদ আবদুল কাদির আওদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে বিষয় সম্পর্কে শরী'আতের নস বিদ্যমান নেই সেই বিষয়কে কারণসমূহের অভিন্নতার ভিত্তিতে এমন একটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা যার সম্পর্কে শরী'আতের নসভিত্তিক বিধান বিদ্যমান আছে, তাকে কিয়াস বলা হয়।[১১১]

(৩) মালিকী মাযহাবের ফিক্‌হবিদগণ বলেন, কারণসমূহ বিবেচনা পূর্বক নির্গত বিধানকে মূল বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ করার প্রক্রিয়াকে কিয়াস বলা হয়। [১১২]

কিয়াসের উদাহরণ :

মদ্যপান একটি সামাজিক সমস্যা। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ-

"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না? [১১৩]

---

[১১০] মুল্লা জিউন, *নুরুল আনওয়ার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩-৩২৫

[১১১] বিচারপতি আবদুল কাদির আওদাহ, *আত তাশরীউল জিনাইল ইসলামী*, বৈরূত : মুয়াসসাআনতুর রিসালাহ্, ১৯৮৬, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮২, ধারা, ১৬৫

[১১২] ইমাম আবূ আহমাদ আল-কুদুরী, *আল-মুখতাসার ফিল-ফিক্‌হ*, ঢাকা. তা.বি. ২য় খন্ড, পৃ. ২০৪

[১১৩] আল-কুরআনুল কারীম, ৫ : ৯০-৯১।

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মদ্যপান হারাম ঘোষনা করেছেন। কারণ এতে রয়েছে নানা ধরনের অনিষ্টকারী উপাদান, যেমন মাদকতা। আয়াতে খামর শব্দের প্রকৃত অর্থ হল, আঙুরের রস থেকে তৈরি করা মদ। এ মদ পান করার ফলে পানকারীর মাঝে মাদকতা আসে। ফলে সে মাতাল হয়ে পড়ে। উপরে বর্ণিত 'খামর' ছাড়াও বর্তমানে আরও এমন অনেক বস্তু রয়েছে যা পানকারী ও গ্রহণকারীকে মাতাল বানায়। এমতাবস্থায় মুজতাহিদগণ অন্যান্য মাদকতা সৃষ্টিকারী বস্তুগুলোকেও 'খাম্‌র'-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই হুকুমের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিদ্যমান :

- খাম্‌র-কে এখানে উসূলশাস্ত্রের পরিভাষায় 'আল-মুকিস আলাইহি' বলা হয়।
- অন্যান্য মাদকতা আনয়নকারী বস্তুগুলো হলো فروع (শাখা)- যাকে উসুলশাস্ত্রের পরিভাষায় আল-মুকিস বলা হয়।
- মাদকতা হলো কারণ, যাকে উসূলের ভাষায় علت (ইল্লাত) বলা হয়।
- এর হুকুম হলো হারাম, যাকে আল-হুরমাহ বলা হয়।

অনুরূপভাবে জুয়াকেও হারাম ঘোষনা করা হয়েছে উপরোক্ত শরী'আতের দলীলদ্বারা। হারাম ঘোষিত হওয়ার কারণ হলো, ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ কেড়ে নেয়া। ঠিক একই কারণ লটারীর মধ্যেও বিদ্যমান। কাজেই জুয়ার উপর কিয়াস করে একেও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।
জুমু'আর দিন আযানের পর বেচাকেনা করা কুরআনের আয়াতদ্বারা মাকরূহ প্রমাণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে মুমিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি করো। [১১৪]
আযানের পর বেচাকেনা মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, সালাত ব্যতীত অপর কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া। কাজেই ইজারা, ধার-কর্জসহ যত কাজ মানুষকে সালাত থেকে বিরত রাখবে, সব কাজই আযানের পর মাকরূহ বলে একই কারণে গণ্য হবে। অন্যান্য প্রকার লেনদেনও একই কারণে বেচাকেনার সাথে কিয়াস করে মাকরূহ ঘোষণা করা হবে।
উপরোক্ত উদাহরণ দুটোতে যে মাসআলার হুকুমের ব্যাপারে নস নেই, তাকে যে মাসআলার হুকুমের ব্যাপারে নস আছে তার সাথে কিয়াস করা হয়েছে। উভয় মাসআলায় ইল্লাত বা কারণ এক ও অভিন্ন।

---

[১১৪] আল-কুরআনুল কারীম, ১০ : ৯।

আর ইল্লাত অভিন্ন হওয়ার কারণে উভয় মাসআলার হুকুমকে একই ধরণের সাব্যস্ত করাকে উসূলুল ফিক্হ শাস্ত্রের পরিভাষায় কিয়াস বলা হয়।[১১৫]

**ফিক্হ [১১৬] শাস্ত্র সংকলন**

ফিক্হ তথা ইসলামী আইন-কানুনের পূর্ণাঙ্গরূপ দানের ক্ষমতা আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত ও বরকতের মাধ্যমেই মুসলমানরা সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। মুসলমানদের উপর আল্লাহ'র রহমত স্বরূপ আল্লাহ এজন্য ইমামগনকে (ফিক্হ শাস্ত্রের উদ্ভবক) দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে চারজন ইমামকে মূল হিসেবে গণ্য করা হয়। তারা হলেন

(ক) ইমাম আবু হানিফা (র.) (মৃ.-১৫০হি.)

(খ) ইমাম মালিক (র.) (মৃ.১৬৯ হিজরী),

(সা.) ইমাম শাফিঈ (র.) (মৃ. ২০৪ হি.) ও

(ঘ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (মৃ. -২৪১ হি.) । এ চারজন ইমাম বা মুজতাহিদ দ্বারা প্রণীত ফতাওয়া ও আইন বিশ্বের সকল মুসলমানদের নিকট স্বীকৃত । এই চারজন ইমামের মাধ্যমেই মাযহাব সমূহের উদ্ভাবন হয়েছে। প্রত্যেক ইমামের স্ব-স্ব নামেই মাযহাবগুলো বিশ্ব মুসলিমের নিকট পরিচিত। কিছু কিছু মাসআলায় তারা কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যামূলক উদ্ধৃতি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। কিন্তু মৌলিক বিষয়ে কোন রূপ পার্থক্য তাদের মধ্যে ছিলনা। এই ইমামগণের দুনিয়ার কোন স্বার্থ-মোহ ছিল না বা নিজের মনগড়া মতের উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন নি। ইসলামের বিভিন্ন দিকের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে মুসলিম উম্মাহর জন্য মূল্যবান সম্পদের ভান্ডার তৈরি করে গেছেন। এর জন্য তাঁরা দুনিয়ার পদ-পদবীকে উপেক্ষা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) কে দু'বার বিচারপতির পদ দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। শেষ পর্যন্ত এই আপোষহীন মনোভাবের কারণে তিনি জেলখানায় ইন্তিকাল করেন। ইমাম মালিক (র.) এইটি মাসয়ালা প্রকাশ করার জন্য বেত্রাঘাতের সম্মুখীন হন। ইমাম শাফিঈ (র.) সারা জীবন নানা সংকটের মধ্যে অতিবাহিত করেন। এই চারজন ইমাম ও 'ইমাম আজম আবু হানিফা (র.) এর দু'অনুসারী ইমাম ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) সারাজীবন ইসলামী জ্ঞান ও নীতিমালার অনুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়ে মুসলিম উম্মাহ'র জন্য যে অবদান রেখে গেছেন, তাতে তাঁরা চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক পরিধিকে সমৃদ্ধ করার জন্য এবং যাবতীয় মিথ্যা ও জালিয়াতী থেকে একে মুক্ত রাখার জন্য তাঁরা অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) তিরাশি হাজার মাসয়ালা নিজ মুখে

---

[১১৫] আবদুল ওয়াহব খাল্লাফ, *ইলমুল উসূল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

১১৬ ফিকহ্ : আরবী শব্দ। অর্থ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, জ্ঞান ইসলামের আইন সমষ্টি (Jurisprundence) ফিক্হ নাম পরিচিত। কুরআন ও হাদিসে ফিকহ্ ক্রিয়ামূলের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপক অর্থে ধর্মীয় রাজনৈতিক ও পৌর জীবনের সকল দিকই এর আওতাধীন। সুতরাং এর গুরুত্ব অপরিসীম- *সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ২য় খন্ড, ই.ফা.বা.,, বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ : ৮৯

বর্ণনা করেন, যার ভেতরে আটত্রিশ হাজার ইবাদতের সাথে আর পঁয়তাল্লিশ হাজার পারস্পরিক লেনদেনের সাথে, বাকী দু'হাজার অন্যান্য বিষয় সম্পৃক্ত।

শাইখুল আইম্যা কারদানী লিখেছেন- ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মাসআলার সংখ্যা হবে ছয় লক্ষ। ইমাম মালিক (র.) তাঁর 'মুদাওয়ালা' নামক গ্রন্থে ছত্রিশ হাজার মাসয়ালা লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) এর 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থটি সাতটি বিরাট খন্ডে লিখিত ছিল। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) মাসয়ালা মাসায়েল চল্লিশ খন্ডে সংকলিত করেন। ফিক্হ শাস্ত্র প্রণয়নের ফলে ইসলামী শরী'য়ত পরিপূর্ণ জীবনী শক্তি লাভ করে। উম্মাতে মুহাম্মদীর কৃতিত্বের মহান দাবী এর মাধ্যমে পূর্ণ হয় । মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে শান্তি শৃংখলার রক্ষা কবজ হিসাবে এটি কাজ করে। যুগ যুগ ধরে আগত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য পথ উম্মুক্ত করে দেয়ার ফলে বিপর্যস্থতা থেকে মুসলমানরা রক্ষা পায়। ইসলাম মহান আল্লাহর শাশ্বত ধর্ম হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তাঁদের এ অবদান দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয়। কিয়ামত পর্যন্ত বিজ্ঞান ও গবেষণার পথকে তারা নিয়মিত ও নির্দেশনায় সাবলীল করে তুলেন। তাদের এই মহান শ্রমের ধারাবাহিকতায় তথ্য ও তত্ত্বমূলক দিক নির্দেশনার জন্য আরও বহু মনীষী আল্ কুরআনের গবেষণায় নিয়োজিত হন, যাঁরা মুফাস্সির হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। কিছু মনীষী হাদীসের উপর তাঁদের চেষ্টা ও সাধনাকে নিয়োজিত করেন, যারা মুহাদ্দিস হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। ফিকহী মাসায়ালা-মাসায়েল 'আইন কানুন প্রণয়ন কাজে যাঁদের নিজেদের মেধা ও সাধনা নিয়োজিত করেন, তাঁরা ইমাম বা মুজতাহিদ হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। গবেষণা ও জ্ঞানের উচ্চাসনে আরোহণ করার জন্যও অনেক চেষ্টা করেন। তাঁরা ফালছাফা বা দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনের যাঁরা নিয়োজিত হন তাঁরা সুফী ও অলী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ইসলামের তথ্য ও তত্ত্বগত পূর্বাপর ইতিহাসবেত্তাগণ ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এমনিভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের (কুরআন ও হাদীস সম্মত) প্রতিটি দিক ও বিভাগের অগণিত মনীষী অবদান রেখে 'ইসলামী শিক্ষা মহান আল্লাহ'র মহানত্ব প্রমানের জন্য যথেষ্ট-তা বাস্তবে প্রমাণ করেন। কালের বিবর্তনে যেসকল মনীষী ইসলামী শিক্ষায় ব্যাপক অবদান রেখেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হল-

### ১. ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদী (র.)

তিনি ৩৩১ হিজরী সনে সমরকন্দ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরিণত বয়সে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করার পর মুতাযিলা[১১৭] সম্প্রদায়ের ফিতনা দানা বেঁধে উঠে। আবু মনসুর মাতুরিদী ব্যক্তিগত জীবনে

[১১৭] মু'তাযিলা ঃ যে ধর্মতাত্ত্বিক দর ইসলামী দল ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের যুক্তিমূলক মতবাদকে সর্বপ্রধান সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাই মু'তাযিলা। অন্যমতে যারা ইতিকালের মতবাদ মানে তারাই, মুতাযিলা, অথাৎ যারা 'মানযিলাতুন' বাইনা আল মানযিলাতাইন এর

হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। মুতাযিলা সম্প্রদায়ের যুক্তি তর্ককে খন্ডন করার জন্য তিনি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'তা'বীলাতুল কুরআন' গ্রন্থটিকে তিনি ফিকহী মাসয়ালা মাসায়েলে বুদ্ধি বৃত্তিক জ্ঞানভান্ডার হিসেবে রচনা করেন।

ইরাক এলাকায় তৎকালীন বামপন্থীদের বিরাট প্রভাব ছিল। আবু মনসুর তাঁর রচনা ও তাবলীগের মাধ্যমে তাদের যথেষ্ট রূপে মুকাবিলা করতে পেরেছিলেন। এই কারণে তিনি কালাম ও আকাইদ শাস্ত্রের প্রবর্তণে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

## ২. ইমাম গাযালী (র.)

তিনি তুস জেলার তাহিরান নামক স্থানে ৪৫০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম গাযালী নিজ দেশে শায়খ আহমাদ আল রাযেকানীর নিকট থেকে শাফিঈ মাযহাবের ফিকহী মাসয়ালা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে তা'লিম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি নিশাপুর গিয়ে শিক্ষা লাভ করে মুসলিম বিশ্বে বিরাট খ্যাতি অর্জন করেন। ৪৮৪ হিজরীতে তিনি বাগদাদের 'নিজামিয়া মাদরাসায়' অধ্যাপনা শুরু করেন। ইমাম গাযালী তখন বাউল মতবাদের বিরুদ্ধে কিতাব রচনা করেন। তার লিখিত এই কিতাবের নাম দেন 'মুস্তজহারা'।

ইমাম গাযালী (র.) পরবর্তী জীবনে জ্ঞান লাভ ও জ্ঞান বিতরণ এবং এর উৎকর্ষ সাধনে দুনিয়াব্যাপী প্রচেষ্টায় রত হন। এক সময় তিনি নির্জনবাসে ও ধ্যানে মগ্ন হন। ৪৯৯ হিজরীতে তিনি পূনর্বার জনগনের সান্নিধ্যে ফিরে আসেন। তিনি দরস ও তাদ্দরীস এবং সংস্কার ও সৎপথ প্রদর্শন কাজে নিজেকে একান্তবাবে নিয়োজিত করেন। ইমাম গাযালী (র.) ইসলামী সংস্কার ও ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টাকে নিম্নোক্তভাবে গ্রহণ করেন:

১. ভ্রান্ত দর্শন ও বাতেনী মতবাদের মোকাবেলা করার জন্য ইসলামী উৎসমূলের সাহায্যে আঘাত হানা।
২. ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে সে সবের উপর পর্যালোচনা।

এই নীতিমালার সুস্পস্ট বাস্তবায়নের জন্য 'তাহাফাতুল ফালাসিফা', 'আল্ মুনকিয মিনাদ্দালাল', 'জাওয়াহিরুল কুরআন', হুজজাতুল হক', 'কাসুমুল বাতেনীয়া', 'ফাছাইহুল ইবাহিয়াহ' ও 'সাওয়াহিমুল বাতিনিয়্যাহ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি আকাইদ, দর্শন ও হাকীকাতে ইলমের উপর

নীতি অর্থাৎ বিশ্বাস ও অবিশাবাসের মধ্যেবর্তী এক তৃতীয় অবস্থার স্বীকার করে তারাই মুতাযিলা। -*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্ব কোষ*, ই.ফা.বা.,, প্রাগুক্ত

ইহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন রচনা করেন। যা মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক অনবদ্য গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে।

শায়খ জয়নুদ্দীন আল ইরাকী (মৃত্যু ৯০৬ হিঃ) ইহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন সম্পর্কে লিখেছেন "ইমাম গাযালীর এ গ্রন্থটি ইসলামের সর্বোত্তম গ্রন্থের একটি । এই গ্রন্থ রচনা করার মাধ্যমে তিনি গবেষণা ও সমালোচনার জন্য নীতি এবং প্রশিক্ষণ নীতি মুসলমানদের মাঝে উপস্থাপন করেন। এর আগে এটা অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। উক্ত গ্রন্থখানিতে নসীহত, উৎসাহ প্রদান, সতর্কীকরণ আখিরাতের মর্যাদা ও মাহাত্ম , ঈমান এবং সৎকর্মের আবশ্যকতা, সংস্কার সাধন, আত্মার সংশোধন এবং অন্তরের ব্যাধি ও প্রবৃত্তির ক্ষতিকর বিষয়াবলীর উপর পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণী আলোচনা পেশ করেন।"

### ৩. শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র.)[১১৮]

তিনি জাহেরী ও বাতেনী ইলমে পরিপূর্ণতা লাভের পর শিক্ষা, সংস্কার ও সংশোধনমূলক কাজে আত্ম নিয়োগ করেন। পঠন, পাঠন, ফাতাওয়া প্রদান, লোকের আক্বীদা শুদ্ধিকরণ, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতকে সাহায্য ও সহানুভূতিতে তিনি কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসুলে ফিকহ আরবী ব্যাকরণ ও ইলমে তাজবীদ শিক্ষা দিতেন। শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে তিনি ফাতওয়া দিতেন। 'তাসলীম ও 'তাকবীদ' এবং তাওহীদ-ই-কামিল ছিল হযরত শায়েখ (র.) এর বিশেষ অবস্থা। এ কারণে তিনি ওয়াজ ও নসিহতের সময় বিশেষ অবস্থায় চলে যেতেন। তার ওয়ায ও নসিহতের প্রভাব শ্রোতাদের মনে খুবই দাগ কাটত। 'ফতহুল গাইব' ও ফতহুর রাব্বানী' গ্রন্থ দু'টির বক্তব্য ও ইলমী আলোচনা ঠিক তেমনি আজও প্রত্যক্ষ ওয়াজ ও নসিহতের মতো মানুষের মনন জগতকে আলোড়িত করে যাচ্ছে। তৎকালীন মুসলমানদের ধর্মীয়, নৈতিক, চারিত্রিক অধঃপতনে তিনি যাতনা অনুভব করতেন। 'দরবারী' ও 'সরকারী' 'আলিম'উলামাদের তিনি প্রত্যাখান করতেন। এসব লোকদের তিনি ইলম-আমলের খিয়ানতদার ও আল্লাহ এবং রাসূলের দুশমন বলে আখ্যায়িত করতেন। তিনি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে প্রকাশ্য ইলমকে সমন্বয় সাধন কাজে সারা জীবন ত্যাগ স্বীকার করেন। "যখন মানুষের মন আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তখন কোন বস্তুই তার থেকে ছুটে যেতে পারেনা" - এই বক্তব্য ছিল তাঁর মিশনের মূল কথা ।[১১৯]

সুফিবাদ, বায়'আত ও তারবিয়াত পদ্ধতি তিনি কুরআন ও হাদীসের নীতিমালার ভিত্তিতে জারী করেন। ইলমে তাসাউফের ভিত্তি রচনা করেন। নৈতিক ও চারিত্রিক কল্যাণ সাধনের জন্য বিরতীহীনভাবে সাধনা করেন। 'গুনিয়াতুত তালেবীন' তাঁর অমর গ্রন্থ।

---

[১১৮] হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)- ঃ ৪৭০ হিজরী সনে ইরানের উত্তর পশ্চিম 'জিলান' বা 'গিলানে' জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত ইমাম হাসান (রা) এর ১০ অধঃস্তন পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৮৮ হি. সনে তিনি বাগদাদে আসেন। তিনি ইলমে মারিফাতে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। 'বড় পীর' হিসেবে তিনি সমাধিক পরিচিত। তিনি ৫৬১ হি. ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। আল্লামা বুস্তানী, আল বিদায় ওয়ান নিহায়া, দ্বাদশ খন্ড, পৃ : ১৪৯

[১১৯] *আন-নাহদাতুল মিসরিয়্যাহ ওয়া কায়াতুল আয়ান*, কায়রো, ৩য় খন্ড, পৃ : ১১৯

বস্তুবাদী যুগে মানুষ যখন ইসলামের নানা যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে হয়। শায়খ (র.) তাঁর ইলমী যোগ্যতা দ্বারা ইসলামকে একটি জীবন্ত মো'জিযা হিসেবে পেশ করেন। তাঁর শাগরিদগণ তাঁর পরবর্তী সময়ে তাঁরই নির্দেশিত পথে দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজ করে ইসলামের বিরাট খিদমতের আঞ্জাম দেন। ইব্‌ন খাল্লিকান লিখেছেন-

"শেষ বয়সে তাঁর যুগে তিনি ছিলেন বাগদাদের অন্যতম শায়খ।"[১২০]

আবদুল কাদির জিলানী (র.) ছিলেন উচ্চস্তরের জ্ঞানতাপস। ইলমে তাছাউফে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তিনি মাদরাসা পদ্ধতির একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি শিক্ষা দান ও গ্রহণ করাকে জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ মনে করতেন। যার ফলে তিনি তাঁর পাঠদানে ইসলামী শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষা দান করেছেন ও গ্রন্থ রচনায় তাঁর প্রমাণ রেখে গেছেন।[১২১]

### ৪. আল্লামা ইবনুল জওযী (র.) [১২২]

ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে আল্লামা ইব্‌ন জাওযী (র.) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ। তিনি একাধারে মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, সমালোচক, গ্রন্থকার, প্রাঞ্জল ভাষ্যকার ও কাগ্মী ছিলেন। বহুগুণ ও প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছিল এই মহান সাধকের জীবনে। তিনি ছিলেন হাদীস লিপিবদ্ধকারীদের মধ্যে অন্যতম। এতবেশী হাদীস তিনি লিখেছেন যে, তাঁর অসীয়ত অনুযায়ী হাদীস লিখার কাঠ পেন্সিলের অবশিষ্ট অংশ (যা তিনি একত্র করে রেখেছিলেন) জ্বালনী কাঠ বানিয়ে মৃত্যুর পর গোসলের পানি গরম করার পরও কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। গ্রন্থ প্রণয়ন ও লিখার ব্যাপারে তিনি এত আগ্রহী ছিলেন যে, প্রতিদিন দৈনিক চার জুয (ষোল পৃষ্ঠার এক ফর্মা) লিখতেন। ইব্‌নে তায়মিয়া তাঁর রচনার সংখ্যা এক হাজার বলে উল্লেখ করেন।[১২৩] শেখা ও জানার আগ্রহ কোন দিন তাঁর মেটেনি। যার কারণে রাশি রাশি কিতাবে পরিপূর্ণ বাগদাদের বিশাল লাইব্রেরী, তাঁর নিজের ঘর বাড়ীর মতো হয়ে গিয়েছিল। তাঁর লিখিত গ্রন্থে তিনি বলেন : "কিতাব অধ্যয়ন দ্বারা কিছুতেই আমার তৃষ্ণা মেটে না, যখনই কোন নতুন কিতাবের উপর আমার চোখ পড়ে তখনই আমার মনে হয়,

---

[১২০] শায়খ ঃ শায়খ অর্থ বৃদ্ধ, মুরব্বী, উস্তাদ । শব্দটির ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। আইয়্যামে জাহিলিয়াতে শায়খ বলতে গোত্র কর্তাকে বুঝাতো। হুজুর (স) ও খুলাফায়ে রাশিদার সময়ে মুসলিম পরিভাষায় এর ব্যবহারিক রীতি প্রায় ছিল না বললেই চলে। ইসলামের সাম্য নীতি, গোত্রীয় শাসনের চরম অমানবীয় ও দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে লোকদেরকে মুক্তি দান করায় 'শায়খের' পরিবর্তে "সায়্যিদ" শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হয়ে উঠে। হিজরী ২য় শতাব্দীর শেষের দিকে 'শায়খ' শব্দটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ শুরু হয়। তখন হাদীস শাস্ত্রের উপর চলছিল ব্যাপক গবেষণা। কোন কোন হাদীস বিশারদ এর অবস্থিত স্থান রীতিমত মহাবিদ্যালয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এ সকল হাদীস বিশারদ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণকে 'শায়খ' নামে অভিহিত করা শুরু হয়। পরবর্তী শতকে ইসলামী ব্যক্তিত্ব; আধ্যাত্মিক মহান পুরুষ, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও মুফতীগণ শায়খ উপাধিতে ভূষিত হন। এলাকা বা দেশের মধ্যে বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও প্রধান সূচক সম্বোধন এবং সম্মান সূচক আখ্যায় পরিণত হয়েছে। ফলে পরিবারের প্রাধান্য, মর্যাদাশীল ব্যক্তি, ধনকুবের ইত্যাদি মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে শায়খ বলে সম্বোধন করা হয়। মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যিনি বুখারী শরীফের দরসে নিযুক্ত হন তাঁকে 'শায়খুল হাদীস' উপাধি দেয়ার রীতি উপমহাদেশে দারুল উলূম দেওবন্দ হতে চালু হয়। আরব দেশে সম্মান সূচক ভাবে 'শায়খ' দ্বারা সম্বোধন করা হয়ে থাকে। *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই.ফা.বা.,, ৪র্থ খন্ড. পৃ.৮১

[১২১] আল্লামা ইয়াফেয়ী, *মিরআতুল জিনান*, ৪র্থ খন্ড, পৃ : ৮১

[১২২] আল্লামা ইবন জাওযী (র.) ঃ ৫০৮ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৯৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন -সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী : *ইসলামী রেনেঁসার অগ্রপথিক*, ই.ফা.বা., ১৯৮৬ খৃ. পৃ. ২২৬

[১২৩] ইব্‌ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ : ৩২১

যেন আমি কোন গুপ্তধন পেয়ে গেছি। যদি আমি বলি যে, বিশ সহস্র কিতাব অধ্যায়ন করেছি, তাহলে এটা কারো কাছে বেশী মনে হতে পারে কিন্তু এটা প্রকৃতই আমার ছাত্র জীবনের ঘটনা।"[১২৪]

### ৫. জালালুদ্দীন রুমী (র.)[১২৫]

ইসলামী সাহিত্য সম্ভারকে দুনিয়ার মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য যে কয়জন মনীষী অবদান রেখে গেছেন, তার মধ্যে জালালুদ্দীন রুমী অন্যতম। ইসলামী শিক্ষার যাবতীয় দিক আয়ত্ত্ব করার পর তিনি নিজেকে একদিকে খোদা প্রেমিক তৈরি করা, অন্যদিকে ইলমের গূঢ় রহস্য উদঘাটনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালান। দর্শন শাস্ত্র ইসলামে কত সুন্দর ও নির্ভুল তিনি তা প্রমাণ করে বাতিল ও খোদাদ্রোহী সকল দর্শনকে পরাভূত করেন। অসাধারণ জ্ঞান স্পৃহা ও জ্ঞান লাভের অধীর আগ্রহ তাঁকে পৃথিবীর নানা দেশে নানা অঞ্চলে ঘুরিয়ে ফিরিয়েছে। তিনি বসে থাকেননি। জীবনের পুরো সময়টুকুই তিনি আল্লাহ প্রেমের স্বাদ আস্বাদনে বিভোর ছিলেন। শিক্ষক ও পূর্বসূরীদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা তাঁকে এই প্রচেষ্টায় বহুগুণে সফল করে তুলেছিল। তাঁর শিক্ষক ছিলেন জ্ঞান সাধক ও খোদাপ্রেমিক শামস তিবরীয (র.)। তাঁর সাহচর্যে তিনি ইলম ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ লাভ করে জগত জোড়া খ্যাতি অর্জন করেন।

'মছনবী রুমী' - গ্রন্থটিকে করো কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না। ফারসী ভাষায় লিখিত মাওলানার এই অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ ইসলামের জ্ঞান ও সাহিত্য জগতের এক অনুপম দলীল। গ্রন্থটিতে তিনি এমন ভাব ধারার সূচনা করেন, যা কেবল তখনকার জন্যই কাজে আসেনি তার পথ ধরে বহু মনীষী জ্ঞান ও গবেষণার পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা লাভ করেছেন। খোদা প্রেম, ইসলামের নানা দিক, পারস্পরিক আচার অভ্যাস, চরিত্র, সামাজিক ও পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্র ও সরকার, ইহকাল ও পরকাল এক কথায় কুরআন-হাদীসের মর্মালোকে যাবতীয় বিষয় তিনি এতে কাব্যিক ভাবধারায় স্থান দিয়েছেন। পৃথিবীর মানুষের কাছে দুর্বোধ্য বস্তু গুলোকে তিনি অতি সহজে তুলে ধরেছেন। মছনবী 'ইলম ও আমলে' মৃতকে জীবিত করার জন্য মৃতসঞ্জীবনীর মত। আল্লাহর অস্তিত্ব, মানবতা, বিনয় নম্রতাকে তিনি অতুলনীয়ভাবে বিশ্বের দরবারে পেশ করার চেষ্টা করেছেন।

### ৬. মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.)[১২৬]

[১২৪] আল্লামা ইবনুল জাওযী (রা.) তাবলীসে ইবলিস, ১ম খন্ড, পৃ : ১২১-১২২

[১২৫] আল্লাহ্ জালালুদ্দীনব রুমী (র) ঃ নাম মুহাম্মদ, উপাধি জালালুদ্দীন, রুম বা রুমী ছিল তাঁর জনপ্রিয় উপাধি। তাঁর পিতার নাম ও ছিল মুহাম্মদ, উপাধি বাহাউদ্দিন। খুরাসানের অন্তর্গত 'বলখ' নগরীতে তিনি ৬০৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

[১২৬] মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) ঃ তাঁর পুরো নাম শায়খ আহমদ ইব্ন আবদুল আহাদ ফারুকী, উপাধি সিরহিন্দী। পিতার নাম শেখ আবদুল আহাদ (র) । তিনি ৯৭১ হিজরীতে ১৪ শাওয়াল শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন-মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ই.ফা.বা.,, ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ৬১৭ ও মুহাম্মদ ফররুখ সোলায়মান আযাদী, *কারবালা থেকে বালাকোট*, ঢাকা- ১৯৮৭ খৃ., পৃ : ১৪৬-১৪৭

তিনি ছিলেন উপমহাদেশে ইলমে হাদীস তথা ইসলামী জ্ঞান বিকাশের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। যাঁর সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলাম শিরক বিদ'আতসহ নানা ফিতনা থেকে রক্ষা পায়। তিনি হাদীসের শিক্ষা গ্রহণে নিজের জীবনের বিরাট অংশ ব্যয় করেন। শায়খ ইয়াকুব সাইফী (র.) -এর নিকট 'বুখারী' , মিশকাতুল মাসাবীহ, আল্লামা সুয়ূতী (র.) - এর নিকট 'জামিউস সাগীর' গ্রন্থের ওপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি 'বহলুল বদখশানী' (র.) - এর মত প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করে পুনরায় তা প্রচার ও প্রসারের অনুমতি লাভ করেন।

তিনি কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে তখনকার মুসলিম সমাজ সংস্কার ও সংশোধনের বিরাট আন্দোলন পরিচালনা করেন। ইলমে হাদীসের উপর তাঁর লিখিত হাদীসে 'আরবাইন' নামক গ্রন্থখানি হাদীস শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছিল। তাঁর অপর একটি গ্রন্থ 'মাকতুবাত'। তিনি এতে কুরআন- হাদীস শিক্ষার ব্যাপারে এবং ইলমে দ্বীন প্রচার ও প্রসারে পারদর্শিতা লাভ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। কুরআন ও হাদীস শিক্ষার গুরুত্ব সবিস্তারে তাতে তিনি বর্ণনা করেন। তাঁর সময়কার প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ফররুখ শাহ (র.), সিরাজ আহমদ মুজাদ্দেদী অন্যতম। খাজা আজম ইবনে সায়ফুদ্দীন সিরহিন্দী 'ফজলুল বারী ফি শারহিল বুখারী' রচনা করেন।

বাদশাহ আকবর 'দ্বীন-ই-ইলাহী' নামক নতুন ধর্মীয় মতবাদ চালু করেন। ইসলাম সম্পর্কে নানা দিকের অপব্যাখ্যায় এই ধর্ম নিছক শিরক বেদআত এর মতবাদে পর্যবসিত হয়। মদ জুয়া বৈধ করে দেয়া হয়। খাতনার বয়স ১২ বছর করা হয়। আকবর নিজে কিবলার দিকে মুখ করে শয়ন করতো। কালিমার সঙ্গে আকবরের নাম যুক্ত করে পড়তে হতো। তাকে লোকেরা সিজদা করতেন। এক কথায় আকবরের আমলে এ উপমহাদেশে ইসলামের আক্বীদাহ ও ঐতিহ্য এতটাই ভুলণ্ঠিত হলো যে, নবতর জাহেলিয়াতের আকারে অনেক কিছুই চালু করা হলো।[১২৭]

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবাণীতে শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এসবের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তাঁর প্রণীত সংস্কার আন্দোলন ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন নামে পরিচিত। এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম আবার শংকামুক্ত ও ভেজালমুক্ত হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে শিরক বিদ'আত দূরীভূত হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় ইসলামী শিক্ষায় নবতর যুগের সূচনা হয়। বহু মসজিদ, মাদরাসা, মকতব ও পাঠাগার স্থাপিত হয়। তিনি এমন সংস্কার আন্দোলন সূচিত করেন যে, বাদশাহ আকবরের খোদাদ্রোহী কর্মকান্ড কেবল বন্ধই হয়নি, তার বংশের পরবর্তী বাদশা বা আমীরদের তিনি ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ মুসলমান হিসেবে তৈরী করতে সক্ষম হন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব পরবর্তীকালে ইসলামের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা ও সভ্যতার সিপাহসালার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। 'মুজাদ্দিদে আলফ সানী বা 'দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক'

[১২৭] মোহাম্মদ সোলায়মান ফররুখ আযাদী, *কারবালা থেকে বালাকোট*, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ১৫১

হিসেবে তিনি যথার্থ গৌরব অর্জন করেন। কারণ তিনি পীর ও ফকীরীর অপসংস্কৃতির মূলৎপাটন করে 'বাই'আত ও এরশাদের' খোলাফায়ে রাশিদার অনুসৃত নীতির অনুসরণ করে শুধু উপমহাদেশ নয়, পুরো এশিয়া জুড়ে নবজাগরনের সূচনা করেন।[১২৮]

[১২৮] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই.ফা.বা., ১৯৮৬ খৃ., ১ম খন্ড, পৃ : ৯০-৯১ ও মুহাম্মদ সোলায়মান ফররুখ আযাদী, প্রাগুক্ত, ঢাকা-১৯৮৬ খৃ. পৃ. ১৫৩

### ৭. মুহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব আলমগীর [১২৯]

উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসে সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন নিবেদিত প্রাণ মুসলমান শাসক ছিলেন। শাসন কার্যের পাশাপাশি তিনি নিজেকে ইসলাম শিক্ষার একজন মহান সেবক হিসেবে পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইসলামের নিয়ম নীতিকে তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের পিতাকে কারাগারে আটক করেন। জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন তিনি পছন্দ করতেন না। রাষ্ট্রীয় তহবিল বা 'বায়তুল মাল'[১৩০] থেকে তিনি অর্থ গ্রহণ করতেন না। সম্পদ ও ক্ষমতা সবই জনগণের আমানত মনে করতেন। টুপী সেলাই করে এবং কুরআনুল কারীম নকল করে নিজের সংসার চালাবার ব্যবস্থা করতেন।

জ্ঞানের একজন সাধক ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। তার মজলিশ ছিল জ্ঞানী-গুনীদের মজলিশ। তিনি নিজেই কয়েকটি ভাষার পন্ডিত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ভাষার ভাষাবিদ ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। ৩৫ বছর বয়সে তিনি কুরআনুল কারীম হিফজ করেন। কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন একজন সুপন্ডিত । তাঁর পূর্ব পুরুষ আকবর ইসলামের মধ্যে যে সব শিরক ও বিদআতকে প্রবিষ্ট করিয়েছিলেন, আওরঙ্গজেব মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এবং তাঁর বংশধরদের সংস্পর্শে থেকে তা সম্পূর্ণভাবে দূর করেন। মুজাদ্দিদে আলফ সানীর পুত্র শেখ আহমদ সাইদ (র.) ও মুহাম্মদ মাছুম (র.) এবং তাদের বংশের খলীফা ও শিক্ষাবিদদের সান্নিধ্যে থেকে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন দিক পূর্ণভাবে আয়ত্ব করেন। ডঃ মুহাম্মদ আসলাম তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন- "মুজাদ্দেদী খানদানই আওরঙ্গজেবকে মুহীউদ্দিন বানিয়েছিল"।

তিনি দেশ শাসনে তাঁর দরবারে তাঁর প্রশংসামুলক কবিতা লেখার প্রথা বন্ধ করে দেন। তাঁর শাসনামলে চান্দ্র বছর প্রবর্তন করেন। দেশের প্রাজ্ঞ 'আলিমগণকে তিনি দরবারে স্থান দিয়ে 'ফাতাওয়া বিভাগ' চালু করেন। প্রতিদিন এই ফাতাওয়া বিভাগের কার্যক্রম চলত। তিনি স্বয়ং এর দেখাশুনা করতেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলেই বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী সংকলিত হয়।

মাওলানা শিবলী নোমানী লিখেছেন- "তিনি দিনে দু'তিনবার প্রকাশ্য দরবার ডাকতেন এবং জনগণের অভিযোগ শুনে ইসলামী শরিআহ মোতাবেক ফয়সালা ঘোষণা করতেন।"[১৩১]

---

[১২৯] মুহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব আলমগীর মুহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব আলমগীর ঃ নাম- মুহিউদ্দীন, উপনাম- আওরঙ্গজেব ও আলমগীর। তিনি বাদশাহ শাহাজাহানের পুত্র ও বাদশাহ জালালুদ্দীন আকবরের প্রপৌত্র ছিলেন। তিনি ৫০ বছর শাসন কার্যপরিচালনা করেন-মুহাম্মদ সোলায়মান ফররুখ আযাদী, *কারবালা থেকে বালাকোট*, ঢাকা-১৯৮৭ খৃ., পৃ. ১৫৪-১৫৫

[১৩০] বায়তুল মাল ঃ আরবী শব্দ। ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারী অর্থভান্ডারকে বায়তুল মাল বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর আমলেই এর নামকরণ করা হয় । খোলাফায়ে রাশিদার আমলে পরিপূর্ণ ইসলামী কানুর দ্বারা এর ব্যবহার স্বীকৃত হয়।

[১৩১] মুহাম্মদ সোলায়মান ফররুখ আযাদী, *কারবালা থেকে বালাকোট*, ঢাকা ১৯৮৭ খ,. পৃ : ১৫৯

## ৮ শাহ ওয়ালী উল্যাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)[১৩২]

ইলমে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার এবং বিদআতের মূলোৎপাটনে শাহ ওয়ালী উল্যাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এর নাম স্বরণীয় হয়ে আছে। তিনি ছিলেন 'আলিম, ফকিহ, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, চিন্তাবিদ, সংস্কারক ও ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের অগ্রপথিক। সাত বছর বয়সে তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় ব্যাপক জ্ঞানলাভ করেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। শাহ আবদুর রহীম (র.) তাঁকে তাফসীর ও হাদীস শিক্ষাদান করে পাগড়ী পরিয়ে শিক্ষাদানের অনুমতি প্রদান করেন। শাহ আবদুর রহীম (র.) তাঁর জন্য দু'হাত তুলে বহু 'আলিম ' ওলামা নিয়ে দোয়া করেন। এর পরও তিনি হাদীস শিক্ষায় তৎকালীন ইলমের শহরগুলো ব্যাপক ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীসের উন্নততর ইলম হাসিল করেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁর পিতা পূর্ব থেকেই দিল্লীতে 'রহিমিয়া মাদরাসা' নামে একটি ইসলামী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পিতার ইন্তিকালের পর দীর্ঘদিন হাদীস শিক্ষায় বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করে এবং দু'বার পবিত্র হজ্জব্রত পালন শেষে পুনরায় পিতার রেখে যাওয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। এরপর 'ফাতহুল কাবীর', 'ফাতহুল খাবির' এবং 'তা'লিমুল আহাদিস' নামক কিতাব রচনা করেন। এ গ্রন্থগুলোতে তিনি চার মাযহাবের পর্যালোচনা পূর্বক তাবেয়ী'ন ও তাবে' তাবেয়ীনগণের মতামত পর্যালোচনা করেন। কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শিক্ষার বন্ধ দরজা তিনি পুনরায় খুলে দেন। হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্যমূলক আলোচনা পেশ করেন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' ছিল তাঁর নজীর বিহীন রচনা। ইজতিহাদের[১৩৩] জগতে এই গ্রন্থ এক অমূল্য সম্পদ। 'রিসালায়ে ইনসাফ', 'উকাদাতুল খাবীর' ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অমর লেখনি।[১৩৪]

ইলমে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের জটিল বিষয়গুলোর লেখনির মাধ্যমে তিনি সমাধান করেন। ইজতিহাদের নীতিমালার জন্য এবং ইলমে দ্বীনের হিকমত তথা প্রজ্ঞাপূর্ণ ধারাবাহিকতার জন্য তার 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' অতুলনীয় গ্রন্থ। সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার দূরীকরণে শাহ ওয়ালী উল্যাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) পাক ভারত উপমহাদেশে কেবল সমাদৃত হননি, বিশ্ব মুসলিমের নিকট তিনি উজ্জ্বল নত্রক্ষের ন্যায় খ্যাতি অর্জন করেন।[১৩৫]

---

[১৩২] শাহ ওয়ালী উল্যাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) ঃ ১১১৪ হিজরী সনের ৪ঠা শাওয়াল বুধবার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুর রহিম (র) । শেখ ওয়াজি উদ্দিন তাঁর দাদা ছিলেন। শাহ আব্দুল আজিজ (র), শাহ রফিউদ্দিন, শাহ আবদুল কাদের, শাহ আদুল গনি তাঁর পুত্র ছিলেন। শাহ ইসমাইল শহীদ (র) তার পৌত্রদের অন্যতম ছিলেন। ১১৭৬ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মুহাম্মদ সোলায়মান ফররুখ আযাদী, *কারবালা থেকে বালাকোট*, ঢাকা-১৯৮৭ খৃ., পৃ : ১৬২-১৬৩

[১৩৩] ইজতিহাদ ঃ অর্থ সাধনা, চেষ্টা, আবিষ্কার । ইসলামী শরীআতের সমস্যাবলী নিরসনে বিশেষ ধরনের নীতিমালার আলোকে সমস্যার সমাধানের পদ্ধতিকে ইজতিহাদ বলে।

[১৩৪] সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, *ইসলামী রেনেঁসার অগ্রপথিক*, ই.ফা.বা., ১৯৮৬, ২য় খন্ড, পৃ : ১২৫

[১৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ : ১২৬

## ৯. আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) [১৩৬]

পাক ভারত উপমহাদেশে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কয়জন খ্যাতিমান মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে শায়খ আবদুল হাক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)-এর নাম শীর্ষে পর্যায়ের একটি নাম। তীক্ষ্ম মোধা সম্পন্ন এই মনীষীর অসাধারণ হিফজ শক্তি তাকে জগত জোড়া খ্যাতি লাভে সাহায্য করেছিলেন । তিন মাসে কুরআন শিক্ষা এবং একমাসে হাতের লেখা শেখা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাল্যকালেই তিনি পিতার সন্নিধ্যে থেকে কুরআনুর কারীম হিফজ করেন। [১৩৭]

বার বছর বা তের বছর বয়সে তিনি 'শরহে মামসিয়া' ও 'শরহে আকাঈদ নাসাফী' অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ষোল বছর বয়সে মুখতাসারুল মা'য়ানী সমাপ্ত হয়ে যায়। আঠার বছর বয়সে তিনি দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, আরবী সাহিত্য, ইসলামী আ্ইন শাস্ত্র এবং হাদীস শাস্ত্রের যাবতীয় গ্রন্থ্ অধ্যয়ন শেষ করেন। তিনি ৯৯৬ হি. সালে মক্কা শরীফ গমন করেন। সেখানে আধ্যাত্মিক সাধক আব্দুলওহহাব মুত্তাকী (র.) (৮৮৫-১০০২ হি.) এর সংস্পর্শে দীর্ঘ সময় কাটান। এ সময় তার বয়স ৪০ বছর পার হয়ে যায়। তার নিকট তিনি হাদীসের যাবতীয় কিতাব পুনরাবৃত্তিসহ অধ্যয়ন করেন।[১৩৮]

৯৯৯ হি. সনে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে তিনি সমাজে অন্যায়, অবিচার সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া ইত্যাদি অনৈসলামী কাজ চলছে দেখে বড়ই ব্যথিত হন। ব্যাপক চিন্তা ভাবনার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার ফলেই এসব খারাপ কাজ সমাজে চালু হয়েছে। তাই কুরআন হাদীস সহ অন্যান্য ইসলামী বিষয়াদি শিক্ষা দানের জন্য দিল্লীতে একটি দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে এ মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া খ্যাতনামা শিক্ষকদের শিক্ষকতায় নিয়োগ করেন।[১৩৯]

শিক্ষা দানের পাশাপাশি তিনি শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থ্ রচনায়ও পিছিয়ে ছিলেন না। পশ্চাতপদ ভারতবাসীকে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থের ফার্সী শরাহ 'আশ'য়াতুল লুম'আত' গ্রন্থ্ রচনা করেন।[১৪০] 'মাছাবাতা বিস্-সুন্নাহ' ও 'শরদু সিফরুস সা'আদা' নামক দু'খানি গ্রন্থ্ তিনি রচনা করেন। এসব কিতাবে তিনি শিরক ও বিদাআতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালান।

[১৩৬] আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) - তাঁর পুরো নাম ঃ শায়খ আবদুল হক সাইফুদ্দীন ইবনে আগা মুহাম্মদ তুর্ক আল বুখারী আদ দেহলভী আল-হানাফী। ৯৫৮ হিজরীতে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। মৌলভী রহমান আলী, *তাযকিয়ায়ে ওলামায়ে হিন্দ*, পাকিস্তান হিষ্টোরিক্যাল সোসাইটি, ১৯৬১ খৃ., পৃ : ২৭৬ ও আবদুল হাই ফখরুদ্দীন : *নুযহাতুল খতিয়ার*, হায়াদারাবাদ, ভারত, দাইরাতুল মাআরিফ, ১৯৭৬ খৃ., পৃ. : ২০৬

[১৩৭] আকদুল হক দেহলভী (র.) ভূমিকা, আশ'আতলি লুম'আত, মোইদ আহমদ কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত, ১ম খন্ড, নয়া দিল্লী ১৯৮৮ খৃ., পৃ : ৬৯-৭০

[১৩৮] *আশ'আতুল লুম'আত*, প্রাগুক্ত, পৃ : ৭১

[১৩৯] প্রফেসর খালিক আহমদ তাঞ্জামী, *হায়াতে শাইখ আবদুর হক দেহলভী*, দিল্লী, ভারত নদওয়াতুল মুসান্নেফীন, ১৯৫৩ খৃ, পৃ : ৭৩

[১৪০] গ্রন্থ্গুলো ফার্সী ভাষায় রচনার কারণ ছিল এই যে, তখন এ এলাকায় ফার্সী ভাষার প্রচলন ছিল। ফলে জসগণের অধিক উপকারের তাগিদেরই তিনিই ফার্সী ভায়ায় এগুলো রচনা করেন। সায়্যিদ আহমদ কাদেরী, *তাযকিয়া-ই-শায়খ আবদুল হক দেহলভী* (র), পাটনা, তা, বি, পৃ : ৩৭-৩৮

সুফীবাদ তখন ব্যাপকতার দিকে অগ্রসর হয়ে অতি মাত্রায় 'তরিকত'কে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। তিনি এর উপর লেখনী পরিচালনা করে সুফী সাধকদের বুঝতে সক্ষম হন যে, শরীয়াত হচ্ছে, তরিকতকে পরিচালনার গাইড বিশেষ। শরীয়ত ব্যতীত তরিকত[১৪১] চলতে পারে না। ফিকহে হানাফী'র উপর তিনি তার কলমের প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেন। অন্যান্য মাযহাবের সাথে হানাফী মাযহাবের মতবাদ ও ব্যাখ্যাবলীকে সহজতর পন্থায় তুলে ধরে সাধারণের বিরাট খেদমাত আঞ্জাম দেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও তাসাউফের উপর তিনি মোট ষাটটি গ্রন্থ রচনা করেন।প্রবন্ধ, নিবন্ধ আকারের রিসালা বা ছোট পুস্তকসহ তার লিখিত পুস্তক সংখ্যা একশত ষোল খানা।[১৪২]

দিল্লী এলাকায় তখন ইসলামী বইয়ের খুবই অভাব ছিল। দিল্লীতে কোন ইসলামী লাইব্রেরী ছিল না। তিনি সর্বপ্রথম 'পাবলিক লাইব্রেরী' দিল্লীতে প্রতিষ্ঠা করেন। [১৪৩]

সেখানে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ জীবনী ও অন্যান্য বিষয়ের দুর্লভ বই তিনি সংগ্রহ করেন। ভারতের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ লাইব্রেরী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা জ্ঞান চর্চার জন্য এ লাইব্রেরীতে ছুটে আসত। তাঁর পরবর্তী বংশধরদের দ্বারাও বহুকাল পর্যন্ত এটি পরিচালিত ও সংরক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিখ, মারাঠা ও জাঠদের দ্বারা দিল্লীতে রাজনৈতিক বিশৃংখলা সৃষ্টি পর্যন্ত এই লাইব্রেরী বিদ্যামান ছিল।[১৪৪]

সীরাত[১৪৫] সাহিত্য বিকাশে আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)- এর অবদান অসাধারণ। তিনি 'মাদারিজুন নবুয়্যাত' নামে সীরাতের ওপর একটি দালিলীক গ্রন্থ রচনা করেন। খতমে নবুওয়াতের ওপর তার এই গ্রন্থ আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি গ্রন্থ। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সামগ্রিক জীবন চরিত স্ববিস্তারে এই গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করেন। এটিও ফরাসী ভাষায় রচিত। ১২০০ পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি ৫টি খন্ডে বিভক্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ভাষায় 'মাদারিজুন নুবুওয়্যাত' গ্রন্থ খানি অনূদিত হয়েছে। আকবরের নতুন ধর্মীয় মতবাদের মোকাবেলায় এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়াত ও রিসালাতকে চক্রান্তের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে।

## ১.৩.৩ উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা :

[১৪১] তরিকতঃ আরবী শব্দ। 'তরক' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। অর্থ-পথ, রাস্তা নির্দেশনা, চলার গতি, নির্দেশনা ইত্যাদি। ইলমে মারিফত পন্থীদের একটি পরিভাষা তরিকত। মারিফতের পরিভাষায় চারটি মূলনীতি সহকারে খোদা প্রাপ্তির সাধনা করতে হয় যথা- ১. শরীয়ত , ২. মারফত, ৩. হাকীকত ও ৪. তরিকত। খোলাফায়ে রাশেদার পরবর্তী যুগে সুফিবাদ বিস্তার লাভ করলে অলী ও সুফি সাধকগণের দ্বীন প্রচারের বিভিন্ন তরীকার উদ্ভব ঘটে। মাযহাবগুলো যেমনি ইলমে পরিপূর্ণতা দান করেছে, তরীকাগুলোও তেমনি ইলমে মারিফাতকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেছে- ফকীর আবদুর রশীদ, *সুফীতত্ত্ব*, ই.ফা.বা.,, পৃ : ২২১

[১৪২] শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, *জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব*, বাইতুশ শরফ ইসলামী পাঠাগার, চট্টগ্রাম-১৯৯২ খৃ., ভূমিকা, পৃ : ৫

[১৪৩] Dr. Mohammad Ishaq: Indias Coutribution to the study of Hadith literature (Dhaka 1976) P-147 (University of Dhaka)

[১৪৪] *হায়াতে শাইখ আব্দুল হক দেহলভী*, প্রাগুক্ত, পৃ : ১৫৪

[১৪৫] 'সীরাত' শব্দের অর্থ জীবন চরিত্র। ইসলামী পরিভাষায় মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত্রকে বুঝানো হয়ে থাকে। *Encyclopaedia of Islam*, Vol, 4, London 1424, p : 432

উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার মন্তব্য করেন "আমরা এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মুসলমানরা কেবল রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলনা, বরং জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বুদ্ধি ও মেধাগত দিক থেকেও তারা ছিল শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাদের হাতে ছিল এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা যাকে কোন অবস্থাতে খাটো করে দেখা যায় না। এতে ছিল উন্নত নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা।"[১৪৬]

এ মন্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা ইংরেজরা মুসলমানদেরকে ধীরে ধীরে গোলামে পরিণত করার কাজ করেছে। প্রথমেই তারা মুসলমানদের শিক্ষা দীক্ষা ইতিহাস ঐতিহ্য তাহযীব ও তামাদ্দুনের উপর সর্বগ্রাসী আগ্রাসন চালায়। তারা মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংশ করে তাদের মত করে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। অথচ ভারতবর্ষের উন্নতি ও সমৃদ্ধিত্বে ইসলামী শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষার অবদান ইতিহাসের নিরিখে বাস্তব সত্য। বৃটিশ শাসন মুসলমানদের শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষাই ছিল ভারতবর্ষের একক জাতীয় শিক্ষা। ইংরেজদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচিতি এদেশের মানুষের নিকট তখন ছিল অস্পষ্ট। অপর দিকে তাদের জন্য তা ছিল অপ্রয়োজনীয়।[১৪৭]

উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বৃটিশ-পূর্ব যুগ পর্যন্ত ধাপে ধাপে আরবী মাদরাসাসমূহে যেসব পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত ছিল, মৌলবী আবুল হাসান আলী নাদভী যুগের ক্রমানুসারে তা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্যগ্রন্থ সমূহের নামও উল্লেখ করেন।[১৪৮]

**প্রথম যুগ**

এ যুগটি খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। বলতে গেলে আরবী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম যুগটি দু'শতাধিক বছর স্থায়ী হয়। এ সময় সরফ, বালাগাত, ফিকহ্, উসুল-ই-ফিকহ্, মানতিক, কালাম, তাসাউফ, তাফসীর, হাদীস-এ সব বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণই ছিল সুধি সমাজের মর্যাদা লাভের মাপকাঠি। এ যুগে যেসব গ্রন্থ পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল তা নিম্নরূপ :

| | |
|---|---|
| নাহ্ব (বাক্যপ্রকরণ ও শব্দের স্বরচিহ্ন নির্ণয়শাস্ত্র) | : মিসবাহ্, কাফিয়াহ্, লুব্বুল আলবাব, ইরশাদ। শেষ অক্ষরের |
| ফিক্হ্ | : হিদায়াহ্ |
| উসূল-ই-ফিক্হ | : মানার ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ, (ফিক্হ-এর মূলনীতি) উসূল-ই-বয্দবী। |
| তাফসীর (কুরআনের ব্যাখ্যা) | : আওয়ারিফ, ফুসূসূল হিকাম, নাক্দুন নুসূস, লাম'আত। |

১৪৬ আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ই.ফা.বা.,, ঢাকা, ১৯৮৭ খৃ., পৃ : ৪৮
১৪৭ *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খন্ড, ই.ফা.বা.,, ঢাকা ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ২২১
১৪৮আবুল হাসান আলী নাদভী, *হিন্দুস্তান কী-কাদীম দরসগাহ*, মাআরিফ প্রেস, আযমগড়, ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৮৯-১০০

হাদীস মাশারিকুল আন্‌ওয়ার, মাজাবীহুস্‌ সুন্নাহ।

মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) : শার্‌হ্‌-ই-শামসিয়াহ।

আল্‌-কালাম : শর্‌হ্‌-ই-সাহায়িফ, তামহীদ-ই-আবুশ্‌ (ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বিদ্যা) শাকুর সালেমী।

সাহিত্য : মাকামাত-ই-হারীরী।

এ যুগে ফিক্‌হ ও উসুল-ই-ফিক্‌হ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করাই ছিল পান্ডিত্য ও সামাজিক মর্যাদা লাভের চাবিকাঠি। হাদীস বিষয়ে 'মাশারিকুল আন্‌ওয়ার' অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত ছিল। সৌভাগ্যবশত কেউ যদি 'মাসাবীহ্‌' পড়ার সুযোগ পেতো তাকে 'হাদীস বিষয়ের ইমাম' খেতাবে ভূষিত করা হতো।[১৪৯] সাহিত্যের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হতো না। কেবল 'মাকামাত-ই-হারীরী' কণ্ঠস্থ করানো হতো।[১৫০]

**দ্বিতীয় যুগ**

এ যুগটি ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। এ যুগের পাঠ্যসূচী ছিল অনেকটা প্রথম যুগেরই অনুরূপ। তবে এ সময় পান্ডিত্য লাভের মাপকাঠি আরো উন্নত করা হয়। এ যুগে পূর্ববর্তী যুগের পাঠ্যসূচীর সঙ্গে কাযী আয়ুদ রচিত 'মাতালি', 'মাওয়াকিফ', ও সাক্বাফী রচিত 'মিফ্‌তাহুল উলূম' ও পাঠ্যভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া ক্রমান্বয়ে 'শরহ্‌-ই-মাতালি', শরহ্‌-ই-মাওয়াকিফ', 'মুতাও-উয়াল', 'মুখতাসারুল মা'আনী', তাল্বীহ, শর্‌হর-ই-আকায়িদ-ই-নাসাফী, 'শর্‌হ্‌-ই-বিকায়াহ', ও 'শর্‌হ্‌-ই-জামী' সংযোজিত করা হয়।

এ যুগের সর্বাশেষ ও সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা 'আলিম ছিলেন শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস-এ-দিহলবী (র.)। তিনি ৯৯৬হি. /১৫৮৭ খৃ.মক্কা-মদীনায় গমন করেন এবং তথায় ৩/৪ বছর হাদীস শিক্ষা করে দেশে ফিরে যথাসাধ্য চেষ্টা নিয়োজিত করেন। পূর্বসুরীদের প্রয়াস আশানুরূপ সাফল্যমন্ডিত হয়নি। কিন্তু এ কৃতিত্ব শায়খ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মোটকথা, দ্বিতীয় যুগে উপমহাদেশে হাদীস ও আরবী সাহিত্য শিক্ষা প্রসার লাভ করেনি। এ যুগে সাক্কাফী রচিত 'মিফ্‌তাহুল্‌ উলূম' এবং কাযী আযূদ লিখিত 'মাতালি ও 'মাওয়াফিক্‌ ই জ্ঞানচর্চা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতো।[১৫১]

১৪৯ আবুল হাসান আলী নাদভী, প্রাগুক্ত, ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৮৯-১০০
১৫০ আবুল হাসান আলী নাদভী, প্রাগুক্ত, ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৮৯-১০০
১৫১ আবুল হাসান আলী নাদভী, প্রাগুক্ত, ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৯৪

**তৃতীয় যুগ ঃ**

এ যুগ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাবদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়েও আরবী মাদরাসা সমূহের পাঠ্য তালিকায় কিছুটা নতুন সংযোজন করা হয়। এবং ইসলামী তথা আরবী-ফার্সী শিক্ষার উন্নতি বিধান করা হয়। এ যুগের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা মনীষী ছিলেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহ্লবী (১৭০৩-১৭৬২ খৃ.)। তিনি তাঁর 'আল্-জুযউল্ লাতীফ' নামক আত্মজীবনী চরিত গ্রন্থে সে যুগে প্রচলিত পাঠ্যসূচী বর্ণনা করে লিপিবদ্ধ করেন, তা নিম্নরূপ :[১৫২]

| | |
|---|---|
| নাহব্ | : কাফিয়াহ্, শর্হ্-ই-জামী। |
| মানতিক | : শর্হ্-ই-শামসিয়াহ্, শর্হ্-ই-মাতালি |
| দর্শন | : শর্হ্-ই-হিদায়াতুল-ই-নাসাফী। |
| ফিক্হ্ | : হুসসামী, তাওযীহ, তালবীহ এর কিয়দংশ |
| বালাগাত (বাক্যলংকার শাস্ত্র) | : মুখ্তাসারুল মাআনী, মুতাওয়াল। |
| জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত | : কতক সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা |
| চিকিৎসা শাস্ত্র | : আল-কানুন (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)। |
| হাদীস | : মিশ্কাতুল্ মাসাবীহ্ (সম্পূর্ণ), শামায়েল-ই তিরমীযী সম্পূর্ণ, সহীহ্ বুখারী (কিয়দংশ) |
| তাফসীর | : মাদারিক, বয়যাবী |
| তাসাওউফ্ | : আওয়ারিফ, রাসায়িল-ই-নক্শবন্দিয়াহ্। |

উপরোক্ত পাঠ্যক্রমে শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ অধ্যয়ন করেন। এর পর তিনি মদীনায় গমন করেন; তথায় কয়েক বছর শায়খ আবু তাহের মাদানীর (র.) নিকট হাদীস শিক্ষা করে দেশে ফিরে আসেন (১৭৩২ খৃ.) এবং সিহাহ্ সিত্তার শিক্ষাদান ও শিক্ষাপ্রসারে জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর বংশের 'আলিমকুল এবং তাঁর শিষ্যগণও হাদীস-তাফসীর চর্চায় যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ স্বয়ং একটি পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তা জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়নি। কারণ সে সময় মুসলিম শাসন পতনোম্মুখ ছিল বলে দিল্লীর শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাধারায় ভাটা পড়ে এবং লখনৌতে মোল্লা কুতবুদ্দীন ও তদীয় পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীনের চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রটি জেগে উঠে। এছাড়া যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের প্রতি সে যুগীয় লোকের অনুরাগও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছিল। তাই তারা দিল্লী স্কুলের হাদীস-তফসীর শিক্ষার প্রতি ততটা আকৃষ্ট না হয়ে লখনৌ কেন্দ্রের মানতিক ও হিকমাত ভিত্তিক শিক্ষায় অনুরাগী হয়ে উঠে। আরবী-ফার্সী সাহিত্যের প্রতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোন ঝোঁক ছিল না। পাঠ্য তালিকায়ও এ সাহিত্য বিষয় দুটির জন্য কোন স্থান ছিল না।[১৫৩]

১৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

১৫৩ আবুল হাসানাত নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭

**চতুর্থ যুগ ঃ**

এ যুগের সূচনা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এ যুগের স্রষ্টা হলেন মোল্লা নিযামুদ্দীন সিহালবী। মূলত এ যুগের অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল মোল্লা কুতুবুদ্দীন অংকিত শিক্ষা রূপরেখার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তিনি আরবী মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচীর জন্য যে কাঠামো দাঁড় করেছিলেন, তা পূর্ণতা লাভ করেছিল তাঁর সুযোগ্য পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীনের কর্মসূচীর ছত্রছায়ায়। তাই মোটামুটি তাঁকেই এ যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার স্রষ্টা বলে আখ্যায়িত করা যায়। মোল্লা কুতুবুদ্দীন ছিলেন শাহ আবদুর রহীমের সমসাময়িক। আবার মোল্লা নিযামুদ্দীন ছিলেন শাহ আবদুর রহীমের স্বনামধন্য পুত্র শাহ ওয়ালিউল্লাহর সমসাময়িক। শাহ ওয়ালিউল্লাহর যুগে যে পাঠ্যসূচী প্রচলিত ছিল, মোল্লা নিযামুদ্দীন তাতে অনেক কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। এ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে যে দরসে নিযামিয়া'র রূপরেখা প্রণীত হয়, তা নিম্নরূপ :

সর্‌ফ : মীযান, মুন্‌শায়েব, সর্‌ফ-ই-মীর, পাঞ্জ-ই-গাঞ্জ, (শব্দপ্রকরণ বিদ্যা) ফুসূল-ই-আকবরী, শাফিয়াহ।

নাহব্‌ : নাহব্‌-ই-মীর, শর্‌হ-ই-মিআতু আমিল, হিদায়াতুন্‌ নাহব্‌, কাফিয়াহ, শার্‌হ-ই-জামী।

মানতিক : সুগরা, কুবরা, ঈসাগুজী, তাহযীব, শর্‌হ-ই-তাহযীব, কুতবী, সুল্লমল্‌-উলূম।

হিকামত : মায়বুযী, শামস্‌ মাযিগাহ।

গণিত : খুলাসাতুল হিসাব, তাহরীর-ই-আক্‌লাদাস (প্রথম মাকালাত), তাশ্‌রীহুল আফ্‌লাক, রিসালা-ই-কুশজিয়াহ্‌, শরহ-ই-চগমনী (১ম অধ্যায়)।

বালাগাত : মুখতাসারুল মাআ'নী, মুতাও-উয়াল।

আল্‌-ফিকহ : শরহ-ই-বিকায়াহ্‌ (১ম দুই খন্ড), হিদায়াহ্‌ (শেষ দুই খন্ড)।

আল্‌-কালাম : শরহ্‌-ই-আকায়িদ-ই-নাসাফী, শরহ্‌-ই-আকায়িদ-ই-জালালী, মীর যাহিদ, শরহ্‌-ই-মাওয়াকিক।

আত-তাফসীর : জালালাইন, বায়যাবী।

আল-হাদীস : মিশকাতুল মাসাবীহ।

এ যুগে প্রণীত দরসে নিযামিয়া গোটা উপমহাদেশের আরবী শিক্ষার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। লখনৌয় দরসে নিযামিয়ার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ায় উপমহাদেশের বাগদাদের দরসে নিযামিয়া'র প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে।[১৫৪]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ১৭৮১ খৃ. কলকাতা মাদরাসা স্থাপিত হয়। তাতেও ১৭৯১ খৃ.পর্যন্ত লখনৌর দরসে নিযামিয়া প্রচলিত ছিল। এর পরবর্তী সময় মাদরাসাই-আলিয়ার পাঠ্যসূচীতে কিছুটা রদ-বদল করা হলেও ১৮৯১ খৃ. পর্যন্ত কিছুটা পরিবর্তন পরিবর্ধন সহকারে লখনৌর 'দরসে নিযামিয়াই'

১৫৪ শিবলী নুমানী, *মাকালাত-এ-শিবলী*, আযমগড়, ১৯২২ খৃ., পৃ. ৪৩

তাতে প্রচলিত ছিল। মাদরাসা-ই-আলিয়া ছাড়া বাংলার খারেজী বা কওমী মাদরাসাসমূহে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত মোটামুটি লখনৌর দরসে নিযামিয়াই প্রচলিত ছিল।

লখনৌর দরসে নিযামিয়ার প্রভাব বর্ণনা করে ১৯১০ খৃ. ১২ই নভেম্বরের 'আন্-নাদওয়া' (লখনৌ) পত্রিকায় মওলানা শিবলী বলেন ঃ

"ভারতের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে 'দরসে নিযামিয়া' সবচাইতে গৌরবময় একটি অধ্যায়। বর্তমান ভারতে কলকাতা থেকে পেশওয়ার পর্যন্ত জ্ঞানর্চর্চার যেসব ধারা প্রবহমান রয়েছে, সে সবই এ উৎস থেকে উৎসারিত। এ পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ না করা হলে কোন ব্যক্তিকে আলিম বলে গণ্য করা চলে না। মেকি মুদ্রাকে যেমন টাকশাল বহির্ভূত, বলে বিবেচিত করা হয়, তেমনি যে গ্রন্থটি দরসে নিযামিয়া বহির্ভূত, তাকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ার অযোগ্য বলেই মনে করা হয়"।[১৫৫]

**পঞ্চম যুগ :**

এটা হলো মুসলিম শাসনের শোচনীয় পতনের যুগ (১৭৫৭-১৮৫৭ খৃ.)। এ যুগেই আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অধঃপতনের অতল গহবলে তলিয়ে যায়। এ যুগে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে শিক্ষাসূচী প্রচলিত ছিল, তাকে লখনৌর দরসে নিজামিয়ারই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ বলা চলে। এ সময় যেসব বিষয় ও গ্রন্থ মাদ্রাসাসমূহে পড়ানো হতো, তা নিম্নরূপ :

| | | |
|---|---|---|
| সর্ফ | : | মীযান, মুন্শায়িব, পাঞ্জ-ই-গাঞ্জ, যুব্দাহ, দস্তরুল মুব্তাদী, সর্ফ-ই-মীর, ইলমুস্ সীগাহ, ফুসুল-ই-আকবরী, শাফিয়াহ ॥ |
| নাহ্ব | : | নাহব-ই-মীর, মিআত আমিল, শরহ্-ই-মিআত, আমিল, হিদায়াতুন, নাহব্, কাফিয়াহ্, শরহ্-ই-জামী। |
| বালাগাত | : | মুখ্তাসারুল মাআ'নী (সম্পূর্ণ), মুতাও-উয়াল। |
| সাহিত্য | : | নাফাহাতুল ইয়ামন, সাবআ-ই-মু'আল্লাকাহ, দীওয়ান-ই-মুতানাব্বী, মাকামাত-ইহারীরী, হামাসাহ। |
| আল-ফিকহ | : | শরহ-ই-বিকায়াহ (প্রথম দুই খন্ড), হিদায়াহ্ (শেষ দুই খন্ড)। |
| উসূল-ই-ফিকহ | : | নুরুল আনওয়ার, তাওযীহ, তালবীহ, মুসাল্লামুস সুবত। |
| মানতিক | : | সুগরা, কুবরা, ঈসাগুজী, কালা-আকুল, মীযান মানতিক, তাহযীব, শরহ-ই-তাহযীব, কুতবী, মীর কুতবী, মুল্লা হাসান, হামদুল্লাহ্ কাযী মুবারক, মীর যাহিদ, মীর যাহিদ এর উপর লিখিত গুলাম ইয়াহয়ার টীকা, মুল্লা জালাল, বাহরুল উলুম, শর্হ-ই-সুলম, মীর যাহিদ এর উপর লিখিত আব্দুল আলীর টীকা, শরহ-ই-সুল্লুম, মুল্লামুবীন। |

১৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

হিকামাত : মীরবুযী, সদরা, শামস বায়িযগাহ।

আল-কালাম : শরহ্-ই-আকায়িদ-ই-নাসাফী, খিয়ালী, মীর যাহিদ

গণিত : তাহরীর-ই-অকলীদাস, (প্রথম মাকালা), খুলাসাতুল হিসাব, তাসবীহ, শরহ্-ই-তাসবীহ্, শরহ্-ই-চগমনী।

ফারায়িয : শারীফাহ।

মুনাযারাহ (বিতর্কবিদ্যা) : রাশীদীয়াহ।

আত-তাফসীর : জালালাইন, বায়যাবী (সূরা আল-বাকারাহ)।

উসূল-ই-হাদীস : শরহ্-ই-নুখবাতুল ফিকর।

আল্-হাদীস : বুখারী, মুসলিম, মুআত্তা, তিরমীযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবন-ই-মাযাহ্।

এ যুগের শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এ সময় যুক্তিবিদ্যা অনেক বেশী পরিমাণে শিক্ষা দেয়া হতো। তফসীর বিষয়ে শেখানো হতো মাত্র দু'টি গ্রন্থ : (ক) তাফসীর আল-বায়যাবী ও (খ) তাফসীর আল-জালালাইন। বায়যাবীর মাত্র আড়াই পারা পাঠ্যভুক্ত ছিল। জালালাইন আদ্যোপান্ত পড়ানো হলেও তা অতি সংক্ষিপ্ত বলে শিক্ষার্থীদের তফসীরে তেমন জ্ঞান অর্জিত হতো না। বলা বাহুল্য যে, আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্যে আধিপত্য অর্জিত হলে হাদীস-তফসীরে জ্ঞানলাভও সহজতর হয়ে উঠে। এ যুগে সে সুযোগও ছিল সীমিত। মানতিক বা যুক্তিবিদ্যার জন্য নির্ধারিত সব কয়টি গ্রন্থই সকল প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হতো। অথচ হাদীস ও সাহিত্যের জন্য পাঠ্যভুক্ত গ্রন্থগুলো সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেয়া হতো না। তাই সাহিত্য পড়ার জন্য অনেকে শিক্ষার্থীর নিজ দায়িত্বে ভিন্ন শিক্ষকের আশ্রয় নিতে হতো। হাদীসের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্যেও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন হাদীসকেন্দ্র সফর করতে হতো। এ যুগের শিক্ষাসূচীতে ইতিহাস, ভূগোল ও কুরআনের মূলনীতি বিষয়ে কোন গ্রন্থের ব্যবস্থা ছিল না।[১৫৬]

সংক্ষেপে বলতে গেলে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ্-পূর্বযুগে আরবী মাদরাসা সমূহে ফিক্হ-ও উসূল-ই-ফিক্হ (ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি) এর উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হতো। তখন হাদীস-তফসীর শিক্ষার প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তেমন কোন লক্ষ্য ছিল না। আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহ্লবীই (১৫৫১-১৬৪২ খৃ.) সর্বপ্রথম মক্কা-মদীনায় হাদীসের তালীম গ্রহন করেন (১৫৮৭-১৫৯০ খৃ.) এবং স্বদেশে প্রচলিত করার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। পরিশেষে শাহ্ ওলিউল্লাহর (১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.) উদ্যোগে দিল্লীতে যে শিক্ষাকেন্দ্র (রহীমিয়া মাদরাসার বর্ধিতরূপ) গড়ে উঠেছিল, তাতেই সত্যিকার অর্থে হাদীস-তাফসীর শিক্ষার গোড়াপত্তন করা হয়। কিন্তু এর পাশাপাশি লখনৌতে দরসে নিযামিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকায় হাদীস-তাফসীরের শিক্ষাকার্যক্রম অনেকটা ব্যাহত হয়। কেননা লখনৌ কেন্দ্রে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হতো। তবে লখনৌর শিক্ষার্থীদের

১৫৬ আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

মধ্যে জ্ঞানার্জনের অধিকতর যোগ্যতা ও স্পৃহার সৃষ্টি হতো। কারণ এ শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যেক বিষয়ের জটিলতম গ্রন্থগুলো পাঠভুক্ত করা হতো। দ্বিতীয়ত। এখানে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে গ্রন্থের ভাষা বা শব্দ চয়নের প্রতি তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বিষয়বস্তুর উপরেই জোর দেয়া হতো। এ যুগের অব্যবহিত পরবর্তী যুগে সাহিত্য হাদীস ও তাফসীরের কয়েকটি গ্রন্থ পাঠ্যভুক্ত করা হয়। কিন্তু তখনো আরবী সাহিত্য বা হাদীসচর্চা প্রাধান্য লাভ করেনি।[১৫৭]

মুসলমানদের শাসনামলে ভারতবর্ষে শিক্ষা সাহিত্য কৃষ্টি কালচারসহ সকল দিক দিয়েই মুসলমানরা উন্নত ছিল। আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর শাহী জামে মসজিদ, কুতুব মিনার ইত্যাদি ঐতিহাসিক নিদর্শনাদী এখনও এর প্রমাণবহ হিসেবে কালের স্বাক্ষী হয়ে আছে। ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পরও মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় শাসন পদ্ধতির মধ্যে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের মূল কাঠামোর অনুসরণ করতে হয়েছে। বিশ্ব বিখ্যাত আইন গ্রন্থ বাদশাহ আওরঙ্গজেব প্রণীত "ফাতওয়ায়ে আলমগীরী" শুধু ভারতবর্ষেই নয় বিশ্বব্যাপী এখনও সমাদৃত।

ইংরেজরা সরকারীভাবে মুসলমানদের শাসনামলে মাদরাসা শিক্ষার জন্য প্রদত্ত 'লাখেরাজ সম্পত্তি ও ওয়াকফ স্টেটগুলো, ওলামা পীর ও মাদরাসা-মসজিদ খানকাহ্'র কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে হিন্দুদের হাতে ন্যস্ত করার দরুণ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় এক অমানিশা নেমে এসেছিল। একইভাবে তারা ভারতবর্ষের শিল্প সাংস্কৃতিকেও ধ্বংস করে দিয়েছিল। মাদরাসা শিক্ষা ধ্বংসের পর তারা সেখানে সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। ১৮৩৫ খৃ. তারা অফিস আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা বাধ্যতামূলক করে ফেলে।[১৫৮]

সারা উপমহাদেশে তখন কয়েক লক্ষ মাদরাসা ছিল। ঐতিহাসিকগণের তথ্য মতে, শুধু বাংলাদেশ ভূখন্ডেই ৮০ হাজার মাদরাসা বিদ্যমান ছিল।[১৫৯] ইংরেজদের এই দমন নিপীড়ন, নির্যাতনের মুখে মুসলমানদের জন্য আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠে। শিক্ষা দীক্ষায় হারানো পূর্ব গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরে পাবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চলে। যার ফলশ্রুতিতে দূরদর্শী মুসলিম শিক্ষাবিদ ও পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্ব স্যার সৈয়দ আহম আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬০]

মোটকথা, বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের দিকে দিকে যুগে ইসলামী তথা আরবী শিক্ষার এমন সব কেন্দ্রে গড়ে উঠে, যাতে মুসলিম শাসনের গোড়া থেকে তার ক্রান্তিলগ্ন পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বছর ধরে ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত থাকে। বৃটিশ আমলেও উপমহাদেশের ইসলামী তথা আরবী শিক্ষা-ধারায় ভাটা পড়েনি, বরং এদেশে বৃটিশ সরকারের আমদানিকৃত ইউরোপীয় সভ্যতার

---

১৫৭আবুল হাসান আলী নাদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১

১৫৮আর এটার উদ্দেশ্যই ছিল কেবল মাত্র এ উপমহাদেশের মাদরাসাসমূহকে বন্ধ করে দেয়া।

১৫৯ ঐতিহাসিক ম্যাক্স মুলার দাবী করেন যে, ১৭৫৭ সালে বাংলাদেশে ৮০ হাজার স্থানীয় মাদরাসা ছিল-অধ্যাপক কে, আলী, *পাক ভারতের মুসলিম ইতিহাস*, ঢাকা-১৯৮৭ খৃ., পৃ. ২২৮

১৬০ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় : ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, যার পাঠ্যসূচীতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার বিষয়াবলী প্রাধন্য দেয়া হয় না।

পরশ লেগে তা আরো সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাহারানপুর জেলায় ‘মাযাহিরুল উলূম’[১৬১] মাদরাসা (১৮৬৬ খৃ.), সে জেলার অন্তর্গত দেওবন্দে ‘দারুল উলুম’ মাদরাসা (১৮৬৬ খৃ.) রিয়াসতে রামপুর মাদরাসা এবং লখনৌতে নাদওয়াতুল উলামা কর্তৃক দারুল উলুম মাদরাসা (১৮৯৮ খৃ.) স্থাপিত হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর ভারতে ‘জামিয়া-এ-মিল্লিয়া’ (১৯২০ খৃ.), বাংলাদেশে হাটহাজারী ‘মুঈনুল ইসলাম’ মাদরাসা ১৯০১ খৃ., সিলেট ‘আলিয়া’ মাদরাসা (১৯১৩ খৃ.) চট্টগ্রাম ‘দারুল উলূম, মাদরাসা (১৯১৩ খৃ.) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উপমহাদেশের অন্যান্য অংশ যথা দিল্লী, লখনৌ, দেওবন্দ, সাহারানপুর, রামপুর, আযমগড়, হায়দারাবাদ প্রভৃতির তুলনায় বঙ্গদেশে ধর্মীয় তথা আরবী-ফার্সী শিক্ষার বিস্তার ও অনুশীলন কম হয়ে থাকলেও এর কৃতিত্বে আঁচ লাগেনি। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে যতটুকু করেছে, তার ঐতিহাসিক মূল্যমান মোটেও কম নয়।

এ দেশের মাতৃভাষা আবহমান কাল থেকেই বাংলা এবং এ ভাষা উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের, অন্তত উত্তর ভারতের মাতৃভাষার তুলনায় আরবী ভাষা থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। তা সত্বেও এদেশের বিভিন্ন অঞ্চল গৌড়, পাড়ুয়া, বিহার, মঙ্গলকোট, কলকতা, ঢাকা, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম ও হাটহাজারীতে আরবী-ফার্সী ভিত্তিক অনেক ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রে গড়ে উঠে এবং সেগুলো থেকে হাজার হাজার বিজ্ঞ ‘আলিম-ফাযিল সৃষ্টি হয়, যাঁরা উর্দূ, আরবী ও ফার্সী ভাষায় শত শত ইসলামী সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬২]

উপমহাদেশের আরবী মাদ্রাসার ইতিহাস আলোচনায় সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হন মাওলানা শিবলী নু’মানী। সে পথ ধরেই লখনৌর ‘নাদওয়াতুল উলামা’ ও আযমগড়ের ‘দারুল মুসাননিফীনের’ বড় বড় ‘আলিম- সৈয়দ আবদুল হাই বেরীলবী, সৈয়দ সুলায়মান নাদভী, আবুল হাসান আলী নাদভী প্রমুখ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র বইপুস্তক রচনা করেন। জানা যায় যে, বৃটিশ আমলের পূর্বে এ দেশের মাদরাসাসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল এখনকার চাইতে অনেকটা স্বতন্ত্র ধরণের। আজকাল গোটা পাঠ্যসূচীকে যেমন কয়েকটি বাৎসরিক বা দ্বি-বাৎসরিক বা ত্রৈবাৎসরিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং সময়সীমা নির্ধারিত করে শিক্ষাকার্য পরিচালিত হয়, অতীতে তেমন কোন শ্রেণী বা বাঁধা ধরা সময়সূচীর অনুশাসন ছিল না।

---

১৬১ মযাহিরুল উলূম সাহারানপুর ঃ হি. ১২৮৩ সনে দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহতি কাছাকাছি সময়ে শায়খুল হাদীছ মাওলানা মাযহার নানতুবীর নামানুসারে ‘মাযাহিরুল উলূম’ নামকরণে ভারতের সাহারানপুরে অন্যতম প্রসিদ্ধ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। মূলত উক্ত মাদরাসাটি ১২৮২ হিজরীতে মৌলভী সাদাত আলী প্রতিষ্ঠিত করার কয়েক মাস পরে সেখানে মাওলানা মাযহার নানতুবী শায়খুল হাদীছ ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা ও যোগ্যতায় অল্পদিনের মধ্যেই মাযাহিরুল উলুম মাদরাসার সুনাম চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে দেওবন্দের দারুল উলুম মাদরাসা উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি বিদ্যাপীঠ বিবেচিত হলেও সাহারানপুরের মাযাহিরুল উলুম মাদরাসাটিও এর স্বকীয়তায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। বলা হতো, ইলমে দ্বীনের বুনিয়াদী শিক্ষা সাহারানপুরের মাযহিরুল উলুম মাদরাসার স্থান দেওবন্দ মাদরাসারও উর্দ্ধে। এ কারণে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এর নিকট শিক্ষার্থী ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভের পরামর্শ চাইলে তিনি বলতেন, “বুনিয়াদী তা’লীম সাহারানপুরে ভাল আর ‘দাওরা’ অধ্যয়ন দেওবন্দে উত্তম”। সুযোগ্য আলীমে-দ্বীন তৈরির কারখানা হিসেবে সাহারানপুরের মাযাহিরুল উলুম মাদরাসার অবদান নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। হাফেজ মাওলানা হাবীবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসুরী, পৃ. ৪২।

১৬২ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (ই.ফা.বা.,, ১৯৮৬ খৃ.) পৃ. ৯-১০

তখন পাঠ্য বিষয়গুলোর জন্য বাছাইকরা গ্রন্থসমূহকে মানের দিক থেকে সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত করা হতো। উচ্চ মানের গ্রন্থ, মধ্যমানের গ্রন্থ এবং নিম্নমানের গ্রন্থ। গ্রন্থমানের ক্রমানুসারে পাঠ্যসূচীকে এক বা একাধিক গ্রন্থের সমন্বয়ে ছাত্রজীবনের আদ্যোপান্ত কয়েকটি গ্রুপ বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হতো। এক গ্রুপভুক্ত গ্রন্থ কয়টির অধ্যয়ন শেষ করা হলে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর গ্রুপ বা শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বলে পরিগণিত করা হতো। এ শিক্ষাপদ্ধতি অনেকটা এখনো উপমহাদেশের কওমী মাদরাসাসমূহে পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক শ্রেণীবন্ধন, বাৎসরিক বা দ্বিবাৎসরিক অধ্যয়নসূচী, শিক্ষার্থীর মর্জি মাফিক বিষয় নির্বাচন ইত্যাদি ইউরোপীয় সভ্যতারই অবদান।

এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মুসলিম-বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী তথা আরবী শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠে। সেগুলোর মধ্যে উপমহাদেশের ওপর সব চাইতে বেশী প্রভাব পড়ে বাগদাদের 'দরসে নিযামিয়া'র।[১৬৩] দিল্লীতে মাওলানা আবদুর রহীমের মাদরাসা-শিক্ষা, পরবর্তী সময় শাহ ওয়ালিউল্লাহর শিক্ষাব্যবস্থা, লখনৌতে নিযামুদ্দীন সিহালবীর 'দরসে নিযামিয়া'[১৬৪] প্রবর্তনের্ পূর্বক্ষণ পর্যন্ত উপমহাদেশের আরবী শিক্ষার ওপর বাগদাদের দরসে নিযামিয়া'র প্রভাব ছিল।

মুসলমানদের আন্দোলন সংগ্রামের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ খৃ. পাক-ভারত স্বাধীনতার পটভূমিতে এদেশের মানুষ ইংরেজদের কবল থেকে আজাদী লাভের পর গোলামী যুগের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘৃণা ভরে ত্যাগ করে এবং পূর্ব প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা প্রবর্তনের দাবীতে সোচ্চার হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নানা ষড়যন্ত্র ও টালবাহানার কারণে মাদরাসা শিক্ষা পাকিস্তান আমলেও তার স্বকীয়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি বাংলাদেশ আমলেও তা পারেনি। বরং ক্ষেত্র বিশেষে, পরিস্থিতি মাদরাসা তথা ইসলামী শিক্ষার বেলায় স্থবির পর্যায়ে চলে যায়। ইংরেজরা স্কুল কলেজে আরবী উর্দূ ও

---

১৬৩ দরসে নিযামিয়া, বাগদাদ ঃ সিলজুকী আলপে আরসালান ও সালেক শাহের স্বনামধন্য মন্ত্রী নিযামুল মুলক তুসী ৪৫৭-৫৯ হি.। (১০৬৫-৬৭ খৃ.) দু'লক্ষ দীনার ব্যায়ে বাগদাদে নিযামিয়া নামে একটি বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি দু'শ বছর ধরে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিস্তারে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে। এতে যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং যে পাঠ্যসূচী অনুসৃত হয়, সেটাই বাগদাদের 'দরসে নিযামিয়া' নামে অভিহিত।

১৬৪ দরসে নিযামিয়া, লখনৌ ঃ মোল্লা কুতুবুদ্দীন শহীদ (মৃ. ১৬৯১ খৃ.) শাহ ওয়ালীউল্লাহ'র পিতা শাহ আব্দুর রহীমের (মৃ. ১৭১৯ খৃ.) সমসাময়িক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন এ উপমহাদেশে প্রচলিত দরসে নিযামিয়ার উদ্ভাবক। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীনের (মৃ. ১৭৪৮ খৃ.) সময় এ শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর উন্নতি ও প্রসার লাভ করেছিল বলেই তা 'দরসে নিযামিয়া' নামে অভিহিত হয়। বাগদাদের দরসে নিযামিয়া ও লখনৌর দরসে নিযামিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলেও মূলত এ-দুটি ছিল স্বতন্ত্র পদ্ধতিভুক্ত। লখনৌর এ পাঠ্যসূচী উপমহাশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। এ পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের পূর্বে উপমহাদেশের আরবী শিক্ষাকেন্দ্র সমূহের দেশীয় লেখক রচিত কোন গ্রন্থই পাঠ্যভুক্ত ছিল না। মোল্লা নিযামুদ্দীনই সর্বপ্রথম উপমহাদেশে রচিত গ্রন্থাদিকে তাঁর পাঠ্যসূচীতে স্থান দেন। তাঁকেই সাধারণত ফিরিঙ্গী মহলের আরবী শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এ পাঠ্যসূচী বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এতে যে কয়টি বিষয় পড়ানো হতো সেগুলোর জন্য রচিত কঠিনতম গ্রন্থসমূহ পাট্যভুক্ত করা হতো। অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনগ্রস্থ বেশী শিক্ষা দেয়াহতো। হাদিসের একমাত্র কিতাব 'মিশকাতুল মাসাবীহ' পাঠ্যভুক্ত ছিল। তবে যেটুকু পড়ানো হতো, তা উপস্থাপিত হতো যুক্তিবাদের ভিত্তিতে। তাই এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিযামুদ্দীনের পিতা মোল্লা কুতুবুদ্দীন একজন বিজ্ঞা আরিম ছিলেন। তাঁর বাসভূমিতে উসমানী সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করতো এবং তাদের মধ্যে পারস্পারিক হিংসা-বিদ্বেষও অন্যায়ভাবে ও স্বার্থান্বেষী হয়ে মোল্লা কুতুবুদ্দীনকে তাঁর সন্তানেরা দেশত্যাগের পর সেই ভূখন্ডটি সরকারী সম্পত্তি বলে ঘোষিত হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে 'ফিরিঙ্গী মহল' বলে অভিহিত হয়। বাদশা আলমগীর সরকার ফিরিঙ্গী দু'টি ভবন মোল্লা কুতুবদ্দীনের পুত্রদের দান করেন। এ সময় মোল্লা নিযামুদ্দীনের বয়স ছিল ১৫ বছর। তদবধি তাঁরা সেখানে বসবাস করতে থাকে। এ খান্দানে বড় বড় আলিম জন্মগ্রহণ অব্যাহত থাকে এবং এখনো সেই বৈশিষ্ট্য অনেকটা অক্ষুন্ন রয়েছে। মোল্লা নিযামুদ্দীনকে কেন্দ্র করে ফিরিঙ্গী মহলে ইতিহাস বিখ্যাত একটি ইসলামী তথা আরবী শিক্ষাকেন্দ্রে গড়ে উঠে। বাহরুল উলুম আবদুল আলী, মোল্লা কামাল, মোল্লা হাসান, মোল্লা নবীন, মাওলানা যহুরুল্লাহ, মাওলানা ওলীউল্লাহ, মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা আবদুল হালীম শরফ, মাওলানা অবদুল হাই লখনবী, মাওলানা বারী প্রমুখ এ শিক্ষা কেন্দ্রেরই সেরা সৃষ্টি। মোল্লা নিযামুদ্দীন ১১৬৮/১৭৫৪ খৃ. লখনৌতে ইন্তিকাল করেন।

ধর্মীয় শিক্ষাকে বাদ দিতে সাহস করেনি। কিন্তু পরবর্তী সময় এ সকল বিষয় পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ দেয়ার ধৃষ্টতাও দেখানো হয়েছে।

## ১.৩.৪ দারুল উলূম দেওবন্দ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

১৮৫৭ খৃ. সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী সিপাহী জনতা বেনিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবে লিপ্ত ছিল। কোলকাতার ব্যারকপুর থেকে শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। পরে সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তবে তা ছিল বিক্ষিপ্ত ভাবে। তখন কেন্দ্রীয় কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত থানা ভবনের ওলামা সম্মেলন থেকে একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

এ সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, চলমান সশস্ত্র গণবিপ্লব ইসলামী জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে। অতএব সকলের জন্য এ জিহাদে অংশ গ্রহণ একান্ত জরুরী। তবে জিহাদের ঘোষণা ও জিহাদের ডাক দেওয়ার জন্য ইসলামী সরকারের প্রয়োজন। তখন ঐ সম্মেলন থেকে একটি অস্থায়ী ইসলামী সরকার গঠন করা হয়। আমীরুল মু'মেনীন নির্বাচিত হন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মককী (র.), কাযিউল কুযাত (চীফ জাস্টিস) নির্বাচিত হন, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.)[১৬৫]এবং প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হন মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (র.) ।[১৬৬] এ সরকার জিহাদের ঘোষণা দিলেন এবং শামেলী রনাঙ্গনসহ কয়েকটি রনাঙ্গনে অংশগ্রহণ করলেন। সাথে সাথে চলমান বিপ্লবকে নিয়ন্ত্রণ করারও পদক্ষেপ দিলেন কিন্তু র্দুভাগ্যের বিষয় এই পদক্ষেপ কার্যকর হবার

---

১৬৫ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ) ঃ ১৮২৯ খৃ. সাহারান জেলার গাঙ্গুহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশধারা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু আয়্যুব আনসারী রাযিআল্লাহু আনহু-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা হিদায়াত আহমদ তৎকালের বিশিষ্ট বুযর্গ শায়খ গোলাম আলীর খলীফা ছিলেন। মাওলানা গাঙ্গুহী প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৭ বছর বয়সে দিল্লী গমন করেন। সেখানে কাজী আহমদ উল্লাহ পাঞ্জাবীর নিকট কিছুদিন অধ্যয়নের পর হিজরী ১২৬১ খৃ. হযরত মাওলানা মামলুক আলীর নিকট উপস্থিত হন। এখানে আরবী সাহিত্য, মানতিক ও হিকমতের কিতাব সম্পন্ন করে হাদীস অধ্যয়ন করেন হযরত শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দিদীর নিকট। এভাবে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি ইলমে যাহিরীর পূর্ণতা অর্জন করেন। অতঃপর হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর নিকট মুরীদ হন। মাত্র ৪০ দিন রিয়াযত করেই খেলাফত প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খৃ. সিপাহী বিপ্লবে 'কাযীউল কুযাতের' দায়িত্ব পালন করেন। বিপ্লবের কারণে তাকে ইংরেজদের জেলখানায় ৬ মাস দন্ডভোগ করতে হয়। তিনি নিজ গ্রাম গাঙ্গুহে ইলমে হাদীসের দরস দান করেন। তাঁর দরসী তাকবীর সংকলিত করে হযরত মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধলবী আরবীতে সহীহ বুখারীর ভাষ্য গ্রন্থ 'লামিউদ দারারী' রচনা করেন। মাওলানা গাঙ্গুহী উচ্চমানের ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর রচিত 'ফাতওয়া রশীদিয়্যা' গ্রন্থকে হানাফী ফিকহের বিশ্বকোষ বলা চলে। মাওলানা নানুতবীর ইনতিকালের পর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হন। তিনি ১২ আগষ্ট ১৯০৮ খৃ. ইনতিকাল করেন। [নূর মোহাম্মদ আজমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২ খৃ., পৃ. ১৬৯ ও নূরুর রহমান, *তাযকিরাতুল আওলিয়া*, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৭ খৃ. পৃ. ৩২৪, হাকীম আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১৪৯-১৫১]

১৬৬ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঃ ইউপির অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার নানূতা গ্রামে ১২৪৮/১৮৩২ খৃ. শেষ ভাগে অথবা ১৮৩৩ খৃ. শুরুর দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ইতিহাসগত নাম খোরশেদ হুসাইন। পিতার নাম শায়খ আসাদ আলী সিদ্দীকী। এ বংশের অনেকেই ছিলেন ধর্ম বিষয়ে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন। তাদের মধ্যে তাঁরই পিতৃব্য আল্লামা মামলূক আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের অনেক প্রসিদ্ধ আলিমের উস্তাদ। মাওলানা নানূতবী প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর দিল্লী সরকারী কলেজের আরবী বিভিগের অধ্যক্ষ মাওলানা মামলূক আলী (মৃ. ১৮৫১ খৃ.) এর নিকট আরবী অধ্যয়ন করেন। এক বছর পর মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীও সেখানে উপস্থিত হন। কিছুদিন স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়নের পর গাঙ্গুহী ও নানূতবী উভয়ে সহপাঠীরূপে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে উভয়ে মুসলিম বিশ্বের সেরা আলিম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। হযরত নানূতবী সিহাহ্ সিত্তাহ অধ্যয়ন করেন হযরত শাহ্ আব্দুল গনী মুজাদ্দিদী মুহাদ্দিস দেহলবী (মৃ. ১৭৭৮ খৃ.) এবং হযরত মাওলানা আহমদ আলী মুহাদ্দিস সাহারানপুরী (মৃ. ১৮৭৯ খৃ.) এর শাগরিদরূপে। তিনি ১২৬৭/১৮৫১ খৃ. গ্রন্থ সম্পাদনা ও টীকা রচনার কাজে দিল্লীর আহমদিয়া মুদ্রণালয়ে যোগদান করেন। হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী রচিত সহীহ বুখারীর টীকা প্রস্তুতিতে তাঁকে সহযোগিতা করেন এবং নিজে সহীহ বুখারীর শেষ ৫ পারার টীকা রচনা করেন। এ অধ্যায়গুলোর বিভিন্ন স্থানে ইমাম বুখারী হানাফী ফিকহ ও হযরত ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমতের সমালোচনা করেন। মাওলানা নানূতবীর তাকওয়া সম্পর্কে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী বলেন, তাঁর জুহ্দ ও তাকওয়া ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুলভ হলেও এ যুগে দুর্লভ। ১৮৫৭ খৃ. সিপাহী বিপ্লবে তিনি আলিমদের মুজাহিদ দল থেকে সিপাহসালার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় (৩০ মে ১৮৬৬ খৃ.)। তিনি ছিলেন একজন উচ্চমানের মুনাযির। খ্রিষ্টান পাদ্রী ও হিন্দু আর্য সমাজীদের সাথে তাঁর একাধিক মুনাযারা হয়। তার বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে। হিন্দুদের পক্ষে পন্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী, মুনসী আন্দ্রমন এবং খ্রিস্টনদের পক্ষে নভেলস, ইসকাট ও ওয়াকরো প্রমুখের সাথে তাঁর মুনাযারা হয়েছিল। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৫ এপ্রিল, ১৮৮০ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। [সায়্যিদ মানাযির ও আহসান গীলানী, *সাওয়ানিহে কাসিমী*, প্রকাশ ১৯৬৪, পৃ. ১২৭-১৫১; *বাংলা বিশ্বকোষ*, ঢাকা, ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৯৯; হাকীম আবদুল হাই, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, হায়দারাবাদ, দায়িরাতুল মাআরিফ উসমানিয়্যা, ৭ম খন্ড, পৃ. ৩৮৩]

আগেই বৃটিশ বেনিয়া সরকার দিল্লীতে জেঁকে বসে। আন্দোলনে ফলশ্রুতিতে বৃটিশ বেনিয়া সরকার উলামায়ে কিরামের উপর অত্যাচারে স্টীম রোলাম চালাতে থাকে। একে তো ৫৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের জিহাদের মাঠে জীবন দিতে হল সাড়ে একান্ন হাজার ওলামায়ে কিরামকে। তারপর গুপ্তহত্যা, প্রহসন মূলক বিচারে ফাঁসি দিয়ে, মুজাহিদ হবার অপরাধে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, কালা পানিতে নির্বাসন দিয়ে প্রভৃতি কৌশলে লক্ষ লক্ষ ওলামায়ে কিরামের জীবনাবসান ঘটান হল। ফলে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, তখন স্বাধীনতার কথা বলা বা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন করার মত কোন ব্যক্তিকেই খুঁজে পাওয়া ছিল দুস্কর। অপর দিকে মাদরাসাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল। ওয়াকফ্ সম্পত্তি সমূহ নিলামে বিক্রি হল। ফলে প্রতীভাদীপ্ত মানুষ তৈরীর কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেল।

রাষ্ট্র কর্তৃক উলামা নিধনের করাল গ্রাস হতে যে ২/৪ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে ছিলেন, তাদের বিরুদ্ধেও হুলিয়া জারী থাকল। এ অবস্থার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল প্রায় ১০টি বছর।

এরপর নেতৃস্থানীয় যে দু'চারজন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক উপমহাদেশের ভবিষ্যতের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার নিমিত্ত গঠিত অস্থায়ী সরকারের চীফ জাষ্টিস হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) এবং অপর জন হলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (র.)। তাঁরা উপমাহাদেশের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। গভীর চিন্তার পর তারা ১৮৬৬ খৃ. উত্তর ভারতের দেওবন্দ নামক স্থানে গড়ে তুললেন 'দারুল উলূম' নামে একটি মাদরাসা। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল :

ক. উপমহাদেশ থেকে বৃটিশ বেনিয়াদেরকে বিতাড়িত করার নিমিত্তে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করা,

খ. স্বাধীনতার জিহাদ পুনঃচাঙ্গা করা,

গ. মাদরাসা শিক্ষা সংরক্ষণ করা,

ঘ. মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও আমল-আখলাকের হিফাজত করা,

ঙ. বৃটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত পাশ্চাত্যের ধর্ম ও নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছোবল থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা,

চ. খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র হতে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করা,

ছ. মুসলমানদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তথা মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার সাধন করে এর প্রচার ও প্রসারকল্পে সারা উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

জ. নতুন উদ্যমে ইসলামের দাওয়াত, তাবলীগ, তাছনীফ ও সংস্কারের কাজ চালু করা,

ঝ. ইসলামের হিফাজত ও প্রচার-প্রসারকল্পে বিভিন্নমুখী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন গড়ে তোলা,

ঞ. মদীনার মাদরাসায়ে সুফফার আদর্শ পুনঃচাঙ্গা করে তোলা।

দারুল উলুম দেওবন্দ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে বেশ সফলতা অর্জন করে যে স্বর্ণোজ্জল ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এবং অনন্য অবদান রেখেছে, তা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এক কথায় বলা যায়

যে, দারুল 'উলূম দেওবন্দ শুধু একটি মাদরাসাই ছিল না বরং তা মাদরাসা কেন্দ্রীক একটি আন্দোলনও ছিল। উপমহাদেশসহ গোটা মুসলিম বিশ্বকে আলোকিত করার একটি আলোক বর্তিকা ছিল।[১৬৭]
এ দারুল উলুমেরই চিন্তাধারার ফসল হচ্ছে আজকের বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাসমূহ। বস্তুত দারুল উলুমের চিন্তাধারার উপর আজ বাংলাদেশে প্রায় সতের হাজার মাদরাসা দ্বীনের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে চলেছে। দারুল উলুমকে উপমহাদেশে মুসলিম অধিকার পুনরুদ্ধারের মারকায বানানো হয়েছিল। একই চিন্তাধারায় মাদরাসাসমূহ মূলত দারুল উলূম দেওবন্দকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়ে আসছিল। দেশ আলাদা হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তখন আমাদের এ অঞ্চলে নিজেদের স্বকীয়তা নিয়ে কাওমী মাদরাসাগুলো দ্বীনী শিক্ষাসহ তেমনি ইসলামী অন্যান্য দিকের উপরও অভিভাবক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করেছে। কারণ দারুল উলূম দেওবন্দ জন্ম দিয়েছে অগনিত ইসলামী মনীষী চিন্তাবিদ, ফকিহ, মুজতাহিদ ও মুজাহিদ। দারুল উলুম দেওবন্দই একই সাথে মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনের নীরবী বিপ্লবের সূচনা করেছে। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম শিক্ষক মোল্লা মাহমুদ, আর প্রথম ছাত্র হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.), যিনি শাহ ওয়ালী উল্ল্যাহর আন্দোলনের একসময় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন হাজী সাইয়্যেদ আবেদ হোসাইন। উল্লেখ্য যে, মাওলানা কাসেম নানুতুবী যদিও দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, কিন্তু তিনি কোনদিন শিক্ষক, সভাপতি বা অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেননি। সাইয়েদ আবেদ হোসাইনের পর শাহ রফিউদ্দিন দারুল উলূমের পরবর্তী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।[১৬৮]

**দারুল উলূমের প্রথম পরিচালনা কমিটি** [১৬৯]

১. মাওলানা কাসেম নানুতুবী (র.)
২. হাজী আবেদ হোসাইন (র.)
৩. মাওলানা মাহতাব আলী দেওবন্দী (র.)
৪. মাওলানা জুলফিকার আলী দেওবন্দী (র.)
৫. মাওলানা ফজলুর রহমান দেওবন্দী (র.)
৬. শায়খ নেহাল আহমদ দেওবন্দী (র.)
৭. মুনশী ফযলে হক দেওবন্দী (র.)

**দারুল উলূমের প্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্র** [১৭০]

১. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.)
২. মাওলানা আবদুল হক (র.)

১৬৭ মাওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ*, ঢাকা, ১৯৯২ খৃ., পৃ. ৪২
১৬৮ জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *আযাদী আন্দোলনে সংগ্রামী আলেম সমাজের ভূমিকা*, ঢাকা ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৩৩-৩৪
১৬৯ জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত পৃ.৩৫; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ই.ফা.বা.,, ২য় খ. ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ১৬
১৭০ জুলফিকার আহমদ কিসমতী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই.ফা.বা.,, ২য় খন্ড, ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ১৬

৩. মাওলানা ফখরুল হাসান গংগুহী (র.)

৪. মাওলানা ফতহে মুহাম্মদ থানভী (র.)

৫. মাওলানা আবদুল্লাহ জালালাবাদী (র.)

৬. আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.)

৭. উবায়দুল্লাহ সিন্ধি (র.)

৮. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)

৯. মুফতী মোহাম্মদ শফী (র.)

জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে তাঁরা সকলেই ছিলেন উপমহাদেশ তথা বিশ্ব মুসলিমের রত্ন স্বরূপ।

## দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের আলিয়া মাদরাসা শিক্ষাধারা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

### ২.১ বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার সূচনায় আউলিয়া কিরামের অবদান :

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতিতে জানা যায় যে, এ ভূখন্ডটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে নাম ধারণ করেছে। সে সাথে রাষ্ট্রীয় শাসনের নানা ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস রয়েছে এ ভূখন্ডটির। ইসলামী শিক্ষা এ এলাকায় প্রচলিত হওয়ার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন । কারণ হযরত মুহাম্মদ (সা.) - এর জীবনদ্দশায় ইসলামের দাওয়াতে নিয়ে জনৈক সাহাবী এ উপমহাদেশে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের এ এলাকায় আগমন করেন।

অন্যমতে, হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ৭ম খৃ. হযরত ওমর (রা.)- এর খিলাফত কালে কয়েকজন মুসলিম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুহাম্মদ (রা.) ও হযরত মুহায়মিন (রা.) ছিলেন এঁদের দল নেতা।[১৭১] সাহাবীদের একেরপর এক ৫টি দল বাংলাদেশে আসেন।[১৭২] তাঁরা ইসলামের দীক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের ইসলামের মৌলিক দিকগুলো শিক্ষা দিতেন। তাই একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, যে সময় ইসলামের দাওয়াত এখানে এসে পৌঁছে ঠিক তখনি ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ইসলামী শিক্ষার মান রাষ্ট্রীয় শাসনের কারণে কখনও সবল অস্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার কখনও তা বাধ্যগ্রস্থ হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা এ উপমহাদেশে ইসলামের আগমনের ফলে চালু হওয়ার পর থেকেই কোন সময়ে একে বারেই বন্ধ হয়ে যায়নি। মুসলমান নর-নারী যেখানেই বসবাস করে জীবন যাপন করেছে, সেখানেই ইসলামী শিক্ষা চলমান গতিতে বিদ্যমান থেকেছে। তাই এ ভূখন্ডে মুসলমানদের ইতিহাস যেমনি প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা ইতিহাস তেমনি প্রাচীন। ইলামী শিক্ষার গোড়া পত্তনের ইতিহাস আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন। ইসলামের দাওয়াত মোটামোটি তিনভাবে এখানে এসে পৌঁছায়।

১. দা'য়ী বা মুবাল্লিগগণে মাধ্যমে,

২. আরব বণিকগণের মাধ্যমে.

৩. ইসলামের বিজয় অভিযানের মাধ্যমে।

এ তিনটি দিকের আলোচনা এখানে পর্যায়ক্রমে পেশ করা হবে:

১. দা'য়ী বা মুবাল্লিগগণের মাধ্যমে

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত বা ইসলামী ভাবধারা তথা মুসলিম জনবসতি কবে চালু হয়েছিল এ নিয়ে ঐতিহাসিক ও ইসলামী মনীষীগণের মধ্যে কিছুটা হলেও মত পার্থক্য আছে। কারো কারো মতে হযরতের ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশিদার আমলেই মুসলমানদের এখানে আবির্ভাব ঘটে।

---

[১৭১] অধ্যাপক আবদুল গফুর, *ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ*, ইসলামিক ফাইন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, পৃ. ৯৭

[১৭২] এ কে এম মহি উদ্দিন, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ই.ফা.বা.,, ১৯৯৬, পৃ.৩১

তাদের যুক্তি হচ্ছে হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুল (সা.) আমাদের নিকট থেকে হিন্দ (ভারত বর্ষ) এর ব্যাপারে ওয়াদা নিয়েছিলেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো বা তা জয় করে ইসলামের প্রবর্তনের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম থেকে রাসূল (সা.) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর জীবদ্দশায় ইসলাম না পৌঁছালে রাসূল (সা.) এভাবে প্রতিশ্রুতি নিতেন না। তারা আরও দাবী করেন যে, রাসূল (সা.) এর নেয়া প্রতিশ্রুতির আলোকেই হযরত ওমর (রা.) এর খিলাফত আমলে এখানে ইসলাম পৌঁছে।

২. আরব বণিকগণের মাধ্যমে

বস্তুত বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব হয় সাহাবা 'তাবিয়ীন'দের যুগে আরব মুসলিম সওদাগরের মাধ্যমে। আর এর প্রচার ও প্রসার হয় সত্যের দিশারী গভীর আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন সুফী দরবেশগণের মাধ্যমে। ব্যবসায়ের কারণে এদেশের সামুদ্রিক যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের আগমন সহজ ছিল। ফলে তাঁরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আসলেও দ্বীনের প্রচার এবং প্রসারে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাই বলা যায় যে, দায়ীগণ ইসলাম প্রচার করেছেন, আর বণিকগণ তা প্রসারে অবদান রেখেছেন।

৩. ইসলামের বিজয় অভিযানের মাধ্যমে

১২০৩ খৃ. মুসলিম বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর এদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিকভাবে গোড়া পত্তন হয়। বাংলাদেশ ভূখন্ডের রংপুরে বহু মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় (পূর্বতন নদীয়া)। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী এসবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[১৭৩] এভাবে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিস্তীর্ণ অঞ্চল অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোর মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসের আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। ফলে বাগদাদ ও কর্ডোভার অনুসরণে দিল্লী, লক্ষ্মৌ, মাদরাজ, লুভালী, সোনারগাঁও ও ঢাকাসহ তদানীন্তন ভারতের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ শিক্ষার জন্য বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মুসলিম শাসকগণ দেশের মোট ভূমির এক তৃতীয়াংশ/এক চতুর্থাংশ লাখেরাজ করে দিয়েছিলেন। মসজিদ ও ইবাদতখানা এবং সুফী সাধকদের খানকা তৈরীর সাথে সাথে সেখানেও ইসলামী শিক্ষা চালু হয়। হিজরী ৬৯ সনে নির্মিত লালমনির হাট জেলার সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নে একটি মসজিদের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এর গম্বুজ থেকে প্রাপ্ত ইটগুলোতে নানা প্রকার ফুল নকশা, ও আরবী হরফে কালিমায়ে তাইয়িবাহ্ লিখাসহ হিজরী ৬৯ সনের উল্লেখ রয়েছে।[১৭৪]

১৭৩ মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, *রংপুরে ইসলাম*, ই.ফা.বা.,, প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৫৬-৭১
১৭৪ ড. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সুফী সাধক*, ই.ফা.বা.,, ঢাকা-১৯৯৩ খৃ.

তুর্কী মুসলমান শাসকেরা এদেশ বিজয়ের পর যুদ্ধ বিগ্রহ ও আভ্যন্তরীন গঠন কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। কাজেই এদেশে ইসলাম প্রচার ও এর উৎকর্ষ সাধনে অলী-আবদাল, আউলিয়া, সুফী গাউস-কুতুবগণকেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ড. আবদুর রহীম মন্তব্য করেনঃ

It is clear that the Arab Merchants Visited the Costal region of Bengal from the mouth of Meghana to Cox's Bazar and Prized its Commodities such as the fine cotton cloth (muslim) and aloe-Wood.

মুসলমানদের সমাজ সংস্কৃতি প্রগতিশীল হওয়ায় একদিকে মুসলমানদের বিজয় অভিযান অপ্রতিহতভাবে চলে আসছিল এবং অন্যদিকে পীর ফকির ও দরবেশগণ অসংখ্য নর-নারীকে ইসলাম ধর্মেও দীক্ষা দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ বা একত্ববাদ। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তা'আলার এই একত্ববাদ প্রচারে সূফী দরবেশগণ নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। যুগে যুগে এখানে বহু আউলিয়া ও সুফীর আবির্ভাব ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ'র (সা.) ইন্তিকালের পরে এরাই হলেন প্রকৃত ধর্ম ও কর্মের দিশারী। বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) বাহাউদ্দিন নখশ বন্দী (র.), মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (র.), খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্তী (র.) মুজাদ্দিদে নখশা বন্দী (র.) প্রমুখ আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক সুফী ও আউলিয়া ছিলেন।

সুফীদের কার্যকলাপ ও গূঢ় রহস্যকে ইলমে তাসাউফ বলা হয়। ইলমে তাসাউফের আলোকে সুফীদের চারটি গুণ অর্জন করার কথা বলা হয়।

ক. ইমান : অদৃশ্য বস্তুর প্রতি বিশ্বাস।

খ. ত্বলা : অদৃশ্য বস্তুর প্রতি অনুসন্ধান।

গ. ইরফান : অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

ঘ. ফানাফিল্লাহ[১৭৫] : অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে বিলীন হওয়া।

ফলে তাদের আধ্যাত্মিক মিশনের এ পর্যায়ে যাওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে আত্মনিযোগ করতে হয়েছে। মুসলিম বিজয়ের পরবর্তী যুগে বাংলায় এসেছিলো অসংখ্য সুফী সাধক। তারা ইসলাম প্রচারের মহান ব্রতে লিপ্ত হয়েছিলেন।

তারা বিভিন্ন তরীকা অবলম্বনের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় খানকাহ্ [১৭৬] প্রতিষ্ঠা করে দ্বীন প্রচার করেছিলেন। পাবনা জেলার হযরত মাখদুম শাহ্ দৌলাহ শহীদ (র.), জামাল উদ্দীন বুখারী (র.),

---

১৭৫ ফানাফিল্লাহ্ : আরবী শব্দ। ইলম মারিফাতের পরিভাষায় আল্লাহ প্রাপ্তির উচ্চস্তর। সুফীগণ তাদের সাধনা বলে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক যোগ্যতা অর্জন করে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। তাঁরা আল্লাহর জন্য সর্বাবস্থায় নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেন- এই পর্যায়কেই ফানাফিল্লাহ্ বলা হয়। [ফকীর আব্দুর রশীদ, *সুফী দর্শন*, ই.ফা.বা.,, ১৮৮৫ খৃ., পৃ. ১৮৪-১৮৬]

১৭৬ যেখানে সুফী সাধকগন ইবাদত করেন। দুনিয়াত্যাগী ফকীর দরবেশের আবাস স্থল। 'খান'-ফকীর-দরবেশ, 'কাহে স্থান অর্থাৎ ফকীর দরবেশের স্থান। যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে উৎসুক। তারা খানকা হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। [*বাংলা 'বিশ্বকোষ*, ২য় খন্ড. বাংলা একাডেমী, পৃ-২৫০]

পূর্ব বঙ্গে শ্রীহট্ট তথা সিলেট অঞ্চলে শাহজালাল (র.), মধ্য বাংলায় শেখ শরফুদ্দীন (র.), রাজশাহী অঞ্চলে শাহ মাখদুম (র.), তাঁর বড় ভাই নোয়াখালীতে, বাগেরহাট- এর খান জাহান আলী (র.), ত্রিবেনীর জাফরখান গাজী (র.), কাঁটা মুয়াবের শাহ ইসমাইল গাজী (র.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

হযরত খান বাহাদুর আহসান উল্যাহ (র.) ১৮৭৩ খৃ. খুলনা জেলার সাতক্ষীরার অন্তর্গত নলতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সারা জীবনের সাধনা ছিল বাংলার মুসলমানদেও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করা। তাঁর আজীবন সাধনা ছিল সবৃস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো বিতরণ করা। তিনি বহু স্কুল কলেজ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ছাত্রবাস নির্মাণ করেছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের তখন দারুণ অভাব ছিল। তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করে সেবার দৃষ্ঠান্ত স্থাপন করেছিলেন।

তিনি সাধারণ শিক্ষায় এম. এ পাশ ছিলেন। তিনি১৯২৯ খৃ. ৫৭ বছর বয়সে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৬৫ খৃ. ৯ ফেব্রুয়ারী জন্মস্থানে ৯২ বছরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মুর্শীদ প্রখ্যাত পীর শাহ্ সুফী হযরত আকছাদ (র.) তিনি মারিফাতের[১৭৭] সাগরে যেন ডুবে গিয়েছিলেন। সহজ সরল জীবন যাপন তিনি পছন্দ করতেন।

চট্টগ্রামের বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে, নদী সমুদ্রে কত পীর, দরবেশ ,সুফী সাধক ও অলী-আল্লাহগণের পূণ্য স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছেন তার হিসেব নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দয্য মন্ডিত এলাকা চট্টগ্রমকে আল্লাহ প্রেমের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেই তারা দলে দলে এখানে আগমন করেছিলেন। চট্টগ্রামকে সাধারণত বার আউলিয়ার দেশ হিসেবে অভিহিত করা হয। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উদ্ধৃত হলো:

| | |
|---|---|
| ১. বায়েজিদ বোস্তামী (র.) | : ইন্তিকাল ৮৭৫ খৃ., চট্টগ্রামশহরের পাঁচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদের পর্বত চুড়ায় তাঁর মাযার অবস্থিত। তাঁর মাজারের অবস্থান বিষয়ে ভিন্ন মত পাওয়া যায়। সে মতে, ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি এ এলাকায় এসেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। সুতরাং চট্টগ্রামে তাঁর অবস্থানের স্থানকে মাজার বলে গণ্য করা বিষয়টি একটি বিভ্রান্তি বা স্বার্থম্বেষী মহল কবর পূজারীদের অপপ্রচারের ফল। |
| ২. শেখ ফরীদ (র.) | : ষোল শহরে তাঁর মাযার অবস্থিত। |
| ৩. বদর শাহ (র.) | : বদর আউলিয়া বা পীর বদর নামে তাঁকে অভিহিত করা হয়। তাঁর মাযার শহরের বকশীর হাটের পাশে অবস্থিত। |
| ৪. কতল পীর (র.) | : কাতাল গঞ্জে তাঁর মাযার অবস্থিত। |

১৭৭ মারিফাত : আল্লাহর পরিচয় জ্ঞানকে মারিফাত বলে। 'উরফুন' ধাতু থেকে মারিফাত শব্দের উৎপত্তি । 'উরফুন' অর্থ জানা । কোন কিছুর সত্ত্বা সম্পর্কে অবগত হাওয়া, পরিচিতি লাভ করা। সম্যক জ্ঞান লাভ ইত্যাদি। একত্ববাদের জ্ঞান লাভ করার অর্থ বেশী গ্রহন করা হয়। আল্লাহ'র সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লাভের উপায়। সুফি সাধকদের পরিভাষায় এটি আল্লাহ প্রাপ্তির তৃতীয় স্তর। [ফকীর আবদুর রশীদ, *সুফী দর্শন*, ই.ফা.বা.,, ১৯৮৫, পৃ : ১৫৩]

৫. শাহ মহসীন আউলিয়া (রা.) : আনোয়ারা থানার অন্তর্গত বটতলী প্রামে তার মাযার অবস্থিত।
৬. শাহ্ পীর (র.) : সাতকানিয়ায় তার মাযার অবস্থিত।
৭. শাহ্ ওমর (র.) : চকরিয়ায় তার মাযার অবস্থিত।
৮. শাহ্ বাদল (র.) : ধুম রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী জামালপুরে তার মাযার অবস্থিত।
৯. শাহ্ চাঁদ আউলিয়া (র.) : পটিয়া থানার নিকটবর্তী স্থানে তার মাযার অবস্থিত।
১০ শাহ্ জায়েজ (র.) : কালেন্দর হাট ষ্টেশনের নিকটবর্তী স্থানে তার মাযার অবস্থিত।

এই সুফী সাধক ও অলীগণ দু'তিনজন করে দলবদ্ধভাবে এ এলাকায় এসেছিলেন। কারো কারো মতে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এসে এখানে একত্রিত হয়েছিলেন। তবে এ কথা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়, সুফীবাদ প্রতিষ্ঠার সাথে এ অসংখ্য অলী দরবেশগণ এই এলাকায় ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি কালচারকে মানুষের মন- মগজে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চট্টগ্রামের প্রতিটি এলাকায় বিভিন্ন সুফীদের পদচারণ সমান্তরালভাবে লক্ষ্য করা যায়। উখিয়ায় খুদা ফকীর (র.). বাসু থানায় শাহ্ হাকিম ফকীর (র.) দামপাড়া এলাকায় শাহ গরীবুল্যাহ (র.), ফটিকছড়িতে হামিদ শাহ্ (র.) চাঁদগাঁও মাওলানা শাহ আবুল হোসেন (র.) লালদীঘি এলাকায় শাহ আমানত (র.) পদচারণায় ধন্য করেন এবং ইন্তিকালের পর তাঁদের মাযার এসব স্থানে তাঁদের স্মৃতিকে অম্লান করে রেখেছে। তাঁদের মাযার খানকাহকে উপলক্ষ্য করে মসজিদ ও মাদরাসা মকতব ইবাদত খানা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। রংপুরে প্রথম ধর্ম প্রচরক হিসেবে হযরত শহজালাল বুখারী (র.) এর নাম জানা যায়। শাহ্ ইসমাইল গাজী রংপুরে ইসলাম প্রচারের অন্যতম অলী হিসেবে খ্যাত।[১৭৮] সাহিত্যে বিজয়' (ড. এনামুল হক) গ্রন্থটিতে এই সুফী সাধকের জীবনী প্রকাশিত হয়েছে।

বায়বেরিলীর বিখ্যাত সংস্কারক সৈয়দ আহমদ বেরলভী (১৭৮২-১৮৩১) পাক ভারত-বাংলাদেশের সংস্কার আন্দোলনের মূল প্রর্বতক। ভারতের জৌনপুরবাসী সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উত্তর পূর্ববঙ্গ ও আসামে সংস্কার আন্দোলন, ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারামত আলী জৌনপুরী (র.) খেলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর পয়ঁত্রিশতম পুরুষ ছিলেন তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাঁর মুর্শীদ সৈয়দ আহমদের নিকট বালাকোটের যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। যুদ্ধে যাওয়ার মত প্রচুর লোক থাকায় তিনি তাঁকে ইসলামের মর্মবাণী প্রচার করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। নির্দেশ পাওয়ার পর তিনি আজিমবাড় গাজীপুর,ফয়জাবাদ, সুলতানপুর ও জৌনপুরে দ্বীন প্রচার কাজ শুরু করেন। জৌনপুর থেকে তিনি কলকাতয় চলে আসেন। সেখানে থেকে খুলনা,যশোর, বরিশাল,চট্টগ্রাম,সন্ধীপ, নোয়াখালী, ঢাকা, সিলেট এবং আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে ইসলামের সংস্কার সাধন পূর্বক তার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন। পোশাক, পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহারসহ যাবতীয় বিষয়ে সংস্কারের জন্য

[১৭৮] (পীর মুহাম্মদ সাত্তারী, *'রিসালাতুশ শুহাদা'* ১৬৩৩খৃ.

তিনি আসামসহ বাংলা সুসলমানদের জন্য বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেন। বাংলাদেশ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণের সময় তিনি শুধু মৃত প্রায় ইসলামকে সঞ্জীবিত করেছেন তা নয়, তাঁর হাতে বহু অমুসলিম ইসলাম ধর্মের দীক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি একজন উঁচু মাপের আলিম ছিলেন। বহু মাদরাসা মকতব খানকাহ্ তিনি প্রতিষ্ঠা করে এ দেশে দ্বীন প্রচারের পথকে সুগম করেন। তিনি আরবী, ফারসী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। তার লিখিত ‘মিফাতহুল জান্নাত’ একটি অনবদ্য গ্রন্থ। বিশ্বে এই বইয়ের এত বিস্তার লাভ করে যে, ১৮টি ভাষায় বইটি অনুদিত হয়।

তিনি ১২৯০ হিজরীতে ইন্তিকাল করলে রংপুর শহরের মুন্সীপাড়ায় তাঁকে দাফন করা হয়। তার মাযারের নিকট একটি সুরম্য মসজিদ ও একটি মাদরাসা তৈরি করা হয়েছে।তার ইন্তিকালের পর তারই সুযোগ্য পুত্র মাওলানা হাফেজ আহমদ পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমাজ সংস্কারের কাজ চালিয়ে যান। এ বিষয়েপ্রখ্যাত লেখক Murry Titus এর মন্তব্য লক্ষ্য করার মতো–

“His work has been carried on by his son mouluvi hafiz Ahmed Who died in 1898. and by his nephew mohammed mohsin and There are ceblain districts in the province (Bangal) where has influence is still a living force,”

নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের সৈয়দ হাফেজ মাওলানা আহমদ তান্নুরী ওরফে সৈয়দ মিরান শাহ্’র মাযার বর্তমান রয়েছে। তার পিতা ছিলেন সৈয়দ মাওলানা আজাল্লা (র.)। সৈয়দ আজাল্লা (র.) ছিলেন বড়পীর হযরত শেখ মহি উদ্দীন আব্দুর কাদির জিলানী (র.) এর পুত্র বাদশাহ হালাকু খান যে সময়ে বাগদাদ লুণ্ঠণ করেছিলেন, সে সময়ে হযরত বড় পীর সাহেবের অনেক আত্নীয় স্বজন ও বংশধর কাবুল, কান্দাহার পারস্য, হিন্দুস্তান এবং পাক বাংলায় আগমন করেন। পিতার সাথে ঐ সময়ে মাওলানা আহমদ তান্নু’রী (র.) বাংলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি সিলেটের শাহ্জালাল (র.) ও ঢাকায় শাহ আলী’র সমসাময়িক ছিলেন। সুলতান রুকনুদ্দীন ফিরোজ শাহ্ তাকে লিখে দেন যে, তিনি তার শিষ্য বাহিনী সহ বাংলার যে কোন স্থানে যেকোন স্থানে বসবাস করতে পারবেন। তার জীবিকা নির্বাহের জন্য লাখেরাজ জমি- জমারও ব্যবস্থা করেন। একই সময়ে তার ভাই প্রখ্যাত দরবেশ সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস ওরফে শাহ্ মাখদুম রাজশাহীতে আস্তানা নির্মান করেন। নোয়াখালীএলাকায় তখন পৌত্তলিক ধর্মের প্রচলন ছিল। একে ধ্বংস করার জন্য তিনি নোয়াখালী জেলা সেনবাগে এসে পৌঁছেন।

মাওলানা ইমামুদ্দীন গাজী (র.) হচ্ছেন বাংলাদেশের তৎকালীন ইসলাম প্রচারে আরেক প্রখ্যাত সাধক। তিনি ছিলেন বালাকোটের শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরলবী (র.) এর একজন বিশিষ্ট খলিফা। ১৮৩১ খৃ. শিখদের সঙ্গে বালাকোটের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাওলানা ইমামুদ্দীন তার মর্শিদের

আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুর্শিদের নির্দেশক্রমে তিনি তাঁর কর্মতৎপরতা নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের মধ্যে চালাতে থাকেন। তৎকালীন সন্দ্বীপের হাজীপুর (সা'দুল্লাপুর) গ্রামে তিনি বসতি স্থাপন করেন। সৈয়দ আহমদের (র.) শিষ্যগণের মধ্যে মাওলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী রাজশাহী ও মালদহ জেলাতে এ সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। অপর দিকে মাওলানা কারামত আলী (র.) মাওলানা ইমামুদ্দীন (র.) ও মাওলনা নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এ দেশের ভিভিন্ন স্থানে দ্বীন প্রচারের কাজ পরিচালনা করেন। তারা সকলেই সমসাময়িক ও একই মুর্শিদের শিষ্য ছিলেন।

সুফিয়ায়ে কিরামের আগমন ও তাদের অবদানের এই সংক্ষিপ্ত ধারণামূলক আলোচনার পর সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে সতের শতক (খৃ.) পর্যন্ত আমরা ইসলামের বিস্তার ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারকে তিনটি পর্যায়ভূক্ত করতে পারিঃ

১. সাহাবাদের ও চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইসলাম প্রচার ও প্রসরের শৈশব ও কৈশোর কাল।

২. ত্রয়োদশ ও চতুদর্শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যৌবন কাল।

৩. পনেরো, ষোল ও সতের শতক ইসলাম প্রচারের পৌঢ়কাল।

সুফীয়ায়ে দ্বীন ও উলামায়ে কিরাম বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার এবং ইসলামী শিক্ষার উৎকর্ষতায় যে ভূমিকা পালন করেন তা বিস্ময়কর। আরব, ইয়ামান ইরাক খোরাসান, মধ্য-এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে এসব সুফী 'আলিমগণ বাংলাদেশে আগমন করেন। অদম্য সাহসিকতা নিয়ে অজানা অচেনা এ দেশে তারা নানা প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে দ্বীন প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে ছয়শত বছরের লালিত ইসলামী শিক্ষা সাহিত্য কৃষ্টি কালচার আরব ও অনারব সকলের জন্যই বিস্ময়ের কারণ ছিল। ১৭৫৭ খৃ. বাংলায় বৃটিশ শাসন কায়েমের মধ্যে দিয়ে সে লালিত ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলিম শাসকদেও মধ্যেও এমন অনেক শাসক বাদশা বা নবাব ছিলেন, যাঁরা ইসলামী চিন্তা চেতনাকে ধারণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। ফলে ইতিহাসে তারা কেবল শাসকই বিবেচিত হননি, তারা ইসলামের 'দায়ী' বা 'মুবাল্লিগ' হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন, বিবেচিত হয়েছেন ইসলামী শিক্ষার মহান পৃষ্ঠপোষক রূপে। তাদের এই পৃষ্ঠপোষকতার প্রভাব বা মূল্য কম ছিল না। তাঁরা এই বিদ্বান শ্রেণীকে এই এলাকায় যে পরিমানে স্থান করে দিয়েছিলেন , ইংরেজদের দু'শ বছরের হাজারো দমন নিপীড়নে একেবারে শেষ করে দিতে পারেনি। ফলে ১৮৫৭ খৃ. সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। বালাকোটের যুদ্ধে শাহাদৎ বরণ করেছিলেন সৈয়দ আহমেরদ বেরলবী (র.)। কিন্তু তার যোগ্য উত্তরসূরী হযরত শাহ্ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) শাহ্ আবদুল হাই (র.), হাজী এমদাদুল্লাহ (র.), মাওলানা কাসের নানুতুবী (র.), রশীদ আহমদ গাংগুহী (র.) প্রমুখ মাশায়েখে দ্বীনগণের অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে। ইতিহাস এর স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, উনিশ শতকে এদেশের 'আলিম 'ওলামা পীর মাশায়েখগণ ইসলাম প্রচার ও প্রসার তথ্য ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যেমনি সেচ্চার ছিলেন , তেমনি বিশ শতকেও একই ধারাবাহিকতা দেখা যায়।

ইসলামী শিক্ষার প্রভাব এদেশের রীতি:নীতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। বঙ্গভঙ্গ রদ এ উপমহাদেশের রজনীতির সুদুর প্রসারী দু'টি ঘটনা। এ দু'ঘটনার সাথে এদেশের 'আলিমগণের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্তা ছিল । সংখ্যায় নগন্য একটি দল কংগ্রেসের মিলনপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে মুসলমানদের প্রশাসনিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধার দিকটিকে গৌণ মনে করতেন। এরা রাজনৈতিক দিক থেকে দুই বঙ্গের হিন্দু মুসলিম ঐক্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন, কেবল তারাাই বঙ্গ বিভাগের বিরোধিতা করেন। তারা হিন্দুদের পাশে দাড়িয়ে মুসলিম লীগ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে ম্লান করতে দ্বিধারোধ করেননি। যে সব 'আলিম বঙ্গ বিভাগের বিরোধীতা করেছিলেন। তন্মধ্যে বাংলার মাওলানা মনিরুজ্জামান ইছলামাবাদী , মাওলানা আকরাম খঁ, ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দীকী, মৌলভী লিয়াকত হোসেন, মৌলভী আবদুল ওয়াহেদ, মাওলানা আহমদ আলী, মৌলভী মোহাম্মদ হোসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **১৯১১** খৃ. ২২ জানুয়ারী রবিবার কলকাতার গ্রীয়ার পার্কের একসভায় আন্‌জুমানে ওয়ায়েজীন বা ধর্ম প্রচার বিষয়ক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।[১৭৯] মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এই সমিতির আজীবন সভাপতি ছিলেন। 'আন্‌জুমান' স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য ছিল। এই আন্‌জুমান বৃহৎ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে শিক্ষা সংস্কৃতি ব্যাপারে কাজ করে। আন্‌জুমানের অধীনে কিছু সংখ্যক অনাররী (অবৈতনিক) প্রচারক ছিলেন, বেতন ভোগী সর্বক্ষণিক প্রচারক ছিলেন অনেকেই। তন্মধ্যে নিম্নের ব্যক্তিগণ উল্লেখ্যযোগ্য

১. মাওলানা ইয়াদ আলী, চব্বিশ পরগনা, ভারত;
২. মাওলানা ফজলুর রহমান, পোড়াদহ;
৩. মৌলভী হাবিবুর রহমান, ফরিদপুর;
৪. মুনসী ইব্রাহিম, নদীয়া;
৫. মৌলভী আবদুল আজীজ, ঝিনাইদহ;
৬. মৌলভী আবদুল মজীদ, বগুড়া;
৭. মৌলভী আবদুল জাববার, চব্বিশ পরগনা;
৮. মাওলানা মকবুল হোসেন, রাজশাহী;
৯. মাওলানা ফজলুর রহমান, চট্টগ্রাম;
১০. মুন্সী জহিরুদ্দীন যশোর;
১১. মাওলানা ওজীহুদ্দীন, রংপুর;
১২. মৌলভী মুজাফফর হোসেন, রংপুর।

১৭৯ ড. মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান, হযরত মাওলানা মোহাম্মদ উল্যাহ হাফেজী হুজুর : তার রাজনীতি ও সমাজ সংস্কার, পিএইচডি, থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ২০০২, পৃ : ২২৯

এই সংগঠনের প্রচারকগণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে মক্তব, মাদরাসা, খানকাহ, সালিশী বোর্ড, ফতোয়া বোর্ড, সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রচার, বায়তুল মাল তহবিল গঠন এবং বিভিন্ন যুব সমিতি গঠনসহ জনহিতকর ও জনকল্যাণ মূলক কাজের দায়িত্ব পালন করতেন।[১৮০] উপমহাদেশ তথা এই বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার ধারাবাহিকতা যেমনি ঐতিহাসিক পালা বদলের অমর স্বাক্ষ্য বহন করে তেমনি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা নানা ট্রাজেডির জীবন্ত স্বাক্ষ্যও বহন করে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি আমরা এক্ষেত্রে আবহমান বাংলার সমাজ সভ্যতার ধারক ও বাহক বলি তাহলে বেশী বলা হবে না। বরং একথা নির্দ্ধিধায় বলা যেতে পারে যে, ইসলামী শিক্ষার অবদানেই এদেশে বহু মনীষার জন্ম হয়েছে, যারা রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্য তাদের প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছেন। ফলে দেখা যায়, এক সময় ইসলাম পাহাড় সাগর মহাসাগর ও নদী ইত্যাদি পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে পৌছে যে বিস্ময়ের সূচনা করেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঐ সূচনা কর্ম ধীরে ধীরে সতেজ আকার ধারণ করেছে।

দুনিয়ার তাবৎ সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সূচনার পর দ্রত পরিণত বয়সে পৌছে আবার তা কালের বিবর্তণে হারিয়ে গেছে। উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস এর থেকে ব্যতিক্রম। এখানে বাধাগ্রস্থ হয়ে গতি হারিয়েছে কিন্তু মূল অস্তিত্ব হারিয়ে যায়নি। যার ফলে আজও এখানকার পথে প্রান্তরে, পরিবেশ, সমাজ, সভ্যতা ও অফিস আদালতে এক কথায় সর্বত্র ইসলামী শিক্ষার সুন্দর নমুনা প্রত্যক্ষ করা যায়। এই ভূখণ্ডে ইসলামি শিক্ষার বিষয় ভিত্তিক বিস্তার ঘটেছে । তাই দুনিয়ার সকল এলাকায় জ্ঞানার্জনে আগ্রহী শিক্ষার্থীগণ উপমহাদেশের মুসলিম মনীষীদের রচিত গ্রন্থ ও প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী ।

---

১৮০ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *রাজনীতিতে বংগীয় ওলামাদের ভূমিকা*, ঢাকা, ১৯৯৫ খৃ., পৃ. ৯৩-৯৪

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ২.২.১ কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা :

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ই আগস্ট দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম ইস্ট ইন্ডয়া কোম্পানীকে বাংলার দেওয়ানী (রাজস্ব আদায়কারী) নিয়োগ করলেও মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের তাৎক্ষণিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ইংরেজরা দেওয়ানী গ্রহণের শর্তনামা প্রথমেই অমান্য করেন নাই। দেশের রাজভাষা তথা প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য রাজ কার্যাবলী ফার্সী ভাষায় সম্পাদিত হতে থাকে। বিচারকার্য সম্পাদিত হতে থাকে ইসলামী আইনানুসারে। ফলে ফার্সী ভাষায় জ্ঞানসম্পন্ন ও ইসলামী আইনে প্রশিক্ষিত লোকবলের প্রয়োজন অব্যাহত থাকে। রাজ্যহারা সম্মানহারা মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার বেসরকারী উদ্যোগ ক্রমান্বয়ে থেমে যেতে থাকে। অবস্থার ক্রমাবনতি দেখে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, এক সময় রাজকার্য নির্বাহের যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের অভাব হয়ে পড়বে।[১৮১] প্রথম অবস্থায় ভারত-বাংলার জনসাধারণকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত না করে শুধু নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির চিন্তা-চেতনা থাকলেও সময়ের চাহিদা তাদের সেই ধারণা পাল্টে দেয়।[১৮২] ফলে তৎকালীন বড়লাট বিচক্ষণ ইংরেজ গভর্নর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস দেশের প্রশাসনিক এবং বিচার ব্যবস্থার সার্বিক প্রয়োজনের বিবেচনায় ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। [১৮৩] কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের ১৭৮১ সালের ১৭ইং এপ্রিল প্রদত্ত একটি বিবরণী থেকে বিস্তারিত তথ্য জানা যায় :

'১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল আমার সাথে সাক্ষাত করে এবং আমাকে অনুরোধ করে যে, প্রেসিডেন্সীতে মোল্লা মাজদুদ্দিন নামের জনৈক ব্যক্তিকে কলকাতায় স্থায়িভাবে রাখার ব্যাপারে আমি যেন সচেষ্ট হই। যাতে এখানকার মুসলমান ছাত্ররা প্রচলিত ইসলামী বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে। এ প্রতিনিধি দল আমাকে অবহিত করে যে, এ ব্যক্তি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন। এ ধরনের গুণী লোক সচরাচর পাওয়া যায় না। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি বিশেষ যোগ্যতা রাখেন। কলকাতা এখন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নগরপীঠ হিসেবে উন্নীত হয়েছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্য অঞ্চল হতেও লোকেরা এ শহরে চলে আসছে। অন্যান্য প্রাচ্য দেশীয় রীতি অনুযায়ী ভারত এবং ইরানের জন্য তা খুবই গৌরবের বিষয় যে, এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লোকেরা তাদের মানসিক উন্নতির প্রয়াস পাচ্ছে। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের পর এখানকার শিক্ষা-দীক্ষার অবনতি ঘটেছে এবং এই লুপ্ত-প্রায় শিক্ষা পদ্ধতিকে পুনরুজ্জীবিত করার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।' তাছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সরকারেরও এমন অসংখ্য অফিসারের প্রয়োজন যাদের প্রচুর যোগ্যতা

---

১৮১ *রিপোর্ট অব দ্যা মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি*, ১৯৪৬ খৃ. পৃ. ৪

১৮২ M. Fazlur Rahman, *The Bengal Muslim and English Education*, p.17

১৮৩ *রিপোর্ট অব দ্যা মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি*, ১৯৪৬ খৃ. পৃ. ৪

রয়েছে। কেননা অবিজ্ঞতা হতে দেখা গিয়েছে যে, ফৌজদারী আদালতে এবং দেওয়ানী আদালতে এ সময় জজ নিয়োগের ব্যাপারে খুবই যোগ্যতাসম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য লোকের প্রয়োজন। এই গণ্যমান্য মুসলমান প্রতিনিধিরা মনে করেন ব্যক্তিগতভাবে আমি যথার্থ যোগ্য লোকদের মর্যাদা দিতে জানি। এজন্য তারা এ ধরনের আবেদন নিয়ে সরাসরি আমার কাছে এসেছেন। আমি এ প্রতিনিধিদলকে এই আশ্বাস দিয়ে বিদায় করেছি যে, যতটুকু সম্ভব আমি এ ব্যাপারে চেষ্টা করব। অতঃপর আমি মোল্লা মাজদুদ্দীনকে ডেকে পাঠাই এবং মুসলমানদের আকাঙ্খা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে অনুরোধ জানাই। তিনি আমার কথায় সম্মত হলেন এবং ১৭৮০ সালে প্রস্তাবিত মাদরাসার জন্য কার্যক্রম শুরু করে দিলেন। এ ব্যক্তি মাদরাসার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং তার সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণাকে অক্ষুন্ন রাখেন।[১৮৪]

মাওলানা মাজদুদ্দীন ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাথমিক অনুমতি পাওয়ার পরই ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে শিয়ালদা রেল স্টেশনের নিকট একটি ভাড়া বাড়ীতে দারসে নিজামীয়া রীতি অনুযায়ী এই মাদরাসার ক্লাস শুরু করেন।[১৮৫] মোল্লা মাজদুদ্দীন প্রণীত কলকাতা আলিয়া মাদরাসার শিক্ষাক্রম নিম্নরূপ ছিল ঃ

১. ছরফ ঃ মিজান মুনশাব, ছরফেমীর, পাঞ্জেগঞ্জ, জুবদা, ফসলে আকবরী ও কাফিয়া।
২. নাহু ঃ নাহুমীর, শরহে মিয়াতে 'আ'মেল, হেদায়াতুন নাহু, কাফিয়া ও শরহে জা'মি।
৩. মানতিক ঃ ছোগরা, কোবরা, ইছাগুজি, তাহজীব, শরহে তাহজীব, কিবতী মা'মীর ও ছুলুমুল উলুম।
৪. হেকমত (বিজ্ঞান) মায়জুবী, ছোগরা, শামছে বাজেগা।
৫. অংক ঃ খোলাসাতুল হেছাব, তাহরিকে আকলিদাস (মালাকায়ে উলা) তা'শরিহুল আখলাক, রেছালায়ে কুশজিয়া, শরহে চগমুনী।
৬. বালাগাত ঃ ভাষা (শরী) মুখতাছারুল মা'আনী, (মোতাওয়াল)।
৭. ফিক্হ ঃ শরহে বেকায়া, হেদায়া (আখেরাইন) ও আউয়ালাইন।
৮. উছুলে ফিক্হ ঃ নূরুল আনোয়ার, তাওজিহ, তালবিহ, মুছুল্লমুদ ছবুত।
৯. কালাম ঃ শরহে আকায়েদ নছফী, শরহে আকায়েদ জালালী, মীর জাহেদ ও শরহে মাওয়াকেফ।
১০. তাফসীর ঃ জালালাইন ও বায়জাবী।
১১. হাদীস ঃ মেশকাত।[১৮৬]

---

১৮৪ *Minute by Warren Hestings dated the 17th April*, 1781
১৮৫ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন-১৯৮০ সাল, পৃ. ৪৩
১৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪-৫৫

অতঃপর মোল্লা মাজদুদ্দীনের কর্ম তৎপরতা ও আগ্রহ দেখে হেস্টিংস নিজ ক্ষমতা বলে বৌদ্ধপুকুর নামক স্থানে এক খন্ড জমি কিনে একটি ভবন নির্মাণ করেন এবং মাদরাসা পূর্ণ মাত্রায় চালু করেন।[১৮৭]

অতঃপর সমুদয় ঘটনার বিবরণ ও আলিয়া মাদরাসার সময়ের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব গভর্নর উক্ত কাজের অনুমতি ও ব্যয় অনুমোদনের উদ্দেশ্যে পত্র লেখেন।[১৮৮]

লর্ড হেস্টিংসের উক্ত পত্র দ্বারা দৃশ্যত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব গভর্নরের অনুমোদনের মাধ্যমে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের সাথে ইংরেজদের সখ্যতার প্রচেষ্টা চালানো হয়। উপরোল্লিখিত পাঠ্যসূচিতে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও প্রথম দিকে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় হাদীস ও তাফসীর পড়ানো হয়নি। তথাপি আরবী ফার্সীর বিজ্ঞ আলিমদের প্রচেষ্টায় অর্ধ শতাব্দী ধরে কলকাতা মাদরাসা থেকে বহু দক্ষ প্রশাসক তৈরি হয়েছিল।[১৮৯] কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮৫ সালে ভারত থেকে ১ম দফা বিদায়ের সময় মাদরাসার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলেন তা থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সময়োপযোগী নীতির চাহিদা অনুযায়ী বর্তমানে ফৌজদারী বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগের অধিকাংশ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমান অফিসারদেরকে বহাল করা উচিত। কিন্তু এসব পদের দায়িত্ব সম্পাদনের বেলায় শুধু ব্যক্তিগত এবং প্রচলিত সতর্কতা অবলম্বনই যথেষ্ট নয়; বরং আরবী এবং ফার্সী ভাষার মাধ্যমে ইসলামী ফিক্‌হ' এর নিরিখে যুক্ত সমস্যাবলী সমাধানের যোগ্যতা থাকাও নেহায়েত প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, কিছুকাল হতে এ ধরনের অনুসন্ধিৎসু শিক্ষাবিদরা ক্রমান্বয়ে দুর্লভ হয়ে পড়ছেন।[১৯০]

আমরা যেহেতু অর্থ বিভাগ নিজেদের আয়ত্তেই রেখেছি, এজন্য এ বিভাগের সব কর্মচারী হয় ইংরেজ নয় হিন্দু। তাদের পরিমিত শিক্ষা, মিতব্যয়ী স্বভাব এবং সহজাত দক্ষতা গুণে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা মুসলমানদের চেয়ে সর্বাংশে অগ্রসর। এজন্য এ বিভাগে মুসলমান কর্মচারী নেই।[১৯১]

এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, মুসলমানদের শাসনের পতনের পর তাদের পারিবারিক কাঠামো রীতিমত ভেঙে পড়েছে। বর্তমানে আর্থিক সঙ্গতি নেই বলে তাদের সন্তান-সন্ততিদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে উচ্চতর সরকারী পদে বহাল করতে পারে না। তাদের এ অবনতি রোধ করার জন্য গভর্নর বাহাদুর আলিয়া মাদরাসা পত্তন করেন। যাতে ভবিষ্যতে মুসলমানরা উপযুক্ত হয়ে সরকারী পদে বহাল হওয়ার সুযোগ পায়। সেই উদ্দেশ্যে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে চব্বিশ পরগনার কতিপয় মৌজা

---

187 G.M.D. Sufi Al-Minhaj, Lahore, Ashraf printing press, 1981, p.90
১৮৮ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুস্ সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, পৃ. ৪৩
189 প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
190 *Report of the moslem Education Advisory committee*, 1934, p.4
১৯১ মওলানা মোহাম্মদ আবদুস্ সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, পৃ. ৪৭

মাদরাসার খরচ নির্বাহের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।[১৯২] লর্ড হেস্টিংসের এসব বিবরণী হতে তার একটি মহৎ উদ্দেশ্য এবং মানবতাবোধ পরিলক্ষিত হয়। তিনি স্থায়িভাবে দীর্ঘদিন থাকলে হয়তো আরো কিছু পরিলক্ষিত হতো। হেস্টিংস প্রস্তাবসমূহ প্রেরণ করেই কলকাতা থেকে স্বদেশের উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিলেন।[১৯৩] লর্ড হেস্টিংসের প্রস্তাব বোর্ড অব গভর্নরসে পাস হয়ে আসে। এদিকে মাদরাসার প্রধান অধ্যাপকের উপর ২৪ পরগনার উক্ত জমির রাজস্ব তদারকির ভার দেওয়ায় তিনি তাঁর আসল দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন।[১৯৪] সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত জমির রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন আমিন নিয়োগ করা হয়।[১৯৫] নিয়োগকৃত আমিনের উপর মাদরাসার কিছু দায়িত্বও দেয়া হয়। ফলে প্রধান অধ্যাপকসহ অন্যান্য শিক্ষকের সাথে ছাত্রদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আমিনের অহেতুক কার্যকলাপের জন্য মাদরাসায় শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়। পরিশেষে আমিনকে কর্তৃপক্ষ পদচ্যুৎ করতে বাধ্য হয়। সে স্থলে উক্ত জমির দায়-দায়িত্ব রাজস্ব বিভাগে চলে যায়।[১৯৬]

কিন্তু ১৭৯৫ সালে নদীয়ার জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র রায় মাদরাসার উক্ত জমির উপর তার স্বত্বের দাবি তোলেন।[১৯৭] মাদরাসা কর্তৃপক্ষ উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফের পক্ষে কোন দলিল দিতে না পারায় আদালত জমিদারদের পক্ষে রায় দেয়। উল্লেখ্য যে, লর্ড হেস্টিংস হয়তো উক্ত সম্পত্তি মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফ করার সুযোগ পাননি। ফলে মাদরাসার ব্যয় রাজস্ব বিভাগেই থেকে যায়।[১৯৮]

কলকাতা আলিয়া মাদরাসার উক্ত জমি হাতছাড়া হওয়ার পূর্বে আরও কিছু ঘটনা ঘটে যায়। মাদরাসার জমিদারী নিয়ন্ত্রণের ভার একজন অনভ্যস্ত পণ্ডিতের উপর সমর্পণ এবং অবশেষে তা রক্ষার জন্য প্রধান অধ্যাপকের ক্ষমতা স্বল্প শিক্ষিত আমিনের সাথে ভাগাভাগিতে মাদরাসার পরিবেশের যে অবক্ষয় ও অরাজকতা শুরু হয় তা আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য ১৭৯১ সালে মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান অধ্যাপক মোল্লা মাজদুদ্দীনের বিদায়ের মাধ্যমে পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়।[১৯৯] মোল্লা মাজদুদ্দীনের পরিবর্তে সে স্থলে মোহাম্মদ ইসমাইলকে প্রধান অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়।[২০০]

---

১৯২ প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭
১৯৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭
১৯৪ মোহাম্মদ আজিজুল হক, অনু: মোস্তফা নূরুল ইসলাম, *বাংলাদেশ মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯ খৃ, পৃ.৪-৬
১৯৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
196 Major Basu, Education in India Under E.I. Company, p.39
১৯৭ মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা* পৃ. ৫৩
১৯৮ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, পৃ. ৫৭
১৯৯ Dr. Sekandar Ali Ibrahimy, *R.On I.E. and M.E. in Bengal, vol.3.p.xiii*
২০০ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, পৃ. ৫৭

এ সময় মাদরাসার সার্বিক ব্যবস্থাপনাকে কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজস্ব বোর্ডের সভাপতিকে সভাপতি রেখে সরকারী ফার্সী অনুবাদক ও সরকারী রিপোর্টারকে সদস্য করে একিট কমিটি গঠিত হয়। মাদরাসার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কমিটি কিছু নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেন।

**কমিটি প্রবর্তিত প্রাথমিক আইন-কানুন**

১. কমিটির সদস্যরা দুই মাস অন্তর একবার মাদরাসা পরিদর্শন করবেন।

২. কমিটি প্রধান অধ্যাপকের কার্যক্রমের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।

৩. প্রধান অধ্যাপককে নিয়োগ ও বরখাস্ত গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল সম্পাদন করবেন। অবশ্য এক্ষেত্রে তার সম্পর্কে প্রচুর অযোগ্যতার প্রমাণ থাকতে হবে।

৪. অন্যান্য শিক্ষকের নিয়োগ এবং বরখাস্ত কমিটির হাতে থাকবে।

৫. সব শিক্ষক অনুশাসনের ব্যাপারে প্রধান অধ্যাপকের অধীনে থাকবেন এবং তাঁর আদেশ মেনে চলবেন।

৬. ছাত্রদের প্রমোশন দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে প্রধান অধ্যাপকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৭. উচ্চতর ক্লাসগুলোর পড়াশোনা প্রধান অধ্যাপকের আওতায় থাকবে।

৮. ছাত্রদের মাঝে শৃংখলা বজায় রাখা এবং শৃংখলার প্রশ্নে কোন ছাত্রের শাস্তি, বৃত্তি বন্ধ অথবা মাদরাসা হতে নাম খারিজ করে দেয়ার সম্পূর্ণ অধিকার প্রধান অধ্যাপকের থাকবে।

৯. মাদরাসার ফিক্‌হ ও ইসলামী বিধান সম্পর্কে শিক্ষার সনদপ্রাপ্ত ছাত্রদের ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালতের চাকুরীতে বহাল করতে হবে।

১০. কোন ছাত্রকেই সাত বছরের বেশি মাদরাসায় পড়াশোনা করতে দেওয়া হবে না।[২০১]

মাদরাসা কর্তৃপক্ষের ১৭৯১ সালের উপরোক্ত বিধি বিধানসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের মধ্যে প্রতিপালনের চেষ্টা চলে পুরোদমে। ১৭৯১ সালের পূর্বের সংস্কার অনুযায়ী পূর্বের কোর্স কারিকুলামকে আরো বর্ধিত করে সপ্তম বর্ষ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এতে নতুন কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা হয়।

১. প্রাকৃতিক দর্শন, ২. নৃতত্ত্ব, ৩. আইনশাস্ত্র, ৪. জ্যোতির্বিদ্যা, ৫. জ্যামিতি, ৬. সাধারণ গণিত, ৭. যুক্তিবিদ্যা, ৮. ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয় নিজামিয়া শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে দেয়া হয়।[২০২] ফলে পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত মাদরাসার অভ্যনতরে আর তেমন কোন গোলযোগ দেখা দেয়নি। কিন্তু মাদরাসার সার্বিক উন্নতির উদ্দেশ্যে একজন সার্বক্ষণিক সেক্রেটারী নিয়োগের জন্য ১৮১১ সালে মাদরাসা কমিটি

201 প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭
202 প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭

সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। উক্ত সুপারিশ পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে আরও দু'বছর কেটে যায়।[২০৩]

১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে দিল্লীর মুঘল বাদশাহর ১৭৬৫ সালের দেওয়ানী চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে এ বিষয়টি বৃটিশ পার্লামেন্টে আলোচনায় আসে। সাথে সাথে ভারতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনা ওঠে। যদিও তা ছিল বৃটিশ উপনিবেশবাদের মূল আদর্শের বিপরীত। ভারতীয় সম্পদে বৃটিশ স্বচ্ছন্দ অর্থাৎ ভারতীয় কাচামালে বৃটিশ কল-কারখানা গড়ে তোলাই ছিল তাদের মূলনীতি।[২০৪] কিন্তু বৃটিশ পালামেন্টে এমন কিছু শিক্ষানুরাগী ছিলেন যাঁরা এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্যও একটি বাজেট অনুমোদন করেন। ১৮১৩ সালের উক্ত ভারতীয় শিক্ষানীতির আওতায় এদেশে শিক্ষা খাতে খরচের প্রায় এক লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়।[২০৫] যদিও শিক্ষা খাতের উক্ত ব্যায়ের পশ্চাতে তাদের একটি গোপন উদ্দেশ্য ছিল, যা আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখবো।

১৮১৩ সালের শিক্ষনীতি ঘোষিত হওয়ার পরপরই লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস পুনরায় পাক-ভারত-বাংলার গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন।[২০৬] কিন্তু এর মধ্যে অনেক ঘটনাই ঘটে যায়। হেস্টিংস মুসলমানদের সাথে বৃটিশের সম্পর্ক উন্নয়ন ও সম্প্রীতির যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাদরাসার কার্যক্রমে মনোনিবেশ করেছিলেন তার অনুপস্থিতিতে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। মাদরাসাকে স্থানীয় সরকারী প্রশাসন সরাসরি খবরদারীর আওতায় নিয়ে আসে।[২০৭] আরও কড়াকড়িভাবে খবরদারী করার জন্য মাদরাসায় একজন সার্বক্ষণিক সেক্রেটারী নিয়োগের সুপারিশসহ অন্যান্য সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্ট হেস্টিংসের দপ্তরে পেশ করা হয়। উক্ত রিপোর্টের বরাতে হেস্টিংস যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তা থেকে মাদরাসা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোভাব এবং হেস্টিংসের উদ্দেশ্য আরো স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

---

203 Dr. A. K. M. Ayyub Ali, *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh*, p.38, The Course of study was: first year- Law and General Literature including Grammar:
Second Year- Law and Arithmatic;
Third Year- Law and Geometry;
Fourth Year- Law and , at the option of the student, Either logic, Rhetoric, metaphysics, Astronomy or Theology;
Fifth year- Law Including the regulations of Governement and any one of the Foregoing subjects which the student might select.
The students of the Sixth and seventh years of the course were apparently on the same lines as those of the fifth year. (*Madrasah Education Committee*)

২০৪ ডা. আবদুল ওয়াহিদ, *উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খৃ, পৃ. ২৪

২০৫ মোহাম্মদ আজিজুল হক, অনুবাদ-মুস্তফা নূরুল ইসলাম, *বাংলাদেশ মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, পৃ.১০

২০৬ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, পৃ. ১০

২০৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭

হেস্টিংস বলেন, "আমি কমিটির প্রস্তাবে একমত। মাদরাসার সংস্কার বিধানের জন্য কমিটি যে প্রস্তাব করেছে তাও যক্তিযুক্ত। কিন্তু তা অত্যন্ত ধীর মন্থর গতিতে করতে হবে। কেননা এতে স্থানীয় জনগণের ভাবাবেগে আঘাত লাগতে পারে। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারেও কমিটি যে প্রস্তাব আনয়ন করেছে তাও গভর্নর অবান্তর বলে উড়িয়ে দিতে চান না। তবে তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য প্রয়াস। কেননা, মুসলমানদের প্রচলিত এ শিক্ষা ব্যবস্থা বহুকাল ধরে চলে এসেছে। এ শিক্ষার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য মুসলমানদের মনপ্রাণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অতএব, এখন এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা ঠিক হবে না। তবে আস্তে আস্তে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার উপকারিতা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের মানসিকাতর উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে, তখন তা কার্যকারী করা কঠিন হবে না"।[২০৮]

কিন্তু হেস্টিংস মুসলমানদের শিক্ষা ও মাদরাসায় প্রশাসনের মান উন্নয়নের উদ্দেশ্য কয়েক বছর ধরে কমিটির সাথে আলাপ-আলোচনার পর ১৮১৯ সালে ক্যাপ্টেন এ্যারোনকে মাদরাসার সার্বক্ষনিক সেক্রেটারী নিয়োগ করলেন। যাতে মাদরাসার সব রকম খবরাখবর কমিটির গোচরীভূত হতে পারে।[২০৯]

মাদরাসা কমিটি ১৮২০ সালে মাদরাসা পরিচালনার বিষয়ে নীতিমালার একটি খসড়া প্রস্তুত করে গভর্নর জেনারেলের কাছে পেশ করেন। গভর্নরের দপ্তর হতে উক্ত খসড়াটি নিম্নলিখিতভাবে অনুমোদন ও কার্যকরী করার জন্য জারি করা হয়।

১. শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহের প্রত্যেক দিন ক্লাস চলবে। মাদরাসার দৈনিক কার্যকাল সকাল ৮ টা হতে বিকাল ২ টা পর্যন্ত চলবে।
২. বিভিন্ন ক্লাসের দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকবে।
৩. লেখাপড়ার উন্নতি সম্পর্কিত তৈমাসিক রিপোর্ট সেক্রেটারীর মাধ্যমে গভর্নর জেনারেলের খিদমতে পেশ করতে হবে।
৪. ভর্তির পূর্বে ছাত্রদের উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য একটি ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।
৫. ভর্তির পর ষান্মাসিক পরীক্ষাও দিতে হবে।
৬. বার্ষিক পরীক্ষা প্রতি বছরের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রদেরকে নগদ পুরস্কারাদি দিতে হবে। এ পুরস্কারের অংক ১২ টাকা হতে ১০০ টাকা পর্যন্ত হবে।
৭. সচ্চরিত্র এবং মিথ্যাচারের ছাত্রদের পুরস্কার বা খেলাত দিতে হবে।
৮. যেসব ছাত্র বিশেষ সম্মানের সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, যোগ্যতানুযায়ী তাদের সরকারী চাকুরীতে বহাল করতে হবে।

২০৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০
২০৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০

৯. কোন ছাত্রই দুই মাসের অধিক অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

১০. ভর্তির জন্য ছাত্রদের লিখিত দরখাস্ত করতে হবে।

১১. কোন ছাত্রই ২৮ বছর বয়স প্রাপ্তির পর আর মাদরাসায় পড়াশোনা করতে পারবে না।[২১০]

উপরোক্ত নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়ের সাথে মাদরাসার নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষার বিষয়ও বড় হয়ে দেখা দেয়। ইতিপূর্বে মাদরাসা শিক্ষায় বিধিবদ্ধ পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার প্রচলন ছিল না। কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর পরীক্ষার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। ছাত্রদের মেধা যাচাইয়ের জন্য পূর্ব হতেই গুরুনির্ভর একজাতীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো। সে পরীক্ষা ছিল শ্রেণী শিক্ষক বা কখনও প্রধান শিক্ষকের সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকটা বিষয়ের পৃথক পৃথকভাবে তুলাদন্ডে ওজন করে পরীক্ষা গ্রহণ করার প্রচলন ছিল না। আধুনিক কালের মত সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বাৎসরিক এরূপ কোন পরীক্ষা হতো না। পরীক্ষার জন্য সময়গুণে দিনক্ষণ নির্ধারিত হতো না। তখন নির্দিষ্ট পুস্তকাদি পড়া শেষ হলে শিক্ষক নিজেই ব্যাক্তিগতভাবে নিজস্ব কায়দায় পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। শিক্ষক যদি মনে করতেন ছাত্রটির লেখাপড়ায় ত্রুটি নেই, সে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করেছে- এমনকি অপরকেও শিক্ষা দেওয়ার মত যোগ্যতা হাসিল করেছে, তখনই তাকে পরীক্ষা পাসের সনদ প্রদান করা হতো। অধিকন্তু যে ছাত্রকে পরীক্ষায় পাসের অনুপযুক্ত মনে করা হতো, তাকে কোন মতেই পাসের সনদ দেওয়া হতো না। যে বিষয়ে দুর্বলতা রয়েছে সে বিষয়ে তাকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য উপদেশ দেয়া হতো। সেকালে যোগ্যতা অর্জন ছাড়াই কোন ছাত্র অহেতুক পাস করার ভাবাবেগ প্রকাশ করত না। যত দিন পর্যন্ত নিজ শিক্ষক তারদ জ্ঞানার্জন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পোষণ না করতেন, ততদিন ছাত্রকে অবিরাম পরিশ্রম করতে হতো।[২১১]

পরীক্ষার এ সনাতন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছাত্র-শিক্ষকদের উপর সরকার আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ছাত্র-শিক্ষক উভয় দিক থেকেই বিরোধতা শুরু হয়। তবুও সরকার প্রস্তাবিত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সবরকম আয়োজন করলেন।[২১২]

১৮২১ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে আলিয়া মাদরাসার প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২য় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৮২২ সালের ৬ই জুন। শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ পরীক্ষার হল পরিদর্শণ করেন। পরীক্ষার এ পদ্ধতি অদ্যাবদি চালু আছে।[২১৩]

১৮২০ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়। ১৮১৯-২০ অর্থ বছরের উদ্বৃত ৭ হাজার টাকা দিয়ে প্রথমে কিছু কিতাবাদি ক্রয় করে লাইব্রেরী উদ্বোধন করা হয়। এরপর

---

২১০ Revenue consultation Dt, 27-10-1812, p.2

২১১ জিয়াউদ্দীন, *নেজামে ইমতেসান*, মুসলিম ইন্সটিটিউট জার্নাল ১ম খন্ড, কলকাতা, পৃ. ৩০৪

২১২ আবদুল হক ফরিদী, *মাদরাসা শিক্ষা*, বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ ইং, পৃ. ৩৮

২১৩ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, পৃ. ৬৪

প্রতি বছর ৪ শ ৮০ টাকা লাইব্রেরীর কিতাব ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ করা হতো। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত এ নিয়ম প্রচলিত ছিল। লাইব্রেরীর এ বরাদ্দ ১৯০৫ সালে ৬শ, ১৯০৭ সালে তা বার্ষিক এক হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছিল।[২১৪]

১৮২৪ সালের ১৫ জুলাই কলঙ্গ নামক (বর্তমানে ওয়েলসী স্ট্রীট) মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মাদরাসার নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই নতুন ভবন নির্মাণে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৫শ ৬ টাকা খরচ করা হয়। ১৮২৭ সালের আগস্ট মাসে মাদরাসার এই নতুন ভবন কলকাতা আলিয়া মাদরাসার উন্নয়নের জন্য একটি বাস্তব পদক্ষেপ।[২১৫] কেননা মাদরাসার পুরনো ভবনটি ছিল কলকাতার বউ বাজার এলাকার একটি খ্রীস্টান মিশনের পাশে এবং মাদরাসার আশেপাশে বহু নিষিদ্ধ পরিবেশ বিরাজিত ছিল। নতুন ভবন তৈরি করায় মাদরাসাটি একটি মনোরম পরিবেশে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়।[২১৬]

## ২.২.২ আলিয়া মাদরাসায় ইংরেজি ভীতি

একের পর এক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে ইস্ট ইন্ডয়া কোম্পানীর মাধ্যমে ইংরেজ জাতি মুসলমান শাসিত পাক-ভারত-বাংলা শাসন-শোষণের উদ্দেশ্য গ্রাস করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিল। তাদের একের পর এক চুক্তি ভঙ্গ, নতুন নতুন কৌশল, ষড়যন্ত্র, ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠী-সম্প্রদায়কে নানা কৌশলে দিল্লীর মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে উসকে দেয়া এবং এভাবেই একের পর এক রাজ্য নিজেদের প্রশাসনের আয়ত্তে আনার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার কারণে এদেশের মুসলমানরা ইংরেজদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি।[২১৭] যদিও তারা মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতির জন্য কলকাতা আলিয়া মাদরাসা স্থাপন করেছিল। তথাপি এ মাদরাসা নিয়ে তাদের অহেতুক নাকগলানো এবং তদারকি মুসলমানদের মনস্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল।[২১৮]

এদিকে দীর্ঘ পাঁচশ বছর যাবত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও উন্নয়নের জন্য মুসলিম শাসকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত লাখেরাজ সম্পত্তি ১৭৯৩ সালে ডিক্রি জারির মাধ্যমে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ায় সমগ্র বাংলার প্রায় ১ লক্ষ প্রাথমিক মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা এক অচলায়তনে পরিণত হয়। তখন কলকাতা আলিয়া মাদরাসাই ছিল বাংলাদেশের মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার একমাত্র বিদ্যাপীঠ। ইতিমধ্যেই রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি শিক্ষার জন্য ‘কলকাতা এ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলেজ’

২১৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯
২১৫ মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশ মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা* পৃ.১২
২১৬ চার্লস লুলিংটন, *স্থাপত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৪০
২১৭ ডা. আবদুল ওয়াহিদ, *উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান*, পৃ.৩৯
২১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

নামে একটি পাবলিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের অন্যান্য স্থানেও ইংরেজি শিক্ষার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষাগত ও কাঠামোগত শিক্ষাক্রমের পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা খ্রীষ্টকরণের এক চক্রান্ত প্রতিফলিত হয় ১৮৩১ সালের শিক্ষা কমিটির রিপোর্টে। উক্ত রিপোর্টের মাধ্যমে তারা এদেশে নব প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহকে তাদের খ্রীস্ট ধর্মীয় প্রচার এবং প্রক্রিয়াগত সাফল্য তুলে ধরেন। এতে তারা আরও আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এ প্রজন্মে যাই হোক, পরবর্তী প্রজন্মে এদেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি খ্রীস্ট ধর্মের প্রতি আরও আকৃষ্ট হবে।[২১৯]

আলিয়া মাদরাসা নতুন ভবনে স্থানান্তরের পর আসলে সরকারীভাবে এর মান উন্নয়নের তেম কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। বরং প্রশাসনে ইংরেজ শিক্ষানুরাগীরা তাদের ভারতীয় শিক্ষার প্রতি দরসের পাশাপাশি খ্রস্ট ধর্ম প্রচারের একটি কূট কৌশলের আশ্রয় নেয়। তাদের একটি বিবরণীতে বলা হয়, ভারতীয়দের উৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সবরকম উপকরণ ও উপাদানের বন্দোবস্ত করতে হবে। তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং ধর্মীয় উন্নতির জন্য যারা এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করার জন্য ভারতে অবস্থান করতে চায় তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করতে হবে। [২২০] মূলত তদানীন্তন বৃটেন ছিল খ্রীস্ট ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। মি.এইচ হোল বলেন, সেকালে ইংল্যান্ডের শিক্ষা ছিল নামে মাত্র এবং তাও ধর্মীয় লোকেরা শিক্ষা দিতেন, যা সর্বতোভাবে ধর্ম সংক্রান্ত ছিল। যারা তখন শিক্ষা লাভ করতো তাদের উদ্দেশ্যও ছিল ধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করা।[২২১]

তারা এদেশে খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার এবং সেজন্য ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করল। তাদের ধারণা খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে ইংরেজি বিশেষ সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। ফলে ১৮২৬ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের নির্দেশক্রমে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় একটি ইংরেজি ক্লাস চালু করা হয়। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মানসিকতায় এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করা যাতে তারা আপন ঐতিহ্য এবং কালচার মিথ্যা বলে মনে করে।[২২২]

অথচ ভারতীয় মুসলমানরা তাদের বিপরীত চিন্তা করতো। তারা তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ইংরেজদের সব সময়ই সন্দেহের চোখে দেখতো। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলে যত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাই বলা হোক, ইংরেজি শিক্ষার নামে মুসলমানদের কৃষ্টি-কালচার বিনষ্ট না হয় এ বিষয়ে তারা অত্যন্ত সচেতন ছিল।[২২৩]

২১৯ Syeed Mohammad, *History of English Education*, P.35
২২০ H.Hole, *English National Education,* p.12
২২১ H.Hole, *English National Education,* p.12
২২২ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, পৃ. ৭৩
২২৩ আবদুল হক ফরিদী, *মাদরাসা শিক্ষা*, বাংলাদেশ, পৃ.৪০

ভারতীয় মুসলমানদের এই চিন্তা আরও ঘনীভূত হলো মি. চার্লস গ্রান্টের লিখিত কিছু নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর। তিনি তার লেখায় ভারতীয়দের ঢালাওভাবে চোর, ডাকাত, বর্বর এবং মুসলমানদের অহমিকাপ্রিয়, সংকীর্ণমনা এবং নিজ ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি প্রথমে হিন্দুদের মূর্তি পূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেন, যাতে মাটির তৈরি প্রতিমার উপসনা বন্ধ হয়ে যায়। মি. গ্রান্টের ধর্ম প্রচার ও ইংরেজি শিক্ষার পরিকল্পনায় মুসলমানদের তেমন সরাসরি আক্রোশমূলক মন্তব্য করা হয়নি। মি. গ্রান্টের পরিকল্পনা প্রথমে ব্যর্থ হলেও ১৭৯৪ সালে কোম্পানীর ডিরেক্টর এবং ১৮০২ সালে পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার পর তিনি ভারতে খৃস্ট ধর্ম প্রচার এবং পাদরীদের ভারতে আসতে দেওয়ার বিষয় বৃটিশ পার্লামেন্টে অনুমোদন লাভে সমর্থ হন। এর ফলে ১৮১৩ সালের ভারতীয় শিক্ষানীতি পাস হয় এবং উক্ত শিক্ষানীতিতে ভারতে খরচের জন্য অনুমোদিত এক লক্ষ টাকা হতে খরচের ব্যাপারে সংস্কৃত পণ্ডিত এবং সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমকে বেশি সহায়তা দানের কথা বলা হয়। অথচ মাদরাসার কথা কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। এখানেই ইংরেজদের ছলচাতুরী প্রতীয়মান হয়।[২২৪]

অতঃপর কলকাতার সদ্য খৃস্ট ধর্ম অবলম্বনকারী ও 'ব্রহ্ম সমাজ' নামে খ্যাত মতবাদের প্রবক্তা রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ইংরেজদের আনুকূল্য লাভের আশায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারকল্পে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলেজ নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন।[২২৫] এর পর পরই কেরী নামক জনৈক পাদ্রী ১৮১৮ সালে বেনারসে আরেকটি কলেজ স্থাপন করেন। ১৮২১ সালে পুনরায় হিন্দু কলেজ, ১৮২৩ সালে আগ্রায় আরেকটি কলেজ স্থাপিত হয়। এসব কলেজে পুরোপুরি ইংরেজি শিক্ষা দেয়া হতো।[২২৬]

ইংরেজদের শিক্ষানীতির এ পর্যায়ে তারা মুসলমানদের পুরনো ঐতিহ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা আলিয়া মাদরাসার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করল। ১৮২৬ সালে মাদরাসায় ইংরেজি পড়ানো শুরু হয়। ১৮১৭ সালে হাজী মুহাম্মদ মহসীনের দানের অর্থ দিয়ে হুগলীতে মুসলমান অভিভাবকগণ ছাত্রদের ইংরেজি পড়তে নিরুৎসাহিত করে।[২২৭]

এদিকে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমান ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ছাত্র বৃত্তি, লোভনীয় চাকুরীর কথা প্রচার করতে থাকে। ইংরেজি শিক্ষার জন্য সরকার বিশেষ আর্থিক সুবিধা রাখা সত্ত্বেও মাদরাসার ছাত্ররা তা বর্জন করে। অবশেষে মাদরাসা হতে ফিক্‌হ বিষয় বাদ দিয়ে তার স্থলে উর্দু, আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের একটি অতিরিক্ত বিষয় সংযোজনের কথা চিন্তা করা হয়। অথবা

---

২২৪ মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, পৃ. ১৩

২২৫ Abdul Karim, *Mohammadan Education in Bengal*, Writen in 1900 for Ulamma and Education Conference. p.2

২২৬ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, পৃ.৭৮

২২৭ Nawab Abdul Latifs reprot on Hoogly Madrasah, 1961. p.13

উর্দু ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাও চিন্তা করে, যাতে ক্রমান্বয়ে মাদরাসা শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নেয়া যায়।[২২৮] কুরআন সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের ব্যবহারিক বিধি-বিধান জানতে না পারলে এ শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার সুফলই বয়ে আনবে। ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে কিছু অন্ধত্ব জন্ম নেবে। নবীন শিক্ষিতরা তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করবে।

মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনীর ( হেস্টিংস ব্যতীত) প্রতিনিধিরা সদিচ্ছা প্রদর্শন করতে পারেনি। তারা মুসলমানদের শিক্ষা ও কৃষ্টি-কালচারকে বাঁকা চোখে দেখত। মুসলমানরা শিক্ষা, রাজশক্তি কোন দিক থেকেই যেন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে তার জন্য সব সময়ই একটি কৌশল অবলম্বন করতো। ফলে তাদের সবরকম সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ডে মুসলমানরা বাধার সৃষ্টি করত। ইংরেজরা মনে করত, মুসলমানরা যদি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইংরেজি শিখে তবে তারা উন্নত জাতিতে পরিণত হবে। আর মুসলমানরা ভাবত, সুচতুর ইংরেজদের চালাকির জালে পড়ে রাজ্য, সম্মান, ধন-সম্পদ সবই গেছে। পুনরায় তাদের ফাঁদে পা দিলে জানি কোন বিপদ হয়। মুসলমানদের শেষ অবলম্বন কৃষ্টি-কালচার টুকু যদি শেষ হয়ে যায়! এমনি একটি ইতিহাস অনুসৃত চিন্তা-চেতনা মুসলমানদের আচ্ছন্ন করে রাখে। ফলে ১৮২৬ সাল থেকে ১৮৫১ পর্যন্ত কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ইংরেজির ক্লাস চালু থাকলেও এই পঁচিশ বছরে মাত্র ১৭৮৭ জন ছাত্র ইংরেজি শিক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন।[২২৯]

আসলে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার মত একটি ক্ষুদ্রায়তন মুসলিম প্রতিষ্ঠানের ক'জন ছাত্র ইংরেজি বর্জন করলেও তখন অনেক প্রতিষ্ঠানে এবং পুরো হিন্দু জনগোষ্ঠী ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গেছে। যারা ইংরেজি শিক্ষায় পারদর্শী তারা সরকারী উচ্চ পর্যায়ে চাকুরী পাচ্ছে। এদের দেখাদেখি মাদরাসার বাইরে ইংরেজির কদর বেড়েই চলেছে। ফলে সময় বুঝেই ১৮২৯ সালের ২৬ জুন ভারতীয় শিক্ষা কাউন্সিলের ইংরেজি শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করে এই বলে যে, যতদিন সরকারী কাজের ভাষা ইংরেজি না হবে ততদিন ইংরেজি ভাষা যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে না। এছাড়া যারা ইংরেজি পড়ছে তাদেরও যথার্থ মর্যাদা দেয়া হবে না। কাজেই আগামী তিন বছর পর সরকারী দপ্তরের কাজকর্ম ইংরেজিতে সম্পন্ন করতে হবে।[২৩০]

ইংরেজি প্রবর্তকদের ধারণা ছিল এদেশের ইংরেজি শিক্ষিতরা ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে উন্নত জীবন যাপনের প্রতি আকৃষ্ট হবে। দ্বিতীয়ত ইংরেজি সাহিত্য যেমন মিল্টন, বেকন, এডিসন, জনসন, প্রমুখ ইংরেজ লেখকের খ্রীস্ট ধর্মের আদলে লেখা সাহিত্য যাতে এদেশের ইংরেজি শিক্ষিতরা তার সাথে পরিচিত হয়, এসব লেখকের বই-পুস্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীতে রাখা হবে। আর ইংরেজি

---

২২৮ W.W. Hunter, *Our Indian Muslman*, p.204

229 Report of the moslem Education Advisory Committee, 1934. p.5

230 Syeed Mahmud, *History of English Education*, p.78

শিক্ষিতরা তাদের ভাষা শিখানোর জন্য সেগুলো অধ্যয়ন করতে বাধ্য হবে। এদিকে সাধারণ স্কুল-কলেজে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদলে ইসলামী বিষয় এবং হিন্দু ধর্মের লেখাপড়াও বাদ দেয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার অন্তরালে খ্রীস্ট ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়াবলী ঠিকই বহাল থাকে।[২৩১]

এতদিন সরকারী প্রশাসনে ভাষা ফার্সী থাকায় মুসলমান শিক্ষিত সমাজ চাকুরী বাকুরীকেই পেশা হিসেবে বেছে নিত। পাশাপাশি হিন্দুরা ইংরেজদের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যেও অনেক উন্নতি করে। এদিকে কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষাও ছিল ইংরেজি। প্রশাসনের ভাষা ইংরেজি হওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে ফার্সী ভবিষ্যতহীন হয়ে পড়ে।[২৩২] ১৮৩০ সালের এক ফরমানে বলা হয়, অফিস-আদালতে ক্রমান্বয়ে ইংরেজি ভাষা ফার্সীর স্থালাভিষিক্ত হবে। ১৮৩৫ সালে আরও এক ফরমানে বলা হয়, একমাত্র ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেয়া হবে। ১৮৩৭ সালের ফরমানে বলা হয়, অফিস-আদালতে ফার্সী লেখা চলবে না। অফিস আদালতের নথিপত্রের ভাষা ইংরেজিতে লিখতে হবে। অথবা আঞ্চলিক ভাষায় লিখতে হবে। এতে মুসলমানার ছাড়া অন্যরা ইংরেজিকে স্বাগত জানায়। মুসলিম আমলে যেমন হিন্দুরা ফার্সীতেও অনেক অগ্রসর হয়েছিল, এখন হিন্দুরা ইংরেজিতেও তেমনি এগিয়ে চলার নীতি অবলম্বন করে। মুসলমানরা যুগের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়।[২৩৩] কিন্তু তাতে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থী কমেনি। মুসলমানেরা রাজ আনুকূল্য লাভের চেষ্টা না করে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্যকে লালন করেছে। এতে মুসলমানদের প্রতি মৌলবাদী খ্রীস্টানদের বৈরী ভাব এবং খ্রীস্ট ধর্মের ধর্মান্তরকরণের প্রপাগান্ডা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

১৮৩৫ সালের ২রা জুন স্যার চার্লস ট্রাভলেনের একটি রিপোর্ট হতে জানা যায়, "আমার মতে যেমন স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত রয়েছে সেগুলোতে প্রচুর পরিমাণ আর্থিক সাহায্য করা উচিত। আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এমন দিন কোন সময়ই আসবে না, যখন সরকারী কলেজসমূহেও খ্রীস্ট ধর্ম চালু করা যাবে না। আমার মতে এমন উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যা দেখে লোকেরা সহজেই আকৃষ্ট হবে। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, খ্রীস্ট ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া কোন শিক্ষাই পরিপক্ব এবং সুসম্পন্ন নয়। ভারতের একটি অংশ যখন সুশিক্ষিত হবে, তখন আমাদের উচিত হবে খ্রীস্ট ধর্মের শিক্ষা চালু করা। কিন্তু আমাদের এ ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কোনরকম অসন্তোষ না জাগে। কলকাতা হতে  বিদায় গ্রহণের পূর্বে আমি খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণকারী এ দেশের উচ্চ শিক্ষিত এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি করেছিলাম। এসব ব্যক্তি হিন্দু কলেজে পড়াশোনা করতো। খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারের মূলে এদের প্রচুর সাধনা

২৩১ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮
232 M.Fazlur Rahman, *The Bengali Muslims and English Education*, p.95
২৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮

ও সহযোগিতা রয়েছে। এদের কিভাবে খ্রীস্টান করতে হবে, লোকেরা তার কোন ফন্দিই জানে না। আমার তো বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যেমন সবাই গোত্রবন্ধী হয়ে খ্রীস্টান হয়েছেন, এখানকার লোকেরাও পাদ্রীদের দ্বারা এবং প্রত্যক্ষভাবে বই-পুস্তক পত্র-পত্রিকা এবং ইংরেজদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মেলামেশার দ্বারা খ্রীস্ট ধর্মের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।" [২৩৪]

বৃটিশ বাংলায় এদেশের মুসলমানদের অবমাননাকর এবং বিপর্যয়কর যে স্মৃতি ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় নিম্ন লিখিত কারণে এদেশের মুসলমান ও ইংরেজদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল ঃ

১. মুসলমানদের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নেয়ায় ইংরেজদের সব সময় তারা সন্দেহের চোখে দেখে।
২. ইংরেজদের রাজ্য বিস্তারে অব্যাহত কূটকৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতা।
৩. শিক্ষা বলতে ইংরেজরা যেমন খ্রীস্ট ধর্মের জ্ঞানার্জনকে বুঝত, তেমনি মুসলমানরাও শিক্ষা বলতে ইসলাম ধর্মের জ্ঞানার্জনকে বুঝতো।
৪. ইংরেজরা ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে খ্রীস্ট ধর্মকে জানার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিল। তাদের সেই পরিকল্পনা তাদের বিভিন্ন লেখার মাধ্যম থেকে মুসলমানরা সহজেই জেনে গিয়েছিল।
৫. ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের অভাব ছিল। কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ইংরেজি পড়ানোর জন্য যে শিক্ষক ছিলেন, তার চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে শিক্ষার্থীরা তাকে ঘৃণা করত।
৬. মুসলমানরা মনে করত অতীতে আরবী ফার্সী শিক্ষা সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি ও আবিষ্কারে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তারা তাদের সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়েই উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা করেছিল।
৭. বাংলার মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে তখনও শুধু দেব-দেবীর পূজা ও কিস্সা-কাহিনীতে পূর্ণ ছিল। মুসলমানদের ঐতিহ্যের আলোকে কোন সাহিত্য তখনও বাংলা ভাষায় গড়ে ওঠেনি।
৮. বৃটিশ শাসনের অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানদের দারিদ্র-পীড়িত নিরীহ শ্রেণীতে পরিণত করেছিল। আর ইংরেজি শিক্ষা ব্যয়বহুল হওয়ায় তাদের পক্ষে সেই লোভনীয় সোনার হরিণ পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল।
৯. মুসলমানদের দু'চার জন যারা ইংরেজদের অধীনে চাকুরীতে ছিল, তাদের সাথে ইংরেজদের বিমাতাসুলভ আচরণ সবাইকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল।

২৩৪ Syeed Mahmud, *History of English Education in India*, p.67

১০. ইংরেজদের সাথে তাল মিলিয়ে হিন্দুরাও মুসলমানদের উত্ত্যক্ত করতো। আর মুসলমানের শূণ্য স্থানে হিন্দুরা জায়গা করে নিত। মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি ইংরেজদের কর্তব্য ছিল দায়সারা গোছের ও লোক দেখানো মাত্র।[২৩৫]

এভাবেই ধীরে ধীরে বৃটিশ বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন জীবিকা পিছিয়ে পড়ে। এমনকি ১৮৪৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া সরকার কর্তৃক ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের সরকারী চাকুরীতে প্রাধান্য দেয়ার উপর সার্কুলার প্রচার করা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি।[২৩৬]

এদিকে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও আলিম সমাজের ফতোয়া অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ বিরোধী জিহাদ চলছিল। কিন্তু সেই অপরাধে বাঙ্গালি মুসলমানদের অবজ্ঞা অবহেলা আর বঞ্চনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা ঠিক হয়নি। সেদিন ইংরেজরা যদি বিমাতাসুলভ আচরণ না করে নিরপেক্ষভাবে এদেশের মুসলমানদের সব ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতো, তাহলে এদেশের রাজনীতি-অর্থনীতির ইতিহাস হয়তো ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতো। আজকের ইংরেজ জাতি যত মানবতার বুলিই আওড়াক, পৃথিবীর দেশে দেশে তাদের অতীদের অপকীর্তি ইতিহাস থেকে মুছে যাবার নয়। সুদূর অতীত হলেও এদেশের মুসলমানদের সাথে ইংরেজদের সেই অপকীর্তির জন্য ইতিহাসের আলোকে ক্ষমা চাওয়া উচিত। কিন্তু এদেশের মুসলমানরা কি সেসব অতীত ইতিহাস মনে রেখে ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করছে? না এদেশের মুসলমানরা সেই জঘন্য ইতিহাসের কিছুই মনে রাখেনি। মনে রাখেনি তাদের ইসলামী শিক্ষার উদারতার কারণেই। যেই মাদরাসা শিক্ষা বা ইসলামিক শিক্ষাকে তাদের রাজত্বের বিপরীতে শত্রু মনে করেছিল; সেই শিক্ষার গুণেই ইংরেজ অইংরেজ সবাই মুসলমানদের বন্ধু।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ঃ

মাদরাসা শিক্ষা ধারার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সাধারণ শিক্ষা ধারার সাথে বৈষম্যপূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। বর্তমানে জুনিয়র দাখিল (JDC), দাখিল ও আলিম স্তরের সকল দায় দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড।  সাধারণ শিক্ষা ধারার এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি স্তরের সাথে মাদরাসা শিক্ষা ধারায় যথাক্রমে দাখিল ও আলিম স্তরকে ১৯৮৫ খ্রি. সম্মান প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া প্রতিষ্ঠার পর ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষাধারা নতুন করে সাজানো হয়। ফাযিলকে স্নাতকের

২৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭
২৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭

মান, যা ৩ বছর মেয়াদী কোর্স ও কামিলকে স্নাতকোত্তর যা ২ বছর মেয়াদী কোর্স করা হয়। ২০০৮ খ্রি. হতে ফাযিল ও কামিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার সাথে যুক্ত হয়।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে তিনটি আলিয়া মাদরাসা। যথা: মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা, সরকারী আলিয়া মাদরাসা সিলেট ও বগুড়া মুসতাফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করা হলো। সে সাথে বেসরকারী পর্যায়ের কয়েকটি মাদরাসারও আলোচনা পেশ করা হলো, যাতে দেশের ইসলামী শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়।

### ২.৩.১ মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা :

ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে মাদরাসা আলিয়া বাংলাদেশের প্রাচীনতম মাদরাসা। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৮০ খৃ.। বৃটিশ রাজত্বকালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এ মাদরাসা। এ দেশের কতিপয় মুসলিম মনীষীর বিশেষ উদ্যোগে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমে (১৭৮১ খৃ.) কলকাতার বৌ বাজারে এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এলাকাটি হিন্দু অধ্যুষিত হওয়ায় ১৮২৪ খৃ. ওয়ালেসলী স্ট্রীটে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ৩৮ বছর (১৭৮১-১৮১৯ খৃ.) পর্যন্ত মাদরাসা ইংরেজ সেক্রেটারী মুসলমান সহকারী সেক্রেটারী দ্বারা পরিচালিত হয়। কলকাতায় মাদরাসার ছাত্রদের আবাসিক সুবিধার জন্য ১৮৯৬ খৃ. ইলিয়ট হোস্টেল নামে একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কলকাতায় থাকাকালে মাদরাসার জন্য মাদরাসা মহল নামে একটি ভূ-সম্পত্তি খরিদ করা হয়। ইংরেজ শাসক লর্ড হেস্টিংস এ মাদরাসার ব্যয় নির্বাহ ও ভৌত অবকাঠামোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। ফলে তৎকালীন সময়ে এই মাদরাসা বিরাট লাইব্রেরী ও গৃহ আসবাবপত্র সহকারে ইসলামী শিক্ষার বৃহদাকারের মাদরাসা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পাক-ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭ খৃ. মাদরাসাটি ঢাকা স্থানান্তরিত হয়। তখন মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন বিশিষ্ট আলিম ও ইসলামী শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর মাওলানা মোহাম্মদ জিয়াউল হক। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে মাদরাসাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে মাদরাসা ও লাইব্রেরীর যাবতীয় আসবাবপত্র সহ ১৯৪৯ খৃ. ঢাকার সদর ঘাটস্থ বর্তমান লক্ষীবাজারের মুসলিম হাইস্কুলের ডাফরীন হলে এর কার্যক্রম শুরু করে।

এরপর ঢাকার বখশী বাজারে ১৯৫৬ খৃ. মাদরাসার জন্য প্রয়োজনীয় জমি খরিদ করে ১৯৫৮ খৃ. তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান মাদরাসা ভবন ও ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। ১৯৬০ খৃ. নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর মাদরাসা স্থায়ীভাবে বখশী বাজারে (বর্তমান স্থানে) স্থানান্তরিত হয়।

'মমতাজুল মোহাদ্দেছীন'[২৩৭] তাফসীর ও ফিকহ নামে বিভাগ চালু করা হয়। মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার জন্য ১৮৪১ খৃ. পর্যন্ত (কলকাতায় থাকা কালে) অধ্যক্ষের কোন পদবী ছিলনা। সদরুল মুহাদ্দেসীন (হেড মাওলানা) দ্বারা মাদরাসা পরিচালনা করা হতো। প্রশাসনিক দিক দেখতেন সরকারী কোন কর্মকর্তা। সর্বপ্রথম ইংরেজ অধ্যক্ষ ড. স্প্রেঙ্গারসহ এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেক বিশিষ্ট মুসলিম মনীষী এর অধ্যক্ষ পদ অলংকিত করেন। অধ্যক্ষ হিসেবে যারা এখানে (ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর) দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা শাফী, হুজ্জাতুল ইসলাম আনসারী (১৯৪৭-১৯৪৯ খৃ.), মাওলানা মুফতী আমিমুল ইহসান, আল্লামা আবদুর রহমান কাশগড়ী,[২৩৮] মাওলানা আহমদ হোসাইন চৌধুরী,মোঃ আবদুল বারী, মাওলানা উবায়দুল হক, মাওলানা মাহবুবুল হক, মাওলানা ইউনুস শিকদার প্রমুখ।

বাংলাদেশের খ্যাতনামা ও বিশিষ্ট 'আলেম দ্বীনগণ এ মাদরাসার অধ্যাপনা সহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এ সাথে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় বিশ্বের বরেণ্য ও স্বনামধন্য বহু ছাত্র লেখাপড়া করেছেন। মাওলানা আকরাম খাঁ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মুফতী আমিমুল ইহসান, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মুহাম্মদ হোসাইন জালালাবাদী, শাহ আজিজুর রহমান, আব্দুর রহমান বিশ্বাস, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীদের মত আরো বহু প্রথিতযশা আলিম ও শিক্ষাবিদগণ এ মাদরাসারই ছাত্র।

---

২৩৭ মমতাজুল মোহাদ্দেছীন ঃ দুটি আরবী শব্দ। এর বাংলা অর্থ হাদীস বিশারদগণের অন্যতম। কলিকাতা আলীয়া মাদরাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারীদেরকে এ উপাধী দেয়া হতো। সংক্ষেপে ইংরেজিতে এম, এ ডিগ্রী লেখার প্রচলন এখনও দেখা যায়। বর্তমানে একেই কামিল ডিগ্রী বলা হয়। অবশ্য হাদীস বিভাগের ডিগ্রীধারীদের এখনও এ উপাধীতে ভূষিত করা হয়।

২৩৮ আবদুর রহমান কাশগড়ী (র:) ঃ ১৯১২ খৃ. ১৫ সেপ্টেম্বর তুর্কীস্থানের রাজধানী কাশগড়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য বয়সেই তিনি যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২২ খৃ. দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায়ে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি ১৯৩১ খৃস্টাব্দে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। আবার এখানেই অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ খৃ. কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৬৯ খৃ. তিনি হেড মাওলানা পদে অধিষ্টিত হন। ১৯৭১ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি জ্ঞানের মহান সাধাক ছিলেন। আরবী ও ফার্সী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে আল হাদীকা, আয-যাহরাত, আল মুফীদ (অভিধান-আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজি), মেহকুন নুকাহ অন্যতম। তাঁর স্মৃতিকে অম্লান করার জন্যই মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকার ছাত্রাবাসের নাম করণ করা হয়েছে আল্লামা কাশগড়ী হল'-[আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দেয়া তথ্যের আলোকে]।

## মাদরাসার স্থাপনাঃ

মাদরাসার বর্তমানে ১টি বিজ্ঞান ভবন, মিলনায়তন, মাদরাসা ভবন, ছাত্র সংসদ কক্ষ, ছাত্রাবাস ভবন, বিরাটাকারের লাইব্রেরী রয়েছে। এক সময় আলিয়া মাদরাসার লাইব্রেরী এশিয়া মহাদেশের অন্যতম লাইব্রেরী ছিল। তথ্য মতে প্রায় ৩০ হাজার মূল্যবান বইও রয়েছে। যে বইয়ের মধ্যে দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বইও রয়েছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, লাইব্রেরীটির যথার্থ তত্ত্বাবধানের অভাবে ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে।

## ছাত্রাবাসঃ

মাদরাসার প্রায় চার সহস্রাধিক ছাত্রের জন্য একটি দ্বিতল ভবন রয়েছে। সম্প্রতি এ ছাত্রবাসকে 'আল্লামা কাশগড়ী (র.) হল' নামে নামকরণ করা হয়েছে। ছাত্রাবাসটিতে ২৭৭টি সীট রয়েছে। আবাসিক চাহিদার তুলনায় ছাত্রাবাসের সংস্থান অপ্রতুল।[২৩৯]

## দুইশত'তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন :

১৯৮০ খৃ. অক্টোবরে এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠের বয়স দুইশত বর্ষ পূর্ণ হয়। তখন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন জনাব মাওলানা ইয়াকুব শরীফ। সরকারীভাবে মাদরাসার দুইশত'তম সমাবর্তন উদযাপনের জন্য ব্যাপক আয়োজনের মাধ্যমে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক-ছাত্রদের সহায়তায় অত্যন্ত ভাব-গম্ভীরভাবে উদ্‌যাপিত হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব শাহ আজিজুর রহমান (কলকাতা মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে) কে সভাপতি ও অধ্যক্ষ মাওলানা ইয়াকুব শরীফকে সদ্য সচিব করে শক্তি শালী উদ্‌যাপন কমিটি গঠন করা হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উপপ্রধান পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করা হয়। মাওলানা নুরু রহমান এমপি, মাওলানা নুর মোহাম্মদ, মাওলানা মাহবুবুল হক, মাওলানা আবদুর রহীম এমপি, উদ্‌যাপন কমিটির কার্যক্রমে সক্রিয় অবদান রাখেন। উল্লেখ্য তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর ব্যাক্তিগত তহবিল থেকে উদ্‌যাপন ব্যয় নির্বাহের জন্য তিন লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এবং সম্মেলনের সকল ব্যয় সরকারী ভাবে নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন। উদ্বোধনী সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথি হিসেবে এবং মন্ত্রীবর্গ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন উপলক্ষ্যে বিদেশী অনেক অতিথি উপস্থিত হন। এ উপলক্ষ্যে মাদরাসার কক্ষ সম্প্রসারণ, টয়লেট আধুনিকীকরণ সহ যাবতীয় দিককে সমৃদ্ধ করা হয়। সম্মেলনে লাইব্রেরীর বই

---

২৩৯ আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ কর্তৃক দেওয়া তথ্যের আলোকে।

দ্বারা সপ্তাহ ব্যাপী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকায় জাতীয় দৈনিকগুলো ক্রোড়পত্র ও বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করে।

এ উপলক্ষ্যে বেশ কয়েকটি স্মরণিকা, সাময়িকী ও বই প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস নামে একটি বই প্রকাশ করে। মাদরাসার গবেষণাগার থেকে মাওলানা আবদুস সাত্তার কর্তৃক লিখিত "তারীখে মাদরাসা-ই-আলিয়া" নামে অপর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া সম্মেলন কমিটি কর্তৃক নিম্ন লিখিত স্মারক প্রকাশিত হয়।[২৪০]

১.মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা : অতীত ও বর্তমান (১৭৮০-১৯৮০) স্মরণিকা (বাংলায়)
২. মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, দুইশত বর্ষ স্মরণে আন্তর্জাতিক সেমিনার ও মহাসম্মেলন (বাংলা ও আরবীতে)।
৩. Madrasah-I-Alia Dacca, Past and Present Acentenial Prospectus (1780-1980) ইংরেজিতে।
৪. আওজায়ুত তারীখ লিল মাদরাসাতিল আলিয়াহ ঢাকা, বাংলাদেশ ১৭৮০-১৯৮০খৃ., (১১৯৪-১৪০৪ হি.) আরবীতে।

১৯৮১ খৃ. ১২,১৩,১৪ ফেব্রুয়ারী তিন দিন ব্যাপী শিক্ষা সেমিনার আলিয়া মাদরাসার মাঠে বিরাট প্যান্ডেলে অনুষ্ঠিত হয়।[২৪১] তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সেলিম, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার, রাবেতা আলমে আল ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ড. আলী আল-হারাকান, মুতামিরুল আলমে ইসলামী পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল মাওলানা নুর মোহাম্মদ, ইন্দোনেশিয়ার ড. হামকা, সৌদি রিয়াদ ইউনিভার্সিটির ভাইস' চ্যান্সেলর ড. আবদুল্লাহ আবদুল মোহসিন আল-তুর্কী, মদীনা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর সহ অর্ধ শাতাধিক অতিথিবৃন্দ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। আন্তর্জাতিক মানের এই শিক্ষা সম্মেলনের জন্য ১৪ টি সরকারী গাড়ী তিন দিন নিয়োজিত ছিল। হোটেল শেরাটনের একটি অংশ সপ্তাহ খানেক ধরে অতিথিদের থাকার জন্য রিজার্ভ রাখা হয়েছিল। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক বাহক মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার দুইশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন সত্যিই ঐতিহ্যমন্ডিত ও ঐতিহাসিকভাবে পালিত হয়। সম্মেলনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় : [২৪২]

১.মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকাকে একটি পূর্ণাঙ্গ আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে।
২. মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার শিক্ষক ও ছাত্রদের বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষা বৃত্তি/স্কলারশীপ সহ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।
৩. মাদরাসা-ই-আলিয়া ছাত্রাবাসের সম্প্রসারণ করা হবে।

---

২৪০ মাদরাসার অফিস রেকর্ড অনুযায়ী।
২৪১ সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি সদস্য সচিব মাওলানা ইয়াকুব শরীফ এর জীবনী গ্রন্থ থেকে এসব তথ্য সংগ্রহিত হয়।
২৪২ প্রকাশক আবুল আসাদ, *দৈনিক সংগ্রাম*, রোজ : শুক্রবার, ২৮ এপ্রিল, ২০০০ খৃ. পৃ. ৭

৪. লাইব্রেরীকে উন্নততর ভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।

৫. ছাত্রদের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। [২৪৩]

উল্লেখ্য, কয়েকটি শিক্ষা কমিশনেও উপরোক্ত ঘোষণার সাথে সংগতিপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে।[২৪৪] কিন্তু আজও মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকাকে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় করার কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রাচীন এ বিদ্যাপীঠের সমস্যা রয়েছে অনেক। ৩০ জন অধ্যাপক ও শিক্ষকের পদ শূণ্য রয়েছে। হাউস টিউটরের কোন পদ সৃষ্টি করা হয়নি। অন্যান্য কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের অনেক পদ শূণ্য রয়েছে। এই বিদ্যাপীঠের সঠিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে এর প্রতি দৃষ্টি দিলে এর থেকে বহু প্রতিভার বিকাশ হবে, যার নজীর পূর্ববৎভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

## ২.৩.২ সরকারী আলিয়া মাদরাসা, সিলেট

বাংলাদেশের সরকারী তিনটি আলিয়া মাদরাসার মধ্যে সরকারী আলিয়া মাদরাসা- সিলেট ঐতিহ্যে লালিত অন্যতম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাকালীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এ প্রতিষ্ঠান মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার চাইতেও প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৭ খৃ. পাক-ভারত বিভক্তির পর মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। অথচ সরকারী আলিয়া মাদরাসা, সিলেট সরকারী ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৩ খৃ.। এর অন্ততঃ দশ বছর আগে ১৯০১/১৯০২ খৃ. সিলেট শহরের নাইওর পুল এলাকায় “আনজুমানে ইসলামিয়া” নামে একটি বেসরকারী সংগঠন কর্তৃক প্রাথমিক স্তরের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। [২৪৫] এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ঐকান্তিকতায় অল্প দিনেই মাদরাসাটি বিশেষখ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়। তৎকালীন সিলেট জেলা আসাম প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের অধীনে ছিল বিধায় আসাম গভর্ণমেন্টের শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর আবদুল মজিদ সি, আই, ই ওরফে ‘কাপ্তান মিয়া’ মাদরাসাটি পরিদর্শন করেন। তিনি মাদরাসার পরিবেশ ও লেখাপড়ার মান দেখে এবং প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে ঐ বছর অর্থাৎ ১৯১৩ খৃ. থেকে মাদরাসাটি সরকারী করার ঘোষণা দেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিলেট শহরের কেন্দ্রস্থলে চৌহট্টা নামক স্থানে মাদরাসার জন্য ৭.১৭ একর জমিন সংগ্রহ করা হয়। প্রথম দিকে মাদরাসাটিতে ইবতেদায়ী ও জুনিয়র মাদরাসা চালু করে কিছু দিন পর হাই মাদরাসা চালু করা হয়। নিউ স্কীম মাদরাসা হিসেবে তখন তা একজন সুপারিনটেনডেন্টের অধীনে পরিচালিত হয়। ইতিহাস খ্যাত বিশ্ববিখ্যাত সুফিসাধক অলিকূল শিরমনি হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (র.)-এর মাযারের কয়েক’শ গজের মধ্যেই সিলেট আলিয়া মাদরাসার অবস্থান। নয়নাভিরাম,

---

২৪৩ নূর মোহাম্মদ, *জীবনের জলছবি*, ঢাকা-১৯৯৯ খৃ., পৃ. ৩৮-৪২
২৪৪ *মাদরাসা-ই-আলীয়া ঢাকার ইতিহাস*, ই.ফা.বা.,, ঢাকা, ১৯৮০ খৃ. পৃ. ৯৭
২৪৫ সোপান, সিলেট সরকারী আলীয়া মাদরাসা স্মরণিকা ১৯৮০ খৃ. পৃ. ৯

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত ও সিলেট শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থান হওয়ায় এ মাদরাসা সিলেটবাসী ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে শতাধিক বছরের ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে টিকে আছে।

১৯১৯ খৃ. কোলকাতা 'আলিয়া মাদরাসার অনুকরণে এখানে ফাযিল শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত এ মাদরাসায় কোন অধ্যক্ষের পদ ছিলনা। ফাযিল শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার মাধ্যমে অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি করা হয়। মাওলানা আবু সাঈদ আবদুল্লাহ মাদরাসার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য, মাদরাসাটি সরকারী ভাবে প্রাথমিক স্তরের মাদরাসা হিসেবে চালু হলে প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন মাওলানা সা'দ উদ্দিন আবুল লেইছ। তিনি মাদরাসার অগ্রগতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার আমলে তিনি মাদরাসার বহুমুখী উন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্র বৃত্তি চালু করেন। সিলেটের বিখ্যাত দানবীর আবু নছর মোহাম্মদ ইয়াহইয়া (জিতু মিয়া) স্বীয় সম্পত্তির এক নির্ধারিত অংশ তাঁর পিতা আব্দুল কাদির সাহেবে নামে ওয়াকফ করে দিয়ে এর আয় মাদরাসার কৃতী ও মেধাবী ছাত্রদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য লিখে দেন। এ ফান্ড থেকে বড় অংকের টাকা ছাত্রদের মাঝে বৃত্তি হিসেবে ব্যয় করা হতো। ১৯৩৫ খৃ. নিউস্কীম শিক্ষা পদ্ধতি বাতিল ঘোষিত হলে হাই মাদরাসা সেকশনটি, যা পূর্ব থেকে চালু হয়ে আসছিল, তা একটি পূর্ণাঙ্গ হাই স্কুল রূপে চালু করা হয়। ১৯৮০ খৃ. পর্যন্ত মাদরাসার ক্যাম্পাসেই এই হাইস্কুল শাখাটি চালু থাকে। ১৯৮০ খৃ. এই হাইস্কুল শাখাটিকে স্থানীয় সিলেট পাইলট স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ঐ বছরই মাদরাসায় দাখিল আলিম ও ফাযিল স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয়। [২৪৬] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে ১৯৮০ খৃ. পর্যন্ত মাদরাসা থেকে ৮৯৭ জন ছাত্র কামিল 'মুহাদ্দিস' হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০০১ খৃ. মাদরাসার ৬৫ তম ব্যাচ কামিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে। [২৪৭] সিলেটের খ্যাতিমান আলিম ওলামাদের অনেকেই এ মাদরাসারই ছাত্র। তাছাড়া বিশিষ্ট রাজনীতিক আব্দুস সামাদ আজাদ, এম. সাইফুর রহমান, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এ মাদরাসারই এক সময়ের কৃতী ছাত্র।

মাদরাসার একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। বহু মূল্যবান গ্রন্থসম্ভার গ্রন্থাগারে মওজুদ রয়েছে। কিন্তু চরম অবহেলিতভাবে তা বিদ্যমান থাকায় দিনে দিনে মূল্যবান এসব বইপত্র বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে্ প্রায় প্রতি বছরই স্মারক' বা ম্যাগাজিন পত্র প্রকাশ হয়ে আসছে। এগুলোর কপি গ্রন্থাগারে মওজুদ আছে। গ্রন্থাগারের মোট ১১,২৭৪ টি গ্রন্থের নাম রেজিষ্টারে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে। প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ ও হাদীসগ্রন্থ ছাড়াও দেশী বিদেশী মূল্যবান গ্রন্থ এখানে স্থান পেয়েছে। ১৯৬৫ খৃ. যখন মাদরাসা সিলেট গভর্ণমেন্ট মাদরাসা হিসেবে ছিল, সে সময়ের একটি ম্যাগাজিনে তৎকালীন অধ্যক্ষ লুৎফুল হক চৌধুরী ভূমিকায় লেখেন- " পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের অপার অনুগ্রহে ছাত্র সমাজের

---

২৪৬ হেলাল উদ্দিন আহমদ, *সিলেট আলীয়া মাদরাসা : অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট*, সরকারী আলীয়া মাদরাসায় সংরক্ষিত প্রবন্ধ হতে গৃহীত হয়, প্রকাশ : ১৯৮৭ খৃ.

২৪৭ সরকারী আলীয়া মাদরাসা, সিলেট এর অফিস রেকর্ড থেকে গৃহিত তথ্য। উল্লেখ্য গবেষক মাদরাসাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

ভবিষ্যত সাহিত্য প্রতিভার প্রতীক স্বরূপ এবারও যথারীতি মাদরাসার ম্যাগাজিন আত্মপ্রকাশ করিল। তরুণ শিক্ষার্থীদের অন্তরে সৃজনী শক্তির বিকাশ সাধন ম্যাগাজিনের এক বিশেষ অবদান।[২৪৮]

## ২.৩.৩ সরকারী মুস্তাফাবিয়া [২৪৯] আলিয়া মাদরাসা, বগুড়া :

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পন্থায় এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে আদর্শ মানব তৈরীর মহান লক্ষ্যে সরকারী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা, বগুড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ খৃ. ১লা জুলাই তারিখে এ মাদরাসাখানি একটি প্রাথমিক পর্যায়ের মাদরাসা হিসেবে কতিপয় জনহিতৈষী ও দ্বীনদরদী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সময়ে বগুড়া অঞ্চলে এ ধরনের মাদরাসা ছিল এটাই প্রথম ও একমাত্র প্রতিষ্ঠান। বেসরকারী পর্যায়ে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২৫ খৃ. ১লা জুলাই তারিখে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশ থেকে এ মাদরাসার শুভ সূচনা করা হয়, একই সঙ্গে মাদরাসার জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন বগুড়ার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান দানবীর সাতানী বাড়ীর জমিদার মরহুম খান বাহাদুর জনাব হাফিজুর রহমান এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি প্রাথমিক উদ্যোগে সকল ব্যয় নিজ তহবিল থেকে দান করেন। তার উদ্যোগের সাথে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। খান সাহেবের নিজস্ব বাড়ীর মসজিদ থেকে মাদরাসার প্রথম পাঠদান শুরু হয়। খান বাহাদুর সাহেব অন্যান্য ব্যক্তিবের্গর সহায়তায় জায়গা সংগ্রহ করে ঘর নির্মাণসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন করেন। খান বাহাদুর হাফিজুর রহমান প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে দীর্ঘদিন পরিচালনা কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে খান বাহাদুর সাহেবের দান ছাড়া ১৯.০০ (উনিশ) টাকা দান হিসেবে সংগৃহীত হয়েছিল। যারা এ দানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের তালিকা নিম্নরূপ : [২৫০]

| | | |
|---|---|---|
| ১. | জনাব মুন্সী নায়েবুল্লাহ মুক্তার | ২.০০ টাকা |
| ২. | জনাব মুন্সী আহমাদ উদ্দিন পাঞ্জাবী | ১.০০ টাকা |
| ৩. | জনাব মুন্সী হামিদ উদ্দিন খন্দকার | ১.০০ টাকা |
| ৪. | জনাব খাদেম আলী | ১.০০ টাকা |
| ৫. | জনাব মুন্সী নরম উদ্দিন খলিফা | ১.০০ টাকা |
| ৬. | জনাব হাফিজ আবদুর রহমান | ১.০০ টাকা |

২৪৮ মাদরাসার গ্রন্থাগারে রক্ষিত তথ্য অনুযায়ী।

২৪৯ মুস্তাফাবিয়া : হযরত মাওলানা মুস্তাফা আল-আল মাদানী (র.) এর নামের অংশ বিশেষকে সংযুক্ত করে মুস্তাফাবিয়া করা হয়েছে। মাদরাসার এই নাম করণের কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রতিষ্ঠাকালে উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ফুরফুরার অন্যতম পীল হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী (র.) এই এলাকায় সফরে আসেন। প্রতিষ্ঠাতাসহ সকলে তাঁর নিকট মাদরাসার নামকরণে পরামর্শ চাইলে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ উপমহাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম, দ্বীন ও সংস্কারক মুস্তফা আল-মাদানীর নাম সংযুক্ত করে এর নাম করণের পরামর্শ দেন। সে মতে এর নামকরণ করা হয় মুস্তাফাবিয়া মাদরাসা। যা এক সময় বগুড়া মুস্তাফাবিয়া মাদরাসা। যা পরবর্তীকালে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলীয়া মাদরাসা নামে খ্যাত হয়।

২৫০ মাদরাসার অধ্যক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী।

| | |
|---|---|
| ৭. জনাব মুন্সী হাবিবুর রহমান মিঞা | ১.০০ টাকা |
| ৮. জনাব হাজী মনির উদ্দিন প্রামানিক | ১.০০ টাকা |
| ৯. জনাব মৌলভী আহমাদুল্লাহ | ১.০০ টাকা |
| ১০. জনাব মৌলভী জিয়াউল হক | ১.০০ টাকা |
| ১১. জনাব মৌলভী সৈয়দ আহমাদ আলী | ১.০০ টাকা |
| ১২. জনাব আবদুস শুকুর | ১.০০ টাকা |
| ১৩. জনাব মুন্সী সৈয়দ উল্যাহ মিঞা | .৫০ টাকা |
| ১৪. জনাব মুন্সী রহিম বক্স মন্ডল | ১.০০ টাকা |
| ১৫. জনাব মুন্সী মজির উদ্দিন খলীফা | ১.০০ টাকা |
| ১৬. জনাব মমিন উদ্দিন | ১.০০ টাকা |
| ১৭. জনাব ফজলুর রহমান | .৫০ টাকা |
| ১৮. জনাব দীন মোহাম্মদ | ১.০০ টাকা |

মাদরাসার জন্য ১৫০/২০ হাত আকারের প্রাথমিক ঘরটি সাতানী জমিদার বাড়ীর মসজিদ এলাকায় তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে আরও একটি আধাপাকা ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল। এ স্থানেই মাদরাসার দাখিল, আলিম ও ফাযিল শ্রেণীর কার্যক্রম চালু করা হয়। ১৯৪১ খৃ. পর্যন্ত মাদরাসাটি এ স্থানেই চলতে থাকে।[২৫১]

ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এখান থেকে বড়-বিস্তৃত কোন স্থানে মাদরাসাকে স্থানান্তরিত করা জরুরী হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বগুড়া শহরের নিশিন্দারা মৌজার নামাযগড় স্থানে জনসাধারণের দানকৃত প্রায় পাঁচ একর জমিতে মাদরাসা স্থানান্তরিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে বিশাল আকারের অনেকগুলো দালান নির্মিত হয়। সুদৃশ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত দৃশ্যে, সুরম্য প্রবেশ তোরণ মাদরাসার অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৪৯ খৃ. এখানে কামিল (হাদিস বিভাগ) খোলা হয়। ১৯৬৫ খৃ. ১৯৬৫ তামিল তাফসীর বিভাগ এবং ১৯৭৫ খৃ. ও ১৯৭৮ খৃ. যথাক্রমে এখানে দাখিল বিজ্ঞান ও আলিম বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। এর আগে ১৯৬৪ খৃ. এখানে কারিগরী বিভাগ খোলা হয়। আকর্ষনীয় দৃশ্যের বিশাল এলাকা জুড়ে মাদরাসার দোলানগুলো কয়েকটি ব্লকে বিন্যস্ত ঃ[২৫২]

২৫১ মাদরাসার রেকর্ড অনুযায়ী। উল্লেখ্য, অত্র মাদরাসা থেকে ১৯৩৮ খৃ. আলিম ও ফাযিল (সাধারণ) পরীক্ষা, ১৯৬৭ খৃ. পর্যন্ত কামিল (তাফসীর) পরীক্ষা, ১৯৭৮ খৃ. আলিম (বিজ্ঞান) পরীক্ষা ১ম অনুষ্ঠিত হয়ে বর্তমান পর্যন্ত তা চলমান রয়েছে।

২৫২ অফিস রেকর্ড অনুযায়ী। উল্লেখ্য , বর্তমানে মাদরাসার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি প্রচুর। বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে এ বিশাল পরিমাণ জমি নিয়ে মাদরাসার অবস্থান সত্যিই ইসলামী শিক্ষার প্রতি এলাকার তথা উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

- ১ম ব্লক : বিজ্ঞান বিভাগের জন্য একটি দালান, যাতে ল্যারেটরী, স্টোর রুম, শ্রেণী কক্ষ ও ১টি বিজ্ঞান গ্রন্থাগার রয়েছে। আধাপাকা দক্ষিণমুখী ৩৪৩৩ বর্গফুট বিশিষ্ট। এই ব্লকটি পাকা দ্বিতল ভবন।
- ২য় ব্লক : অধ্যক্ষের কার্যালয়, মিক্ষক কমন রুম, অফিস কক্ষ, মিলানায়তন, ডাকঘর এবং কয়েকটি শ্রেণী কক্ষ রয়েছে এই ব্লকে। এই ব্লকটিও দক্ষিণমুখী ৩৪৩৩ বর্গফুট বিশিষ্ট। এই ব্লকটি পাকা দ্বিতল ভবন।
- ৩য় ব্লক : এই ব্লকের ৫টি রুম ছাত্রবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাকী কক্ষগুলো শ্রেণী কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্বমুখী এ ব্লকটির আয়তন ৫৫৬৫ বর্গফুট।
- ৪র্থ ব্লক : এই ব্লকটি পাকা দালান, উত্তরমুখী দ্বিতল ভবন। এতে কারিগরী বিভাগ, শ্রেণী কক্ষ এবং ১৫ লক্ষ টাকার দশ সহস্রাধিক গ্রন্থাদির একটি বড় লাইব্রেরী রয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকদের অধ্যয়নের পাশাপাশি বহু গবেষক এই লাইব্রেরী থেকে উপকৃত হচ্ছেন। এই ব্লকের আয়তন ৫০৪০ বর্গফুট।[২৫৩]

মাদরাসার একটি নিজস্ব বড় আকারের সুরম্য মসজিদ রয়েছে। এছাড়া মাদরাসার আশে পাশে প্রচুর গাছ গাছালী দ্বারা শোভা বর্ধিত হয়েছে। ১৯৯৭ খৃ. বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে জাতীয়ভাবে অত্র প্রতিষ্ঠান তৃতীয় স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়। ১৯ টাকা প্রাথমিক চাঁদা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই মাদরাসা বর্তমানে প্রায় ৩০ একর সম্পত্তির অধিকারী। সরকারী তিনটি আলিয়া মাদরাসার মধ্যে এ প্রতিষ্ঠান সর্বদিক দিয়ে অন্যতম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

মাদরাসায় বর্তমানে প্রায় ১৩০০ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। লেখা পড়ার মান অতীত থেকেই ভাল বলে প্রতীমান হয়। কারণ এই মাদরাসা থেকে বহু ছাত্র ভাল ফলাফল করে উচ্চ শিক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। তারা দেশ-বিদেশের উচ্চ পর্যায়ে সমাসীন থেকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।

## ২.৩.৪ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা :

এই দেশ ও জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশ এবং ইসলামী ধ্যান-ধারণা ঈমান আকীদার সংস্কারমূলক অবদানের জন্য কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে আছে, সে সব মাদরাসার মধ্যে দক্ষিণ বাংলার (বর্তমান পিরোজপুর জেলার) স্বরূপকাঠী থানাধীন ছারছীনা নামক স্থানে অবস্থিত ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা অন্যতম। ১৯১৩ অথবা ১৯১৪ খৃ. উপমহাদেশের

২৫৩ বর্তমান স্থানে মাদরাসাটির স্থাপনা বিষয়ক পরিকল্পনায় জানা যায় ইংরেজি "এল" অক্ষরের প্যাটার্ণ-এ মাদরাসার ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। অবস্থার আলোকে সে পরিকল্পনা মাফিক ভবন নির্মাণ সম্ভব হয়নি। বর্তমানে মাদরাসার ভবনগুলোর অবস্থানে তা "ই" নকশা সদৃশ দেখায়।

অন্যতম সংস্কারক ও আধ্যাত্মিক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ) [২৫৪] কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমত মাদরাসাটি কুরআনুল কারীমের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ফোরকানিয়া মাদরাসা বা মক্তব আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজ তা দেশের বৃহত্তম মাদরাসা। মাদরাসার প্রথম ভৌত অবকাঠামো ছিল গোলপাতা বাঁশের তৈরী ছোট একটি ঘর। আজ তা রূপ নিয়েছে বহুতল বিশিষ্ট বেশ কয়েকটি দালানে। সম্পূর্ণ জাঁক জমকহীন অনাড়ম্বর পরিবেশে উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম প্রাণ পুরুষ মাওলানা আবুবকর সিদ্দীক (র.) এই মাদরাসায় প্রথম 'সবক'[২৫৫] দান করে শিক্ষা দান উদ্বোধন করেন এবং প্রাণ খুলে এর জন্য দু'আ করেন। তিনি তখন এর নাম রাখেন ক্বেরাতিয়া মাদরাসা। তিনি মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) এর কাজে অকুন্ঠ সমর্থন জানালেন এবং উন্নতির আশাবাদ ব্যক্ত করে তাঁর কাজ করে যাবার উৎসাহ প্রদান করলেন।

ড. মোঃ এনামুল হক তাঁর লিখিত Darus sunnat Jamia-e-Islamia গ্রন্থে মাদরাসা প্রতিষ্ঠাকালীন অবস্থা সম্পর্কে এভাবে মন্তব্য করেন-

"In 1914 with a very aditions Plan, he established a Madrasah called Sarsina Darus Sunnat, thouth This Madrasah as run on the line of the says-tem of Government madrasah, yet it Maintained its own Characterstics.[256]

তৎকালীন সময়ে এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একেবারেই না থাকায় প্রতিষ্ঠার কিছু সময় পর ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যায়। কুরআনুল কারীম শিক্ষার সাথে অন্যান্য বিষয় যেমন- বাংলা, ইংরেজী, আরবী ইত্যাদি বিষয়ও পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। প্রথম ক্বারী শিক্ষক ছিলেন মৌলভী খোরশেদ আলী। এ মাদরাসার প্রথম শিক্ষক হাফেজ আবদুর রশীদ। ১৯১৫ খৃ. দ্বিতীয় শিক্ষক ইদিলপুর নিবাসী মৌলভী মির্জা আলী নিযুক্ত হন। সাধারণ বিষয়ের শিক্ষাদানের জন্য ভান্ডারিয়া নিবাসী মাস্টার এমদাদ আলী নিযুক্ত হন।

---

২৫৪ বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক সাধকগণের অন্যতম আলিম ও ইসলামী শিক্ষার মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। তাঁর পিতার নাম মুন্সী ছদরুদ্দীন। তৎকালীন বাকেরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল) জেলার স্বরূপকাঠী থানার ছারছীনা গ্রামে ১২৭৯ বাংলা সনে তাঁর জন্ম হয়। শৈশবে পিতৃবিয়োগে তিনি মায়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা জীবনে নিয়োজিত থাকেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের পান্ডিত্য লাভের জন্য তিনি জগতখ্যাত শিক্ষ্দেন্দর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ভারতের হুগলিতে তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বেশ সময় কাটান। এখানেই উপমহাদেশের মহান সংস্কারক মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক (র) এর সান্নিধ্যে সময় কাটান এবং আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভে ধন্য হন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর একজন যোগ্য খলিফা মনোনীত হন। তিনি ছারছীনা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও বহু মক্তব, মাদরাসা, খানকা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মুসলমানদের ঐতিহাসিক অনেক আন্দোলনে তিনি শরীপক ছিলেন। নেজামে ইসলাম ও জমিয়তে 'ওলামায়ে ইসলাম পার্টির সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল। তৎকালীন সময়ের প্রখ্যাত 'ওলামায়ে কিরামগণের মধ্যে তিনি খুবই সম্মানিত ছিলেন। তাঁর লিখিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। সুন্নতে নবুবীর প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসা ছিল। এ কারণেই তাঁর কৃত প্রতিষ্ঠানের নাম 'দারুস সুন্নত' শব্দদ্বয় যোগ করেছেন। 'তারিকুল ইসলাম' তাফসীরে নেছারিয়া তাঁর লিখিত গ্রন্থ সমূহের অন্যতম। ১৯৫২ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। [নুরুদ্দীন আহমদ, *ছীরাতে নেছারিয়া*, ১ম ভাগ, শর্ষিনা মাদরাসা লাইব্রেরী, ১৯৫২ খৃ. পৃ. ৫-৩১ ও *মাসিক মাদরাসা*, ৫ম বর্ষ, দশম সংখ্যা, পৃ. ৪৫-৪৮]

২৫৫ সবকঃ একটি আরবী শব্দ। পুংলিঙ্গ। শাব্দিক অর্থ; শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, উপদেশ, অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি। বহুবচনে আসবাক। পাঠদানে ব্যবহৃত হলে শিক্ষক ছাত্রদের পাঠ্য বইয়ের মধ্যে থেকে এক সময় বা বৈঠক যেটুকু পড়ান তাকে সবক বলা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন জামা'আত বা শ্রেণী উদ্বোধন কালে একটি 'সবক' দারস দিয়ে আরম্ভের আয়োজনকে 'সবক অনুষ্ঠান' নামে আখ্যায়িত করা হয়। পাঠ পরিক্রমাকেও সবক বলা যেতে পারে। [মৌলভী মোহাম্মদ ফিরোজ উদ্দিন (র) *ফিরোজুল্লোগত*, উর্দূ, দিল্লী ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৫৯৪]

২৫৬ ড.মোঃ এনামুল হক, *দারুস সুন্নাত ইসলামিয়া*, ঢাকা, ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ৫২

এ সময় মাদরাসার অর্ধেক অংশ কুরআন শিক্ষার জন্য আর অর্ধাংশ পাঠ্যসূচী ভিত্তিক প্রাথমিক মাদরাসা (ইবতেদায়ী) হিসেবে চালু করা হয়।

এ মাদরাসা থেকে তৎকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত প্রাইমারী শেষ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে প্রতি বছরই দু একটি করে বৃত্তি লাভ করত। অবশ্য প্রাথমিক সময়কার ঐ মক্তব পরবর্তীকালেও স্বতন্ত্র প্রাইমারী স্কুল হিসেবে বিদ্যমান থেকে যায়, যা আজও বিদ্যমান থেকে শতাধিক বছরের ইতিহাসকে অম্লান করে রেখেছে।

এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পীর সাহেব এ দ্বীনি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজেই মন্তব্য করেছেন। "আমি যখন এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করি তখন আমার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। অপরের সন্তানদের শিক্ষা দিলে আখিরাতে কাজে লাগবে, এ উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এ কাজে হাত দেই।[২৫৭] তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি একনিষ্ঠভাবে মাদরাসার বহুমুখী উন্নতির প্রতি নজর দেন। পুঁথিগত শিক্ষাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তিনি চেয়েছিলেন- ইলমে দ্বীন শেখার সাথে ইসলামী আদর্শে আদর্শবান ও হযরত মোহাম্মদ (স:) এর যোগ্য উত্তরসূরী এখান থেকে যেন তৈরী হতে পারে। যারা দেশ ও জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং ইসলামের আলো দিকদিকে প্রসারিত করবে। সেজন্য তিনি ছাত্রদের মাদরাসায় সার্বক্ষণিক হাতে কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্য বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস তৈরী করার মানসে তালপাতা দিয়ে অপর একটি কাঁচা ঘর নির্মাণ করেন। সূফী ফতেহ্ আলী (র.) এর স্মরণে ফতেহ আলী লিল্লাহ বোর্ডিং নামে এ ছাত্রাবাস চালু করা হয়। অপর দিকে তৎকালীন সময়ে সার্বিক শিক্ষার অবস্থা ততটা ভাল ছিলনা। গরীব মেধাবী ছাত্রদের সহায়তা করার জন্য এবং ছাত্রদের লেখা পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য পৃথক একটি ফান্ড গঠন করেন। এর নাম দেয়া হয় 'ফাতেহা ফান্ড'। ভালভাবে বিদ্যা শিক্ষার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই তিনি ফরিদপুর জেলার মাওলানা আবদুর রহমান সাহেবকে হেড মাওলানা পদে নিয়োগ দেন।

মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা বেড়ে গেলে, চারিদিকে মাদরাসার সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এরি মধ্যে মাদরাসার বয়স একযুগ পার হয়ে গেল। সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে মাদরাসায় সার্বিক উন্নতিতে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। ১৯২৭ খৃ. মাদরাসা আলিম মঞ্জুরী লাভ করে। স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯৩৪ খৃ. ৮০ হাত দৈর্ঘ্য ও ২০ হাত প্রস্থ একটি দালান নির্মাণ করা হয়। এ বছর মাদরাসা ফাযিল পর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৪৪ খৃ. মাদরাসার দ্বিতল পাকা ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়। এর আগে ১৯৪২ খৃ. মাদরাসায় কামিল শ্রেণী খোলা হয়। প্রতিষ্ঠাতা পীর সাহেবের আন্তরিকতা ও এ, কে, ফজলুল হকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তৎকালীন সময়ে এ কঠিন কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কারণ তখনকার সময় একমাত্র কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ছাড়া কোথাও কোন মাদরাসায় কামিল শ্রেণীতে পড়ার সুযোগ ছিল

২৫৭ মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, *আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (র)*, ঢাকা , ১৯৯৭ খৃ।

না। কামিল ডিগ্রী লাভের জন্য কলকাতা মাদরাসায় ভর্তি হওয়া ব্যতীত কোন উপায় ছিল না। পরীক্ষাও হতো একমাত্র কলকাতায়। ফলে এ ব্যাপারে এতদাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি বিশেষ অসুবিধার কারণ ছিল। আর এ অবস্থায় তৎকালীন বাংলার প্রথম কামিল মাদরাসা হিসেবে এর যাত্রা শুরু হলো। ১৯৪৫ খৃ. এ মাদরাসার ছাত্ররা প্রথম বারের মতো কামিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে।

## ২.৩.৫ গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদরাসা (স্থাপিত- ১৯০১ খৃ.) :

হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদরাসা। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এ মাদরাসাটি সিলেট অঞ্চলসহ পুরো দেশের ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বিরাট অবদান রেখে আসছে। এ মাদরাসা থেকে বহু ছাত্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছে ইসলামী শিক্ষার আলো।

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানিক ভাবে ইসলামী শিক্ষা ধারার ঊষালগ্নে ১৯০১[২৫৮] খৃ. প্রতিষ্ঠিত হয় গাছবাড়ী জামিউল 'উলূম কামিল মাদরাসা। স্থানীয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নিরলস প্রচেষ্টার ফসল এ মাদরাসা। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ক্বারী আতাহার আলী (র.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বহু ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে তিলে তিলে গড়া মাদরাসাটি আজকের যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন হিসেবে দেশে স্থান করে নিয়েছে। ১৯০৪ খৃ. মাওলানা আতাহার আলী (র.) এর ইন্তিকালের পর মাওলানা কামিল (র.) এই মাদরাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৯১৩ খৃ. মাদরাসার পূর্বের ভূখন্ড নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তীতে মাওলানা ইব্রাহিম (র.) মাদরাসা পুনঃ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নিজেই জমিন ওয়াক্ফ করে পুনরায় মাদরাসায় কার্যক্রম শুরু করেন। এ সময় মাদরাসার নাম রাখা হয় "আইনে গুলজার"। এ নামের প্রস্তাবক ছিলেন মাওলানা আজনক আলী শওকত (র.)। ১৯২১ খৃ. মাদরাসার নাম পুনারায় পরিবর্তন করে পূর্ব নামে নামকরণ করা হয়। ১৯২৬ খৃ. সর্বপ্রথম মাদরাসা খানি আসাম বোর্ডের অধীনে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। ১৯৩৮ খৃ. মাদরাসা খানি তৎকালীন আসাম বোর্ডের অধীন ফাযিল স্তর পর্যন্ত অনুমোদন লাভ করে। ১৯৫৩ খৃ. মাদরাসা কামিল (হাদীস) স্তরে উন্নীত হয় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে।[২৫৯]

## ২.৩.৬ দারুণ নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসা :

ইংরেজ আমলে মুসলমানদের দাবির প্রেক্ষিতে ইসলামি জ্ঞানের মারকাজ হিসেবে আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে হাতে গোনা কিছু আলিয়া মাদরাসা ছাড়া সামগ্রিক অবস্থা হতাশাজনক, এর মাঝেও দ্বীনি শিক্ষার ঝাণ্ডাবাহী নাবিক হিসেবে ঢাকা ডেমরার দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসার ভূমিকা প্রশংসনীয়।

---

২৫৮ *জামিউল উলূম* (সাময়িকী), শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদরাসা, ফেব্রুয়ারি ২০০১ খৃ. পৃ. ১৪-২০
২৫৯ *জামিউল উলূম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

আয় দারুন্নাজাতে আয়, আয় ইলমের সন্ধানে দারুন্নাজাতের এই থিম সং এর সাথে বাস্তবতার মিল ও খুঁজে পাওয়া যায়, ইলমি অবস্থার হতাশাজনক পরিস্থিতে দারুন্নাজাত মাদরাসা আলিয়া জগতে তার নামের সুবিচার করতে বদ্ধপরিকর।

আলিয়া মাদরাসা পরিমণ্ডলে দারুন্নাজাত যেন মুক্তির দ্বার হিসেবেই ভূমিকা পালন করছে, ১৯৯০ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার ডেমরার সারুলিয়ায় ইবতেদায়ী শাখা দিয়ে যাত্রা শুরু করে দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসা।প্রতিষ্ঠার মাত্র ২৭ বছর হলেও এর মধ্যে দেশ ও দেশের বাইরে সুনাম কুড়িয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটি। দাখিল, আলিম, জেডিসি ইবতেদায়ী সমাপনীতে প্রতিবছর মাদরাসা বোর্ডে সেরা অবস্থানসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭ এ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়েছে স্বনামধন্য এ প্রতিষ্ঠান।দারুন্নাজাত মাদ্রাসা ১৯৯০ সালে ইবতেদায়ী পর্যায় থেকে যাত্রা শুরু করলেও কামিল মাদরাসা হিসেবে যাত্রা শুরু করে ২০০৪ সালের জুলাই মাসে।মাদরাসায় বর্তমান ছাত্র সংখ্যা প্রায় ছয় সহস্র।

দারুন্নাজাত মাদরাসার রয়েছে দারুন্নাজাত মহিলা শাখা , নেছারিয়া হিফজ খানা, সালেহিয়া এতিমখানা ইত্যাদি শাখা প্রতিষ্ঠান।মাদরাসার রয়েছে সুবিশাল ১৭ টি আবাসিক হল।রয়েছেন প্রায় শতাধিক শিক্ষক।দাখিল ও আলিম স্তরে রয়েছে বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগ।ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধীনে চার বছর মেয়াদি ফাযিল অনার্স কোর্স চালু রয়েছে দারুন্নাজাত মাদরাসায়।এছাড়া হাফেজ ছাত্রদের সুবিধার জন্য তাখসিস রয়েছে জামাত।যারা কুর আন ও হাদীসের উপর মাহের আলেম হতে চান তাদের জন্য রয়েছে আলাদা নজর, সম্পূর্ণ দরসে নেজামি পদ্ধতিতে নবম শ্রেণি থেকে বিশেষভাবে পাঠদান করা হয়।আলিম শ্রেণির মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবিহ খতমের সুযোগ, এছাড়া ফাযিল ও কামিল শ্রেণিতে তাফসিরে জালালাইন, খতমে বুখারিসহ বিভিন্ন বিখ্যাত হাদিস ও তাফসির গ্রন্থ বাধ্যতামূলকভাবে খতম করা হয়।

দারুন্নাজাত মাদরাসায় ইলমের পাশাপাশি আমলের প্রতিও আলাদা গুরুত্ব দেয়া হয়।প্রত্যহ ফজর নামাজের পর আবাসিক শিক্ষার্থীদের কুরআন তিলাওয়াতসহ মাগরিব নামাজের পর আওয়াবিন সালাত, যিকির বাধ্যতামূলক।মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে সহস্রাধিক বই সংবলিত সুবিশাল গ্রন্থাগার যাতে রয়েছে ইন্টারনেট সুবিধাসহ বিভিন্ন ইসলামি কিতাব,গল্প, উপন্যাস, আন্তজার্তিক জার্নাল ইত্যাদি।

অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে মাদরাসায় রয়েছে আন নাজাত শিল্পী গোষ্ঠী, সাহিত্য মজলিস, সাপ্তাহিক জলসা, আরবি, ইংরেজি বক্তৃতার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। সাহিত্য শাখায় দারুন্নাজাতের রয়েছে অত্যাধিক গুরুত্ব।প্রতি মাসে মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় বাংলা মাসিক পত্রিকা 'বিকাশ'।এছাড়া ইংরেজিতে দক্ষ শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় ইংরেজি ম্যাগাজিন।প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় আরবি দেয়ালিকা।দারুন্নাজাতের উস্তাদদের রয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সরব পদচারণা ।ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়াতে উস্তাদগন টকশো, কলাম লিখনসহ বিভিন্নভাবে দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন।সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বলয় থেকে মুক্ত দারুন্নাজাতে একাডেমিক শিক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়, রয়েছে ক্লাস এর বাইরে আলাদা স্পেশাল ক্লাস, গ্রুপ ওয়াইজ এক্সট্রা টিচিং কেয়ার ইত্যাদি। দারুন্নাজাত মাদরাসার আরেকটি সৌন্দর্য হল এর অসাধারণ ড্রেসকোড, সাদা পাঞ্জাবি পায়জামা আর টুপি পরিধানকারী শিক্ষার্থীদের মিলিত রূপ দেখলে যে কারো মন জুড়িয়ে যাবে। জাতীয় বিভিন্ন দিবস যেমন স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শোক দিবস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইসলামি স্মরণীয় দিনগুলোতে মাদরাসায় প্রতিযোগিতার পাশাপাশি দুয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।দারুন্নাজাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল মহান আল্লাহ, রাসুলে কারিম সা. ও সাহাবায়ে কেরাম এবং সুফী সাধক আউলিয়ায়ে কেরামের দিক নির্দেশনা গ্রহণ করা।সেই উদ্দেশ্যে দারুন্নাজাত ছাত্র ছাত্রীদের সুন্নাতে রাসুলের পাবন্দী হতে জোরদান করে।সফলতার ২৬ বছরে দারুন্নাজাতের তুলনা দারুন্নাজাত নিজেই।সাধারণ ধারাতেও দারুন্নাজাতের ছাত্রদের বলিষ্ঠ পদচারণা রয়েছে।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় , চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যেমন নর্থ সাউথ, ড্যাফোডিলসহ ঢাকা কলেজ এর মত প্রতিষ্ঠানে রয়েছে দারুন্নাজাত হতে দাখিল-আলিম সমাপ্ত করা শিক্ষার্থীদের এক বিশাল অংশ।দেশের বাইরে আল আজহার, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে রয়েছে দারুন্নাজাতের শিক্ষার্থীদের সরব পদচারণা।

দেশের ইসলামি সংগীত জগতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কলরবসহ সংগীতাঙ্গনে দারুন্নাজাতের শিক্ষার্থীদের রয়েছে সরব অংশগ্রহণ, দারুন্নাজাতের অব্যাহত সাফল্যের পেছনে রয়েছেন এক সুদক্ষ কারিগর, যিনি দারুন্নাজাত মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল আ খ ম আবু বকর সিদ্দীক।

তার সুদক্ষ পরিচালনা শক্তি আর মোহনীয় বক্তৃতা শক্তি দারুন্নাজাতকে জুগিয়েছে অফুরন্ত সাহস আর সফলতার সঞ্চয়। ইলম ও আমলের সমন্বয়ে দারুন্নাজাতের এই প্রশংসনীয় অগ্রযাত্রা বিমুগ্ধ করেছে দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষদের।

দারুন্নাজাত তার সফলতার চূড়ায় বিরতিহীন, নির্ভীকভাবে অগ্রসর হবে এ প্রত্যাশাই করেছেন দেশের ইসলামী শিক্ষাবিদসহ গুণীজন।

## ২.৩.৭ কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা, নোয়াখালী :

কারামতিয়া [২৬০] আলিয়া মাদরাসা নোয়াখালী জেলা শহরের অদূরে সোনাপুর নামক স্থানে ১৯২৫ সালের ২৯ মে স্থাপিত হয়। হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর সুযোগ্য পুত্র মাওলানা হামেদ (র.) এ মাদরাসাটি দ্বীনি শিক্ষার মহান লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে এ মাদরাসা দেশের অন্যতম মাদরাসা হিসেবে অল্পদিনের মধ্যে সুখ্যাতি লাভ করে। অপর দিকে প্রতিষ্ঠা সময়ে কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম এলাকায় এ মাদরাসাই আলিয়া মাদরাসা হিসেবে বিদ্যমান থাকায় বহু জ্ঞান পিপাসু ছাত্র দূরদূরান্ত থেকে এখানে ভর্তি হতো। তাছাড়া উপমহাদেশের খ্যাতিমান শিক্ষকবৃন্দ এখানে শিক্ষকতা করেছেন বিধায় এ মাদরাসা তাঁদের সূত্র ধরেও বিশেষ পরিচিতি  লাভ করেছে।

মাদরাসাটি ১৯২৬ খৃ. দাখিল ও আলিম মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৪৫ খৃ. ফাযিল শ্রেণীর মঞ্জুরী লাভ করে। মাদরাসার পরীক্ষা সমূহ তৎকীন সময়ে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার অধীনে অনুষ্ঠিত হতো। মাদরাসার ছাত্রদের সন্তোষজনক ফলাফল ও সার্বিক উন্নতি এবং অগ্রগতির প্রতি খেয়াল করে সরকারী কর্তৃপক্ষ মাদরাসার ফাযিল শ্রেণীর স্থায়ী মঞ্জুরী প্রদান করেন। ১৯৫৬ খৃ. মাদরাসা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কামিল শ্রেণীর (হাদিস বিভাগ) মঞ্জুরী লাভ করে। সে থেকে মাদরাসাটি আজও কামিল স্তর (হাদিস বিভাগ) নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

২৬০ কারামতিয়া : উপমহাদেশের অন্যতম সংস্কারক আধ্যাত্মিক সাধক ও বিশিষ্ট ‘আলিমে দ্বীন কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর নামের প্রথম অক্ষর ‘কারামত’ এর সাথে সম্বন্ধ সূচক আরবী অক্ষর ‘ইয়া-তা’ যোগ করে কারামাতিয়া শব্দটি সংযোজন করা হয়। এই মনীষীর সুযোগ্য পুত্র মাওলানা হামেদ (র.) প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন বিধায় জৌনপুরী খানদানের অনেক ‘আলিম ‘উলামা এখানে অধ্যয়ন করেন এবং মাদরাসার সার্বিক বিষয়ে অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশে ‘কারামাতিয়া নামে বেশ কিছু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ প্রতিষ্ঠান তাদের মধ্যে প্রথম। (মাদরাসার অফিস রেকর্ড অনুযায়ী)

## ২.৩.৮ তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা :

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা রাজধানী ঢাকার একটি ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বহুমুখী কর্মসূচী ও কার্যক্রম দ্বারা এ মাদরাসা ইতোমধ্যে দেশের সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে এ মাদরাসার অবদান উল্লেখযোগ্য। মানব সম্পদ উন্নয়ন, ইসলামী শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধন এবং মেধা ও মনন বিকাশে দেশের অভ্যন্তরে তথা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। প্রান্তিক যোগ্যতা ও ফলাফলের ক্ষেত্রে এ বিদ্যাপীঠ অনন্য কৃতিত্বের দাবীদার।

**প্রতিষ্ঠাকাল :**

১৯৬৩ খৃ. দেশের কতিপয় স্বনামধন্য ইসলামী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ও হিতাকাংখীর উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণ পূর্ব উপকণ্ঠে মীর হাজিরবাগ নামক স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথম পর্যায়ে মাদরাসায় ইবতিদায়ী ও দাখিল স্তরের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালে উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষার পথিকৃৎ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) এ মাদরাসার উদ্বোধন করে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট এর কবুলিয়াতের জন্য বিশেষ দোয়া করেন।

**তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার টঙ্গী শাখা :**

ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির ফলে স্থান ও পরিবেশগত কারণে ১৯৯৭ সালে ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে মনোরম পরিবেশে চালু করা হয়েছে 'তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা টঙ্গী শাখা'। একই প্রশাসনের অধীনে পৃথক এই শাখায় ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১০০০। এই শাখায়ও হিফজ বিভাগ, সুরম্য জামে মসজিদ, কুতুবখানা, চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র, মৎস্য চাষ প্রকল্প নামে কয়েকটি বিভাগ চালু করা হয়েছে। [২৬১]

**তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার মহিলা শাখা**

২০০০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ছাত্রীদের জন্য পৃথম আকারে শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার অধীনে ঢাকার গোলাপবাগে 'মহিলা শাখা' চালু করা হয়েছে।

২৬১ সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত উপাধ্যক্ষ এর সাক্ষাৎকার অনুযায়ী।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## ২.৪.১ মাদারাসা শিক্ষা উন্নয়নে সরকারি পদক্ষেপ সমূহ :

১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ১৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাসের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হলো আজকের বাংলাদেশ। প্রায় হাজার বছর থেকে এ দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, নৈতিক বিকাশ, সুনাগরিক হিসেবে চরিত্র গঠনে, দেশাত্ববোধের দৃঢ়তায় এবং আধ্যাত্মিক ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষা এক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এই নব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাকা মাদরাসা-ই-আলিয়া প্রাঙ্গনে ১৯৭২ সালে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এক ঐতিহাসিক ঘোষণায় মাদরাসা শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত করে সংস্কার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আর শুধু মাদরাসা শিক্ষা নয়, পাকিস্তানী ঔপনিবেশকতায় এদেশের পশ্চাদপদ সবরকম শিক্ষা ব্যবস্থাকেই ঢেলে সাজাবার লক্ষ্যে নিম্লোক্ত শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

National Education Commission (Dr. M. Qudrat-i-Khuda Commission) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মন্ত্রণালয় কর্তৃক[২৬২] সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয় প্রস্তাব পেশের নিমিত্তে এই কমিশন গঠন করা হয়। ২৩ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড.মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা। কমিটির কার্যক্রমের টার্ম এন্ড রেফারেন্স অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সাব-কমিটি গঠনের সুযোগ ছিল। ফলে মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।[২৬৩]

| | | |
|---|---|---|
| ১. | জনাব মুহাম্মদ নূরুচ্ছাফা | আহ্বায়ক |
| ২. | জনাব মুহাম্মদ ফেরদৌস খান<br>সচিব | সদস্য |
| ৩. | মওলানা আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ | সদস্য |
| ৪. | ড. মুহাম্মদ এনামুল হক | সদস্য |
| ৫. | অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা | সদস্য |

১৭২ পত্র নং-শিক্ষা/৯০০, তারিখ: ১১ ই শ্রাবণ, ১৩৭৯ সন বাংলা/২৬ শে জুলাই, ১৯৭২ সন।

263 Dr. Sekander Ali Ibrahimy, Reports on Islamic and Madrasah Education in Bengal (Dhaka: Islamic Foundation-Bangladesh, 1990) part5, P21-22

৬. ড.এম. এসহাক সদস্য
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭. ড.এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ সদস্য
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৮. মাওলানা আলাউদ্দীন আল আজহারী, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা সদস্য

৯. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সদস্য
সুপার, দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চন্দনপুর, চট্টগ্রাম।

উক্ত রিপোর্টে একাদশ অংশে মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে। নিম্নে তা সন্নিবেশ করা হলো :

"১১.১. বাংলাদেশে এখন ১,৪১২টি মাদরাসা রয়েছে। তন্মোধ্যে ৫৪টি কামিল মাদরাসা, ৩০০টি ফাযিল মাদরাসা, ৩০২টি আলিম মাদরাসা এবং ৭৭৫টি দাখিল মাদরাসা। এসব প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্র সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ এবং শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার। এদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার তেমন সংযোগ নেই। ফলে মাদরাসা শিক্ষা একটি পৃথম শিকষা ব্যবস্থা রূপে গড়ে উঠেছে। এদের বর্তমান স্তর বিন্যাস হচ্ছে নিম্নরূপ :

ইবতেদায়ী বা প্রাথমিক ৪ বছর, দাখিল ৬ বছর, আলিম ২ বছর, ফাযিল ২ বছর। ফাযিল পাসের পর ছাত্ররা সরাসরি উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসে ভর্তি হতে পারে।

১১.২. ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া আরবী ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ইংরেজি ও মাদরাসার শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তবে ইসলামী শিক্ষার উপরই বেশি জোর দেয়া হয়। অন্যান্য শিক্ষা গৌণ স্থান অধিকার করে আছে। এ কারণে মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশ দর্শী। কেননা সব শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদরাসার লক্ষ্য।

১১.৩. বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদরাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী করে পুনর্গঠন প্রয়োজন। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হয়ে এবং সর্বস্তরে বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি, আরবী, সংস্কৃতি, পালি ইত্যাদি যে কোন একটি হতে পারে এবং যারা ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা পড়বে না তারা সপ্তম শ্রেণী থেকে অতিরিক্ত হিসেবে ইংরেজি পড়বে। তদুপরি

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা অথবা নীতি বিষয়ক শিক্ষাও পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিমূলক ও সাধারণ উভয় কোর্সেই ধর্ম শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় রূপে স্থান পেয়েছে। মাদরাসা গুলোও তাদের শিক্ষা পদ্ধতিকে আধুনিক জীবনের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। বাংলাদেশ ইসলামিক শিক্ষা সংস্কার সংস্থা তাদের স্মারকলিপিতে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের যে মৌলনীতি নির্ধারণ করেছে তা হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মাদরাসার প্রাথমিক স্তরটিকে সমপরিসর ও একত্রীভূত করা এবং পরিবর্তিত স্তরগুলোকেও সমপরিসর ও যথাসম্ভব সমন্বিত করা, বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসেবে ব্যবহার করা।

১১.৪. আমরা উক্ত উদ্দেশ্যাবলির সাথে একমত। আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার পর মাদরাসা ছাত্ররা তিন বছর মেয়াদী বৃত্তিমূলক ধর্মশিক্ষা কোর্স পড়তে পারবে। এ কোর্সের নবম ও দশম শ্রেণীতে তাদেরকে আমাদের প্রস্তাবিত আবশ্যিক চারটি পাঠ্য বিষয় (বাংলা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরেজি) অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে। এ শিক্ষার পরবর্তী স্তর বিন্যাস হবে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স এবং দু'বছরের পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স। এ কোর্সগুলোর নামকরণ এবং তাদের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রস্তাবিত কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি নির্ধারণ করবেন। আমরা আশা করি এরূপ সংস্কারের ফলে মাদরাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংগরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

সারাংশ

১. মাদরাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী পুনর্গঠন প্রয়োজন। দেশের অন্যান্য সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় মাদরাসাগুলোতে একই প্রাথমিক শিক্ষক্রম প্রবর্তিত হবে এবং সর্বস্তরে বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিকষা আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা যেমন ইংরেজি, আরবী ইত্যাদি পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। তবে যারা ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়বেনা তারা সপ্তম শ্রেণী থেকে অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে ইংরেজি পড়বে।

২. মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে ধর্ম শিক্ষা পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। এই স্তরের সাধারণ কোর্সেও ধর্ম শিক্ষা একটি ঐচ্ছিক বিষয়রূপে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত হবে। আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার পর মাদরাসার ছাত্ররা তিন বছর মেয়াদি বৃত্তিমূলক ধর্ম শিক্ষা কোর্স পড়তে পারবে। এ কোর্সের নবম ও দশম শ্রেণীতে তাদেরকে বাংলা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরেজি এ চারটি আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন করতে হবে। এ শিক্ষার পরবর্তী বিন্যাস হবে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স এবং দু'বছর মেয়াদী পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স। মূলত কমিটি সরকারি প্রস্তাবনার ভিত্তিতে উপরোক্ত রিপোর্ট প্রণয়ন ও ১৯৭৩ সালের ৮ই জুন অন্তর্বর্তী

রিপোর্ট সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। সর্বশেষ ১৯৭৪ সালের ৩০ শে জুন কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করা হয়। এ রিপোর্টের মাধ্যমে শিক্ষার সাথে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রতিফলন দেখানো হয়। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এক ধারার শিক্ষা প্রবর্তন করে তা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাথমিক স্তর থেকে বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষার প্রচলন নবম শ্রেণী থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি, সর্ব স্তরে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচলন এবং ১৯৮০ সালের মধ্যে দেশে নিক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু একটি সদ্য স্বাধীন দেশের সম্পদ ও সময়ের অভাবে কুদরত-ই-খুদা রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। প্রস্তাবিত মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের অনেক বিষয় পরবর্তী সরকারের আমলে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখতে পাওয়া যায়ঃ [২৬৪]

## The National Committee for Curriculum Course of Study.

১৯৭৫ সালের ২২ অক্টোবর তদানীন্তন সরকার কর্তৃক জাতীয় কারিকুলাম এণ্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটি গঠিত হয়। ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির চেয়াম্যান ছিলেন দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হক। এই কমিটির টার্ম এণ্ড রেফারেন্স হিসেবে নির্দেশ ছিল, '১৯৭২ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে শিক্ষার বিভিন্ন ধারার বিস্তারিত নিরীক্ষণ ও বিভিন্ন ধারার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর সুপারিশ প্রণয়ন।

'এ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালের ৪ মার্চ। সভা উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্টের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর আবুল ফজল। এই জাতীয় কারিকুলাম কমিটির ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি ছাড়াও ১০ সদস্য বিশিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের ১০টি কমিটি এবং শিক্ষার বিভিন্ন শাখার ৪৯ টি বিষয়ের উপর ৩১টি বিষয়ভিত্তিক কমিটি ছিল। এতে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় ২৫০০ জন শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক তাদের বিস্তৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করেন। প্রফেসর মুহাম্মদ শাসুল হক পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেলে ১৯৭৭ সালের ২৭ মে তদস্থলে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী জাতীয় কারিকুলাম কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৬৫]

দেশের মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের জন্য পৃথক ভাবে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সাব-কমিটি ছিল নিম্নরূপ :

---

২৬৪ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও এ.এম. আলাউদ্দিন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামি এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯ ইং পৃ. ৯৬-৯৭

265 Dr. A.K.M. Ayub Ali, History of the Traditional Islamic Education in Bangladesh, (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983) p.186-87

১. ড.এ.কে.এম আইউব আলী, অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা চেয়ারম্যান

২. জনাব আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, চেয়ারম্যান, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা সদস্য

৩. জনাব আলাউদ্দিন আল আজহারী, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা সদস্য

৪. ড.এম.ইসহাক, চেয়ারম্যান, এরাবিক এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য

৫. জনাব এ.কে.এ. বোরহানুদ্দীন, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও সদস্য
পাঠ্যপুস্তক বোর্ড[২৬৬], ঢাকা সদস্য

মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাস এই প্রথমবারের মত মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে নিছক ধর্মীয় সাহিত্য সীমাবদ্ধ না রেখে এই প্রথমবারের মত বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কৃষি বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ গ্রুফ খোলার বিষয়ে সরাসরি মতামত পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রুপ খোলার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ড.এ.কে.এম. আইউব আলী, রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ ছিল ঃ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড মঞ্জুরী প্রাপ্ত ইবতেদায়ী ও দাখিল মাদরাসাসমূহের জন্য মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ও সংশোধিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রনয়ন করা হয়েছে। এই সংশোধিত পাঠ্যসূচী ১৯৭৫ ইং শিক্ষা বর্ষ হতে কার্যকরী হবে। অত্র বোর্ড কর্তৃক গৃহীতব্য ১৯৭৬ সালের দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রণীর শেষ পরীক্ষা এই পাঠ্যসূচী অনুযায়ী গৃহীত হবে। পুনঃবিজ্ঞপ্তি না দেয়া পর্যন্ত এই পাঠ্য তালিকা বলবৎ থাকবে। [২৬৭]

আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর উপর্যুক্ত সিলেবাসের সাথে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের তদানীন্তন রেজিস্ট্রার, ড.এ.কে.এম. আইউব আলী স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হয়। তাতে উল্লেখ ছিল ঃ

"এই সংশোধিত পাঠ্যসূচি ১৯৭৬-৭৭ ইং শিক্ষা বর্ষ থেকে আলিম শ্রেণীতে কার্যকর হবে এবং অত্র বোর্ড কর্তৃক গৃহীতব্য ১৯৭৮ সালের আলিম পরীক্ষা এই পাঠ্যসূচি হতে গৃহীত হবে। ফাজিল শ্রেণীতে ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষা বর্ষ থেকে এই সিলেবাস কার্যকরী হবে এবং ১৯৮০ ইং সালে গৃহীতব্য ফাযিল পরীক্ষা এই সিলেবাস থেকে অনুষ্ঠিত হবে। কামিল শ্রেণীসমূহে এই সংশোধিত পাঠ্যসূচি ১৯৭৫ সালের

266 Dr. Sekander Ali Ibrahimy, Reports on Islamic and Madrasah Education in Bengal, parts-5, p.271-72
২৬৭ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি নং-২১১/এস-১৩, তারিখ-২০ শে জানুয়ারী ১৯৭৫।

শিক্ষা বর্ষ থেকে কার্যকরী হবে। এই পাঠসূচি অনুযায়ী কামিল পরীক্ষাসমূহ ১৯৭৭ সাল থেকে যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। পুনঃবিজ্ঞপ্তি না দেয়া পর্যন্ত এই পাঠ্য তালিকা বলবৎ থাকবে।[২৬৮]

মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতিতে বহুমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ভূমিকায় উল্লেখ হয় : "বর্তমান মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কৃষি বিষয়ক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রধানের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২২/০৯/৭৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সভায় মাদরাসা বোর্ডের বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রণীত বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি ও শর্তাবলী সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলাপ-আলোচনা, পরে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বর্তমান মাদরাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য, আদর্শ এবং এর ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে বর্তমান প্রচলিত সাধারণ বিভাগ ছাড়াও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে নির্বাচিত কতিপয় মাদরাসায় ১৯৭৬-৭৭ শিক্ষা বছরে আলিম শ্রেণীতে এবং ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষা বছর হতে ফাযিল শ্রেণীতে অতিরিক্ত বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণা এবং আনবিকশক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, তাদের ১৯/১২/৭৫ তারিখের স্মারক নং শাখা ১০২৩/৮ শিক্ষা দ্বারা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত আলিম ও ফাযিল শ্রেণীর সাধারণ বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুমোদন করেন।[২৬৯]

এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞান বিভাগ খোলার শর্তাবলী, পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যসূচি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

মাদারাসার জন্য নির্ধারিত সাধারণ শর্তাবলী ছাড়াও আলিম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্য বিশেষ শর্ত সমূহ ঃ

১. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত কোন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান বিভাগ খুলতে পারবে না।
২. বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমতির জন্য আবেদনপত্র সেশন আরম্ভ হওয়ার অন্তত ছয় মাস পূর্বে রেজিস্ট্রারের নিকট যথারীতি দাখিল করতে হবে।

---

২৬৮ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি নং ৮৪৫৫/এস-১৩, তারিখ, ২ শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ সাল।

২৬৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পক্ষে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, আলিম ও ফাযিল শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগ, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসুচি, পৃ.১

৩. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রারের অনুরোধ ক্রমে জনশিক্ষা পরিচালক/বিভাগীয় উপ-জনশিক্ষা পরিচালক, উক্ত মাদরাসায় বিজ্ঞান বিভাগ খোলার উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য পরিদর্শন করবেন এবং মঞ্জুরী সম্বন্ধে তাঁর অভিমত পেশ করবেন।

৪. প্রত্যেক শ্রেণীতে সাধারণত গড়ে ২০ জন করে ছাত্র থাকতে হবে।

৫. আলিম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্য নিম্নে বর্ণিত কক্ষ সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র পাকা বিজ্ঞান গৃহ অবশ্যই থাকতে হবে।

৬. পরিমাপ অনুযায়ী সুসজ্জিত ২টি শ্রেণী কক্ষ এবং প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল ও আসবাবপত্র সম্বলিত একটি ল্যাবরেটরি থাকতে হবে।

৭. প্রাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন ও সরঞ্জামাদি বিশিষ্ট এক বা একাধিক কক্ষ থাকতে হবে।

৮. মাধ্যমিক বিজ্ঞান শ্রেণীর উপযোগী ও প্রয়োজনীয় রসায়ন, পদার্থ এবং জীব বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি থাকতে হবে।

৯. মাদরাসাগুলিতে অভিজঞ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্তত ২ জন গ্রাজুয়েট বিজ্ঞান শিক্ষক থাকতে হবে।

১০. লাইব্রেরীতে বিজ্ঞান বিষয়ক রেফারেন্স বুকসহ যথেষ্ট সংখ্যক বই থাকতে হবে।

১১. মাদরাসার রিজার্ভ ফান্ডে অন্তত ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা থাকতে হবে।

১২. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও সরকার কর্তৃক সময় সময় আরোপিত যাবতীয় শর্তাবলী পালন করতে হবে।

উপরোক্ত শতাবলী পূরণ করা হলে এবং জনশিক্ষা পরিচালক/বিভাগীয় উপ-জনশিক্ষা পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শনের রিপোর্টে সুপারিশ থাকলে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিষ্ট্রার অস্থায়ী এবং পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমবারে অনধিক ৩ বছর মুরি দিতে পারবেন।[২৭০]

---

২৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩

**মাদরাসার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী ছাড়াও ফাযিল শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্য বিশেষ শর্তসমূহ :**

১.আলিম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমতি প্রাপ্তির অন্তত ২ বছর শেষ হওয়ার পর ফাযিল শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমতির জন্য আবেদনপত্র মাদরাসা বোর্ডের রেজিস্ট্রারের নিকট যথারীতি দাখিল করতে হবে। পূর্বাহ্নে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ফাযিল শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ খুলতে পারবে না।

২. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রারের অনুরোধক্রমে জনশিক্ষা পরিচালক/বিভাগীয় উপ-জনশিক্ষা পরিচালক উক্ত মাদরাসায় ফাযিল শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য পরিদর্শন করবেন এবং মঞ্জুরি সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত পেশ করবেন।

৩. প্রত্যেক ফাযিল জামাতে অন্ততপক্ষে গড়ে ১৫ জন করে ছাত্র থাতকে হবে।

৪. ফাযিল শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্য রসায়ন, পদার্থ ও জীব বিজ্ঞানের জন্য পরিমাপ অনুযায়ী স্বতন্ত্র পাকা বিজ্ঞান গৃহ অবশ্যই থাকতে হবে।

৫. পরিমাপ অনুযায়ী সুসজ্জিত ৪টি শ্রেণীকক্ষ, প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল্স এবং আসবাবপত্র সম্বলিত ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপ থাকতে হবে।

৬. ব্যবহারিক শ্রেণীর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন ও সরঞ্জামাদি বিশিষ্ট পাকা কক্ষ থাকতে হবে।

৭. উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শ্রেণীর উপযোগী ও প্রয়োজনীয় রসায়ন, পদার্থ ও জীব বিজ্ঞান সংক্রান্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকতে হবে।

৮. অভিজ্ঞ ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াতে সক্ষম সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তত একজন করে এম.এস.সি পাস প্রভাষক নিয়োগ করতে হবে।

৯. লাইব্রেরীতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেফান্সে বুক থাকতে হবে এবং প্রত্যেক জিনিসের ও আসবাব পত্রের স্টক রেজিস্ট্রার রাখতে হবে।

১০. মাদরাসার রিজার্ভ ফান্ডে অন্তত ৭,০০০ (সাত হাজার) টাকা জমা রাখতে হবে।

উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ করা হলে এবং জনশিক্ষা পরিচালক/বিভাগীয় উপ-জনশিক্ষা পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শনের রিপোর্টে সুপারিশ থাকলে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার অস্থায়ী এবং পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম বারে অনধিক ৩ বছর পর্যন্ত মঞ্জুরী দিতে পারবেন। [২৭১]

২৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৫

অতিরিক্ত বিষয়ে শতকারা ৪০ এর উর্ধ্বে যে নম্বর পাওয়া যাবে কেবল সেই নম্বর মোট নম্বরের সংগে যোগ হয়ে উক্ত পরীক্ষায় পরিক্ষার্থীর স্থান নির্ধারণ করবে। কিন্তু বৃত্তির ব্যাপারে ঐ বিষয়ের নম্বরের কোন সুবিধা পাওয়া যাবে না। [২৭২]

ফাযিল শ্রেণীতেও নতুন সংযোজন হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বিজ্ঞান গ্রুপ খোলা হয়। ইদিপূর্কে মুজাব্বিদ-ই-ফাযিল নামে একটি গ্রুপ থাকলেও তা ছিল সংক্ষিপ্ত আকারে মাত্র ৫০০ নম্বরের পরীক্ষা।

১৯৮০ সালে ফাযিল বিজ্ঞানের উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়সমূহ, বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়  এবং পলিটেকনক ইন্সটিটিউটে ১৯৮০-৮১ শিক্ষা বর্ষ ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়।

## বিনা মূল্যে বই বিতরণে অনন্য দৃষ্টান্ত :

২১০ সাল থেকে শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন ঘটা করে শিক্ষার্থীদের হাতে বিনা মূল্যে নতুন বই তুলে দিছে সরকার। এনসিটিবির সূত্রমতে। আসন্ন শিক্ষাবর্ষসহ (২০২০ সাল) ২১ বছরে মোট ৩৩১ কোটি ৪৭ লাখ ৮৩ হাজারের কিছু বেশি বই দেয়া হয়েছে ও হচ্ছে। বই দিতে এখন প্রতিবছর সরকারের খরচ হচ্ছে এক হাজার কোটি টাকার বেশি। আগামী শিক্ষাবর্ষে সারাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের (মাদরাসা ও কারিগরিসহ) সোয়া ৪ কোটির বেশী শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে প্রায় ৩৫ কোটি ৪০ লাখ বই দিবে সরকার।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবির কর্মকর্তা এবং শিখ্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন। বিনা মূল্যে বই দেয়ার ক্ষেত্রে এটি সারা বিশ্বে বিরল ঘটনা। বিনামূল্যে বই পাওয়া শিক্ষার্থীর এই সংখ্যা বিশ্বের অনেক দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশী।[২৭৩]

## ৫.৩.২ ইসলামী বিশ্বদ্যিালয়ে প্রতিষ্ঠা এবং জাতির প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ দ্দৌলাহর হাত থেকে শাসনভার কেড়ে নিয়ে ইংরেজগণ দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে। তারা মুসলিম আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা উপেক্ষা করে (ক) সাধারণ শিক্ষা ও (খ) মাদরাসা শিক্ষা এ দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। যা বাংলার ইসলাম প্রিয় জনতার প্রাণে আঘাত হানে। ১৯৪১ খৃ. The Mohamedan Education Advisory Committee সরকারী পর্যায়ে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী পেশ করেন। পরবর্তীতে মাওরানা

২৭২ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি নং ১৪০৩০/এস-১৩, তারিখ, ২৪ শে ডিসেম্বর ১৯৭৫ইং।

[২৭৩] দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ নভেম্বর, ২০১৯, রোজ: শনিবার, কলাম : ৪, পৃ. ১

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা আকরাম খাঁ প্রমূখের নেতৃত্বে আন্দোলনের সূচনা হয়। যার লক্ষ্য ছিল “বিজ্ঞান ও মানবিক বিষয়ের সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা।’ উদ্দেশ্য ছিল (১) কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে ইসলামী শিক্ষার সংযোগ ও সমন্বয় সাধন। (২) নতুন আঙ্গিকে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যস্তকরণ। (৩) ঐশী ও জাগতিক জ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দেশে একটি সুসংহত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন।

১৯৩৭ খৃ. অভিভূক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শের-ই বাংলা এ.কে ফজলুল হক কলিকাতা মাদরাসায় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। মাদরাসার ছাত্ররা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী পেশ করে। ১৯৪১ খৃ. ‘মোহামেডান এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি’ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী পেশ করে। ১৯৪৬-৪৭ খৃ. মাদরাসা সিলেবাস কমিটির সভাপতি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন মুসলিম বিশ্ববিদ্যারয় প্রতিষ্ঠার জোর সুপারিশ পেশ করেন। ১৯৪৯ খৃ. মাওলানা আকরাম খাঁ একটি কমিটি গঠন করে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জোরদার করেন। ১৯৬৩ ও ৬৫ খৃ. ঢাকায় মাদরাসা ছাত্রদের মহাসমাবেশের মাধ্যমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৭ খৃ.  ২৭ শে জানুয়ারী পবিত্র মক্কায় অনুষ্ঠিত ও.আই.সির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। [২৭৪]

পরবর্তীতে ১৯৭৯ খ. ২২ শে নভেম্বর শিল্পনগরী কুষ্টিয়া হতে ২৫ কি.মি. ও ঝিনাইদহ শহর হতে ২১ কি.মি. দূরে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সীমান্তবর্তী শান্তিডাংগার দুলালপুরে তিনি ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৮০ খৃ. ১০ই জুলাই জাতীয় সংসদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাশ হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ খৃ. ২১ শে জুলাই ঢাকার অদূরে গাজীপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। কিন্তু তখনও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়নি। ১৯৮৫ খৃ. বাংলাদেশ মাদরাসা ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র ভর্তির দাবীর প্রেক্ষিতে তৎকালীন ভাই চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দীন আহমদ ১৯৮৫/৮৬ শিক্ষাবর্ষে শরীয়াহ ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ৪টি বিভাগের ছাত্র ভর্তির মাধ্যমে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৮৮ খৃ. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত প্রসপেক্টাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বলা হয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্জিত হয় না এমন একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় নিবেদিত। [২৭৫] ১৯৯০ খৃ. তৎকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী পুনরায় কুষ্টিয়াতে ক্লাস উদ্বোধন করেন।

[২৭৪] সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, বর্ষ ঃ ১০, সংখ্যা : ২৬, বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর-৩, অক্টোবর ২০০০ খৃ.।
[২৭৫] ড.আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* ২০০৫, ই.ফা.বা., পৃ. ৩৮৫

বাংলাদেশের জনগণের আশা ছিল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষা-ভাষীদের ধর্মীয় চেতনা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ বিকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। বস্তুতঃ মাদরাসা চাত্রদের ক্রমাগত আনেদআলন এবং অবিশ্রান্ত সংগ্রামই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করে তুলেছিল। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত ইসলামী শিক্ষার জন্য। যেখানে মাদরাসা ছাত্রদের অগ্রাধিকার থাকবে। কিন্তু আজকের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে জনগণের সে আশা আকাংখা পূরণ হবে বলে অনেকে মনে করেন না। ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে ফুটে উঠার দাবী রাখে।

২০০৮ সাল হতে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে থাকা সকল ফাযিল ও কামিল মাদরাসা সমূহ নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হয়েছে। বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার ৩৪টি বিভাগ ও ৪১৬টি ফ্যাকাল্টি রয়েছে। ছাত্র সংখ্যা ১৬,০০০ এর উপরে। যা ইসলামী শিক্ষার অনুরাগী শিক্ষার্থীদের জন্য এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## ২.৫.১ মাদরাসা শিক্ষার নবযুগ : পূর্ণাঙ্গ বিকাশ

মাদরাসা শিক্ষার বহুমুখী উন্নয়নের জন্য মাদরাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৭৮ নামে একটি প্রজ্ঞাপন ২রা মার্চ ১৯৭৮ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপনের ধারা অনুসারে 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড' নামে একটি 'স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা বোড' প্রতিষ্ঠা করা হলো। ফরে ১৭৮১ সালে ইংরেজদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত কলকাতা আলিয়া মাদরাসার সুদীর্ঘ দু'শ বছরের আশা-নিরাশা ও জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে মাদরাসা শিক্ষাধারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিজামউদ্দীন (মৃত্যু-১৭৪৮) দারসে নিজামিয়ার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে 'মাছের মায়ের পুত্র শোকের' মত মাদরাসা শিক্ষার বিরোধীরা এই শিক্ষা ধারাকে বিভিন্ন চিন্তার সাথে মিলিয়ে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন খাতে প্রবাহত করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু সে সব চিন্তা ভাবনা এ শিক্ষা ধারাকে আংশিক পরিবর্তন করতে পারলেও মূল ধারা থেকে সরাতে পারেনি।

মাদরাসা শিক্ষায় প্রথম সমস্যার সৃষ্টি হয় ফার্সীর বদলে ইংরেজি শিক্ষাকে কেন্দ্র করে। এ সমস্যাটি সমাধান করতে করতে প্রায় অর্ধ শতাব্দী কেটে যায়। সর্বশেষ দেখা যায়, বাঙ্গালী মুসলমানরা যত না ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল বৃটিশ আমলাদের প্রতি সন্দেহ। সরলমনা ভারতবাসীকে ছলচাতুরির মাধ্যমেই তারা পরাধীন জাতিতে পরিণত করেছিল। ফলে তাদের ভাল কাজেও সন্দেহ হতো।

যাই হোক ১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় শিক্ষানীতি, ১৮৪৫ সালে ডেসপাচ শিক্ষা কমিশন, ১৮৮২ সালে ডব্লিও ডব্লিও হান্টারের কমিশন, ১৯০৭ সালের আর্ল কমিটি, ১৯০৬ সাল থেকে খাজা সলিমুল্লাহর পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স, ১৯০৯ সালের শার্প কনফারেন্স, ১৯১২ সালে নাথানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি, ১৯১4-১৫ সালের হার্লি কমিটি, ১৯২১ সালের শামসুল হুদা কমিটি, ১৯৩১-৩৪ সালের আবদুল মোমেনের মুসলিম শিক্ষা এডভাইজারী কমিটি, ১৯৩৮-4 সালের মওলা বখশের মাদরাসা শিক্ষা কমিটি, ১৯৪৬-৪৭ সালের সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেনের মাদরাসা সিলেবাস কমিটি, ১৯৪৯-৫১ সালের মাওলানা আকরম খানের পূর্ব বাংলা শিক্ষা পদ্ধতি ও রিকন্সট্রাকশন কমিটি, ১৯৫৬ সালের আশরাফ উদ্দীন চৌধুরীর পূর্ব বাংলা মাদরাসা এডভাইজারী কমিটি, ১৯৫৭ সালের আতাউর রহমান খানের পূর্ব পাকিস্তান শ্ক্ষিা পুনর্গঠন কমিটি, ১৯৫৯ সালের এস, এস, শরীফ হোসেনের জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৩ সালের মমিয়তে মুদাররেসনের ইসলামী এরাবিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন স্কীম, ১৯৬৩-৬৪ সালের এম.এম. হোসেনের

ইসলামী এরাবিক বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, ১৯৬৬ সালের বিচারপতি হামিদুর রহমানের ছাত্র কল্যাণ ও কল্যাণ কমিশন, ১৯৬৭ সালের মাদরাসা শিক্ষা সেমিনারের কার্য বিবরণী, ১৯৬৯ সালের নূর খানের নতুন শিক্ষানীতি, ১৯৭০ সালের নতুন শিক্ষানীতি, ১৯৭২-৭৪ সালের কুদরত-ই-খুদার জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৫ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি, ১৯৭৭ সালের ড. আবদুল বারীর ইসলামিক এরাবিক বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি এবং সর্বশেষ ১৯৭৮ সারের ১৯৭৭ সালের ড. আবদুল বারীর ইসলামিক এরাবিক বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিসহ সকল কমিটির সকল সুপারিশ-পরামর্শ নিরসনকল্পে ১৯৭৮ সালের মাদরাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ জারি করেন। উপরোক্ত বিভিন্ন কমিশন/কমিটির বিক্ষিপ্ত প্রস্তাবনার মর্মানুযায়ী সদাশয় সরকার মাদরাসা শিক্ষার স্বায়ত্ত্ব শাসন প্রদান করে তার আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। মাদরাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ'৭৮ নিম্নরূপ :

যেহেতু বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষার পুনর্গঠন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু ১৯৭৫ সালের ২০ শে আগস্ট এবং ১৯৭৫ সালের ৮ই নভেম্বর এর ঘোষণার অনুসরণে এবং সেই সূত্রে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত অধ্যাদেশ জারি করতে সম্মত হয়েছেন :

**প্রথম অধ্যায়**

**প্রাথমিক কথা**

১.সংক্ষিপ্ত শিরোনামা : এ অধ্যাদেশ ১৯৭৮ সালের মাদরাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ নামে অভিহিত হবে।

২. সংজ্ঞা : বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এ অধ্যাদেশ

ক. 'আলিম মাদরাসা' অর্থ দাখিল এবং আলিম মানের জন্য স্বীকৃত এবং বোর্ডের অধিভূক্ত একটি প্রতিষ্ঠান।

খ. 'আলিম মান' অর্থ যে মানে দু'বছর মেয়াদী আলিম কোর্সের মাদরাসা শিক্ষা দান করা হয়।

গ. 'বোড' অর্থ এ অধ্যাদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড;

ঘ. 'চেয়ারম্যান' অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান।

ঙ. 'দাখিল মাদরাসা' অর্থ দাখিল মানের জন্য স্বীকৃত এবং বোর্ডের অধিভূক্ত একটি প্রতিষ্ঠান।

চ. 'দাখিল মান' অর্থ যে মানে দাখিল কোর্সের মাদরাসা শিক্ষা দান করা হয়।

ছ. 'ফাযিল মাদরাসা' অর্থ দাখিল, আলিম ও ফাযিল মানের জন্য স্বীকৃত এবং বোর্ডের অধিভূক্ত একটি প্রতিষ্ঠান।

জ. ফাযিল মান’ অর্থ যে মানে দ’বছর মেয়াদী ফাযিল কার্সের মাদরাসা শিক্ষা দান করা হয়।

ঝ. ‘ফুরকানিয়া মাদরাসা’ অর্থ ইবতেদায়ী মানের জন্য স্বীকৃত এবং বোর্ডের অধিভূক্ত একটি প্রতিষ্ঠান।

ঞ. ‘ইবতেদায়ী মাদরাসা’ অর্থ ইবতেদায়ী মানের জন্য স্বীকৃত এবং বোর্ডের অধিভূক্ত একটি প্রতিষ্ঠান।

ট. ইবতেদায়ী মান’ অর্থ যে মানে ইবতেদায়ী কোর্সের মাদরাসা শিক্ষা দান করা হয়।

ঠ. ‘কামিল মাদরাসা’ অর্থ দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মানের জন্য স্বীকৃত এবং বোর্ডের অধিভূক্ত একটি প্রতিষ্ঠান।

ড. ‘কামিল মান’ অর্থ যে মানে দু’বছর মেয়াদী কামিল কোর্সের মাদরাসা শিক্ষা দান করা হয়।

ঢ. ‘মাদরাসা’ অর্থ ইসলামী শাস্ত্র চর্চার জন্য সনাতন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ফুরকানিয়া মাদরাসা, ইবতেদায়ী মাদরাসা, দাখিল মাদরাসা, আলিম মাদরাসা, ফাযিল মাদরাসা এবং কামিল মাদরাসা এর অন্তর্ভূক্ত।

ণ. ‘মাদরাসা শিক্ষা’ অর্থ ইবতেদায়ী মান, দাখিল মান, আলিম মান, ফাযিল মান এবং কামিল মান সংক্রান্ত শিক্ষা এবং এর অন্তর্ভূক্ত আছে।

১. পবিত্র কুরআন পাঠ;

২. ইসলামিয়াত অর্থাৎ তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, কালাম, উসূল, মা’কুলাত, ফারায়েজ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ;

৩. মানবিক বিদ্যা যার অন্তর্ভূক্ত আছে আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস, সাধারণ ইতিহাস, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য;

৪. বিজ্ঞান

৫. বাণিজ্য

৬. কৃষি

৭. শিল্প

৮. সামরিক বিজ্ঞান

৯. শারীরিক শিক্ষা স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ

১০. সরকারের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করে এরূপ আর অন্যান্য যে সব কারিগরি ও বিশেষ শিক্ষা বোর্ড চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ত. ‘সদস্য’ অর্থ চেয়ারম্যান সহ বোর্ডের কোন সদস্য;

থ.'প্রজ্ঞাপন' অর্থ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন;

দ. 'নির্ধারিত' অর্থ এ অধ্যাদেশের আওতায় প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

ধ. 'রাষ্ট্রপতি' অর্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি;

ন. 'অধ্যক্ষ' অর্থ কামিল মাদরাসার শিক্ষক বৃন্দের প্রধান ব্যক্তি; তার পদবী যেভাবেই দেওয়া হোক না কেন;

প. 'প্রবিধান' অর্থ এ অধ্যাদেশের আওতায় বোর্ড কর্তৃক প্রনীত প্রবিধান;

ফ. 'তত্ত্বাবধায়ক' অর্থ কামিল মাদরাসা ব্যতীত অন্য যে কোন মাদরাসার শিক্ষক মন্ডলীর প্রধান ব্যক্তি তার পদবী যেভাবেই দেওয়া হোক না কেন।[২৭৬]

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা

১. এ অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পরে যথা সত্বর সরকার একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার সংগঠন, পরিচালন, তত্ত্বাবধায়ন, নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতির নিমিত্ত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড নামে একটি প্রতিষ্ঠা করেন।

২. স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহরসহ বোর্ড একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং প্রবিধানের বিধানসাপেক্ষে এর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও সংরক্ষণ করতে, অধিকারে থাকালীন এরূপ সম্পত্তি হস্তান্তর করতে, চুক্তি করতে এবং এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আর যা করা প্রয়োজন তা করতে ক্ষমতা লাভ করবে এবং এটা এ নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং এর বিরুদ্ধে এ নামে মামলা দায়ের করাও যাবে।

৩. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষার পরিচালন, তত্ত্বাবধায়ন, নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের ক্ষমতা বোর্ডে ন্যস্ত থাকবে।

৪. বোর্ডের গঠন

নিম্নে সদস্যগণ সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হবে, যেমন-

ক. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত চেয়ারম্যান;

খ. সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক মাদরাসা শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকার বলে;

গ. পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অথবা তাঁর মনোনীত কারিগরি শিক্ষার সহকারী পরিচালকের পদমর্যাদার নিম্নের নহে এমন একজন কর্মকর্তা;

ঘ. বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানগণের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত এক ব্যক্তি;

---

২৭৬ ৫ই নভেম্বর ১৯৮৫ সালের সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি ঃ নং শা/৯/৬/ এম.সি-১৩/৮৪/৭৪১ (১১১) শিক্ষা, অনুযায়ী আলিম শ্রেণীসমূহের মান উন্নীত হওয়ায় অধ্যাদেশের এই অংশটি দাখিল মাদরাসার ক্ষেত্রে প্রধান মুদাররিস এবং আলিমসহ উচ্চ পর্যায়ের সব মাদরাসা প্রধানকে অধ্যক্ষ হিসাবে স্বীকৃত দেয়া হয়।

ঙ. বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আরব ও ইসলামী শিক্ষার বিভাগীয় প্রধানগণের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত এক ব্যক্তি;

চ. সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সরকারী মাদরাসার অধ্যক্ষ;

ছ. সরকার কর্তৃক মনোনীত বে-সরকারী মাদরাসা সমূহের দু'জন অধ্যক্ষ;

জ. সরকার কর্তৃক মনোনীত বে-সরকারী মাদরাসা সমূহের দু'জন তত্ত্বাবধায়ক;

ঝ. সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা;

ঞ. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত মাদরাসা শিক্ষায় বিশেষভাবে নিবেদিত দু'জন ব্যক্তি।

৫. বোর্ডের সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ

১. এ অধ্যাদেশের বিধানসাপেক্ষে পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্য ব্যতীত অন্য সদস্যগণ ৫ ধারা মতে প্রজ্ঞাপনে তাদের নাম প্রকাশিত হবার তারিখ তারিখ হতে তিন বছর মেয়াদে বহাল থাকবেন এবং তাদের মেয়াদ শেষ হবার পরেও পুনঃনিযুক্ত বা পুনঃমনোয়নের জন্য তাঁরা যোগ্য বিবেচিত হবেন।

২. ৪ ধারার ঘ. থেকে ঝ. উপ-ধারার আওতায় সরকার কর্তৃক মনোনীতকোন ব্যক্তি যে পদের বলে তিনি মনোনীত হয়েছিলেন সে পদ হরালে সদস্যপদ হারাবেন।

৩. পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্যগণ ও চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্য যে কোন সদস্য চেয়ারম্যান বরাবরে লিখিত একটি পত্রযোগে তাঁর সদস্যপদে ইস্তফা দিতে পারবেন এবং চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রপতি বরাবরে লিখিত একটি পত্রযোগে তার সদস্যপদে ইস্তফা দিতে পারবেন, তবে শর্ত থাকে যে রাষ্ট্রপতি বা সরকার কর্তৃক তা গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইস্তফা কার্যকর হবে না।

৪. রাষ্ট্রপতি বা সরকার যে কোন সময় লিখিতভাবে কোন আদেশ প্রদান করে পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্য ব্যতীত নিযুক্ত বা মনোনীত যে কোন সদস্যকে তাঁর পদ হতে অপসারণ করতে পারবেন যদি রাষ্ট্রপতি বা সরকার জনস্বার্থে বা বোর্ডের স্বার্থে এরূপ অপসারণ প্রয়োজন বলে মনে করেন।

৫. ৪ ধারার গ. উপ-ধারা মোতাবেক কারিগরি শিক্ষা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত সদসকে সরকার যে কোন সময় লিখিতভাবে আদেশ প্রদান করে অপসারণ করতে পারবেন যদি মনে করা হয় যে, তার এরূপ অপসারণ জনস্বার্থে অথবা বোর্ডের স্বার্থে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

৭. সদস্য পদের অযোগ্যতা

১. কোন ব্যক্তি সদস্য হিসেবে মনোনীত বা নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন না যদি তিনি-

ক. উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অসুস্থ মনের অধিকারী বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকেন;

খ. একজন দেউলিয়া হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকেন।

গ. একজন দেউলিয়া হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হলেও আদালত হতে একটি সনদ এ মর্মে লাভ করতে পানে নি যে, তার পক্ষে কোন প্রকার অসদাচরন ব্যতিরেকে দুর্ভাগ্যবশতই তার দেউলিয়াত্ব ঘটেছে।

ঘ. আদালত কর্তৃক নৈতিক পদস্খল জনিত অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন যদি না যে অপরাধের কারণে তিনি দণ্ডিত হয়েছেন তা ক্ষমা করা হয়ে থাকে অথবা তার দণ্ডপ্রাপ্তির তারিখ হতে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে থাকে।

২. কোন ব্যক্তি যদি তার মনোনয়ন বা নিযুক্তির তারিখে ১. উপ-ধারায় বর্ণিত কোন একটিতে জড়িত হয়ে থাকেন তবে তার মনোনয়ন বা নিযুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. কোন সদস্য যদি ১. উপ-ধারায় বর্ণিত অযোগ্যতার কোন একটিতে জড়িত হয়ে পড়েন, তবে তার সদস্যপদ সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হবে।

৮. সাময়িক শূণ্য পদ পূরণ

১.১১ ধারার বিধান সাপেক্ষে কোন সদস্যের সদস্যপদ ইস্তফা, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে শূণ্য হলে ৪ ধারার সংশ্লিষ্ট উপ-ধারার বিধান মোতাবেক অন্য কোন ব্যক্তি তার শূণ্য পদে মনোনীত বা নিযুক্ত হবেন এবং পদটি শূণ্য না হলে সাবেক সদস্য যতদিন সদস্য হিসেবে বহাল থাকতেন এরূপ মনোনীত বা নিযুক্ত ব্যক্তি ততদিন ঐ সদস্যপদে বহাল থাকবেন।

২. ৬ ধারার ১. উপ-ধারায় নির্দিষ্ট তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও এ অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক নির্ধারিত মেয়াদ শেষে শূণ্য পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত একজন সদস্য তার কার্য চালিয়ে যাবেন।

৯. বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ

নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বোর্ডের কর্মকর্তা হবেন, যথা-

ক. চেয়ারম্যান

খ. রেজিস্ট্রার

গ. পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক

ঘ. মাদরাসা পরিদর্শক এবং

ঙ. বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হতে পারে এমন অন্য সকল কর্মকর্তা।

১০. পরিদর্শন

১. রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করে সরকার কোন ব্যক্তির দ্বারা বোর্ড পরিদর্শন করাতে পারেন এবং বোর্ডের কার্যক্রম ও তহবিল এবং বোর্ড পরিচালিত পরীক্ষা সম্পর্কে বোর্ডকে নির্দেশ দিতে পারেন এবং বোর্ডের যেকোন বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করাতে পারেন। সরকার এরূপ পরিদর্শন অথবা তদন্তের ফলাফল বোর্ডকে অবহিত করবন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করণীয় বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন। এরূপ পরামর্শ প্রাপ্তির পরে বোর্ড যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় বা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বোর্ড সে সমএর্ক সরকারকে অবহিত করবে এবং যে ক্ষেত্রে যুক্তসঙ্গত সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বোর্ড কোন কার্যকর ব্যবস্থা সরকারের সন্তুষ্টি মোতাবেক গ্রহণ করতে পারবে না সে ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বিবেচনা করে সরকার যেভাবে বিবেচনা করা উপযুক্ত মনে করবে সেভাবে নির্দেশ দিতে পারবেন এবং চেয়ারম্যান এরূপ নির্দেশ পালন করবেন।

২. উপ-ধারা ১ এর বিধান থাকা সত্ত্বেও বোর্ড বা এর কোন কমিটি কোন সিদ্ধান্ত এ অধ্যাদেশের বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে সরকার নিশ্চিত হলে রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করে সরকার লিখিতভাবে আদেশ প্রদান করে ঐ সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সরকার চেয়ারম্যানের মাধ্যমে এরূপ আদেশ কেন প্রদান করা হবে না বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কমিটিকে তার কারণ দর্শাতে বলবেন।

১১.চেয়ারম্যানের নিয়োগ, ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ

১. চেয়ারম্যান বোর্ডের একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হবেন এবং রাষ্ট্রপতি যে সকল র্ত স্থির করবেন সে শর্তে তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

২. ছুটি, পীড়া বা অন্য কোন কারণে অনধিক এক বছরের জন্য যখন সাময়িক বা অন্যভাবে চেয়ারম্যানের পদ শূণ্য হয়, তখন উপ-ধারা-১ এ যাই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব পালনের জন্য যেভাবে সক্ষম মনে করবেন সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩. চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী ও একাডেমিক কর্মকর্তা হবেন এবং বোর্ড সভা ও ১৮ ধারা মোতাবেক নিযুক্ত কমিটিসমূহের সভায় উপস্থিত থাকলে সেখানে সভাপত্বি করবেন।

৪. চেয়ারম্যানের কর্তব্য হবে এ অধ্যাদেশ ও প্রবিধানসমূহের বিধানসমূহ বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিপালিত এবং বাস্তবায়িত হলো। কিন্তু তা নিশ্চিত করা এবং তিনি এ উদ্দেশ্যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৫. বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যক্রমের মধ্য হতে উদ্ভুত কোন জরুরী অবস্থায় চেয়ারম্যানের মতে অবিলম্বে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হলে তিনি যেভাবে সঙ্গত মনে করবেন সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং পরবর্তী বোর্ড সভায় এটা অবগতির জন্য রিপোর্ট করবেন।

৬. সরকার কর্তৃক চেয়ারম্যানকে কোন ক্ষমতা অর্পণ করা হলে বা প্রবিধানে তাকে এরূপ কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হলে চেয়ারম্যান এরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

১২. বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

১. যেভাবে নির্ধারিত হবে সেভাবে চেয়ারম্যান ব্যতীত বোর্ডের অন্য সকল কর্মকর্তা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হবে।

২. যেভাবে নির্ধারিত হবে সেভাবে বোর্ডের অন্য সকল কর্মচারী চেয়ারম্যান কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

১৩. বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী

অধ্যাদেশের বিধানসাপেক্ষে বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়, ছুটি মঞ্জুরী ও অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়সহ তাদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারিত হবে।

১৪.চেয়ারম্যান ব্যতীত বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তার সাময়িক শূণ্য পদ পূরণ

চেয়ারম্যান ব্যতীত বোর্ডের অন্য কর্মকর্তাদের পদ অস্থায়িভাবে বা সাময়িকভাবে শূণ্য হলে তা যেভাবে নির্ধারিত হবে সেভাবে পূরণ করা হবে।

১৫. সভা পরিচালনা

বোর্ড বা কমিটির প্রত্যেক সভায় চেয়ারম্যান এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত কোন সদস্য সভাপতিত্ব করবেন এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়ে ভোটের অধিকারী হবেন এবং ভোট সমসংখ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তার একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকবে এবং তিনি তা প্রয়োগ করবেন।

১৬. ভোট প্রদানে সীমাবদ্ধতা

১. সভায় কোন সদস্যের ব্যাক্তিগত কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনা হলে (সকল মাদরাসার সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতীত) সে সদস্য সে বিষয়ে সে সভায় কোন ভোট প্রদান করতে পারবে না।

২. চেয়ারম্যান অথবা সভাপতির দায়িত্ব পালনরত কোন সদস্য ১ উপ-ধারার কারণে কোন সভায় উত্থাপিত কোন প্রশ্নের মীমাংসা করবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

১৭. বোর্ডের ক্ষমতা

১. এ অধ্যাদেশের বিধানসাপেক্ষে মাদরাসা শিক্ষার সংগঠন, পরিচালনা, তত্ত্বাবধায়ন, নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন এবং অগ্রগতিতে বোর্ডের ক্ষমতা থাকবে।

২. বিশেষভাবে এবং ১ উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার সার্বিকতা ক্ষুন্ন না করে বোর্ডের ক্ষমতা থাকবে ঃ

ক. এর পরীক্ষাসমূহের শিক্ষাধারা নির্ধারণ করতে;

খ. শিক্ষা অধিদপ্তর হতে বা নিজস্ব পরিদর্শন কর্মকর্তাদের নিকট হতে বা বোর্ডের পক্ষ হতে প্রেরি কোন কর্মর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত কোন পরিদর্শন প্রতিবেদন বিবেচনা করে মাদরাসাসমূহের অধিভূক্তি মঞ্জুর করতে বা স্থগিত করতে বা  প্রত্যাহার করতে;

গ. দাখিল মাদরাসা, আলিম মাদরাসা, ফাযিল মাদরাসা এবং কামিল মাদরাসার ছাত্র ভর্তি এবং বদলী সংক্রান্ত শর্তাবলী নির্ধারণ করতে;

ঘ. মাদরাসাসমূহ পরিদর্শনের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে;

ঙ. বোর্ডের নিজস্ব কর্মকর্তা অথবা এটা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে উপযুক্ত মনে করে তাদের দ্বারা এর অধিভূক্ত মাদরাসা প্রয়োজন বোধে পরিদর্শন করাতে;

চ. দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল, মুজাব্বিদ-ই-মাহির, মুজাব্বিদ-ই-ফাযিল এবং মুজাব্বিদ-ই-কামিল স্তর বা এর আর অন্য কোন স্তরের শেষ ভাগে পরীক্ষা গ্রহণ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে;

ছ. বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষাসমূহের ফলাফল প্রকাশ করতে;

জ. বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা সমূহে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে সনদ, ডিপ্লোমা ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে;

ঝ. দাখিল মাদরাসা, আলিম মাদরাসা, ফাযিল মাদরাসা ও কামিল মাদরাসাসমূহের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে অথবা পরিচালনা পরিষদ অথবা ব্যবস্থাপনা পরিষদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করতে বা  মীমাংসার ব্যবস্থা করতে;

ঞ. সরকারের নিকট বোর্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে মতামত পেশ করতে;

ট. বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা, পদবী এবং বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করতে এবং এ অধ্যাদেশের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বোর্ডের নিকট বা প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে সেভাবে বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা নিয়োগ করতে;

ঠ. পদ সৃষ্টি ও বাতিল সহ সকল প্রশাসনিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে;

ড. দাবি স্থির করতে এবং যেরুপ নির্ধারিত হবে সেরুপ ফিসগ্রহণ করতে;

ঢ. উৎসর্গীত সম্পদ ধারণ ও ব্যবস্থা করতে এবং স্কলারশীপ, স্টাইপেন্ড, পদক ও পুরস্কার প্রতিষ্ঠা ও বিতরণ করতে;

ণ. এ অধ্যাদেশ এবং প্রবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে চুক্তি করতে এবং তা বাস্তবায়ন করতে এবং অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে;

ত. এর কার্য সমাধার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ইমারত, প্রাঙ্গণ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পুস্তক ও অন্যান্য জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করতে;

থ. এ অধ্যাদেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য আর যা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হবে সে সকল কার্য সমাধা করতে;

৩.বোর্ড এর ক্ষমতাসমূহের কোন একটি চেয়ারম্যান বা বোর্ডের কোন কর্মকর্তা অথবা এ অধ্যাদেশের আওতায় নিযুক্ত কোন কমিটিকে যেভাবে সঙ্গত মনে হবে সেভাবে অর্পণ করতে পারবে।

তবে শর্ত থাকে যে অনুচ্ছেদ বলে প্রবিধান জারি করার কোন ক্ষমতা অর্পণ করা যাবে না।

১৮.বোর্ডের কমিটিসমূহ

১. বোর্ড নিম্নলিখিত কমিটিসমূহ নিয়োগ করবে, যথা-

ক. একাডেমিক কমিটি
খ. অর্থ কমিটি
গ. বাছাই কমিটি
ঘ. প্রবিধান কমিটি
ঙ. আপীল ও আর্বিট্রেশন কমিটি
চ. শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাধারা কমিটি
ছ. বিজ্ঞান শিক্ষা কমিটি
জ. কারিগরি শিক্ষা কমিটি
ঝ. শিল্প শিক্ষা কমিটি
ঞ. কৃষি শিক্ষা কমিটি
ট. বাণিজ্যিক শিক্ষা কমিটি
ঠ. শারীরিক শিক্ষা কমিটি
ড. নারী শিক্ষা কমিটি
ঢ. পরীক্ষা কমিটি
ণ. বয়স ও নাম সংশোধনী কমিটি
ত. ডিসিপ্লিন কমিটি এবং
থ. এরূপ আরও কমিটি বা কমিটিসমূহ যা বোর্ড এ অধ্যাদেশের বিধাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করে।

২. (১) উপ-ধারার আওতায় নিযুক্ত কমিটিগুলোর গঠন, ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ নির্ধারিত হবে।

১৯.বোর্ড সভা

১. বোর্ডের বাজেট সভা প্রতিবছর ৩১ শে মার্চ বা এর পূর্বে অনুষ্ঠিত হবে।

২. বোর্ডের কোন সভায় কোরামের পাঁচজন সদস্যের উপস্থিত থাকতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, কোরামের অভাবে মলতবি সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থ

২০.বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বাজেট প্রাক্কলন

১. বোর্ডের বাজেট সভায় রেজিস্ট্রার বিগত অর্থ বছরে বোর্ডের সম্পাদিত কার্যাবলীর একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং সে সাথে নির্ধারিত ফরমে পরবর্তী অর্থ বছরে বোর্ডের অনুমোদিত আয় ও ব্যয়ের একটি বাজেট প্রাক্কলনও দাখিল করবেন।

২. বোর্ডের দ্বারা গৃহীত হলে এ বাজেট প্রাক্কলন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হবে এবং পরবর্তীতে বোর্ড যেভাবে দাখিল করেছে সরকার সেভাবে তা অনুমোদন করতে পারবে অথবা চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে তাতে সরকার যেভাবে প্রয়োজন মনে করবেন সেভাবে তাতে সংশোধন করবেন।

২১. মাদরাসা শিক্ষা তহবিল

১. মাদরাসা শিক্ষা নামে একটি তহবিল সংগঠিত হবে যাতে জমা হবে-

ক. ৪৩ ধারামতে বোর্ডে যে সকল তহবিল স্থানান্তরিত বলে গণ্য;

খ. এ অধ্যাদেশের বিধান মতে আদায়কৃত সকল ফিস;

গ. উৎসর্গীকৃত সম্পদ হতে অথবা এ অ্যাদেশের উদ্দেশ্যে বোর্ডের অধিকারে বা ব্যবস্থাপনায় আছে এমন সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ;

ঘ. এ অধ্যাদেশে ব্যবস্থা আছে এমন যে কোন উদ্দেশ্য সরকার বা অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্ত অন্য সকল অর্থ;

২. মাদরাসা শিক্ষা তহবিল বোর্ডে ন্যস্ত হবে এবং এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আমানত হিসেবে এটা বোর্ডের দায়িত্বে এবং প্রশাসনে থাকবে।

৩. মাদরাসা শিক্ষা তহবিলে প্রদেয় সকল অর্থ বোর্ডের অনুমোদিত কোন তফসীলী ব্যাংকে বা সরকারি ট্রেজারিতে জমা করতে হবে।

২২. মাদরাসা শিক্ষা তহবিলের ব্যবহার

১. ২০ ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট প্রাক্কলনে কোন খরচের ব্যবস্থা না থাকলে বা বোর্ড কর্তৃক উপযোজনের মাধ্যমে এরূপ কোন ব্যবস্থা না করা হলে এবং এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধিত না হলে মাদরাসা শিক্ষা তহবিল হতে কোন ব্যয় করা যাবে না।

২. ১ উপ-ধারা সাপেক্ষে মাদরাসা শিক্ষা তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাবে-

ক. নিরীক্ষা ব্যয় মিটাতে;

খ. বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান করতে;

গ. এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে কাগজপত্র ও অন্যান্য দলিল প্রতাদির মুদ্রণ কার্য সম্পর্কিত সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহ করতে;

ঘ. বোর্ড ও কমিটির সদস্যদের ভাতা প্রদান করতে;

ঙ. বোর্ডের পরীক্ষা অনুষ্ঠান, পরিচালনা এবং এর উদ্দেশ্য কার্যকর করা উপলক্ষ্যে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত  ব্যক্তিগণের পারিশ্রমিক প্রদান করতে;

চ. আনুষঙ্গিক ও মূলধন ব্যয় মিটাতে;

ছ. এ অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে এবং এর উদ্দেশ্য কার্যকর করা উপলক্ষ্যে বোর্ডের অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় মিটাতে।

২৩. হিসাব

নির্ধারিতভাবে এবং নির্ধারিত ফরমে বোর্ড-এর প্রাপ্তি ও খরচের হিসাব সংরক্ষণ করবে।

২৪.নিরীক্ষা

১. প্রতিবছরে একবার বোর্ডের হিসাব সরকারের নিকট দাখিল করতে হবে এবং সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক দ্বারা এ হিসাব পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হবে।

২. বোর্ড এবং এর প্রত্যেক সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কর্তব্য হবে বোর্ডের হিসেব পরী্ক্ষা ও নিরীক্ষায় নিরীক্ষককে সকল প্রকার সযোগ প্রদান করা এবং নিরীক্ষকের যাবতীয় অধিযাচন রক্ষা করা।

২৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদন

১. নিরীক্ষক হিসাব নিরীক্ষান্তে একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করবেন এবং সে সঙ্গে বোর্ডের নিকট এ প্রতিবেদনের দু' প্রস্থ প্রেরণ করবেন। অতঃপর নির্ধারিত সময় কালের মধ্যে বোর্ড প্রতিবেদনের এক প্রস্থ এর মতামতসহ সরকারের নিকট অগ্রায়ন করবে।

২. ২৭ ধারার বিধান সাপেক্ষে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর যেভাবে সঙ্গত মনে করবেন সরকার সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৬. অগ্রাহ্যকরণ

১. নিরীক্ষক

ক. আপাতত প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে যে ব্যয় করা হয়েছে তা অগ্রাহ্য করবে এবং যে ব্যাক্তিগণ এরূপ ব্যয় করেছে বা কতে ক্ষমতা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অর্থ দায়ধারা করবে।

খ. যে ব্যক্তির অক্ষমতা বা অবহেলার কারণে ঘাটতি বা ক্ষতি হয়েছে তার বিরুদ্ধে ঐ অর্থ দায়ধারা করবে।

২. এ ধারায় অগ্রাহ্যকরণ ও দায়ধারার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিরীক্ষক লিখিতভাবে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তার কাছে কত অর্থ পাওনা আছে তা প্রত্যয়ন করবেন এবং এরূপ প্রত্যয়ন পত্রের এক প্রস্থ তিনি বোর্ডের নিকট এবং আরেক প্রস্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ২৫ (১) ধারায় উল্লিখিত প্রতিবেদন বোর্ডে যে তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে তার চৌদ্দ দিনের মধ্যে প্রেরণ করবেন।

২৭. আপীল

১. নিরীক্ষক কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২৬ ধারা মোতবেক কোন অর্থ দায়ধারা করে কোন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করলে সে ব্যক্তির এ প্রত্যয়নপত্রের এক প্রস্থ প্রাপ্তির তারিখের এক মাসের মধ্যে এরূপ আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপীল করতে পারবে।

২. এভাবে আপীল করা হলে সরকার আপীল দায়েরকারী ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ প্রদান করে যেরূপ সঙ্গত মনে হবে সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এরূপ আপীলের ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

২৮. প্রত্যয়নকৃত অর্থ আদায়

১. ২৬ ধারা মতে কোন ব্যক্তির নিকট্‌ত্যয়নকৃত পাওনা অর্থ এই ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্রের একপ্রস্থ প্রাপ্তির তারিখ হতে এক মাসের মধ্যে ২৭ ধারা মোতাবেক আপীল করা না হলে তাকে ঐ অর্থ সময়ের মধ্যে মাদরাসা শিক্ষা তহবিলে জমা দিতে হবে।

২. বোর্ড নির্দেশ দিতে পারে যে (১) উপ-ধারা মোতাবেক যে পাওনা অর্থ প্রদত্ত হবে না বা ২৭ ধারা মোতাবেক যদি কোন আপীল দায়ের করা না হয়ে থাকে তবে সরকার যে অর্থ পাওনা বলে আদেশ দিবেন সে অর্থ আদায় করা হবে।

ক. সরকারি কর্মচারী বা বোর্ডের কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে নির্ধারিত হতে পারে এরূপ শর্তে তার বেতন বিল হতে কর্তন করে অথবা গণদাবি হিসেবে এবং

খ. অন্যান্য ক্ষেত্রে গণদাবি হিসেবে।

৩. ১৯১৩ সালের গণদাবি আদায় আইনের (১৯১৩) সালে বঙ্গ আইন নং (৩) ৪ ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক এমন ব্যক্তি বরে গণ্য হবেন যার অনুকূলে এরূপ পাওনা অর্থ প্রদেয় এবং এরূপ দাবির প্রেক্ষিতে কোন অর্থ আদায় করলে তা তিনি বোর্ডকে প্রদান করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবিধ

২৯. মাদরাসা শিক্ষকগণের চাকরির সাধারণ শর্তাবলী

১. কোন অধিভুক্ত মাদরাসার একজন কর্মচারী নিম্নলিখিত চাকিরির সাধারণ শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ থাকবেন, যথা-

ক. তিনি কোন রাজনৈতিক আন্দোলন, বা যে কোন কর্মকান্ডে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টিতে উত্তেজনা প্রদান করে এমন কোন কাজে অংশগ্রহণ করতে বা এর সহায়তায় চাঁদা দিতে বা অন্য কোন উপায় সহায়তা করতে পাবেন না অথবা বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রণীর নাগরিকের মধ্যে কোন ঘৃণা বা শক্রুতা মূলক মনোভাব সৃষ্টি করতে বা জনগণের শান্তি বিঘ্নত করতে পারবে না।

খ. তিনি বাংলাদেশের কোন স্থানীয় সরকার বা আইন সভার কোন নির্বাচনে প্রচার চালাতে বা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে বা প্রভাব খাটাতে বা প্রার্থী হিসেবে দাড়াতে পারবেন না।

২. (১) উপ-ধারা মোতাবেক কর্তৃপক্ষের আদেশের দরুন ক্ষুব্দ যে কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যানের নিকট আপীল করতে পারে এবং তিনি যেভাবে সঙ্গত মনে করবেন সেভাবে এ আপীলের প্রেক্ষিতে আদেশ দান করবেন এবং এরূপ আদেশ চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৩০. কতিপয় ব্যক্তিকে গণকর্মচারী বলে ধরে নেওয়া বোর্ড এবং এ অধ্যাদেশ মোতাবেক নিযুক্ত প্রতিটি কমিটির সদস্যগণ এবং এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি দন্ডবিধির (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) ২১ ধারা মোতাবেক একজন গণকর্মচারী বলে গণ্য হবেন।

১.অবমুক্তি

সরকার বা বোর্ড বা কোন কমিটি বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ অধ্যাদেশের আওতায় সরল বিশ্বাসে কৃত বা করতে ইচ্ছাকৃত কোন কাজের জন্য কোন মামলা দায়ের বা অভিযোগ আনয়ন বা কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

৩২. বৈধকরণ

এ অধ্যাদেশের আওতায় কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বাতিল বলে গণ্য হবে না, শুধুমাত্র এ অজুহাতে যে-

ক. বোর্ডের সংগঠনে বা এ অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত কোন কমিটির সংগঠনে কোন পদ শূণ্য ছিল বা কোন ত্রুটি ছিল।

খ. বোর্ডের কোন সদস্য ১৬ ধারার বিধান লংঘন করে কোন বিষয়ে ভোট প্রদান করেছে, অথবা

গ. বিষয়টির গুণাগুণ ক্ষুন্ন না হলেও এতে ত্রুটি বা অনিয়ম আছে।

৩৩. অবসর ভাতা (পেন্সন) এবং ভবিষ্যৎ তহবিল বা অংশীদারী ভবিষ্যৎ তহবিল

১. নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে যেভাবে সঙ্গত মনে হবে সেভাবে বোর্ড এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণার্থে পেন্সন এবং ভবিষ্যৎ তহবিল অথবা অংশীদারী ভবিষ্যৎ তহবিল প্রতিষ্ঠা করবে।

২. বোর্ড যদি (১) উপ-ধারা মোতাবেক একটি অংশীদারী ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন করে তবে বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিজ বেতনের শতকরা ৮.৫ ভাগ অর্থেরসমান অর্থ চাঁদা হিসেবে এ তহবিলে প্রতিমাসে জমা দিতে এবং বোর্ডও প্রতিমাসে প্রত্যেক চাঁদা দাতার জন্য সমপরিমাণ চাঁদার অর্থ প্রদান করবে।

৩. এ তহবিলে কর্মচারীদের চাঁদা জমা দেওয়া এবং সমপরিমাণ চাঁদার অর্থ বোর্ডের পক্ষ হতে দান এবং এ তহবিল হতে অর্থ উত্তোলন ও আগাম অর্থ গ্রহণ সম্পর্কিত শর্তাবলী নির্ধারিত হবে।

৩৪. অবসর গ্রহণের বয়স

একজন সরকারি কর্মচারী যে বয়সে অবরস গ্রহণ করে, চেয়ারম্যান ব্যতীত বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সে বয়স যেদিন হবে সে দিনের অপরাহ্নে তার অবসর গ্রহণ হবে।

৩৫. আনুতোষিক

১. কোন কর্মকর্তা  ও কর্মচারী অসময়ে মৃত্যুবরণ করলে বা চাকুরীরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় পঙ্গু হলে বা পীড়িত হলে বোর্ড তাকে বোর্ডের অধীনে তার চাকুরীকালের প্রতি পূর্ণ বৎসরের জন্য এক মাসের বেতনের সমান অর্থ আনুতোষিক হিসেবে প্রদান করবে।

২. (১) উপ-ধারার আওতায় প্রদেয় আনুতোষিকের শর্তাবলি নির্ধারিত হবে।

৩৬. বোর্ডের সাথে চুক্তি করতে সদস্যদের বাধা

কোন সদস্য বোর্ডের সাথে প্রত্যক্ষভাবে অ অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বোর্ডের কোন বিষয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে না।

৩৭. বোর্ডের সাথে আর্থিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বোর্ডের বা কোন কমিটির সদস্যপদ প্রাপ্তিতে বাধা

বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত কোন পরীক্ষায় পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন পুস্তকে আর্থিক স্বার্থ আছে অথবা এরূপ কোন পুস্তকের প্রকাশক, সংগ্রাহক বা সরবরাহকারী কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসেবে আর্থিক স্বার্থ আছে এমন কোন ব্যক্তি বোর্ড অথবা এ অধ্যাদেশের আওতায় নিযুক্ত হকোন কমিটির সদস্য হবার যোগ্য হবে না এবং এরূপ স্বার্থ লাভের পরে আর সদস্য হিসেবে কাজ করতে পারবে না।

৩৮. প্রবিধান

১.বোর্ড সরকারের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করে এ অধ্যাদেশের বিধানসমূহ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

২. বিশেষভাবে এবং (১) উপ-ধারায় প্রদত্ত সার্বিক ক্ষমতায় কোন প্রকার বিঘন সৃষ্টি না করে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রত্যেকটি অথবা কোন একটি সম্পর্কে বোর্ড প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারে, যথা-

ক. বোর্ডের কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ ;

খ. বোর্ড এবং কমিটির সভা পরিচালনা;

গ. সনদ, ডিপ্লোমা এবং প্রত্যয়নপত্র প্রদান এবং প্রত্যাহার;

ঘ. সনদ, ডিপ্লোমা এবং প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ;

ঙ. মাদরাসাসমূহের অধিভুক্তি প্রদান , স্থগিত  এবং প্রত্যাহারকরণ;

চ. অধিভুক্ত বেসকারি কামিল মাদরাসা ও ফাযিল মাদরাসার পরিচালনা পরিষদ বা অধিবুক্ত বেসরকারি: দাখিল মাদরাসা ও আলিম মাদরাসা ব্যবস্থাপনা পরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

ছ. অধিভুক্ত বেসরকারি মাদরাসাসমূহের শিক্ষকগণের চাকুরীর শর্তাবলী;

জ. বোর্ডের পরীক্ষাসমূহে প্রার্থদের অংশগ্রহণের জন্য এবং সনদ, ডিপ্লোমা ও প্রত্যয়নপত্রের জন্য পালনীয় শর্তাবলী; পরিদর্শনের পদ্ধতি ও ধরণ;

ঞ. বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য প্রদেয় ফিসের দাবি ও আদয়;

ট. বোর্ডের সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং পরিচালন;

ঠ. বোর্ড কর্তৃক সম্পত্তি অধিকারে আনয়ন, দখলে রাখা এবং হস্তান্তর, এরূপ অধিকার, দখল ও হস্তান্তরের শর্তাবলী এবং ৩ ধারার ২ উপ-ধারায় উল্লিখিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন;

ড. চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্য সকল কর্মকর্তার বোর্ড কর্তৃক নিয়োগদান পদ্ধতি;

ঢ. বোর্ডের কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কর্মচরীদেরকে চেয়ারম্যান কর্তৃক নিয়োগদান পদ্ধতি;

ণ. বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, ছুটি মঞ্জুরি এবং অবসর গ্রহণসহ চাকুরীর শর্তাবলী;

ত. ১৪ ধারা মতোবেক বোর্ডের কর্মকর্তাদের অস্থায়ী ও সামরিক শূণ্যপদ পূরণের পদ্ধতি;

থ. বোর্ডের অনুমিত আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বিবরণী ফরমএবং যে সময়ের মধ্যে বাজেট প্রাক্কলন সরকারের নিকট অগ্রায়ন করতে হবে;

দ. হিসাব ম্যানুয়েল প্রস্তুতকরণ অথবা বোর্ডের প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণের পদ্ধতি ও ফরম নির্ধারণ;

ধ. যে সময় কালের মধ্রে বোর্ডের সমামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি সরকারের নিকট অগ্রায়ন করতে হবে;

ন. পেন্সন এবং ভবিষ্যৎতহবিল বা অংশীদারী ভবিষ্যৎ তহবিলের সুবিধা লাভের পদ্ধতি ও শর্তাবলী;

প. আনুতোষিকের শর্তাবলী;

ফ. বোর্ড এবং কমিটির সভায় যোগদানের জন্য সদস্যগণকে দেয় ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা;

ব. ২৫ ধারা মতে যে সময় কালের মধ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর বোর্ডের মতামত সরকারে নিকট দাখিল করতে হবে এবং

ভ. অন্যান্য আর সকল বিষয় যা প্রতিধান দ্বারা নির্ধারিত হবে হবে বা হতে পারে;

৩. এ ধারামতে প্রণতি সকল প্রবিধান সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হবে এবং এরূপ প্রকাশনার সময় হতে এগুলো কার্যকর হবে।

৩৯. প্রথম প্রবিধান

অ অধ্যাদেশে সংযোজিত ও তপসিলে বর্ণিত প্রবিধাসমূহ এ অধ্যাদেশ প্রবর্তনের সময় হতে বোর্ডের প্রথম প্রবিধানসমূহ বলে ধরা হবে এবং ৩৮ ধারা মোতাবেক এগুলো প্রণীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

৪০. বিধিসমূহ

বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিসমূহ বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে এ অধ্যাদেশ এবং প্রবিধানসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিধি প্রণয়ন করতে পারে।

ক. যাতে থাকবে এগুলো সভা পরিচালনায় কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তা এবং কোরামের জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা এবং

খ. আরও থাকবে এরূপ কমিটি সংক্রান্ত সকল বিষয় এবং যা এ অধ্যাদেশ এবং প্রবিধানসমূহে উল্লিখিত হয়নি।

৪১. সাময়িক ব্যবস্থা

যতদিন পর্যন্ত চেয়ারম্যান ব্যতীত সকল সদস্য মনোনীত বা নিযুক্ত না হবে ততদিন পর্যন্ত চেয়ারম্যান, সময় সময় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ সাপেক্ষে, বোর্ডের এবং এ অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত কমিটিসমূহের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন এবং সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

৪২. অসুবিধা দূরীকরণ

বোর্ডের প্রতিষ্ঠা বা বোর্ডের প্রথম সভা উপলক্ষ্যে বা এ অধ্যাদেশের বিধানসমূহ কার্যকর করতে কোন প্রকার অসুবিধা দেখা দিলে সরকার এ অধ্যাদেশের সাথে সঙ্গতি রেখে অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে যা প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হবে সেভাবে যে কোন আদেশ দিতে পারবেন।

৪৩. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ইত্যাদির বাতিলকরণ

বোর্ডের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার অব্যহতি পূর্বে যে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড চালু ছিল যা এখন হতে বালিত বোর্ড বলে উল্লেখ করা হবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এরূপ বাতিলের সঙ্গে-

ক. এর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং সকল স্থাবর বা অস্থাবর নগদ বা ব্যাংক ব্যালান্স, তহবিল, বিনিয়োগ এবং বাতিলের অব্যবহিত পূর্বে বাতিল বোর্ডের অন্য যে সকল স্বার্থ ও অধিকার যা এরূপ সম্পত্তিতে ছিল বা তা হতে উদ্ভুত, এ সকল কিছুই বর্তমান প্রতিষ্ঠিত বোর্ডে স্থানান্তরিত ও ন্যস্ত হবে।

খ. এর সকল ঋণ, বাধ্যবাধকতা ও দায়, সকল আবদ্ধচুক্তি এবং কৃত হবে এরূপ সকল বিষয় ও জিনিস যা বাতিল হবার অব্যবহিত পূর্বে বাতিল বোর্ড কর্তৃক বা দ্বারা বা জন্য কৃত হওয়ার কথা ছিল তার সব কিছুই বোর্ডের দ্বারা, কর্তৃক বা জন্য কৃত হয়েছে বা আবদ্ধ হয়েছে বা যুক্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

গ. কোন চুক্তি বা সম্মতিপত্র বা চাকুরীর শর্তাবলীতে যা-ই থাকুক না কেন বাতিল বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরী বোর্ডে স্থানান্তরিত হবে এবং বাতিল বোর্ডে তাদের চাকুরীর যে শর্তাবলী ছিল সে একই শর্তাবলীতে তারা বোর্ডের দ্বারা নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলে গণ্য হবেন তবে তাদের অসুবিধা সৃষ্টি না করে বোর্ড কর্তৃক সে সকল শতাবলী পরিবর্তন করা হয়ে থাকলে তা স্বতন্ত্র কথা।

ঘ. বাতিলের পূর্বে বাতিল বোর্ডের দ্বারা বা বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মোকদ্দমা এবং অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা বোর্ডের দ্বারা বা বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

**তফসীল**

**বোর্ডের প্রথম প্রবিধানসমূহ**

১.বোর্ড বা এ অধ্যাদেশের অধীন গঠিত কোন কমিটির সিদ্ধান্ত বা আদেশ চেয়ারম্যান তার সুপারিশসহ সরকারের নিকট সরকার যেভাবে সঙ্গত মনে করবেন সেভাবে আদেশের জন্য অগ্রায়ন করতে পারবেন এবং এরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশের প্রেক্ষিতে সরকারের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান বোর্ডের এরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখতে পারবেন।

২. বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যাতে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তা নিশ্চিত করতে চেয়ারম্যান সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং বিশেষভাবে তিনি-

ক. বোর্ডের কর্মকর্তাদের আচরণ, চরিত্র ও দক্ষতা সম্পর্কে গোপনীয় প্রতিবেদন লিখবেন।

খ. বোর্ডের যে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী বিবেচনা করলে তিনি বোর্ডে তার সুপারিশ করবেন।

গ. বোর্ডের নিকট আপীল সাপেক্ষে বোর্ডের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হলে তিনি তার বিরুদ্ধে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩. চেয়ারম্যান বোর্ডের কর্মকর্তা ও সদস্যদের (নিজের বিলসহ) এবং এ অধ্যাদেশের অধীনে নিযুক্ত কমিটির সদস্যদের ভ্রমণভাতা বিলে প্রতি স্বাক্ষর করবেন।

৪. এ অধ্যাদেশের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অধিবুক্ত কোন মাদরাসা বা অধিবুক্তির জন্য আবেদন করেছে এমন মাদরাসার বিষয় সম্পর্কে চেয়ারম্যান পরিদর্শণ করতে  অথবা বোর্ডের কোন কর্মকর্তা অথবা তিনি যাকে উপযুক্ত মনে করেন এমন ব্যক্তি দ্বারা পরিদর্শন করাতে ক্ষমতা লাভ করবেন এবং একইভাবে বোর্ড সংক্রান্ত কোন বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করাতে পারবেন।

৫. চেয়ারম্যান বোর্ডের পরীক্ষা উপলক্ষে প্রশ্নপত্র প্রণেতা, প্রশ্নপত্র সমন্বয়কারী, অনুবাদক, পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, সহকারী প্রধান পরীক্ষক, নিরীক্ষক এবং ফল বিন্যাসকদের পরীক্ষা সুপারিশ বিবেচনা করে নিয়োগ করবেন।

৬. যারা কামিল পাস করেছে তাদের সনদে চেয়ারম্যান দস্তখত করবেন এবং তা প্রদান করবেন।

৭. চেয়ারম্যান লিখিতভাবে বোর্ডের কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনভোধে তার কোন ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন, তবে শর্ত থাকে এটা অধ্যাদেশের বিধান বা প্রবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না।

২. রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১. রেজিস্ট্রার চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে বোর্ড অফিসের ভারপ্রাপ্ত হবেন এবং বোর্ড চেয়ারম্যানের আদেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবেন।

২. রেজিস্ট্রার নিম্নলিখিত ক্ষমতা ভোগ ও দায়িত্ব পালন করবেন যেমন :

ক. তিনি সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিশ্চিত করবেন যে, বোর্ডের তহবিল যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধার্য করা আছে সে উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হয়েছে।

খ. তিনি বার্ষিক হিসাব ও বাজেট বিবরণী প্রস্তুত করাবেন এবং বোর্ডের অনুমোদনের জন্য তা পেশ করবেন।

গ. তিনি চেয়ারম্যানের নির্দেশক্রমে বোর্ড ও কমিটির সকল সভা আহ্বান করবেন। বোর্ড অথবা কমিটির সভার আলোচ্যসূচি প্রণয়নের সময় এ উপলক্ষে চেয়ারম্যানের নির্দেশ কার্যকর করবেন এবং চেয়ারম্যানের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে আলোচ্য সূচিতে কোন বিষয় স্থান পাবে না বা সভায় বিবেচনা করা যাবে না।

ঘ. তিনি চেয়ারম্যানের কর্তৃত্বাধীন পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত পতযোগাযোগ ব্যতীত বোর্ডের সকল দাপ্তরিক পত্রযোগাযোগ করবেন এবং বোর্ড ও কমিটিসমূহের সভার আলোচনা লিখে রাখবেন এবং কার্য বিবরণীর কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

ঙ. বোর্ডকে প্রদেয় সকল ফিস ও পাওনা এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ বোর্ডের অনুমোদিত কোন তপসিলী ব্যাংকে অথবা সরকারি ট্রেজারিতে বোর্ডের হিসেবে অবিলম্বে জমা হবে।

চ. তিনি বোর্ডের কর্মচারীদের ব্যয়ন কর্মকর্তা হবেন এবং তিনি সঠিকভাবে কর্তন ও আদায়ের জন্য দায়ী থাকবেন এবং দেখবেন যে, এরূপ অর্থ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের তহবিলের সঠিক হিসেবের খাতে জমা হয়েছে কিনা।

ছ. তিনি আয়ন কর্মকর্তা হবেন এবং চেয়ারম্যানের সাথে যুগ্মভাবে ৫০০ টাকার উর্ধ্বে একটি আইটেম অনধিক ৫০০ টাকা ও তার নিচের সকল চেকে রেজিস্ট্রার একাই সই করবেন।

জ. তিনি বোর্ডের ২,৫০০ টাকার স্থায়ী অগ্রিম অর্থের অভিভাবক হবেন এবং এক সময় একটি আইটেমে অনধিক ৫০০ টাকা খরচ করতে পারবেন। যে কোন অস্বাভাবিক ব্যয় এবং ৫০০ টাকার উর্ধ্বে যে কোন ব্যয়ের পূর্বে চেয়ারম্যানের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

ঝ. অনুচ্ছেদ (জ) তে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে তিনি সকল আনুষঙ্গিক ও অন্যান্য বিলের অর্থ আয়ন-ব্যয়ন করবেন।

ঞ. তিনি বোর্ডের কর্মচারীদের ভ্রমণভাতা বিলের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হবেন।

ট. চেয়ারম্যান কর্তৃক অন্য আর যে সকল দায়িত্ব প্রদত্ত হবে তা তিনি পালন করবেন।

৩. এ প্রবিধানের পরিপন্থী কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও বোং অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণকে মাঝে মাঝে যখন প্রয়োজন হয় রেজিস্ট্রারের কোন কোন ক্ষমতা অপর্ণ করতে পারে।

৩. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১. পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রন সাপেক্ষে বোর্ডের পরীক্ষা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন এবং বোর্ডের পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠান ও পরিচালনার সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২. বিশেষ করে এবং আগের বিধানের সার্বিকতা ক্ষুন্ন না করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিম্নলিখিত ক্ষমতা ভোগ ও দায়িত্ব পালন করবেন, যেমন ঃ

ক. তিনি বোর্ডের পরীক্ষসমূহে অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার দাখিল ফর গ্রহণ করবেন এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় পতযোগাযোগ করবেন এবং প্রবিধান মোতাবেক সকল দলিলপত্র জারি করবেন।

খ. তিনি দায়ী থাকবেন-

১. যথাসময়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, অনুবাদন, সমন্বয়করণ, মুদ্রণ এবং সকল স্তরে এগুলোর নিরাপদ রক্ষণ এবং বিষয়বস্তুর গোপনীয়তা রক্ষার জন্য;

২. সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে যথাসময়ে সঠিকভাবে প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষা মালামাল বিতরণের জন্য;

৩. সকল কেন্দ্র হতে সকল উত্তরপত্র, পরীক্ষার অবশিষ্ট মালামাল, লিখিত কাগজপত্র ও অন্যান্য দলিলাদি সংগ্রহের জন্য;

৪. পরীক্ষকগণের সভা অনুষ্ঠান, উত্তরপত্র পরীক্ষকগণের মাঝে বিতরণ এবং পরীক্ষকগণের নিকট হতে নম্বর দেওয়া উত্তরপত্র ও নম্বর ফর্দ সংগ্রহের জন্য;

৫. নম্বর দেওয়া উত্তরপত্রগুলো প্রধান পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণ, তাদের নিকট হতে নম্বর সংগ্রহ এবং তা সংশ্লিষ্ট ফল বিন্যাসকদের নিকট প্রেরণের জন্য;

৬. ফল বিন্যাসকদের নিকট হতে বিন্যাস্ত ফলাফল গ্রহণের জন্য;

৭. যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশ করার জন্য;

৮. উত্তীর্ণ প্রার্থীগণকে যথাসময়ে প্রত্যয়নপত্র ও ডিপ্লোমা প্রদানের জন্য;

গ. তিনি দাখিল, আলিম, ফাযিল সনদে ও ডিপ্লোমায় দস্তখত করবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সনদ প্রদান করার ক্ষমতা পরীক্ষসমূহের উপ-নিয়ন্ত্রক অথবা সহকারী নিয়ন্ত্রকের বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হতে পারে।

ঘ. তিনি বোর্ডের পরীক্ষাসমূহের সকল তথ্য সম্পর্কে কাঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করবেন।

ঙ. তিনি নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা কমিটির সুপারিশ চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করবেন-

১. নতুন পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা ও প্রয়োজন বোধে পুরাতন পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করাসহ পরীক্ষার কেন্দ্র নির্বাচন এবং

২. অন্য সকল বিষয় যা তিনি প্রয়োজন মনে করেন এবং যে বিষয় সম্পর্কে চেয়ারম্যান তার নিকট কিছু জানতে চান।

চ. চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর উপর আরও অর্পিত হতে পারে এরূপ সকল দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।

ছ. পরীক্ষা বিধি লংঘনের সকল ঘটনা ব্যবস্থা গ্রহেণের জন্য পূর্ণ প্রতিবেদনসহ চেয়ারম্যানের গোচরীভূত করবেন।

জ. কোন সভার আলোচ্য সূচিতে বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকলে তিনি সে সকল সভায় যোগদান করবেন।

৪. একাডেমিক কমিটির গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১. একাডেমিক কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হবে ঃ

ক. চেয়ারম্যান- পদাধিকার বলে

খ. সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক, মাদরাসা শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত-পদাধিকার।

গ. পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা, অথবা ৪ ধারার (সা.) উপধারা অনুযায়ী তাঁর মনোনীত কোন কর্মকর্তা-পদাধিকার।

ঘ. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড বা তাঁর মনোনীত বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের কোন কর্মকর্তা।

ঙ. ৪ ধারার (ঙ) উপ ধারা মতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি।

চ. ৪ ধারার (চ) উপ ধারা মতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি।

ছ. বেসরকারি মাদরাসাসমূহের অধ্যক্ষগণের মধ্য হতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দু'ব্যক্তি।

জ. সরকারি ডিগ্রী কলেজসমূহের অধ্যক্ষগণের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত এক ব্যক্তি।

ঝ. বেসরকারি মাদরাসাসমূহের তত্ত্বাবধায়কগণের মধ্য হতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত এক ব্যক্তি।

ঞ. সরকার কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিশেষজ্ঞসহ তিন জন বিশেষজ্ঞ।

২. বোর্ডের রেজিস্ট্রার একাডেমিক কমিটির সচিব হবেন।

৩. পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্য ব্যতীত একাডেমিক কমিটির অন্য সদস্যগণ দু'বছর সময় কালের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

৪. একাডেমিক কমিটির সভার কোরামের জন্য পাঁচজন সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে।

৫. একাডেমিক কমিটি শিক্ষা ও পরীক্ষার মান বজায় রাখার জন্য দায়ী থাকবে এবং এ দু'য়ের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধায়নের ক্ষমতা লাভ করবে।

৬. উপ-প্রবিধান (৫) এর বিধানের সার্বিকতা ক্ষুণ্ন না করে একাডেমিক কমিটি নিম্নলিখিত ক্ষমতা ভোগ  এবং দায়িত্ব পালন করবে, যথা-

ক. এটা শিক্ষাদান ও পরীক্ষার মান বজায় রাখবে।

খ. প্রতিটি পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাধারা কমিটিতে কোন বিষয় বা বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে তা স্থির করবে।

গ. এটা শিক্ষকবৃন্দ ও পরীক্ষকগণের যোগ্যতা সম্বন্ধে চেয়ারম্যানকে পরামর্শ দিবে।

ঘ. এটা বোর্ডকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সকল একাডেমিক বিষয়ে পরামর্শ দান করবে-

১. পরীক্ষার জন্য পঠিতব্য সকল বিষয়ের সাধারণ পরিকল্পনা

২. পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য বিষয়ের সংখ্যা।

৩. প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্ধারণ যোগ্য নম্বর

৪. পরীক্ষা পাস এবং কোন বিশেষ বিভাগে পাসের জন্য যে শর্তাবলী পূরণ করতে হবে।

৫. শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাধারা কমিটির গঠন ও কার্যাবলী

১. বোর্ড কর্তৃক সংগঠিত শিক্ষাধারার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয় বা বিষয় সমষ্টির জন্য একটি করে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাধারা কমিটি থাকবে। এরূপ প্রতিটি কমিটি নিম্নরুপ গঠিত হবে ঃ

ক. চেয়ারম্যান-পদাধিকার বলে
খ. একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত কামিল স্তরে বিষয়টির দু'জন শিক্ষক।
গ. একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত ফাযিল স্তরে বিষয়টির দু'জন শিক্ষক।

ঘ. বোর্ড কর্তৃক মনোনীত মাদরাসা শিক্ষায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দু'ব্যক্তি।

ঙ. চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ।

চ. বোর্ডের রেজিস্ট্রার পদাধিকার বলে;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না পাওয়া যায় তবে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাধারা কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করতে পানে যা নয় হতে কম হতে পারে  এবং যারা শিকষক নন অথচ যোগ্য এমন ব্যক্তিদেরকেও তিনি কোন বিশেষ বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাধারা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়নের অনুমতি দিতে পারেন।

২. পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্যগণ ব্যতীত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাধারা কমিটির অন্য সদস্যগণ দু'বছর মেয়াদে বহাল থাকবেন।

৩. শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাদারা কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয় বা বিষয় সমষ্টির শিক্ষা সংক্রান্ত দিক বিবেচনা করবে এবং একাডেমিক কমিটির নিকটে শিক্ষাধারা ও নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক এবং বিষয় বা বিষয় সমষ্টির সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা পাসের জন্য পূরণীয় শর্তাবলী সম্পর্কে সুপারিশ করবে।

৪. শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাধারা কমিটির সভার কোরামের জন্য তিনজন সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে।

৬. অর্থ কমিটির গঠন ও কার্যাবলী

১. অর্থ কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হবে ঃ

ক. চেয়ারম্যান- পদাধিকার বলে।

খ. সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক, মাদরাসা শিক্ষার দায়িত্বে- পদাধিকার বলে।

গ. বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য।

ঘ. সরকার কর্তৃক মনোনীত দু'ব্যক্তি।

ঙ. বোর্ডের রেজিস্ট্রার যিনি সদস্য-সচিব হবেন পদাধিকার বলে।

২. অর্থ কমিটির সভার কোরামের জন্য তিনজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন।

৩. অর্থ কমিটির নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকবে ঃ

ক. বোর্ডের বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করা এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন তা সংশোধন করা;

খ. বছরের যে কোন সময় যখন প্রয়োজন হবে তখন উপযোজনের মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দ এক খাত হতে অন্য খাতে স্থানান্তরের সুপারিশ করা;

গ. বাজেট প্রাক্কলনে ব্যবস্থা করা হয়নি এমন বিশেষ ধরনের খরচের জন্য বা বিশিষ্ট অতিথি বা বিশেষজ্ঞের জন্য ভ্রমণ ভাতার বিশেষ হারের সুপারিশ করা;

ঘ. বোর্ডের আর্থিক অবস্থা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখা এবং এর আর্থিক উন্নতির জন্য বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা;

ঙ. কখনও কখনও বোর্ডের হিসেবের তদারকি করা এবং যখন প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ নিলক্ষিক নিয়োগের সুপারিশ করা;

চ. প্রবিধান মোতাবেক বোর্ডের বাজেট কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে এবং বোর্ডের হিসাব কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে তা নির্ধারণ করা;

ছ. আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত প্রবিধানসমূহে পরিবর্তন এবং সংযোজনের সুপারিশ করা;

জ. নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিবেচনা করা এবং এতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে তা সুপারিশ করা;

ঝ. চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রেরিত কোন বিষয় বিবেচনা করা এবং তাতে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করা;

৪. পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্যগণ ব্যতীত অর্থ কমিটির অন্য সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ হবে দুবছর।

৭. বাছাই কমিটির গঠন ও কার্যাবলী

১. বাছাই কমিটি নিম্নরূপ গঠিত হবে ঃ

ক. চেয়ারম্যান- পদাধিকার বলে;

খ. সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক, মাদরাসা শিক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত, পদাধিকার বলে;

গ. সরকার কর্তৃক সরকার কর্তৃক মনোনীত দু' ব্যক্তি এবং

ঘ. ৪ ধারার (ঘ) উপ-ধারার আওতায় সরকার কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পদাধিকার বলে;

২. বোর্ডের বাছাইকৃত কমিটি ৩৭৫ টাকা বা তদূর্ধ্ব প্রারম্ভিক বেতনে বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনের নিয়োগ ও বেতনক্রম সম্পর্কে সুপারিশ করবেন।

৩. বাছাই কমিটির সভার কোরামের জন্য তিনজন সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে।

৪. পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্যগণ ব্যতীত বাছাই কমিটির অন্য সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ হবে দু'বছর।

৫. এ প্রবিধানের বিধা সাপেক্ষে চেয়ারম্যান যে সকল কর্মচারীর নিয়োগকর্তা তাদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদানের জন্য লোক বাছাই করতে বোর্ডের প্রবীণ কর্মকর্তাগণসহ ন্যূনপক্ষে পাঁচ সদস্যের একটি বাছাই কমিটি চেয়ারম্যান গঠন করবেন।

৮. উপ-কমিটি ইত্যাদি নিয়োগ

১. একটি কমিটি একটি সাব-কমিটি গঠন করতে পারে এবং তাকে এরকম কার্যভার অর্পন করতে পারে যা তার বিবেচনায় উপযুক্ত মনে হবে।

২. কোন ব্যক্তি কোন কমিটির সদস্য হওয়ার দরুন তার অধীনস্থ কোন সাব-কমিটির সদস্য হয়ে থাকলে ঐ কমিটির সদস্য হয়ে থাকলে ঐ কমিটির সদস্যপদ হারালে তিনি অধীনস্থ সাব-কমিটির সদস্যও আর থাকবেন না।

৯. মাদরাসার অধিভুক্ত ইত্যাদি

১. বোর্ড কামিল মাদরাসার অধিভুক্ত প্রদান করবে এবং শিক্ষাধারার কোন একটি গ্রুপ বা একাধিক গ্রুপ প্রবর্তনের অনুমতি দিবে এবং ফাযিল মাদরাসায় কামিল শ্রেণী খোলার অনুমতি প্রদান করবে যদি এটা পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে এরূপ অধিভুক্তি বা অনুমতির জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী সন্তোষজনকভাবে পূরণ করা হয়েছে। বোর্ড প্রয়োজনবোধে কামিল মাদরাসা বা কামিল শ্রেণী খোলার অনুমতি প্রার্থীফাযিল মাদরাসা পরিদর্শনের উদ্দেশ্য চেয়ারম্যান কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শক দল বা কর্মকর্তা দ্বারা বিশেষ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারে।

২. কামিল শ্রেণী খোলার অনুমতি প্রার্থী কোন ফাযিল মাদরাসা বা কামিল মানের কোন শিক্ষাধারার নতুন গ্রুপ খোলার জন্য অনুমতি প্রার্থী কামিল মাদরাসা জনকিষা পরিচালক এবং বোর্ডের পক্ষে প্রেরিত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যুগ্মভাবে পরিদর্শন করবে।

৩. বোর্ড দাখিল মাদরাসা, আলিম মাদরাসা, ফাযিল মাদরাসা, ইবতেদায়ী মাদরাসা এবং ফুরকানিয়া মাদরাসার অধিভুক্ত প্রদান করবে যদি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তিতে এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, এরূপ অধিভুক্তির জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী সন্তোষজনকভাবে পূরণ করা হয়েছে। বোর্ড প্রয়োজনবোধে নিজস্ব কর্মকর্তা বা চেয়ারম্যান কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা যুগ্মভাবে এরূপ মাদরাসার বিশেষ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারে।

৪. বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ পরবর্তী উচ্চ শ্রেণী খুলবে না। সংশ্লিষ্ট মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট এরূপ আবেদনপত্র প্রাপ্তির পরে এরূপ মাদরাসা পরিদর্শনের জন্য রেজিষ্ট্রার সংশ্লিষ্ট জনশিক্ষা উপ-পরিচালককে অনুরোধ করতে পারেন।

৫. কোন মাদরাসার অধিভুক্তি বা এতে প্রচলিত কোন মান বা শিক্ষা বিষয় বা শিক্ষাধারার কোন গ্রুপের স্বীকৃতি বোর্ড বালিত করতে পারে এবং ইতোমধ্যে কোন মাদরাসা উন্নীত করণের জন্য বা কোন শিক্ষার বিষয় বা শিক্ষাধারার কোন গ্রুপ প্রবর্তনের জন্য কোন অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকলে বোর্ড তা প্রত্যাহার করতে পারে যদি পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হয় যে, অধিভুক্তি বা অনুমতির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এ মাদরাসা আর পূরণ করতে পারে না।

৬. দাখিল, আলিম ও ফাযিল মাদরাসা সম্পর্কে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বা মহকুমা শিক্ষা কর্মকর্তার মর্যাদার নিম্নে নয়, এমন কোন পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার পরিদর্শন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগের জনশিক্ষা উপ-পরিচালকের মাধ্যমে বোর্ডে প্রেরিত হবে।

১০. মাদরাসাগুলোকে অধিভুক্তির আবেদন করতে হবে

১. এ অধ্যাদেশ প্রবর্তনের অব্যাবহি পূর্বে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মান পর্যন্ত মাদরাসা শিক্ষা দানকারী সকল মাদরাসা এরূপ প্রবর্তনের তারিখের ছয় মাসের মধ্যে বোর্ডের অধিভুক্তির জন্য আবেদন করবে।

**মাদরাসা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কতিপয় সিদ্ধান্ত**

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড স্বায়ত্বশাসন লাভের পর মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিভিন্ন স্তরের মাদরাসা পরিচালনা সম্পর্কে মাদরাসা বোর্ড সরকারের মাধ্যমে একটি প্রবিধান প্রকাশ করেন। ফলে পুরনো ধাঁচের শিক্ষক কর্মচারীর স্থলে নতুন প্রতিষ্ঠানের নানা রকম সমস্যার উদ্ভ হয়। মাদরাসা বোর্ড পর্যয়ক্রমে এর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ হয়।

অতপর সিদ্ধান্ত হলো ১. কামিল মাদরাসাসমূহে ৩-১-৮০ ইং তারিখের পূর্বে নিযুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কামিল পাস অধ্যক্ষগণ স্ব স্ব পদে বহাল থাকবে। কিন্তু নতুন নিযুক্তির ক্ষেত্রে চাকুরী বিধিতে বর্ণিত যোগ্যতাসমূহের প্রয়োজন।

২.কামিল ও ফাযিল মাদরাসাসমূহে ৩-১-৮০ ইং তারিখের পূর্বে নিযুক্ত আছেন, তারা স্বীয় পদে বহাল থাকবে কিন্তু নতুন নিযুক্তির ক্ষেত্রে চাকুরী বিধিতে বর্ণিত যোগ্যতাসমূহের প্রয়োজন হবে।

৩. তৃতীয় শ্রেণীতে কামিল পাস শিক্ষকগণ যারা অধ্যক্ষ ও তত্ত্ববধায়ক পদে নিযুক্ত আছেন, তারা স্বীয় পদে বহাল থাকবে। ১৯৮৩ সালের মধ্যে বিভাগ উন্নয়ন করতে হবে। বিভাগ উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বন্ধ রাখা হবে।

৪. তৃতীয় বিভাগে আলিম পাস শিক্ষকগণকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে বিভাগ উন্নয়ন করতে হবে। অন্যথায় তাদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ থাকবে।

৫. প্রত্যেক মাদরাসায় একজন করে 'ক্বারী' শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের ন্যূনতম যোগ্যতা আলিম পাসসহ ক্বারীয়ানা সনদ প্রাপ্ত হতে হবে।

৬. মঞ্জুরির অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাদরাসায় ইংরেজি, বাংলা, গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষকদের নিম্নলিখিত সংখ্যা নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করা হলো।

ক. দাখিল মাদরাসা সর্বমোট তিন (৩) জন শিক্ষক। তাদের মধ্যে একজন সহকারি শিক্ষক এবং অপর দু'জন জুনিয়র শিক্ষক। সহকারী শিক্ষককে স্নাতক পরীক্ষায় এবং অপর দু'জনকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দু'জন শিক্ষকের ক্ষেত্রে একজন অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগের হতে হবে।

খ. আলিম মাদরাসায় সর্বমোট ৪ জন শিক্ষক তাদের মধ্যে একজন সিনিয়র শিক্ষক, একজন সহকারী শিক্ষক ও অন্য দু'জন জুনিয়র শিক্ষক। সিনিয়র শিক্ষককে অবশ্যই স্নাতকসহ বি.এড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। অপর তিন জন সহকারী শিক্ষকের শর্ত দাখিল মাদরাসার অনুরূপ।

গ. ফাযিল মাদরাসায় দু'জন প্রভাষক (বাংলা, ইংরেজি)। উভয় প্রভাষককে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীতে মাস্টার ডিগ্রী প্রাপ্ত হতে হবে। [২৭৭]

৭. ফাযিল ও কামিল মাদরাসায় অতিরিক্ত দু'জন সহকারী মাওলানা নিতে হবে এবং কামিল মাদরাসার শিক্ষকগণের মধ্যে হতে সার্ভিস রুলে অধ্যক্ষ পদের জন্য বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রবীনতম শিক্ষককে উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করতে হবে।[২৭৮]

২৭৭ একাডেমিক কমিটির দ্বিতীয় সভা তারিখ ২০/০৯/১৯৮০ ইং বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
২৭৮ একাডেমিক কমিটির তৃতীয় সভা ৩১/১২/১৯৮০ ইং মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

## ২.৫.২ সরকার নিয়ন্ত্রিত মাদরাসা সমূহের বিভিন্ন পরিসংখ্যান :

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই সাধারণ শিক্ষায় যে ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, ইসলামী শিক্ষার বেলায় তা হয়নি। স্বাধীনতার এক বছর পর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য ডঃ কুদরাত-ই-খুদাকে চেয়ারম্যান করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট যে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়, তাতে ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এ লক্ষ্যে কোন সুপারিশ দাখিল করা হয়নি। বরঞ্চ প্রকারান্তরে ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে সংকোচিত করার জন্য এ কমিশন কাজ করছে। অবশ্য এ কমিশনের সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৭৬ খৃ. যে শিক্ষা কমিটি গঠিত হয় তাতে বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ ভিত্তিক কমিশন ও কমিটিগুলো ইসলামী শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষার জন্য যে ধরনের সুপারিশ করেছিল তার সিকি ভাগও শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ হয়নি। যদি সকল কমিটির সুপারিশ সমূহ কার্যকরী হতো, তাহলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ একটা অবস্থানে এসে দাঁড়াতে সক্ষম হতো। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সরকারগুলো তাদের শিক্ষা নীতিতে বিমাতা সুলভ আচরণ করেছে মাদরাসা শিক্ষার বেলায়। ইসলামী শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণার বিষয়টি নিতান্ত জরুরী হলেও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়ে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আশানুরূপ উন্নতি হয়নি।

তবুও সত্তরের দশকে এবং আশির দশকে মাদরাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার কিছু কিছু উন্নতি সাধিত হয়। মাদরাসার সংখ্যা বেড়ে যায় অনেক গুণে। ইসলাম ধর্ম শিক্ষা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যকীয় করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে যথাক্রমে ২০০ ও ৩০০ নম্বরের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষা ও আরবীর জন্য একটি পৃথক বিভাগ হিসেবে চালু করণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই খোলা হয়।

স্বাধীনতার আগেও পরের অবস্থা যদি আমরা তুলনামূলক হিসেব করি, তাহলে পরিসংখ্যানে দেখা যাবে, স্বাধীনতার পর মাদরাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তুলনামূলক ছক[২৭৯]

(মাদ্‌রাসার সংখ্যা)

**বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড**

২ নং অরফ্যানেজ রোড, বক্‌শীবাজার, ঢাকা।

**Madrasah List (Division wise Summary)**

| Sl. # | Division Name | Level | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dakhil | | | | Alim | | | | Fajil | | | | Kamil | | | | |
| | | M | F | CO | Tot. | M | F | CO | Tot. | M | F | CO | Tot. | M | F | CO | Tot. | |
| 1. | BARISHAL | 15 | 155 | 631 | 801 | 11 | 31 | 177 | 219 | 19 | 1 | 115 | 135 | 10 | 1 | 6 | 17 | 1172 |
| 2. | CHATTOGRAM | 14 | 183 | 765 | 962 | 3 | 22 | 259 | 284 | 10 | 4 | 259 | 273 | 16 | 3 | 37 | 56 | 1575 |
| 3. | DHAKA | 7 | 210 | 1156 | 1373 | 2 | 29 | 292 | 323 | 8 | 6 | 227 | 241 | 12 | 4 | 32 | 48 | 1985 |
| 4. | KHULNA | 4 | 139 | 712 | 855 | 5 | 22 | 180 | 207 | 7 | 6 | 84 | 97 | 6 | 1 | 17 | 24 | 1183 |
| 5. | RAJSHAHI | 12 | 103 | 994 | 1109 | 2 | 11 | 224 | 237 | 3 | 8 | 142 | 153 | 1 | - | 28 | 29 | 1528 |
| 6. | RANGPUR | 21 | 138 | 901 | 1060 | 1 | 9 | 181 | 191 | 4 | 1 | 153 | 158 | 2 | - | 17 | 19 | 1428 |
| 7. | SYLHET | 3 | 28 | 255 | 286 | 1 | 1 | 61 | 63 | 1 | - | 30 | 31 | 2 | - | 9 | 11 | 391 |
| **Grand Total =** | | 76 | 956 | 5414 | 6446 | 25 | 125 | 1374 | 1524 | 52 | 26 | 1010 | 1088 | 49 | 9 | 146 | 204 | 9262 |

ইসলামী শিক্ষার জন্য যে সকল বিভাগ ও স্তরগুলো বাংলাদেশে চালু আছে। এর ওপর এখানে ধারাবাহিক আলোচনা উপস্থাপন করা হচ্ছে।

ক. মাদ্‌রাসা ঃ (আলিয়া)

১৯৯১ খৃ. দাখিল মাদ্‌রাসার সরকারী অনুদানের আওতায় আনা হয় ৫৪০১৭ জন শিক্ষক এবং পরবর্তীকালের সংযোজনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭৮৯৪ জন শিক্ষক। এ সময় দাখিল মাদ্‌রাসার ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা দাড়ায় ৬১৪২১৩জন।

আলিম মাদ্‌রাসা শিক্ষাক সংখ্যা ১৮,৪৪০ জন এবং ফাযিল মাদরাসার শিক্ষক সংখ্যা ২১,৩৮৬ জন এবং কামিল মাদ্‌রাসার শিক্ষাক সংখ্য ৩৭৮৮জন। অপর দিকে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুমোদন প্রাপ্ত ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫,৯৮৬টি। এদের শিক্ষক সংখ্যা ৫৭,৬৯৮জন এবং ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ১৭,৩০,৪৯১জন।[২৮০]

স্বাধনতাত্তোর দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার যেমনি আমুল পরিবর্তন ঘটে, মাদরাসা শিক্ষার বেলায় তেমিন পরিবর্তন না ঘটলেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৮৪ খৃ. সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদরাসা শিক্ষাকে সমমান নির্ধারণের উদ্যোগ নেয়া হয়। দাখিল ও আলিম পরীক্ষাকে যথাক্রমে

২৭৯মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, (ঢাকা-১৯৯ খৃ.) পৃ. ৩৫০।

280. Bangladesh Education statistics -1991 Banbais Dhaka March -1992 & Bangladesh Statistics Bureau Census-2002.

3.

এস.এস.সি ও এইচ এস সি সমমান প্রদান করা হয়।[281] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপন বলে ১৯৮৫ খৃ. দাখিল পরীক্ষাকে এস.এস.সি ও ১৯৮৭ খৃ. আলিম পরীক্ষাকে এইচ.এস.সির সমমান করা হয়। দেশের মাদরাসা শিক্ষার অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছরই দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কালিম পর্যায়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৩ খৃ. দাখিল ফাজিল ও কালিম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৯১৯৮, ৮৫২০, ৪৯৯৫ ও ২৪৭৮ জন। ১৯৯৫ খৃ. এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৭৯০১, ৩১২৫১, ১৩৩১৭ ও ৮০৯৬ জন। অর্থ্যাৎ প্রতিটি স্তরে এক দশকের বেশী সময়ে ছাত্র সংখ্যা প্রায় চার গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। যা সত্যিকারার্থে আশার কথা। ২০০৩ সালে দাখিল, আলিম ফাযিল, কামিল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৯৭৫০২, ৬৭০৪০, ৪৪০৩০ ও ১৫০২২ জন।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে গৃহিত পরীক্ষা সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান

**ক. ১৯৮২ খি. থেকে ১৯৯৮ খি. পর্যন্ত :**

| খৃষ্টাব্দ | দাখিল | | | আলিম | | | ফাজিল | | | কামিল | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | অংশ গ্রহণ | কৃতকার্য | শতকরা হার | অংশ গ্রহন | কৃতকার্য | শতকরা হার | অংশ গ্রহণ | কৃতকার্য | শতকরা হার | অংশ গ্রহণ | কৃতকার্য | শতকরা হার |
| ১৯৮২ | ১৭৩৭২ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |
| ১৯৮৩ | ১৯১৯৮ | ১২৬০১ | ৬৫.৬৩% | ৮৫২০ | ৪৭৩৩ | ৫৫.৫% | - | - | - | - | - | - |
| ১৯৮৪ | ২৪০২৪ | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| ১৯৮৫ | - | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| ১৯৮৬ | ২৫৫৭১ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |
| ১৯৮৭ | ৪৫৫৩৫ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |
| ১৯৮৮ | ৪৮০১৮ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |
| ১৯৮৯ | ৪৬৫৮৪ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |
| ১৯৯০ | ৫৩০৫৬ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |
| ১৯৯১ | ৫০৪৭১ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |
| ১৯৯২ | ৫৬২৭৮ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |
| ১৯৯৩ | ৫৯৮০৬ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |
| ১৯৯৪ | ৬৭৯০৩ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |
| ১৯৯৫ | ৬৭৯০৩ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |
| ১৯৯৬ | ৮০৩২৭ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |
| ১৯৯৭ | ১০৪৬৪১ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |
| ১৯৯৮ | ১৩৪৮৫৬ | ১১৪৩২ | ৬৫.৮৩% | ৭২৬৯ | ৫৩৬৮ | ৭৩.৮৫% | ৩৪২১ | ১৯৪৮ | ৫৪.০৮ | ২৪৮৩ | ১০৭৮ | ৪৬.০৭% |

281১৯৮৫ খৃ. শিক্ষামন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শা / ৯ /৬ এস সি -১৩/৮৪/৭৪১ (১১) ইবতেদায়ী স্তরকে প্রাথমিক, দাখিলকে মাধ্যমিক আলিমকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেনীর মান দেওয়া হয়।

খ. ২০১৫ খ্রি. থেকে ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে গৃহিত জুনিয়র দাখিল, দাখিল ও আলিম পরীক্ষার পরিসংখ্যান

**বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড**

২ নং অরফ্যানেজ রোড, বক্‌শীবাজার, ঢাকা।

**Statistics of JDC, Dakhil and Alim Result**

**Year : 2015 - 2019**

| Year | Class | Total Madrasah | Total Appeared | | Total Appeared | Passed | | Total Passed | % of Pass | | Overall % of Pass | Expel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Boys | Girls | | Boys | Girls | | Boys | Girls | | |
| 2015 | JDC | 9,086 | 167,773 | 190,707 | 358,480 | 147,517 | 169,795 | 317,312 | 88% | 89% | 89% | 121 |
| | Dakhil | 9,142 | 132,476 | 123,982 | 256,458 | 120,945 | 108,765 | 229,710 | 91% | 88% | 90% | 218 |
| | Alim | 2,695 | 48,050 | 36,338 | 84,388 | 42,510 | 31,966 | 74,476 | 88% | 88% | 88% | 138 |
| 2016 | JDC | 9,056 | 175,262 | 199,226 | 374,488 | 154,179 | 178,453 | 332,632 | 88% | 90% | 89% | 0 |
| | Dakhil | 9,129 | 127,208 | 121,806 | 249,014 | 112,360 | 105,139 | 217,499 | 88% | 86% | 87% | 274 |
| | Alim | 2,708 | 52,603 | 38,967 | 91,570 | 45,687 | 33,333 | 79,020 | 87% | 86% | 86% | 98 |
| 2017 | JDC | 9,084 | 173,464 | 205,115 | 378,579 | 140,461 | 170,908 | 311,369 | 81% | 83% | 82% | 0 |
| | Dakhil | 9,089 | 130,584 | 125,920 | 256,504 | 99,910 | 93,229 | 193,139 | 77% | 74% | 75% | 0 |
| | Alim | 2,703 | 57,667 | 41,653 | 99,320 | 43,676 | 30,990 | 74,666 | 76% | 74% | 75% | 0 |
| 2018 | JDC | 9,131 | 180,016 | 223,046 | 403,062 | 149,292 | 191,019 | 340,311 | 83% | 86% | 84% | 0 |
| | Dakhil | 9,103 | 143,655 | 146,092 | 289,747 | 101,436 | 101,946 | 203,382 | 71% | 70% | 70% | 0 |
| | Alim | 2,700 | 56,000 | 44,136 | 100,136 | 42,920 | 34,032 | 76,952 | 77% | 77% | 77% | 0 |
| 2019 | JDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
| | Dakhil | 9,139 | 151,554 | 158,705 | 310,259 | 124,662 | 130,127 | 254,789 | 82% | 82% | 82% | 0 |
| | Alim | 2,702 | 49,225 | 39,314 | 88,539 | 42,237 | 34,044 | 76,281 | 86% | 87% | 86% | 0 |
| **Total** | **JDC** | **36,357** | **696,515** | **818,094** | **1,514,609** | **591,449** | **710,175** | **1,301,624** | **85%** | **87%** | **86%** | **121** |
| | **Dakhil** | **45,602** | **685,477** | **676,505** | **1,361,982** | **559,313** | **539,206** | **1,098,519** | **82%** | **80%** | **81%** | **492** |
| | **Alim** | **13,508** | **263,545** | **200,408** | **463,953** | **217,030** | **164,365** | 381,395 | **82%** | **82%** | **82%** | **236** |

**Controller of Examinations**
**Bangladesh Madrasah Education Board**
**Dhaka**

বাংলাদেশ মাদরাস শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর পরীক্ষা বিভাগ থেকে নেয়া তথ্যানুযায়ী। ব্যাপক অনুসন্ধান করেও খালিঘরগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ধারায় পুরুষের পাশাপাশি নারী শিক্ষার ও আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে নিচের ক্রমবর্ধমান পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এর ধারণা প্রদান করেঃ

ক) মাদরাসার ক্রমবর্ধমান ছক[২৮২]

| খৃষ্টাব্দ | দাখিল | আলিম | ফাজিল | কামিল |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৯১ | ৭১০৯ | - | - | - |
| ১৯৯২ | - | ১৩৫৬ | ২৫৯ | ৫১ |
| ১৯৯৩ | - | ১৭৫১ | ৩১৮ | ৭১ |
| ১৯৯৬ | ১৭১৪১ | - | ৯৪৫ | ১০৩ |
| ১৯৯৭ | ২৭৬৯২ | ৬২৭৩ | ১২৪৪ | ১৮৪ |
| ১৯৯৮ | ৩৯০৫৪ | ৮৩৮৪ | ২০২১ | ২৯৩ |

খ) বাংলাদেশ মাদারাসার শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমতি/স্বীকৃতি প্রাপ্ত ২০১৯ সালের ইবতিদায়ী শাখার মাদরাসা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংখ্যা

**বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড**
২ নং অরফ্যানেজ রোড, বক্শীবাজার, ঢাকা।

**বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমতি/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসার তালিকাঃ**
**(ডাটা সোর্স ঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে সংরক্ষিত মাদ্রাসার নথিপত্র)।**

| Sl. No. | Division Name | Total Madrasah | Total Teacher | Total Student |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BARISHAL | 1,231 | 5,713 | 221,529 |
| 2. | CHATTOGRAM | 691 | 3,397 | 118,623 |
| 3. | DHAKA | 1,688 | 7,148 | 289,908 |
| 4. | KHULNA | 592 | 2,610 | 84,798 |
| 5. | RAJSHAHI | 946 | 3,795 | 151,901 |
| 6. | RANGPUR | 1,675 | 7,670 | 287,359 |
| 7. | SYLHET | 173 | 719 | 28,632 |
| | **Total =** | **6,996** | **31,052** | **1,182,750** |

২৮২বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের (বিভিন্ন খৃ.) প্রকাশিথ ফলাফল বহি থেকে গৃহিত।

**প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার তথ্যাবলী :**

| সাল | মোট শিক্ষার্থী | মোট কৃতকার্য | ছেলে | মেয়ে | GPA-5 | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৩ | ২৬,৩৯,০৮৫ | ২৫,১৯,০৩২ | ১২৪০৩৯২ | ১২৪৩০৯৯ | ২,৪০,৯৬১ | ৯৮.৫৮% |
| ২০১৪ | ২৬,৯৩,৭৮১ | ২৬,৩৭,৭৫০ | - | - | ২,২৪,৪১১ | ৯৭.৯২% |
| ২০১৫ | ২৮,৩৯,২৩৮ | ২৭,৯৭,২৭৪ | ১২,৭৭,১৪৬ | ১৫,২০,১২৮ | ২,৭৫,৯৮০ | ৯৮.৫২% |
| ২০১৬ | ২৮,৩০,৭৩৪ | ২৭,৮৮৪৩২ | ১২,৭০,২২২ | ১৫,১৮,২১০ | ২,৮১,৮৯৮ | ৯৮.৫১% |
| ২০১৭ | ২৬,৯৬,২১৬ | ২৫,৬৬,২৭১ | - | - | ২,৬২,৬০৯ | ৯৫.১৮ |
| ২০১৮ | ২৬,৫২,৮৯৬ | ২৫,৮৮,৯০৪ | ১১,৮১,০১৯ | ১৪,৭,৮৮৫ | ৩,৬৮,১৯৩ | ১৭.৫৯ |
| ২০১৯ | ২৫,৬৩,২৬৭ | - | ১১,৮১,৩০০ | ১৩,৭১,৯৬৭ | ২৪ নভেম্বর ২০১৯ পরীক্ষা | |

**বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাদরাসা সমূহের ইবতিদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের চিত্র :**

| সাল | মোট শিক্ষার্থী | মোট কৃতকার্য | ছেলে | মেয়ে | GPA-5 | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১২ | ২,৭৬,৩৭৩ | ২,৫৫,৫৩৪ | ১,২১,০৯০ | ১,৩৪,৪০৪ | - | ৯২.৪৫% |
| ২০১৩ | ২,৭৩,৯৭৯ | ২,৬২,৪৭২ | ১,২৯,৩২০ | ১,৩৩,১৫২ | - | ৯৫.৮০% |
| ২০১৪ | ২,৬৫,৯৭৪ | ২,৫৫,২৭৩ | - | - | ৬০৪১ | ৯৫.৯৮% |
| ২০১৫ | ২,৬৪,১৩৪ | ১,৫১,২৬৬ | ১,২৮,৪২৫ | ১,২২,৮৪১ | ৫,৪৭৩ | ৯৫.১৩% |
| ২০১৬ | ২,৫৭,৫০০ | ২,৪৫,৮১৮ | ১,২৫,১৬০ | ১,২১,৬৫৮ | ৫,৯৪৮ | ৯৫.৫৮% |
| ২০১৭ | ২,৫৪,৩৯৯ | ২,৩৬,৪৪৪ | ১,২৯,৯৪৪ | ১,০২,৬০৭ | ৫০২৩ | ৯২.৯৪% |
| ২০১৮ | ২৭৪,৯০৭ | - | - | - | ১২,২৫৪ | ৫৭.৬৯% |
| ২০১৯ | ৩,৫০,৩৭১ | - | ১,৮৭,০৮২ | ১,৬৮,২৮৯ | ২৪ নভেম্বর ২০১৯ পরীক্ষা | |

সারা বাংলাদেশে ইবতিদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের কৃতকার্যের তুলনামূলক হার :

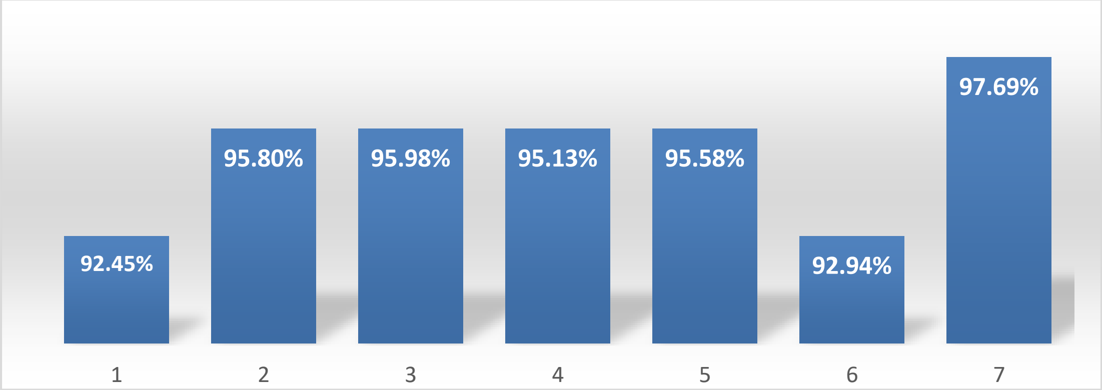


মাদ্‌রাসা শিক্ষা এক রাশ সমস্যা বুকে ধারণ করে সংখ্যাগত ভাবে কিছুটা উন্নতি লাভ করলেও সম্ভাবনার তুলনায় তা কম। এক্ষেত্রে বলা যায়, মাদ্‌রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষা বাংলাদেশে একটি সম্ভাবনাময় শিক্ষা ব্যবস্থা, যা সামগ্রিকভাবে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট অবদান রাখতে পারে।

## ২.৫.৩ বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া-বাংলাদেশ :

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া-বাংলাদেশ বা কউমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা মাদরাসাসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাদের কর্মসূচির মধ্যে প্রথমেই শিক্ষার্থীকে মাদরাসায় পড়ার নিয়ত করার উপর গুরুত্বারোপ করে। “নিয়ত ১, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ, ২. আখিরাতে মুক্তি লাভ, ৩. নিজের জাহালাত দূর করা, ৪. সমাজ থেকে জাহালাত তথা নিরক্ষরতা, মূর্খতা, অশিক্ষা, অপশিক্ষা, অপ-সংস্কৃতি, কুসংস্কার, শিক, কুফর, বিদ্‌আত, ইত্যাদি দূর করা এবং সকল স্তরের জনগণের নিকট ইসলামের জ্ঞান পৌছে দেয়া, ৫. দীন রক্ষা করা এবং দীনের পুনরুজ্জীবন দান করা তথা সমাজের সর্বস্তরে ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, ৬. আল্লাহর দেয়া নিয়ামত স্বাস্থ্য ও বিবেক-বুদ্ধির শুকরিয়া আদায় করা। স্বাস্থ্য, মেধা, জ্ঞান ও প্রতিভার চর্চা ও বিকাশ ঘটিয়ে দীন, দেশ, জাতি ও সমাজের সেবা করে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করা। [২৮৩] মাদরাসা শিক্ষার্থীদের এ ছয়টি লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে কোথাও অর্থ উপার্জন বা ভাল। চাকরি পাওয়ার কথা নেই। আরাম-আয়েশ বা বিলাসিতার কথা নেই। দীনের খিদমত, দেশের সেবা, জনসেবা ইত্যাদির মধ্যেই

[২৮৩] পাঠ্য তালিকা ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া, বাংলাদেশ, পৃ. ৭।

একজন মাদরাসা শিক্ষার্থী জীবনকাল অতিবাহিত করতে চায়। এভাবে গড়েওঠা একজন শিক্ষার্থী নিঃসন্দেহে সমাজ, দেশ ও জাতির অমূল্য সম্পদ বৈকি।

সহীহ শুদ্ধ নিয়তের পর মাদরাসা কর্তৃপক্ষের কউমী মাদরাসার প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং মুসলিম তাহজীব-তমদুন সম্পর্কিত যে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা আরো আকর্ষণীয়।

১. মাদরাসা শিক্ষার্থীগণকে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক ব্যবস্থাপনায় নিয়ে এসে উস্তাদের তত্ত্বাবধানে তাদের লেখাপড়া তৈরি, চরিত্র গঠন, স্বাস্থ্য চর্চা, মেধা চর্চা, প্রতিভা বিকাশ। প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

২. সব শিক্ষার্থীকে আবাসিক ব্যবস্থাপনায় আনা সম্ভব না হলে সারা দিন মাদরাসায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. কোন উস্তাদ ছাত্রদের প্রাইভেট পড়াতে পারবে না। কারণ একজন শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন করার কাজে উস্তাদই সর্বেসর্বা এবং সব ছাত্রই তার নিকট সমান। আদর-শাসন পাওয়ার যোগ্য।

৪. শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশ, মেধা, চর্চা পড়াশোনায় মনোযোগী করানো। এবং বাংলা সাহিত্যে তাদের ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য প্রতিটি মাদরাসায় বা প্রাইমারিতে

# তৃতীয় অধ্যায়

## প্রথম পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান

### ৩.১.১ ইয়াহুদী ধর্মে নারী

পৃথিবীর যে সব ধর্ম শুধুমাত্র কিছু আকীদা এবং তত্ত্ব পেশ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং পেশকৃত আকীদা ও তত্ত্বের ভিত্তিতে জীবনের বাস্তব সমস্যাদি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছে, ইয়াহুদী ধর্ম তারই একটি। এ ধরনের একটি ধর্ম নারী জাতি সম্পর্কে বাস্তববাদী ধ্যাণ-ধারণা পেশ করবে এরূপ আশা করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধর্ম আমাদের সামনে যে ধারণা পেশ করে তার সারমর্ম এই যে, পুরুষ সৎস্বভাব বিশিস্ট ও সৎকর্মশীল আর নারী বদস্বভাব বিশিষ্ট এবং ভণ্ড।

ইয়াহুদী ধর্ম মতে, মানব জাতির প্রথম সদস্য হযরত আদম (আ) জান্নাতে মহাসুখে জীবন যাপন করছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা। কিন্তু তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ) তাঁকে প্রথমে আল্লাহর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করেন এবং তাঁকে এমন একটি ফল খাওয়ান যা খেতে আল্লাহ তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। ফলে তিনি আল্লাহর সর্ব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলেন এবং তাঁর ভাগ্যলিপিতে কায়-ক্লেশের জীবন লিপিবদ্ধ হলো।

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে লিপিবদ্ধ আছে যে, মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ) কে জিজ্ঞেস করলেন : 'যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তার ফল ভোজন করিয়াছ? আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, তাই আমি উহা ভোজন করিয়াছি।'

এরপর আল্লাহ হাওয়াকে বললেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া দিব। তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে। স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে। সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করিবে।"

অন্য কথায়, হাওয়া (আ.) আদম (আ.) কে পথভ্রষ্ট করে যে অপরাধ করেছিলেন, আল্লাহর তরফ থেকে তার সেই অপরাধের শাস্তি হলো সন্তান প্রসবকালীন কষ্ট এবং তার উপর পুরুষের স্থায়ী কর্তৃত্ব। পুরুষ কিয়ামত পর্যন্ত নারীর উপর এ কর্তৃত্ব চালাতেই থাকবে।

এই দর্শনের ফলশ্রুতিতে ইয়াহুদী শরীয়তে পুরুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব এত বেশি যে, কোন স্ত্রীলোক যদি যৌবনকালে আপন পিতৃগৃহে বাস করাবার সময়ে সদা প্রভুর উদ্দেশ্যে কোন মানত করে অথবা কোন ব্রতবন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করে এবং তার পিতা যদি তার সেই মানত বা ব্রতের কথা শুনে তাকে তা পালন করতে নিষেধাজ্ঞা করে, তবে তার সে মানত বা ব্রতবন্ধন স্থির থাকবে না তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ফলে তার পিতার নিষেধ কার্যকর হবে এবং সদাপ্রভু সেই যুবতীকে ক্ষমা করবেন না। কারণ তার পিতা তাকে অনুমতি প্রদান করেন নি। আর যদি সে কোন পুরুষের স্ত্রী হয়ে তার অধীনা হয় এবং এ অবস্থায় কোন মানত করে অথবা ওষ্ঠ নির্গত কোন চপল বাক্যে ব্রতের দ্বারা আপন প্রাণ আবদ্ধ করে, অতঃপর স্বামী যদি শুনতে পায় এবং শ্রবণের দিন তাকে কিছু না বলে, তবে সেই মানত

বা ব্রত স্থির থাকবে। আর যদি শ্রবণের দিন স্বামী তাকে নিষেধ করে তবে ঐ মানত বা ব্রত স্থির থাকবে না। কারণ তার স্বামী তা ব্যর্থ করেছে। আর সদাপ্রভু সেই স্ত্রীকে ক্ষমা করবে না। স্ত্রীর প্রত্যেক মানত ও দিব্য তার স্বামী ইচ্ছা করলে স্থির রাখতেও পারে অথবা উহা ব্যর্থও করে দিতে পারে। পুরুষ ও স্ত্রীর বিষয়ে এবং যৌবনে পিতৃগৃহে অবস্থানকালে কন্যার বিষয়ে সদাপ্রভু মোশিকে এই সকল আজ্ঞা করলেন। ইয়াহুদী আইন অনুসারে পুরুষ উত্তরাধিকারীর বর্তমানে নারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। অনুরূপভাবে নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকারও নাই।[২৮৪]

আদালতের রায়ে তালাক হলে গোঁড়া ও রক্ষণশীল ইয়াহুদী সমাজ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ গ্রহণ করে না। স্ত্রীকে পূর্ব স্বামীর বিবাহিতা বলে গণ্য করে। স্বামী স্ত্রীকে 'গেট' বা বিবাহ বিচ্ছেদের সনদ না দিলে ধর্মীয় আইন বিবাহ অটুট থাকে। সংশোধিত ইয়াহুদী আইন ও সিভিল আইনে তার পুনর্বিবাহ হলেও গোঁড়া ও রক্ষণশীলদের নিকট স্ত্রী ব্যভিচারিনী এবং সে বিবাহের সন্তানগণ বংশানুক্রমে 'মামজের' বা অবৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে। 'গেট' তাওরাতে লিপিবদ্ধ আইনেরই অংশ। ইয়াহুদীদের বিশ্বাস এ আইন সিনাই পর্বতে আল্লাহ হযরত মূসা (আ)- কে দিয়েছিলেন। [২৮৫] ওল্ড টেস্টামেন্টে হযরত আদম ও হাওয়ার জান্নাত হতে বহিস্কৃত হওয়ার ঘটনাটি এভাবে পেশ করা হয়েছে: "তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? তিনি কহিলেন, আমি উদ্যানে। তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম। কারণ আমি উলঙ্গ। তাই আপনাকে লুকাইয়াছি। ঈশ্বর কহিলেন, তুমি যে উলঙ্গ উহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল খাইতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? তাহাতে আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল। তাই খাইয়াছি। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, তুমি এ কি করিলে? নারী কহিলেন, সর্প আমাকে ভুলাইয়াছিল, তাই খাইয়াছি।"

এর অর্থ এই হয় যে, বেহেশত থেকে বহিস্কৃত হওয়া আদম তথা মানব জাতির পক্ষে অভিশাপ বিশেষ এবং এ অভিশাপের মূল কারণ হচ্ছে নারী- আদমের স্ত্রী। এ জন্যে ইয়াহুদী সমাজে স্ত্রীলোক চির লাঞ্ছিতা, জাতির অভিশাপ এবং ধ্বংস ও পতনের কারণ। এ জন্যে পুরুষ সব সময়ই নারীর উপর প্রভুত্ব করার স্বাভাবিক অধিকারী। এ অধিকার আদমকে হাওয়া বিবি কর্তৃক নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানের শাস্তিবিশেষ। যতদিন নারী বেঁচে থাকবে, ততদিন এ শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে।

---

[২৮৪] সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ৩১-৩৩
[২৮৫] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, নারীর অধিকার ও মর্যাদা, ঢাকা, আশরাফিয়া বইঘর, ১৯৯৫, পৃ. ১৯

ইয়াহুদী সমাজে নারীকে ক্রীতদাসী না হলেও চাকরাণীর পর্যায়ে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে বাপ নিজ কন্যাকে নগদ মূল্যে বিক্রয় করতে পারত। মেয়ে কখনও পিতার সম্পত্তি থেকে মীরাস লাভ করত না। করত কেবল তখন, যখন পিতার কোন পুত্র সন্তানই থাকত না।

ইয়াহুদী ধর্মে নারীকে 'পুরুষের প্রতারক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইয়াসরিবের (বর্তমান মদীনা শহর) ফিতুম নামক এক ইয়াহুদী বাদশাহ আইন জারী করেছিল, যে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হবে, স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে তার সাথে এক রাত্রিযাপন করতে হবে।[২৮৬]

ইয়াহুদীরা নিজ ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে এই অধিকার লাভ করে থাকে যে, যখন তারা ইচ্ছা করবে, ক্ষুদ্রতম অপরাধের কারণেও স্ত্রীকে বিদায় করে দিতে পারবে। তারা স্ত্রীদেরকে হায়েয ও নেফাসের সময় অপবিত্র বলে মনে করে। এ সময়ে তারা স্ত্রীদের সাথে উঠা-বসা, কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করা, এমনকি তাদের হাতের তৈরি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করাকেও নিজেদের জন্য জঘন্যতম অপমানজনক কাজ বলে মনে করে থাকে। [২৮৭]

ইয়াহুদী সমাজে বিবাহ ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপারে। সুতরাং এজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে ইহা ছিল না। বাস্তবে ইহা ছিল একপ্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব ইহাতে খুব বেশী ছিল। [২৮৮]

সামাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি জরুরী ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহুনারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত না। কারণ, নারী মানুষরূপে পরিগণিত ছিল না। [২৮৯]

## ৩.১.২ খৃষ্ট ধর্মে নারী :

নারীকে খৃষ্ট ধর্ম যতদূর নীচে নিক্ষেপ করা সম্ভব ছিল তা করেছে। নারী সম্পর্কে এ ধর্মের অনুভূতি তারতুলীনের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় :

"হে নারীকুল, তোমরা জান না যে, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন হাওয়া। তোমাদের জন্য আল্লাহ যে ফতোয়া ছিল তা যদি এখনও বর্তমান থাকে, তাহলে উক্ত অপরাধ প্রবণতাও তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছে। তোমরা তো শয়তানের দরজা। তোমরাই খোদার প্রতিচ্ছবি পুরুষদের ধ্বংস করেছো।"

---

[286] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩, পৃ. ৬২, ড. আল্লামা জামাল আল বাদাভী, ইসলামিক টিচিং কোর্স, ৩য় খণ্ড, অনুবাদঃ আবূ খালদুন আল মাহমুদ, *ইসলামের সামাজিক বিধান*, ঢাকা, দি পাইওনিয়ার, ১৯৯৯, পৃ. ৪৯-৫৫

[২৮৭] মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, *মহানবী (সা.) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা*, ঢাকা, ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫, পৃ. ৬৫; আল্লামা আবদুল কাইয়ুম নদভী, *ইসলাম আওর আওরাত*, লাহোর, ইদারায়ে ইসলামিয়া, তা.বি, পৃ. ২৩

[২৮৮] আবদুল খালেক, *নারী*, ঢাকা, দীনী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯, পৃঃ ৮; Report of the Commission Marriages, Divorce and the Church, London, 1971. P. 9-10

[২৮৯] আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮; Shaner Donald W., A Christian View of Divorice, Leiden, 1969, P. 31.

সেন্ট পর তার একটি পত্রে লিখেন: "নারী পূর্ণ বশ্যতা শিক্ষা করুক। আমি পুরুষদেরকে উপদেশ দিবার কিংবা পুরুষদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার নারীকে দেই না। তাকে মৌনভাবে থাকিতে বলি। কারণ প্রথমে আদমকে এবং পরে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। আদম প্রবঞ্চিত হইলেন না। কিন্তু হাওয়া প্রবঞ্চিত হইয়া অপরাধে পতিত হইলেন।"

তিনি অপর একটি পত্রে লিখেন : আমার ইচ্ছা এই, তোমরা যেন জান যে, প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ খৃষ্ট, স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ পুরুষ আর খৃষ্টের মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর। যে পুরুস মস্তক আবৃত করিয়া প্রার্থনা করে কিংবা ভাববাণী বলে, সে আপন মস্তকের অপমান করে। কারণ পুরুষ স্ত্রীলোক হইতে নয়, বরং স্ত্রীলোক পুরুষ হইতে। আর স্ত্রীর নিমিত্ত পুরুষের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু পুরুষের নিমিত্ত স্ত্রীর সৃষ্টি হইয়াছে।[২৯০]

প্রথম যুগের খৃষ্ট ধর্মের যাজকগণ রোমান সমাজে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের ব্যাপক ছড়াছড়ি ও চরম নৈতিক অধঃপতন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং এসব কিছুর জন্য নারীকেই এককভাবে দায়ী করেন। কেননা নারীরা সমাজে অবাধ চলাফেরা, খেলাধুলা ও পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করতো। তাই খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ স্থির করলেন যে, বিয়ে একটা নোংরা কাজ এবং অবিবাহিত ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বিবাহিত অপেক্ষা বেশী সম্মানার্হ। তারা ঘোষনা করে দিলেন যে, নারী হলো শয়তানের প্রবেশ দ্বার। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তার লজ্জিত থাকা উচিত। কেননা, নারীর সৌন্দর্য হলো বিপথগামী ও প্রলুব্ধ করার কাজে শয়তানের অস্ত্র।

তারতোলিয়ান নামক জনৈক যাজক বললেনঃ "নারী হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে শয়তানের প্রবেশের সিংহদ্বার। নারী আল্লাহর বিধান ভঙ্গকারী এবং আল্লাহর চেহারা অর্থাৎ পুরুষকে বিস্মৃতকারী :

মোস্তাম নামক আরেক যাজক বলেনঃ "নারী এক অনিবার্য আপদ, এক লোভনীয় আপদ। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।"

পঞ্চম শতাব্দীতে 'মাকোন একাডেমী' এ গবেষণা চালায় যে, নারী কি আত্মাহীন দেহ, নাকি তার আত্মাও আছে? গবেষণা শেষে একাডেমী সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একমাত্র মসীহের মাতা মরিয়ম ব্যতীত আর কোন নারীই দোজখ হতে মুক্তির নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত আত্মার অধিকারিণী নয়।"

পাশ্চাত্য জগত খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর উপরোক্ত যাজকদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে কি মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে, নাকি অমানুষ বলে? অবশেষে স্থির করা হয় যে, সে মানুষ বটে, তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষদের সেবা করা। পাশ্চাত্যবাসীর পক্ষ থেকে নারীর প্রতি এই অবজ্ঞা তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করার এই ধারা অব্যাহত থাকে মধ্যযুগ পর্যন্ত। কেননা এ যুগেও

[২৯০] সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ : ৩৩-৩৪।

তাকে অধিকারহীন অবস্থায় থাকতে হয় এবং নিজের সম্পদেও সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া হাত দিতে পারতো না।

১৮০৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর যখন মানুষকে দাসত্ব ও হীনতার জীবন যাপন থেকে মুক্তিদানের কথা ঘোষনা করা হলো, তখনও নারীর মর্যাদা সংরক্ষিত হলো না। ফরাসী নাগরিক আইনে নারী অবিবাহিতা হলে সে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্য নয় বলে ঘোষণা করা হল। এ আইনে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয় যে, নারী, শিশু ও পাগল- এই তিন শ্রেণীর মানুষ অধিকারহীন ও দায়িত্বহীন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে। এর পর নারীর স্বার্থে এই আইন সংশোধিত হয়।[২৯১]

খৃস্টান সেন্টদের চোখে মেরী ছাড়া আর সব নারীই পাপিষ্ঠা। তারা নারীকে শয়তানের খেলার মাঠ এবং বিষ্ঠার ছালা বলে অভিহিত করেছে।

বাইবেলে সদাপ্রভু নারীকে বলেন, "পুরুষ তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।" নিওপ্লাটনিজমের প্রভাবে নিষ্কাম ভালবাসার উপর জোর দেওয়া হয়। নারী পুরুষের যৌনমিলন এমনকি স্বামী-স্ত্রী যৌন সম্পর্ককেও অশ্লীল ও অপবিত্র জ্ঞান করা হয়। নর-নারীর কৌমার্যই পাদ্রীদের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিষয়। তাদের কাছে বিবাহিত জীবন প্রয়োজনীয় পাপাচার।"

সেন্ট তারতুলীয়ান বলেন, "নারী শয়তানের দ্বার। সে আদমকে বিপথগামী করেছে। সে খোদার আইন ভঙ্গাকারিণী এবং পুরুষের ধ্বংসকারিণী।" সেন্ট ক্রাইমসটম বলেন, "নারী একটি অনিবার্য পাপ এবং জন্মগত দুষ্ট প্ররোচনা। সমস্ত বর্বর পশুর মধ্যে নারীর মত ক্ষতিকর আর কিছু নাই।" সেন্ট টমাস বলেন, "নারী হচ্ছে বিকৃত পুরুষ।" সেন্ট পল বলেন, "ঈশ্বরের প্রতি নারী যেমন অনুগত থাকবে, তেমনি অনুগত থাকবে স্বামীর প্রতি।" লুথার বলেন, "নারী কখনও নিজের প্রভু নয়। ঈশ্বর তার দেহ তৈরী করেছেন পুরুষের জন্য, সন্তান ধারণ এবং পালনের জন্য। নারীকে সন্তান প্রসব করতে করতে মরতে দাও। এ জন্যই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।" [২৯২]

খৃষ্ট ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জীল এর বিশুদ্ধ নির্দেশ এই যে, নারীর একবার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর, স্বামী যত বড় অত্যাচারী ও জালিমই হোক না কেন বা যত বড় অপরাধী ও পাষণ্ডই হোক না কেন, ঐ স্ত্রীর ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য এই নরপশু স্বামীর বিবাহবন্ধন হতে পরিত্রাণ পাওয়ার আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। হ্যাঁ, যদি প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে তবে স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। কিন্তু এই বিচ্ছেদের শর্ত এই যে, ঐ পুরুষ ও নারী বাকী জীবনে আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। এ বিধানটি অযৌক্তিক বিধায় পরবর্তীকালে নব-সভ্য খৃষ্টানগণ এটা

[২৯১] ড. আশ শাইখ মুসতাফা আস সিবায়ী, *আল মারআতু বাইনাশ শারীয়াতি ওয়াল কানূন*, অনুবাদ, আকরাম ফারুক, *ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার নারী*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম সংস্করণ ১৯৯৮, পৃ. ১৪-১৫

[২৯২] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, *নারীর অধিকার ও মর্যাদা*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬

পরিবর্তন করেছে। এ পরিবর্তিত বিধানটির শর্ত এই যে, স্ত্রী যদি অত্যাচারী ও অপদার্থ স্বামী হতে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে প্রথমে তাকে প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে হবে। এছাড়া বিচ্ছেদের আর কোন পথ নেই। এই ইঞ্জীল গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, নারী মৃত্যুর চেয়েও অধিক তিক্ত ও ঘৃণিত। আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দা কখনো নারীর গায়ে হাত লাগাবে না। [২৯৩]

এজন্য খৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার ও খৃষ্ট ধর্মের রচয়িতা সেন্ট পল বিবাহকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে স্বীকার করেন না। আর এটিকে তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলেও বিশ্বাস করেন না।[২৯৪]

### ৩.১.৩ হিন্দু ধর্মে নারী :

ভারতবর্ষকে একটি ধর্মভিত্তিক দেশ মনে করা হয়। কারণ এর অন্যান্য যে কোন দিকের চেয়ে ধর্মীয় দিকটি সব সময় বেশী প্রভাব বিস্তার করে আছে। এখানেও নারী দাসত্ব ও পরাধীনতার জীবন থেকে মুক্তি পায় নি। ভারতবর্ষের বিখ্যাত আইন রচয়িতা মুনজার নারী সম্পর্কে বলেছেন :

নারী অপ্রাপ্ত বয়স্কা, প্রাপ্ত বয়স্কা বা বৃদ্ধা যাই হোক না কেন স্বাধীন যেন না হয়। শৈশবে নারী তার পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনে থাকবে স্বামীর অধীনে আর বিধবা হওয়ার পর থাকবে পুত্রের অধীনে। কোন সময়ই সে স্বাধীন থাকবে না।

কুরবানী এবং ব্রত পালন নারীর জন্য পাপ। তার উচিত শুধু স্বামীর সেবা করা। স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় স্বামী গ্রহণের কথা মুখে আনাও নারীর উচিত নয়। বরং স্বল্পাহারী হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেয়া উচিত।

জনৈক ব্রাক্ষ্মণ যিনি মহারাজ মুনজীর মনু স্মৃতিকে বাচলতা থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং যার শিক্ষা দীর্ঘদিন যাবৎ রাষ্ট্র প্রশাসনের মূলনীতি হিসেবে কার্যকর ছিল, তিনি নারী জাতি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন:[২৯৫]

(ক) নদী, সশস্ত্র সৈনিক, শিং ও নখরযুক্ত জন্তু, শাসক এবং নারীকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

(খ) মিথ্যা কথা বলা, অগ্র-পশ্চাত না ভেবে কাজ করা, ধোঁকাবাজি, আহমকী, লোভ, অপবিত্রতা এবং নিষ্ঠুরতা নারীর স্বভাবজাত দোষ।

(গ) রাজপুত্রদের নিকট থেকে নৈতিক শুচিতা, বিদ্বানদের নিকট থেকে মিষ্ট ভাষণ, জুয়াড়ীদের নিকট থেকে মিথ্যা বলা এবং নারীদের নিকট থেকে প্রতারণা শেখা উচিত।

---

[২৯৩] মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, *মহানবী (সা.) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫ ; আল্লামা আবদুল কাইউম নদভী, *ইসলাম আওর আওরাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

[২৯৪] আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; Klanser Joseph, From Jesus of Paul, London, 1964, P- 571-572

[২৯৫] সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪-৩৬

(ঘ) আগুন, পানি, নিরেট মূর্খ, সাপ, রাজ পরিবার ও নারী এরা সবাই ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। এদের ব্যাপারে সবসময় সাবধান থাকতে হবে।

(ঙ) বন্ধু, চাকর এবং নারী দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু যখনই আবার সে সম্পদের অধিকারী হয়, তখনই তার কাছে ফিরে আসে।

প্রাচীনাকলে হিন্দু পণ্ডিতরা মনে করতেন মানুষ পারিবারিক জীবন বর্জন না করলে জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হতে পারে না। মনুর বিধানে পিতা, স্বামী ও সন্তানের কাছ থেকে কোন কিছু পাওয়ার অধিকার নারীর নেই। স্বামীর মৃত্যু হলে তাকে চির বৈধব্যের জীবন যাপন করতে হয়। জীবনে কোন স্বাদ-আনন্দ-আহলাদ-উৎসবে অংশগ্রহণ করা তার জন্য চির নিষিদ্ধ। নেড়ে মাথা, সাদা বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আতপ চালের ভাত ও নিরামিষ খেয়ে তাকে জীবন যাপন করতে হয়।

প্রাচীন হিন্দু ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছেঃ মৃত্যু, নরক, বিষ, সর্প এবং আগুন এর কোনটিই নারী অপেক্ষা খারাপ ও মারাত্মক নয়।

যুবতী নারীকে দেবতার উদ্দেশ্যে- দেবতার সন্তুষ্টির জন্য কিংবা বৃষ্টি অথবা ধনদৌলত লাভের জন্য বলিদান করা হত। একটি বিশেষ গাছের সামনে এভাবে নারীকে পেশ করা ছিল তদানীন্তন ভারতের স্থায়ী রীতি। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সমমৃত্যু বরণ বা সতীদাহ রীতিও পালন করতে হত অনেক হিন্দু নারীকে।[২৯৬]

হিন্দু ধর্মে নারীদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে নারীদেরকে মানুষের কাতারে গণ্যই করা হয় না। পিতামাতার সম্পত্তি হতে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তালাকের ব্যাপারে তাদেরকে কোন অধিকারই দেয়া হয়নি। স্বামী যত বড় জালিম আর পিশাচই হোক না কেন, তার থেকে পরিত্রাণের কোন ব্যবস্থাই নেই। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্ত্রীর বয়স যত কমই হোক না কেন তার অন্যত্র বিবাহের কোন ব্যবস্থা নেই। এ কারণেই পূর্বের যুদ্ধে কোন হিন্দু মহিলারা স্বামী মারা গেলে সাথে সাথেই ঐ মহিলাও আত্মহত্যা করে এরূপ করুণ অবস্থা হতে মুক্তি লাভ করত।[২৯৭]

হিন্দু আইনে নারীর কোন মূল্য নেই। সে একটা অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র। ধর্ম ও শিক্ষায় তার কোন অধিকার নেই। সে বেদ পাঠ করতে পারে না। এমনকি পূজা উৎসর্গ করাও তার জন্য নিষিদ্ধ। ব্রত পালন করা নারীর জন্য পাপের কাজ।[২৯৮]

---

[২৯৬] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২-৬৩

[২৯৭] মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, *মহানবী (সা.) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪, আল্লামা আবদুল কাইউম নদভী, ইসলাম আওর আওরাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[২৯৮] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯

### ৩.১.৪ বৌদ্ধ ধর্মে নারী :

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নারী জাতির জন্য কিছুই করে যাননি। কোন কিছু করার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি। একদিন বুদ্ধের এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "নারী জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?" বুদ্ধ উত্তর করলেন, "নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী।" অন্য এক সময় তিনি আরও বলেছেন, "নারীদের সাথে কোনরূপ মেলামেশা করো না এবং তাদের প্রতি কোন অনুরাগ রেখো না। আর তাদের সাথে কথাবার্তাও বলো না। কেননা, পুরুষের পক্ষে নারী ভয়ঙ্কর বিপদস্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গি দ্বারা পুরুষের বিশ্বাস-ধন লুট করে নেয়। নারী একটি সশরীরী ছলনা মাত্র। সুতরাং নারী থেকে বাঁচার চেষ্টা কর।"

বৌদ্ধ ধর্ম আরো বলে যে, "নারীর সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা বাঘের মুখে চলে যাওয়া কিংবা, জল্লাদের ছুরির নীচে মাথা পেতে দেওয়া উত্তম।" সুতরাং যে ধর্ম এ কথা বলে সে দর্শন কখনো নারীকে শান্তি ও মর্যাদা দিতে পারে না।

গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার সারমর্ম এই যে, নারীর সঙ্গে বসবাসকারী পুরুষ পরকালের মুক্তি হতে বঞ্চিত থাকবে। নারীরা পুরুষের মোক্ষ লাভের অন্তরায়। তাদের সাহচর্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। এ জন্যেই গৌতম বিয়ে প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি লোকদেরকে সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসব্রতের আহবান করে গিয়েছেন।[২৯৯]

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতে নারী হল সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েষ্টার মার্ক বলেন : Women are, of all the snares which the tempter has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which blind the mind of the world. 'মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজ্জনক। নারীর মধ্যে মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।'[৩০০]

উল্লেখিত আলোচনা হতে নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, আলোচিত ধর্মগুলোর কোন একটিতেও নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে নারী যে একটি প্রাণী, তার যে প্রাণ আছে- এ কথাটিও স্বীকার করা হত না। তাকে গৃহের অন্যান্য আসবাবপত্রের ন্যায় নির্জীব পদার্থ বলে গণ্য করা হত। নারী জাতির অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষা এবং সর্বপ্রকার স্বাধিকার হতে তারা চির বঞ্চিত ছিল। সুতরাং এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি অন্যান্য সকল ধর্মের ধর্ম বিশ্বাসই নারীর উন্নতির পথে প্রথম অন্তরায় ছিল। যেথায় নারীর শিক্ষা-দিক্ষার ব্যাপারটি ছিল সুদূর পরাহত স্বপসম বিষয়।

---

[২৯৯] মাওলানা ইহসাক ওবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, ঢাকা, শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৬ পৃ. ২১-২২, মুফতী আবদুল্লাহ ফারুক, *ইসলামের রমণীর মান*, যশোর : আল ফারুক প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ: ১৯-২০

[৩০০] Nazhat Afza and Khurshid Ahmaed, *The Position of Women in Islam*, Kuwait; Islamic Book Publishers, 1982, P. 12-13

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ৩.২.১ ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব :

কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারীশিক্ষা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। তা হচ্ছে এই যে, কুরআন ও হাদীসে শুধু নারীশিক্ষার কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়নি। শিক্ষা সম্পর্কে যে কথাই বলা হয়েছে, তা নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নর ও নারীর জন্য আলাদাভাবে কোন আলোচনা করা হয় নি।

আরও একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কুরআন ও হাদীসে শিক্ষা প্রসঙ্গে যে নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছে, তাকে সাধারণত পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে اقرأ باسم ربك তুমি পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে। আর হাদীস শরীফে বলা হয়েছে اطلبوا العلم তোমরা বিদ্যা অন্বেষণ কর। এখানে اقرأ এবং اطلبوا দুইটি ক্রিয়াপদই পুরুষবাচক। কিন্তু এই নির্দেশ কেবল পুরুষের জন্য নয়, বরং নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, প্রায় সকল বিষয়েই কুরআন ও হাদীসে সাধারণ নির্দেশগুলো এভাবে পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এ দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই সমভাবে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়। اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ তোমরা নামায পড় এবং যাকাত দাও। এখানে اَقِيْمُوا এবং اٰتُوا দুটি ক্রিয়াপদই পুরুষবাচক। বরং নর ও নারী উভয়কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা নামায পড়া এবং যাকাত দেয়া নর ও নারী উভয়ের জন্য ফরয।

অতএব, আলোচ্য নিবন্ধে নারী শিক্ষা সম্পৃক্ত আলোচনা কুরআন ও হাদীসের এরূপ সাধারণ নির্দেশাবলীর উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে।

## ৩.২.২ নারী শিক্ষা সম্পর্কে আল কুরআন ও আল হাদীস

শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধির মূল উৎস হলেন মহান আল্লাহ। নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর তরফ হতে মানুষের কাছে শিক্ষা ও জ্ঞান পৌঁছে। আল্লাহ হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে। এভাবে বিকশিত বুদ্ধি দ্বারা মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে থাকে। মানুষের সামনে তখন আল্লাহর সৃষ্টি রাজ্যে লুক্কায়িত অনেক রহস্যের দ্বারা উদঘাটিত হয়। অজানা বহু বির্ষ সম্পর্কে মানুষ জ্ঞান লাভ করে। সে অনেক কিছু আবিস্কার করে এবং পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলে।

অতএব, আল্লাহ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান বলেই মানুষ পৃথিবীকে সুশোভিত, সুসজ্জিত এবং সৌন্দর্যমন্ডিত করতে সক্ষম হয়েছে।

নর-নারী নির্বিশেষে সকল মানুষেরই সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো শরীয়তের জাহিরী ইলম অর্থাৎ ওযু, গোসল, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি শিক্ষা করা। জাহিরী ইবাদতের সাথে সাথে বাতিনী ইবাদতও আবশ্যক। যে সকল আমল দিলের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাকেই বাতেনী ইবাদত বলা হয়। যেমন তাওয়াক্কুল, সবর, শোকর, আল্লাহর রিযা, মুহব্বত, কানা'আত, তাসলীম, তওবা, ইখলাস, তাকওয়া প্রভৃতি অর্জন করা এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হাসাদ, রিয়া, অহংকার ইত্যাদি বর্জন করা। সুতরাং বাতিনী ইবাদত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাও প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। কেননা যাহিরী এবং বাতিনী উভয় প্রকারের ইবাদতই ইলম ছাড়া সম্ভব নয়।[৩০১]

ইসলামে আধ্যাত্মিক শিক্ষার স্থান সকল শিক্ষার উপরে। বস্তুত সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন। কথায়, কাজে এবং চিন্তায় আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলা। এ-ই আত্মার শিক্ষা। এর অভাবে মানসিক শিক্ষা জগতে কল্যাণপ্রসূ না হয়ে বরং অকল্যাণের হেতু হয়ে থাকে। আত্মিক শিক্ষার ভিত্তি আল্লাহর ভয়। আল্লাহ জগতের সৃষ্টা, পালকর্তা ও সংহারকর্তা। তিনি সৃষ্টির পতি স্নেহশীল ও কৃপাবান। তিনি পরকালে সৎকার্যের জন্য মানুষকে পুরস্কার এবং মন্দকাজের জন্য শাস্তি দিবেন। এই বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে আত্মিক শিক্ষা। কিন্তু এ বিশ্বাস সহজ নয়। কেননা, আমরা আল্লাহকে দেখি না। পরকালের কোন ধারণা করতে পারি না। শৈশব হতেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল না হলে, ভবিষ্যতে যুক্তিতর্কের সাহায্যে এ বিশ্বাসে উপনীত হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।[৩০২]

মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের আত্মবিকাশ ও কল্যঅণ আনয়ন করে। মহানবী (সা.) এর প্রতি আল্লাহ পাকের সর্বপ্রথম বাণী 'পড়ুন' অর্থাৎ জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করুন। তাই জ্ঞানান্বেষণ বা বিদ্যার্জনকে বলা হয় ইসরামের মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডহীন মানুষ যেমন অর্থ ও অকর্মণ্য হয়ে থাকে, বিদ্যার্জন না করে প্রকৃত মুসলমান হওয়াও তেমনি অস্বাভাবিক ও অসম্ভব দাবি। পবিত্র কুরআন বলছে. "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। পাঠ কর, আর জেনে রাখ, তোমার প্রতিপালক সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা তারা জানতো না। [৩০৩]

আল্লাহ জ্ঞানের সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের কথা ঘোষনা করেছেন। তিনি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে জ্ঞান দান করে তাকেহ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা  আসন প্রদান করেছেন।

---

[৩০১] প্রফেসর মাওলানা আবদুল খালেক, *সিরাজুস সালিকীন*, ঢাকা, সেবা প্রিন্টিং প্রেস, মহাখালী, বাংলা সন ১৩৯০, পৃ. ৩-১০

[৩০২] খানা বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, *কুরআন শরীফ*, ভূমিকা, ঢাকা, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, ১৯৫২, পৃ. ৭১-৭৩

[৩০৩] *আল কুরআন*, সুরা আলাক, আয়াত ১-৫

আল্লাহ পাক আরো বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশোধিত করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট ছিল।” [৩০৪] জ্ঞানার্জনের কোন বিকল্প ইসলামে নেই। সুতরাং ইসলাম জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। ফলে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হতে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞানচর্চার যে প্রবাহ শুরু হয়, নারীরাও সেখানে শামিল হয়েছিল। পরবর্তীতে আব্বাসীয় ও উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। [৩০৫]

ইসলামে পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্যে নারীকে শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি; বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রূপ মনে করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিতা মহিলারা শুধু নারীদের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সাহাবী, তাবে'য়ী এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁদের নিকট হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। অতএব, শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করে নি। উভয়ের অধিকার সমান। [৩০৬]

অবশ্য শিক্ষার প্রকারে পার্থক্য আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত শিক্ষা এই যে, তদ্দ্বারা তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিনীরূপে গড়ে তোলা হবে। যেহেতু তার কর্মক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা এই ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারে। এ ছাড়া তার জন্য ঐ সকল বিদ্যা-শিক্ষারও প্রয়োজন যা মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে, তার চরিত্র গঠন করতে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করতে পারে। এই ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য। এরপর কোন নারী যদি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারিনী হয় এবং এ সকল মৌলিক শিক্ষা-দীক্ষার পরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাহলে ইসলাম তার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। তবে শর্ত এই যে, কোন অবস্থায়ই সে শরীয়তে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে না। শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকে উচ্চ শিক্ষালাভে ব্রতী হতে হবে।[৩০৭]

পবিত্র ইসলাম যেভাবে পুরুষের উপর শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন ফরয করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি এটা ফরয করে দিয়েছে নারীদের উপর। নবী করীম (সা.) আলিমদেরকে তার উত্তরাধিকারী বলে ঘোষনা করেছেন। এ ঘোষনায় তিনি পুরুষ বা মহিলা কাউকেও বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন নি। তিনি আরও বলেছেন, জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরই ফরয। এখানেও নর ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য না করে পুরুষ ও মহিলা উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গোটা মানব

[৩০৪] *আল কুরআন*, সূরা আল ইমরান, আয়াত- ১৬৪
[৩০৫] ফাতেমা আলী, *ইসলামে নারী*, ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃ. ৩৫-৪১
[৩০৬] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩-৪৬
[৩০৭] সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, পর্দা ও ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৪-১৭৫

জাতিকে ধ্বংস হতে উদ্ধার করার লক্ষ্যে নবী করীম (সা.) এর ঐ বাণী সে যুগে এমনি নজিরবিহীন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও নারী কোন রকম ইজ্জত-সম্মান ছিল না। তথাকথিত উন্নত জাতির লোকেরাও নারীদেরকে মানবের স্তর হতে বহিস্কার করে জীব-জন্তুর স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। মহান আল্লাহ অশেষ রহমত করে তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষার মাধ্যমে শুধু পুরুষদেরকেই নয়, বরং নারীদেরকেও সঠিক মানবতা ও মর্যাদার উঁচু চূড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। বর্বতার যুগে ক্রীত দাস-দাসীদের মান-ইযযত বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমে তারাও এত উচ্চ আসনে আসীন হয়েছেন যে, অনেক সম্মানিত ব্যক্তিরাও তাঁদের নিকট হতে দীনী শিক্ষা গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয়েছেন।

ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্য হতে যেমনি হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমার (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত ইবন আব্বাস (রা.), হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.), হযরত ইবনে উমার (রা.) এবং হাসান বসরী (র.), ইমাম বুখারী (র.), ইমাম মুসলিম (র.), ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম রাযী (র.), ইমাম গায্যালী (র.) এর মত মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমিন হযরত আয়েশা (রা.), হযরত হাফসা (রা.), হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.), হযরত কারীমা বিনতে মিকদাদ (রা.), হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) এবং হযরত রাবে'য়া বসরী (র.) এর মত মহিয়ষী নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মোটকথা ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের মহিলাগণ আত্মসংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দীনী-শিক্ষা লাভ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলতেন, যাতে তাঁরা নিজেদের যুগের পথিকৃৎরূপে কওমের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।[৩০৮]

শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার জন্য নারী জাতিকে রাসূলে করীম (সা.) বহু হাদীসে তাকীদ দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষাকে যেরূপ জরুরী মনে করা হয়েছে, মহিলাদের জন্যও তেমনি আবশ্যক মনে করা হয়েছে। পুরুষরা যেমন নবী (সা.) এর নিকট তা'লীম গ্রহণ করতেন, তেমনি করতেন নারীরাও। মহিলাদের শিক্ষা লাভের জন্য নির্ধারিত সময় দেয়া হত। সে সময় নবী (সা.) তাদের তা'লীম দিতেন। উম্মুল মু'মিনীগণ মহিলাদের শিক্ষয়িত্রী হতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) কেবল নারীদের নয়, বরং পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। বড় বড় সাহাবীরাও তাঁর কাছে হাদীস, তাফসীর এবং ফিকহ শিক্ষা করতেন। শুধু সম্ভ্রান্ত মহিলাদেরকেই নয়, বরং দাসীদেরকেও শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ "যার নিকট কোনদাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা দান করে, ভালভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, এবং এটা খুব সুন্দররূপে আঞ্জাম দেয়, অতঃপর তাকে মুক্ত করে এবং বিয়ে করে স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদা দান করে, তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।" তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ

[৩০৮] মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, নবী (স) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯-৮১

মূসা (রা.) এর সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, "আমাদের মাঝে যখনই কোন হাদীসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, আমরা তখনই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম।[৩০৯]

ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করার জন্য ইসলাম নারী জাতিকে শুধু সুযোগই দেয়নি বরং ফরয করে দিয়েছে। পুরুষগণ যেভাবে নবী করীম (সা.) এর নিকট ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করতো, তেমনি মহিলাদের জন্যও ইলমে দিনের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। নবী করীম (সা.) ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীস বুখারী গ্রন্থে মহিলা শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক একটি শিরোনামও দিয়েছেন। যার বিশ্লেষণের দ্বারা নারী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থারই গুরুত্ব বোঝা যায়। সাহাবা এবং তাবে'য়ীনের যুগেও বিকল্প পন্থায় মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে যুগে মহিলাদের মধ্যে বড় বড় বিদূষী, বিজ্ঞানী এবং হাদীসবেত্তা বিদ্যমান ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আসমা(রা.), হযরত উম্মে দারদা(রা.), হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) প্রমুখ মহিলা সাহাবীদের ইলমী যোগ্যতা ও ইসলামী আইন বিদ্যা সম্পর্কে তাবাকাতে ইবনে সা'দ এবং মুসনাদে আহমদে বিবরণ রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) এর নিকট হতে অনেক সাহাবী ও তাবে'য়ী দীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন।

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" এ হাদীসে কুরআনের ইলম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের জন্য সমভাবে প্রয়োজন। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বেহেশতী জেওর নামক গ্রন্থে লিখেছেন : "এলাকার মুসলিম মহিলাদেরকে একত্র করে দীনী শিক্ষা দেয়া একান্ত দরকার।" শুধু নামাজ রোযার আহকাম, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও সামান্য তাসবীহ-তাহলীল জানলেই ইসলামী জ্ঞানার্জন হলো না, বরং ইসলামী আকাইদ, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের ইলম অর্জন করা এবং অপর মুসলমানকে শরীয়তের অনুসরণে সংশোধন করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই জরুরী। দীনের শিক্ষা ছাড়া বিধি-বিদানের সংস্কার সম্ভব নয়।

হযরত অমিয়া বাগদাদী (র.) নাম্নী জনৈকা মহিলা মদীনাতে ইমাম মালিক (র.) এর নিকট ইলম হাদীস এবং ইমাম শাফে'য়ী (র.) এর নিকট ইলমে ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে মহিলারা হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও তাসাউফের বিশদ জ্ঞান অর্জন করে দীনের প্রচারণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রচারণা পর্দাহীনভাবে হয় নি। বরং পর্দার মাধ্যমেই হয়েছে। 'মাদখাল" মাদক কিভাবে বর্ণিত আছে যে, অতীতে মুসলিম মণীসীদের পত্নীগণ ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি লিখে মহিলাদের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার ও শিক্ষাদান কাজে

[৩০৯] মাওলানা নো'মান আহমদ, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার, ঢাকাঃ শিবলী প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ-৯৬

আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে তাঁদেরই গর্ভে বড় বড় উলামা, আউলিয়া ও ইমামের জন্ম হয়। যাদের দৃষ্টান্ত বর্তমান বিশ্বে দূর্লভ।

## নারী শিক্ষা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশণা :

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন :

*طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ –

"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতেক মুসলমানের উপর ফরয বা অপরিহার্য।"[৩১০]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেনঃ

*من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة–

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ তাদ্বারা তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দেন।"[৩১১]

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ ওহীযোগে আমাকে জানিয়েছেন-

من سلك مسلكا فى طلب العلم سهلت له طريق الجنة–

"যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোন পথ ধরে, আমি তার জন্য বেহেশতের পথ সুগম করে দেই।"[৩১২৩৮]

কাসীর ইবনে কায়েস বলেন, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেছেন যে, আমি রাসূলে করীম (স কে বলতে শুনেছি :

*من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طريق الجنة–

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন পথ গ্রহণ করে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের একটি পথে পরিচালিত করেন।"[৩১৩]

হযরত ওয়াছিরা ইবনে আসফা (রা.) বলেন রাসুলে করীম (সা.) বলেছেনঃ

*من طلب العلم فادركه كان له كفلان من الاجر فان لم يدركه كان كفل من الاجر–

[৩১০] *ইবনে মাজাহ*, সুনান, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ ৮১

[৩১১] আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ২য় খণ্ড, বাবু ফী তালাবিল ইলম, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯০, পৃ ২৬২

[৩১২] বায়হাকী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩

[৩১৩] বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬২

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং তা পেয়ে যায়, তার পুরস্কর দ্বিগুণ। আর যদি তা নাও পায়, তবুও সে একগুণ পুরস্কার পাবে।"[৩১৪]

হযরত মাখরাবা আযদী (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেনঃ

*من طلب العلم كان له كفارة لما مضى –

"জ্ঞানপূন কথা জ্ঞানীর হারানো ধন অতএব, সে যেখানেই তা পাবে, তা গ্রহণ করার জন্য তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"[৩১৫]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, রাসূসে করীম (সা.) বলেছেনঃ

*من خرج فى طلب العلم فهو فى سبي الله حتى يرجع –

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, সে আল্লাহর পথেই চলতে থাকে, যতক্ষণ না ফিরে আসে।"[৩১৬]

হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূল করীম (সা.) বলেছেন:

*نعم الرجل الفقيه فى الدين ان احتيج اليه نفع وان استغنى عنه اغنى نفسه–

"ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কতই না উত্তম! যদি কেউ তাঁর শরণাপন্ন হয়, তিনি তার উপকার করেন। আর কেউ তার সাহায্য না চাইলেও তিনি নিজেই তো কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।"[৩১৭]

আবদুল্লাহ ইবনে হারেস বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

*من تفقه فى دين الله كفاه الله مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب–

"যে ব্যক্তি আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে, তার চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাকে এরূপ স্থান থেকে রিযিক দান করবেন যা সে ধারণাও করতে পারবে না।"

[৩১৪] দামেরী, সুনান, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯
[৩১৫] *জামিউত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, আবওয়াবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮
[৩১৬] *জামিউত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, আবওয়াবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩
[৩১৭] আদ-দায়লামী, *আল-ফিরদাউস*, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৯৮৬, পৃ ২৫১

### নবী করীম (সা.) এর যুগে নারী শিক্ষা

মহানবী (সা.) যখন একটি আদর্শ সমাজ গঠনে ব্যস্ত, তখন মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো যে, কোন মহিলা যদি এ সমাজের সদস্য হিসেবে গণ্য হতে চায়, তাহলে তার নিকট হতে নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা ও আইনের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে হবেঃ

* يَايُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

"হে নবী! ঈমানদার মহিলারা যখন আপনার কাছে বাইয়াতের জন্য আসে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, নিজেদের হাত ও পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের কোন অপবাদ গড়বে না এবং কোন ভাল কাজে আপনার অবাধ্য হবে না, তাহলে আপনি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়াবান।"[৩১৮]

এই আয়াতে মহিলাদের নিকট থেকে যেসব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো তারা কোন সৎকাজে রাসূলে করীম (সা.) এর অবাধ্য হবে না। এ কথাটি দ্বারা তাদের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হয়েছে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাদেরকে রাসূলের আনুগত্যের জন্য বাধ্য করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ নবী করীম (সা.) এর স্ত্রীদেরকে জ্ঞান চর্চার নির্দেশ দান করে বলেনঃ

* وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا –

"তোমাদের ঘরে আল্লাহর যেসব আয়াত ও হিকমতের কথা শেখানো হয়, তোমরা তা স্মরণ রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে অবহিত।"[৩১৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সেজন্য তারা দিনরাত সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকতো। জ্ঞান আহরণের পথে কোন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ করতে পারতো না।

---

[৩১৮] আল কুরআন, সূরা আল মুমতাহিনা, আয়াত-১২
[৩১৯] আল কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত-৩-৪

আনসারী মহিলাদের সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেনঃ

*نعم النساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن فى الدين–

"আনসারী মহিলারা কতই না ভাল। দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরমও তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।"[৩২০]

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মহিলারা কত গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন হযরত আয়েশা (রা.) এর নিম্নের উক্তি হতেই তা বোঝা যায়ঃ

*كانت تنزل علينا الاية فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحفظ حلالها وحرامها وامرها وزاجرها ولا نحفظها–

"নবী করীম (সা.) এর যুগে কুরআন মজীদের কোন আয়াত নাযিল হলে, আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্ত না করলেও তার হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।"[৩২১]

ইবাদত এবং জ্ঞান চর্চার মজলিসে নারীরা বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতো। খাওলা বিনতে কায়েস আল জাহনিয়া (রা.) নবী করীম (সা.) এর সুউচ্চ কণ্ঠের উল্লেখ করে বলেছেন?

*كنت اسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وانا فى موخر النساء–

"জুমু'আর দিনে আমি নবী (সা.) এর খুতবা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম। অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।"[৩২২]৭৯

হারিসা ইবনে নু'মানের এক কন্যা বর্ণনা করেছেনঃ

*ما حفظت ق الامن فى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة–

"আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কাফ মুখস্ত করেছিলাম। তিনি প্রত্যেক জুমু'আর খুতবাতে এটি পড়তেন।"[৩২৩]

মেয়েদের উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নবী করীম (সা.) নিজেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। যদি কোন সময় তিনি বুঝতে পারতেন যে, মেয়েরা তার বক্তব্য ঠিকমত শুনতে পায় নি, তাহলে তিনি তাদের কাছে গিয়ে পুনরায় তা বলে দিতেন।

[৩২০] মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬১
[৩২১] ইবন আবদি রাব্বিহি, *আল-ইকদুল ফরীদ*, ১ম খন্ড, কায়রোঃ মাতবা'আতু লাজনাতিত তা'লীক, ১৯৫৬, পৃ ২৭৬
[৩২২] ইবনে সা'দ, *আত তাবাকাত*, ৮ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৭
[৩২৩] মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯৫

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এক ঈদের দিনের কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ

*فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن وامرهن بالصدقة –

"তিনি মনে করলেন যে, তাঁর কথা মেয়েদের কাছে পৌঁছতে পারেন নি। তাই পুনরায় তিনি তাদেরকে নসীহত করলেন। তাদের সাদকা দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন।"৩২৪

ইসলাম জ্ঞানান্বেষণের জন্য নারীদের মনে অত্যন্ত গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। তাদের এই জ্ঞান-পিপাসা নিবরণের জন্য নবী করীম (সা.) সাধরণ ব্যবস্থা ছাড়াও মাঝে মধ্যে তাদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ করে দিতেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যেঃ

* قال النساء للنبى صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوم نفسك فوعدهن يوما يأتيهن فيه فوعظهن وامرهن –

"মহিলারা নবী করীম (সা.) কে বললো, আপনার কাছে পুরুষরা এত ভিড় লাগিয়ে থাকে যে, অনেক সময় আমাদের পক্ষে আপনার কথা শুনা সম্ভবই হয় না। অতএব, আমাদের জন্য আপনি আলাদা একটি দিন ধার্য করে দিন। একথা শুনে নবী করীম (সা.) তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেই দিন তিনি তাদের কাছে গিয়ে উপদেশ দিতেন এবং সৎকাজের নির্দেশ দান করতেন।"৩২৫

কোন কোন সময় নবী করীম (সা.) মহিলাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন তাদের কাছে পাঠাতেন। হযরত উম্মে আতিয়া (রা.) বলেন, মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (সা.) মহিলাদেরকে একটি ঘরে একত্রে করে নসীহত করার জন্য হযরত উমর (রা.) কে পাঠালেন। তারপর তিনি এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সালাম দিলেন। আমরাও তাঁর সালামের জবাব দিলাম।

*ثم قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكن وامرنا يا عيدين ان تخرج فيهما الحيض والحيض والعتق ولا جمعة علينا – ونهانا عن اتباع الجنائز –

এরপর তিনি বললেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের কাছে এসেছি। অতঃপর তিনি আমাদের যুবতী এমনকি ঋতুবতী মেয়েদেরকেও দু'ঈদের দিন ইদগাহে যাওয়ার নির্দেশ

---

৩২৪ বুখারী, সহীহুল বুখারী, ১ম খন্ড, কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ ২০; মুহাম্মদ জামালুদ্দীন, মুসলিম নারীর পোশাক ও কর্ম, ঢাকাঃ এশা রাহনুমা, সাইনস ল্যাবরেটরী, ১৯৯৮, পৃ ৭২-৭৬

৩২৫ বুখারী, সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ ২০

দিলেন। আরও বললেন যে, আমাদের জন্য জুম'আর নামায ফরয নয়। আর তিনি আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেদ করলেন।"[৩২৬]

মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ স্থান হলো গৃহ। তাই পিতামাতা যাতে কন্যাদেরকে এবং স্বামী যাতে স্ত্রীকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখায় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ইসলাম সেদিকে তাদের দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

*يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا –

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।"[৩২৭]

এ আয়াতের অর্থ হযরত আলী (রা.) এভাবে করেছেন :

*علموا انفسكم واهليكم الخير وادبوهم –

"তোমরা নিজেরা শেখ এবং পরিবারবর্গকে শেখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং তাদের আদব শিক্ষা দাও ও এসব কাজে অভ্যস্ত করে তোল।"[৩২৮]

মালিক ইবনে হুয়াইরিস (রা.) বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী (সা.) এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি, তখন তিনি বললেনঃ

*ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم وامروهم –

"তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের কাছেই অবস্থান কর। তাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলার নির্দেশ দাও।"[৩২৯]

### সাহাবীদের যুগে নারী শিক্ষা

নবী করীম (সা.) এর পরবর্তীকালে সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে নারীদের চিন্তা ও কর্মের সংশোধনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা সাধনা করেছেন। একইভাবে তাঁরা সমাজ সংস্কারের যে চেষ্টা-সাধনা করতেন তাতেও পুরুষদের সাথে নারীরা অন্তর্ভূক্ত থাকতো। আয়েযা নাম্নী এক মহিলা সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেছেন :

---

[৩২৬] জালালুদ্দীন উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪

[৩২৭] আল কুরআন, সূরা আত তাহরীম, আয়াত-৬

[৩২৮] আল্লামা শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৬

[৩২৯] বুখারী, সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল আযান, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮

*رأيت ابن مسعود يوصى الرجال والنساء ويقول من ادرك منكم من امراة او رجل فالسمة الاول–

"আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে নারী ও পুরুষের উদ্দেশ্য এই বলে নসীহত করতে দেখেছি যে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে তোমাদের মধ্যে থেকে যেই ফিতনার যুগের মুখোমুখী হবে সে যেন নবী (সা.) এর সাহাবাদের কর্মপন্থা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে।"[৩৩০]৮৭

ফলে পূর্বে যে নারীর জ্ঞান ও সংস্কৃতির সাথে একেবারেই অপরিচিত ছিল এখন তারা তার রক্ষক হয়ে দাঁড়ালো। চিন্তা ও সাহিত্যের জগতে যাদের কোন অস্তিত্বই অনুভূত হতো না, এখন তারা জ্ঞান ও হিদায়াতের প্রদীপরূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

হযরত আয়েশা (রা.) এর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ছাত্র উরওয়া ইবনে যুবায়র (রা.) বলেছেনঃ

*ما رأيت احدا من الناس اعلم بالقران ولا بفريضة ولا بحلال ولابحرام ولا بشعر ولا بحديث

العرب ولا بالنسب من عائشة–

"আমি কুরআন, ইসলামের ফরযসমূহ, হালাল ও হারাম, কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা.) এর চেয়ে অধিক জ্ঞান লোক আর দেখি নি।"[৩৩১]

আরবী কাব্য ও কবিতায় উরওয়া ইবনে যুবায়র (রা.) এর বেশ দখল ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করা হলো তিনি বলতেন, কাব্য বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা.) এর জ্ঞানের সাথে আমার জ্ঞানের কোন তুলনাই চলে না। তিনি তো কথায় কথায় কবিতা থেকে প্রমাণ পেশ করতেন।[৩৩২]

মূসা ইবনে তালহা বলেনঃ

*ما رايت احدا افصح من عائشة–

"আমি হযরত আয়েশা (রা.) এর চেয়ে অধিক বাগ্মী ও শুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখি নি।"[৩৩৩]

লোকেরা হযরত আয়েশা (রা.) এর কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানের তুলনায় চিকিৎসা বিষয়ক অধিক জ্ঞান দেখে বিস্মিত হতো। ইবনে আবী মুলায়কা হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললেন, আমরা আপনার কবিত্ব ও বাগ্মীতা দেখে চমৎকৃত হই না। কারণ, আপনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর কন্যা। আর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর বাগ্মীতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আপনি চিকিৎসা বিদ্যা কিভাবে

[৩৩০] দারেমী, সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ ৮২
[৩৩১] হাফিজ যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফাজ*, ১ম খন্ড, বৈরুতঃ দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, তা.বি., পৃ ২৭
[৩৩২] জালালুদ্দীন উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩
[৩৩৩] ইবনে হাজার আলী আসকালানী, আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬০

শিখেছেন? হযরত আয়েশা (রা.) বললেনঃ নবী (সা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধিদল তাঁর চিকিৎসা করতো। আমি সেগুলো মনে রাখতাম।[৩৩৪]

অংক শাস্ত্রে তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবীগণ পর্যন্ত উত্তরাধিকার বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন।[৩৩৫]

আমরা বিনতে আবদুর রহমান ও (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) এর একজন ছাত্রী ছিলেন। ইবনে ইমাদ হাম্বলী নিম্নোক্ত ভাষায় তার কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

* الفقيهة الفاضلة عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية نشأت فى حجر عائشة فا كثرت الروا ية عنها وهى العدل الضابطة لما يؤخذ عنها-

আমরা বিনতে আবদুর রহমান আনসারী বিজ্ঞ ফিকহবিদ ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা.) এর কোলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। অতএব, তাঁর নিকট থেকে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং মজবুত স্মৃতিশক্তি ও ধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সর্বদা গৃহীত হতো।[৩৩৬]

ইবনে হাব্বান (র.) তাঁর সম্পর্কে লিখছেনঃ

* كانت من اعلم الناس بحديث عائشة-

"তিনি হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন।"[৩৩৭]

তাবে'য়ীদের যুগে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ কাসিম ইবন মুহাম্মদ ইমাম যুহরীকে বললেনঃ আমি তোমার মধ্যে জ্ঞান পিপাসা লক্ষ্য করছি। আমি কি তোমাকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ একটি পাত্র দেখিয়ে দেব না? যুহরী বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, 'আমরা বিনতে আবদুর রহমানের মজলিস কখনো ছেড়ে থেকো না। কারণ, তিনি হযরত আয়েশা (রা.) এর কোলে লালিত-পালিত। অতএব, তিনি তাঁর জ্ঞানের পূর্ণ উত্তরাধিকারিণী। ইমাম যুহরী (র.) বললেন, তাঁর পরামর্শ অনুসারে আমি আমরা বিনতে আবদুর রহমানের খিদমতে হাজির হলে জানতে পারলাম, প্রকৃতই তিনি জ্ঞঅনের অফুরন্ত ভান্ডার।"[৩৩৮]

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উম্মে সালমা (রা.) সম্পর্কে লিখেছেনঃ

*كانت ام سلمة موصوفة با لجمال البارع والعقل البالغ والراى الصائب-

---

[৩৩৪] হাকেম, মুসতাদরাক, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১১
[৩৩৫] প্রাগুক্ত
[৩৩৬] ইবনে ইমাদ হাম্বলী, শাজারাতুয যাহাব, ১ম খন্ড, বৈরুতঃ অঅল মাকতাবাতুত তিজারী, তা.বি. পৃ ১১৪
[৩৩৭] ইবনে হাজার আল আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খন্ড, বৈরুতঃ দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, তা.বি., পৃ ১২৯
[৩৩৮] হাফিজ যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফাফাজ, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৬

"উম্মে সালামা (রা.) পরমা সুন্দরী হওয়ার সাথে সাথে পরিপক্ক বুদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারিণী ছিলেন।"[৩৩৯]

হযরত উম্মে সালামা (রা.) এর কন্যা যায়নাব (রা.) সম্পর্কে ইবনে আবদুল বার (র.) বলেনঃ

*كانت من افقه اهل زمانها-

"তিনি তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহদের অন্যতম ছিলেন।"[৩৪০]

আবূ রাফে' সায়িগ (র.) বলেনঃ

*كنت اذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب بنت ابى سلمة-

"যখনই আমি ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মদীনার কোন মহিলার কথা স্মরন করি, তখনই যায়নাব বিনতে আবূ সালামার কথা মনে পড়ে যায়।"[৩৪১]

উম্মুল হাসান নামে উম্মে সালামার একজন দাসী ছিলেন। তিনি এতই যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন যে, মেয়েদের মধ্যে নিয়মিত তাবলীগ ও ওয়াজ নসীহত করতেন।[৩৪২]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) বলেনঃ

*كانت عاقلة من عقلاء النساء-

"তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারিণী মহিলাদের একজন।"[৩৪৩]

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) এর স্ত্রী উম্মুদ্দারদা (রা.) এর জ্ঞান ও মর্যাদা এত উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, ইমাম বুখারী (র.) তাঁর আমলকে সহীহ বুখারী গ্রন্থে প্রমাণ ও উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

*كانت عاقلة من عقلاء النساء-

"উম্মুদ্দারদা (রা.) একজন ফকীহ মহিলা ছিলেন। তিনি নামাযে পুরুষের মত করে বসতেন। তাঁর এই আমল দলীল হিসেবে গণ্য।"

---

[৩৩৯] ইবনে হাজার আসকালানী, আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৯
[৩৪০] ইবনে আবদুল বার, আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাত যায়নাব বিনতে আবূ সালামা; ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৫৫
[৩৪১] ইবনে হাজার আল আসকালানী, আল ইসাবা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৭
[৩৪২] ইবনে সা'দ, আত তাবাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫০
[৩৪৩] ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত, ২য় খন্ড, মিশরঃ ইদারাতুত তারআতিল মুনীরিয়াহ, তা.বি. পৃ ৩৪৯

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ৩.৩.১ শিশুর শিক্ষার অধিকার :

শিশু জন্মাবার পর থেকেই নিত্য-নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিক্ষাবিজ্ঞানে শিশুর শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। শিশুর শিক্ষার জন্য শিক্ষাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক সকলকে শিশুর মনো-দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে মৌলিক ধারণা করা হয়েছে।

## ৩.৩.২ শিশুর বর্ধন ও বিকাশ :

প্রত্যেক নবজাতক অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। সে সময় তার কয়েকটি সহজাত আচরণ মাত্র লক্ষ করা যায়। যেমন- কান্না, হাঁচি, কাশি ইত্যাদি। ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধি ঘটে। একমাসের শিশুর দৈহিক পুষ্টি অপেক্ষা এক বছরের শিশুর দৈহিক পুষ্টি লাভের হার দ্রুততর হয়। বয়:বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই হার আরো দ্রুত হয়। যৌবনের আগমন পর্যন্ত এভাবে চলে। দৈহিক বিকাশ অব্যাহত গতিতে সাধিত হলেও এতে কয়েকটি স্তর লক্ষ করা যায়। একটি স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের গতি ও প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী জীবন বিকাশের স্তরগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মনোবিজ্ঞানী আর্নেস্ট জোনস, মুম্যান এবং কফ্কা প্রমুখ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত জীবন বিকাশের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রকৃতিকে নম্নরূপভাবে উপস্থাপন করা যায়।

| শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বর্ধনের প্রকৃতি | |
|---|---|
| বিকাশে বা বর্ধনের সময়কাল | বিকাশ বা বর্ধনের প্রকৃতি |
| শৈশব ১-৩ বছর | শারীরিক বিকাশের বয়স |
| বাল্য ৩-১১ বছর<br>প্রথম বাল্যাবস্থা ৩-৬ বছর<br>শেষ বাল্যাবস্থা ৬-১১ বছর | মানসিক বিকাশের বয়স<br>শারীরিক বৃদ্ধির বয়স |
| কৈশোর /বয়:সন্ধিকাল ১১-১৮ বছর<br>প্রথম কৈশোরব্যবস্থা ১১-১৪ বছর<br>শেষ কৈশোরব্যবস্থা ১৮-২১ বছর | মানসিক বিকাশের বয়স<br>শারীরিক বিকাশের বয়স |

মানুষের জীবনকে সাধারণভাবে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন- শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন ইত্যাদি।

### ৩.৩.৩ শৈশবে শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক বিকাশ (১-৩ বছর) :

শিশুর শারীরিক বিকাশ তার ভূমিষ্ঠ হবার দশমাস আগে মাতৃগর্ভকালীন অবস্থা থেকেই শুরু হয়। ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই শিশুর দেহ প্রায় সম্পূর্ণ হয়। কেবল তার দাঁত গজায় না। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্রুত বিকাশ হতে আরম্ভ করে। প্রথমে বেকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে এবং ক্রমশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর কিছু কিছু কর্তৃত্ব লাভ করে। দেখার জন্য চোখ খোলে, কোন জিনিস ধরার জন্য হাত বাড়াতে পারে। ছয় মাস বয়সে শিশু মাথা স্থির রেখে বসতে পারে, ছয় মাসের পর কোন শব্দ হলে সে আগ্রহের সাথে শুনতে চায়। সাধারণত এক বছরে শিশু দাঁড়াতে শিখে এবং দ্বিতীয় বৎসরে সে হাঁটতে পারে। এ সময়ে সে আধো আধো কথা বলতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যে সে অনেক শব্দ শিখে এবং অনেক জিনিসের নাম বলতে পারে। তৃতীয় বৎসরে সে তার অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে। সে সারাক্ষণ ছুটাছুটি করে এবং ভালভাবে কথা বলতে পারে ও চায়। শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক বিকাশও শুরু হয় শৈশব থেকে। ভূমিষ্ঠ হবার পর তার কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতি হয় কিন্ত কোন বিষয়ের জ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। জন্মের অল্প পরেই তার স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ-জ্ঞান জাগে। তার পরে তার চোখ এবং শ্রবণ ইন্দ্রয় কাজ করতে আরম্ভ করে। প্রথম বৎসরের মধ্যেই তার আনন্দ, ভয়, ক্রোধ, দুঃখ ও বিরক্তি প্রভৃতি আবেগ উন্মেষের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময়ে তার স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তিরও বিকাশ শুরু হয়।

### ৩.৩.৪ বাল্যকালের শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক বিকাশ (৩-১১ বছর) :

প্রথম বাল্য অবস্থায় শিশুর শারীরিক বিকাশ তেমন দ্রুত হয় না, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর তার অধিক কর্তৃত্ব জন্মে। সে দ্রুত হাঁটতে ও দৌড়াতে পারে এবং এক মুহূর্তও চুপ করে বসে থাকতে চায় না। খেলার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। এ সময় তার অনুসন্ধিৎসাও খুব প্রবল হয়। কী এবং কেন শব্দ ও ভাব দু'টো সারাক্ষণ তার মুখে ও চোখে লেগে থাকে। এ সময় শিশু হয় অনুকরণপ্রিয়। শেষ বাল্যাবস্থায় (৬-১১) শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়। দুধ দাঁত পড়ে নতুন ও স্থায়ী দাঁত জন্মায়। শরীরের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা বছরে প্রায় দুই ইঞ্চি বাড়ে এবং মস্তিস্কের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ (৪/৫) পূর্ণ হয়।

প্রথম বাল্যাবস্থায় শিশুর কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটে। সে রোমাঞ্চকর গল্প শুনতে ভালবাসে। এ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি সতেজ থাকে। শিশুরা এ সময়ে ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক হয় এবং তার সকল আচরণে অহংবোধ বা আমিত্বজ্ঞানের প্রতিফলন ঘটে। শেষ বাল্যাবস্থায় শিশুদের মানসিক বিকাশ আরও দ্রুত হয়। স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি সবকিছুই তীক্ষ্ণ হতে থাকে। ইচ্ছ শক্তির বিকাশের ফলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মসংযম মনোভাব গড়ে উঠে। সে আর পূর্বের ন্যায় অন্ধভাবে আদেশ পালন করে না। তবে যে সমস্ত ব্যক্তি বা গল্পের নায়ক তার প্রশংসা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে তাদেরকে অনুকরণ করতে এবং তাদের আদেশ পালন করতে ভালবাসে। এই সময়ে তার সামাজিকীকরণ হয়।

মা-বাবা বা পরিবারের মানুষের চেয়ে সে তার সমবয়স্কদের নিকট থাকতে বেশি ভালবাসে। দলবদ্ধ খেলা ও দলবদ্ধ কাজ করতে বেশি আনন্দ পায়।

### ৩.৩.৫ কৈশোর/বয়:সন্ধিকালের শারীরিক বিকাশ (১২-১৮ বছর) :

শিশুর জীবন-বিকাশে বাল্য এবং যৌবনের মধ্যবর্তী দ্রুত পরিবর্তন কালকে আমরা বয়ঃসন্ধি কাল বলে থাকি। এটা একটি দৈহিক ও মানসিক বিকাশের বিচিত্র পরিবর্তনের কাল। বাল্যকাল থেকে যৌবনে অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়স্কের স্তর থেকে প্রাপ্ত বয়স্কের স্তরে উন্নীত হওয়ার কালই বয়:সন্ধি। শিশুর দেহে এবং মনে তখন অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। এর ফলে সে নতুন করে তার জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে প্রশ্নব্যাকুল হয়ে ওঠে, অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, সময় সময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ডরোথি রোজার্স মনে করেন যে, বয়:সন্ধি কাল জীবনের এমন একটা সময় যখন সমাজ ব্যক্তিকে শিশু হিসেবেও গণ্য করে না, আবার পরিপূর্ণ বয়স্কের মর্যাদা, ভূমিকা বা ক্রিয়াও তার ক্ষেত্রে আরোপ করে না।

### ৩.৩.৬ কৈশোর/বয়:সন্ধিকালের দৈহিক পরিবর্তন :

বয়সন্ধিকালে দেহের সর্বাঙ্গে নানা পরিবর্তন উপস্থিত হয়। শরীরের মাংসপেশী, হাড়, গ্রন্থি, মস্তিস্ক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়। শরীরের ওজন ও দৈর্ঘ্যের হার বৃদ্ধি পায়। তবে শরীরের দৈর্ঘ্য ও ওজন সমান অনুপাতে বাড়ে না। তাছাড়া ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে এই দৈহিক বৃদ্ধির হার সমান নয়। মেয়েরা প্রথম দিকে ছেলেদের চাইতে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সের পর এ বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে এবং একটি স্তরে এসে দৈহিক বৃদ্ধি অর্থাৎ উচ্চতা থেমে যায়। বয়:সন্ধিকালে রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস ও পাকস্থলীর ক্রিয়ার ক্ষমতা ও গতি বৃদ্ধি পায়। তার ফলে ছেলেমেয়েদের ক্ষুদা বৃদ্ধি পায়, দৈহিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বয়:সন্ধিকালের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল দেহাকৃতির-বিশেষভাবে মুখমণ্ডলের পরিবর্তন। এ সময়ে ছেলেদের মুখের ওপর একটা কাঠিন্যের চাপ পড়ে। দেহের অন্যান্য অংশের মত মুখের মাংসও দৃঢ় এবং উজ্জ্বল হয়। আর মেয়েদের মুখ কোমল, লাবণ্যময় এবং গোলগাল হয়ে ওঠে।

বয়:সন্ধিকালে ছেলেদের গলার স্বরেরও পরিবর্তন হয়। এ সময়ে ছেলেদের স্বরনালীর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এবং তাদের গলার স্বর কর্কশ ও ভারী হয়। মেয়েদের এ রকম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হলেও তাদের স্বর অনেকটা তীক্ষ্ম এবং মিহি হয়। বয়:সন্ধিকালে ছেলেদের দেহে লোম বৃদ্ধি পায় এবং মেয়েদের শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে লোম জন্মে। বিশেষ করে ছেলেদের এ সময় দাড়ি গোঁফ গজায়। বয়:সন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের রসক্ষরা গ্রন্থির পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তনের ফলে দেহের যৌন হরমোন নি:সৃত হয় এবং যৌন অঙ্গের ও দেহের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বয়:সন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের যৌন-অঙ্গ পূর্ণতা

লাভ করে। ফলে শিশুর জীবনে যৌনপরিনতি দেখা দেয়। যৌনপরিণতি বা যৌবনাগম প্রথম অবস্থায় ছেলেদের বেলায় বীর্যোৎপাদন ক্ষমতা এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে রজ:সৃষ্টি  বা ঋতু হওয়া বোঝায়। এই সময়ে ছেলে মেয়েদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ সর্বাপেক্ষা দ্রুত হয়। এই সময়ে তাদের শরীরের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পায়, স্বর পরিবর্তিত হয়, শরীর খুব কর্মঠ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ হয়।

### ৩.৩.৭ কৈশোর বা বয়:সন্ধিকালে আবেগি বিকাশ :

আবেগ বলতে এমন একটি মানসিক অবস্থাকে বুঝায় যা ব্যক্তিকে উত্তেজিত বা ক্ষুব্দ করে তোলে। সাধারণত ভয়, আনন্দ, দুঃখ, রাগ, বিরক্তি, ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদিকে আবেগ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। জীবনের যে কোন স্তরে আবেগিক বিকাশের পেছনে তিনটি কারণ বর্তমান। সেগুলো হল চাহিদার তৃপ্তি, চাহিদার অতৃপ্তি এবং নিরাপত্তার অভাব। শৈশব থেকেই এই তিনটি কারণে ব্যক্তির মদ্যে আবেগের বিকাশ ও প্রকাশ হতে থাকে। বিভিন্ন মৌলিক ও মিশ্র বা জটিল আবেগের বিকাশ বয়:সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে হতে থাকে। বয়:সন্ধিকালে রাগ, ভয়, দুশ্চিন্তা, স্নেহ, ভালবাসা, ঘৃণা, ঈর্ষা, আবেগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে। এ সময়ে এসব আবেগের তীব্রতা দেখা দেয়। আবেগমূলক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ বয়সের ছেলেমেয়েরা অন্য স্তরের ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি ভিন্ন। এ বয়সে সব রকম আবেগের বিকাশ হয়। আবেগিক আচরণের প্রকাশও কোন কোন ক্ষেত্রে খুব বেশী হয়। আবার কোন সময় একদম থাকে না। যেমন- কোন সময় আনন্দ তীব্রভাবে প্রকাশ করে, আবার কখনো এমন বিমর্ষ হয় যে, সে যে কোন সময় আনন্দিত হয়েছিল তা কল্পনা করা যায় না।

শৈশবের সোনালী সকাল পেরিয়ে, বাল্যকালের চঞ্চলতার মাঝে যৌবনের দোর গোড়ায় পৌছানোর যে বাড়ন্ত, দ্রুত পরিবর্তনশীল স্বপ্নিল সময় তাকেই বলা হয় বয়:সন্ধিকাল বা কৈশোরকাল। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী এই সময়কে পীড়ন ও কষ্টের কাল বরে অভিহিত করেছেন। অনেকেই এই সময়টিকে ঝড়-ঝঞ্জা বা অপরাধ প্রবণতার কাল বলেও চিহ্নিত করেছেন। ব্যাক্তি, লিঙ্গ, স্থান এবং পরিবেশের তারতম্য ভেদে এক দশকের বয়সগুলোকে সাধারণত: বয়:সন্ধিকাল ধরা হয়ে থাদকে। অর্থাৎ বয়:সন্ধিকালের ব্যাপ্তি হয়ে থাকে দশ থেকে ঊনিশ বছর। এই কালটি আবার দু'টো বাগে ভাগ করা যায়।

যথা :

(১) প্রথম কৈশোর যার বয়:ক্রম ১০-১৪ এবং

(২) শেষ কৈশোর  যার বয়:ক্রম ১৫-১৯ বছর।

ঝড়ে পড়া শিশুদের ইসলামী শিক্ষার আওতায় আনার পদক্ষেপ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়:

### ৩.৩.৮ সরকারের মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি অন্যতম বৃহৎ প্রকল্প। ১৯৯৬ খৃ. পর্যন্ত এই প্রকল্পে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৯শ ৫০ জনকে স্বাক্ষরতাদান করা হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চাবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও ৬ লাখ ১১ হাজার ৫শ ২০ জনকে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

**এই প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপ :**

১. ৪ থেকে ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য একটি সুসংগঠিত মসজিদ ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা।

২. শিক্ষাঙ্গণ বহির্ভূত ৬ থেকে ১০ বয়ঃস্তরের শিশুদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা দান করে বিদ্যালয় মুখী হওয়ার পথ সুগম করা।

৩. বিদ্যালয় ত্যাগী বা বিদ্যালয় বহির্ভূত ১১ থেকে ১৪ বয়ঃস্তরের কিশোর কিশোরীদের জন্য মসজিদ ভিত্তিক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৪. নতুন ও স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা চর্চা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, যাতে সব অর্জিত স্বাক্ষরতা সতেজ ও সজীব থাকে এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

# চতুর্থ অধ্যায়

## প্রথম পরিচ্ছেদ :

### ৪.১.১ মানিকগঞ্জ জেলা : পরিচিতি ও ইতিহাস :

**অবস্থান**

মানিকগঞ্জ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত ঢাকা বিভাগের একটি জেলা। মানিকগঞ্জের উত্তরে টাংগাইল জেলা, পশ্চিম, পশ্চিম দক্ষিণ এবং দক্ষিণ সীমান্তে যথাক্রমে যমুনা এবং পদ্মা নদী, পাবনা ও ফরিদপুর জেলাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পূর্ব উত্তর পূর্ব দক্ষিণে রয়েছে ঢাকা জেলার যথাক্রমে ধামরাই, সাভার, কেরাণীগঞ্জ দোহার এবং নবাবগঞ্জ উপজেলা। ইহা ২৩° ৫২.৪৫″ অক্ষাংশ ও ৯০° ৪.১৫″ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

### ভূমি :

বাংলার মধ্যভাটি অঞ্চলভুক্ত মানিকগঞ্জ জেলার মাটি নদবিহিত পলি মাটি দ্বারা গঠিত। এ জেলার বুক চিরে বয়ে চলছে পদ্মা, ধলেশ্বরী, ইছামতি, করতোয়া, যমুনা ও কালীগঞ্জ। মানিকগঞ্জ জেলার ভূভাগের মদ্যে হরিরামপুর শিবালয়, ঘিওর এবং সিংগাইর এর অংশ বিশেষ প্রাচীন। বাকী ভূ-ভাগ আঠার এবং ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে বসবাস উপযোগী হয়। প্রাচীনকালের নকশার ও জরিপকরীগণ যেমন বাউ দ্য বারোস (১৫৫০খ্রি.), ভ্যান ডেনপ্রোক (১৬৬০খ্রি.) এবং বেনেল (১৭৬৪-৭৬খ্রি.) প্রমুখের নকশাগুলি মিলিয়ে দেখলে শুধু মানিকগহ্জ নয়, প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত। তাই বাংলাদেশকে বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

### মানিকগঞ্জ জেলার নামকরণ :

সংস্কৃত 'মানিক্য' শব্দ থেকে 'মানিক' শব্দটি এসেছে। মানিক অর্থ-চুনি, পদ্মরাগ, মণি কিংবা মুক্তা। এর ইংরেজি হয় Ruby, Jewel. মাণিক ও মানিক সমার্থবোধক শব্দ। তবে প্রয়োগ ক্ষেত্রে মানিক নাম বিশেষ্যের বেলায় এবং মাণিক গুণবাচক বিশেষ্যের বেলায় ব্যবহার হয়ে থাকে। গঞ্জ শব্দটি ফার্সি, হাট, বাজার, শস্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানকেই গঞ্জ বলা হয়। মানিকগঞ্জ নামের উৎপত্তি সম্পর্কিত ইতিহাস একনও রহস্যে ঘেরা। স্থানীয় জনশ্রুতিই এর একমাত্র ঐতিহাসিক উপাদান। এ নিয়ে বহু বিতর্কও রয়েছে। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে মানিকগঞ্জ নামের উদ্ভব দেখা যায়। এর পূর্বের কোন ঐতিহাসিক বিবরণে, মানচিত্রে বা সরকারী নথিপত্রে মানিকগঞ্জ নামের উল্লেখ নেই।

মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন তার গ্রন্থ মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস-এ কিছু অধিক প্রচলিত জনশ্রুতি বর্ণনা করেছেন[৩৪৪] (ক) অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে 'মানিক শাহ' নামক জনৈক সূফী দরবেশ সিংগাইর উপজেলার মানিকনগর নামক স্থানে আগমন করেন এবং খানকা প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে তিনি এ খানকা ছেড়ে হরিরামপুর উপজেলার দরবেশ হায়দার শেখের মাজারে গমন করেন এবং ইছামতি তীরবর্তী জনশূণ্য চরাঞ্চল বর্তমান মানিকগঞ্জে এসে খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। এ খানকাকে কেন্দ্র করে এখানে জনবসতি গড়ে উঠে। উক্ত জনবসতি মানিকশাহের পূর্ণ স্মৃতি ধারণ করে হয়েছে 'মানিকনগর'। মানিকশাহ শেষ জীবনে ধামরাইতে অবস্থিত আধ্যাত্মিক গুরুর দরবার শরীফে ফিরে যাবার মানসে পণরায় দ্বিতীয় খানকা ছেড়ে ধলেশ্বরীর তীরে পৌছেন। জায়গাটির নৈসর্গিক দৃশ্য তাঁর পছন্দ হয়। তিনি এখানে খানকা স্থান করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খানকার ভক্তবৃন্দ এখানে এসে দীক্ষা নিত। ক্রমে ক্রমে এ জনশূণ্য স্থন বিরাট জনবসতি ও মোকাম প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিন 'মানিক শাহ' তাঁর ভক্তবৃন্দের নিকট ধামরাই হয়ে সোনারগাঁও যাবার বাসনা প্রকাশ করে এবং সত্যিই তিনি খরস্রোতা ধলেশ্বরী পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। তাঁর শিষ্যদের গানে এ বিষয়টি পাওয়া যায়-

মানিক শাহ দরবেশ ছিল,
ধল্লা গাং পড়াইয়া গেল,
সিন্ধুকে বিন্দু হইল তাজা
ও তাতে ধল্লা গাং হইল বাজা[৩৪৫]

ত্রৈমাসিক 'ঋতু রং মন' পত্রিকায় "মানিকগঞ্জের ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে কবি মুফাখখারুল ইসলাম সম্ভবত: এ দরবেশের কথাই উল্লেখ করেছেন-

"মানিক সাধু চইল্যা গেল
খালিগঞ্জ পড়ে রইলো[৩৪৬]

মানিকশাহ চলে গেলেও তাঁর খানকা এবং তৎসংলগ্ন মোকাম বা গঞ্জ পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারেই যে মানিকগঞ্জ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। উক্ত খানকা ও তৎসংলগ্ন খানকা নদীতে বিলীন হয়ে যায়। (খ) কেউ কেউ মনে করেন দুর্ধর্ষ পাঠান সরকার মানিকঢালীর নামানুসারে মানিকগঞ্জ নামের উৎপত্তি হয়েছে। অবশ্য ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, শেরশাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শুরী বংশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক শক্তির অবনতিতে মোঘলদের পণরুত্থান এবং মোঘল আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞের হাত তেকে রেহাই পাবার জন্য বহু পাঠান সৈনিক স্ত্রী-পুত্রসহ বাংলার মধ্যপাঠ অঞ্চলে আশ্রয়গ্রহণ করে।

৩৪৪ বিস্তারিত দ্রঃ মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস, ঢাকা: তা.বি., পৃ-৭-১৫।
৩৪৫ মোঃ আজহারুল ইসলাম (আজহার), মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস, মানিকগঞ্জ: মানিকগঞ্জের লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৯, পৃ.১৩-১৪
৩৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ.১৪

মানিকঢালী সম্ভবত এদেরই একজন হবেন। পাইক, বরকন্দাজ সহ তিনি এ অঞ্চলে এসে প্রভাব বিস্তার করেন এবং পরবর্তীতে তারই নামানুসারে মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ হয়ে থাকবে।

(সা.) আবার কেউ মনে করেন মানিক চাঁদ এর নামানুসারে মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ করা হয়ে থাকবে। মানিকচাঁদ নবাব সিরাজউদৌল্লাহর বিশ্বাসঘাতকদের অন্যতম ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে বাংলার নবাব দরবারের গোপন সরবরাহ করেছেন এবং পলাশীর যুদ্ধে নবাবের সাথে চরম বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন। ইংরেজদের প্রতি মানিক চাঁদের বিশ্বাস দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ও একনিষ্ঠ সেবার কথা ইংরেজগণ ভুলে নি। তাই প্রশাসনিক প্রয়োজনে জেলাকে যখন মহকুমার বিভক্ত করা হয় তখন কোম্পানীর ফাইল ঘেটে ভক্ত মানিক চাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার নামানুসারেই মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ করা হয়।

উপরোক্ত তিনটি পটভূমি স্থানীয় জনশ্রুতি এবং অনুমান ভিত্তিক। এ ব্যাপারে সরাসরি কোন দলিল দস্তাবেজ অথবা ঐতিহাসিক প্রতিবেদন এ যাবৎ হস্তগত হয়নি। তবে 'মানিক শাহ' এর নামানুসারে মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ জনশ্রুতি এবং ঘটনা প্রবাহের যে চিত্র ও ধারণা পাওয়া যায় তাই যুক্তি-যুক্ত বলে মনে হয়।

## মহকুমা ঘোষণা

ইংরেজ শাসক কর্তৃক ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মানিকগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানিকগঞ্জ মহকুমা প্রথমে ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্ট ফরিদপুর জেলার অধীনে ছিল এবং প্রশাসনিক জটিলতা। রিসনকল্পে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে মানিকগঞ্জ মহকুমা ফরিদপুর জেলা হতে কেটে ঢাকা জেলার অন্ত-র্ভুক্ত করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মানিকগঞ্জ মহকুমার আয়তন বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে আটিয়া (বর্তমানে টাঙ্গাইল), ১৮৮০/৮১ খ্রিস্টাব্দে ধামরাই সাভার ও সয়াপুর মানিকঞ্জ মহকুমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মানিকগঞ্জে একটি কোর্ট, ৬৮ জন নিয়মিত পুলিশ অফিসার, ৪০ জন নিয়মিত সিগন্যাল ফোর্স এবং ৭৬৯ জন গ্রাম পাহাদার বা চৌকিদার ছিল।[৩৪৭] মানিকগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠার লগ্নে তিনটি রাজস্ব থানায় বিভক্ত ছিল।

১) মানিকগঞ্জ
২) জাফরগঞ্জ
৩) হরিরামপুর

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পরবর্তী সময়ে বৃটিশ সরকার প্রশাসনিক প্রয়োজনেই বৃহৎ মানিকগঞ্জ ও শিবালয় (প্রতিষ্ঠালগ্ন জাফরগঞ্জ) রাজস্ব থানা ভেঙ্গে অতিরিক্ত চারটি নতুন থানার সৃষ্টি করে। ফলে থানার সংখ্যা বেড়ে সাত এ উন্নীত হয়-

১) মানিকগঞ্জ

৩৪৭ শ্রী শ্রী কুমার কুন্ডু, মানিকগঞ্জঃ ইতিকথা/ইতিহাস, মানিকগঞ্জ সুহৃদ সম্মিলনী স্মরণিকা, ১৮৮৩

২) সাটুরিয়া
৩) সিংগাইর
৪) শিবালয়
৫) ঘিওর
৬) দৌলতপুর এবং
৭) হরিরামপুর

## জেলা ঘোষণা

অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোঃ এরশাদের সামরিক সরকার দেশের প্রশাসনিক পুনবিন্যাসের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে সিদ্ধান্তের আলোকে সকল মহকুমাকে জেলায় এবং থানাগুলোকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়। মানিকগঞ্জ বাংলাদেশের জেলা হিসেবে গণ্য হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ থেকে। মানিকগঞ্জ স্টেডিয়ামে এক বিরাট জনসভায় মেজর জেনারেল এম.এ.মুন মানিকগঞ্জকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রথম জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন জনাব এম.জি.মর্তুজা।[৩৪৮]

## মানিকগঞ্জের উপজেলা সমূহের বিস্তারিত তথ্য :

মানিকগঞ্জ জেলা সর্বমোট ৬৬টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত। নিচে থানা ওয়ারী ইউনিয়নগুলোর তালিকা দেয়া হলঃ

১। মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা : ইউনিয়ন ১০ টি  (পৌরসভাসহ)

ক) মানিকগঞ্জ পৌরসভা
খ) দীঘি
গ) কৃষ্ণপুর
ঘ) নবগ্রাম
ঙ) ভাড়ারিয়া
চ) গড়পাড়া
ছ) বেতিলা-মিতরা
জ) পুটাইল
ঝ) হাটীপাড়া
ঞ) জাগীর

৩৪৮ বিস্তারিত দ্র: মোঃ আযহারুল ইসলাম, মানিকগঞ্জের শত মানিক, মানিকগঞ্জ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০৫, পৃ.০৩-১৫

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার মানচিত্র :

**মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা** (মানিকগঞ্জ জেলা) আয়তন: ২১৪.৮১ বর্গ কিমি।অবস্থান: ২৩°৪২´ থেকে ২৩°৫৫´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৫৮´ থেকে ৯০°০৭´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে সাটুরিয়া উপজেলা, দক্ষিণে নবাবগঞ্জ (ঢাকা) এবং হরিরামপুর উপজেলা, পূর্বে সিঙ্গাইর ও ধামরাই উপজেলা, পশ্চিমে হরিরামপুর ও ঘিওর উপজেলা।

**জনসংখ্যা** ২৬১৬৬২; পুরুষ ১৩০৮৪২, মহিলা ১৩০৮২০ ।মুসলিম ২৩২৪০৭, হিন্দু ২৯১৭০, বৌদ্ধ ৩৩ এবং অন্যান্য ৫২।

**জলাশয়** কালীগঙ্গা, ধলেশ্বরী, ইছামতী ও গাজীখালী নদী এবং গাঙডুবি বিল উল্লেখযোগ্য।

**প্রশাসন** মানিকগঞ্জ থানা গঠিত হয় ১৮৪৫ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে।

| উপজেলা | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম | জনসংখ্যা | | ঘনত্ব(প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | |
| | | | | শহর | গ্রাম | | শহর | গ্রাম |
| ১ | ১০ | ২৭০ | ৩১৮ | ৫৩৬৭৮ | ২০৭৯৮৪ | ১২১৮ | ৬৬.৩৪ | ৪৭.৬৪ |

| পৌরসভা | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| আয়তন (বর্গ কিমি) | ওয়ার্ড | মহল্লা | লোকসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) |
| ৩৯.০৯ | ৯ | ৫০ | ৫২৮২৬ | ১৩৫১ | ৬৬.৫৫ |

| উপজেলা শহর | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আয়তন (বর্গ কিমি) | মৌজা | লোকসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) |
| ১.৩২ | ২ | ৮৫২ | ৬৪৫ | ৫৩.১৩ |

| ইউনিয়ন | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড | আয়তন (একর) | লোকসংখ্যা | | শিক্ষার হার (%) |
| | | পুরুষ | মহিলা | |
| আটিগ্রাম ১৩ | ৫০৮৩ | ৯৯৭৩ | ৯৬০৭ | ৪৩.২৩ |
| কৃষ্ণপুর ৭১ | ৭৪৪৫ | ১৩৬৮৬ | ১৩২০৮ | ৪৩.৫৪ |
| গড়পাড়া ৩১ | ৩৮৭৫ | ১০৫৮৯ | ১০৭০৪ | ৪৬.৫৫ |
| জাগীর ৫৫ | ৪৭৬৮ | ১১৯০৭ | ১১১০৬ | ৪৫.৭০ |
| দীঘি ২৩ | ৩০০২ | ৮১১৬ | ৮০২৬ | ৫২.৭৩ |
| নবগ্রাম ৮৭ | ৩৬৪৩ | ৮১৮৮ | ৮১৫৯ | ৫২.৪৮ |
| পুতাইল ৯৪ | ৫২৮৯ | ৯৫৬১ | ১০৬২৪ | ৪৮.৭২ |
| বেতিলামিত্র ১১ | ৪২৫৬ | ১০০৪৫ | ১০৫৩১ | ৫২.৬৬ |
| ভাড়ারিয়া ১৫ | ৪৬৭৮ | ৯২৭০ | ৯৭৪৭ | ৪৯.০০ |
| হাতিপাড়া ৩৯ | ৫৯৩৫ | ১২০২২ | ১৩৭৬৭ | ৪৫.৭৪ |

সূত্র : আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

২। সিংগাইর উপজেলা : ইউনিয়ন ১১টি; পৌরসভা ১টি

ক) বায়রা

খ) তালেবপুর

গ) সিংগাইর পৌরসভা ও ইউনিয়ন

ঘ) জয়মন্টপ

ঙ) ধল্লা

চ) শায়েস্তাপুর

ছ) চারিগ্রাম

জ) বলধরা

ঝ) জামশস

ঞ) কামির্তা

ট) চান্দহর

**সিঙ্গাইর উপজেলার মানচিত্র :**

**সিঙ্গাইর উপজেলা** (মানিকগঞ্জ জেলা) আয়তন: ২১৭.৩৮ বর্গ কিমি।অবস্থান: ২৩°৪২´ থেকে ২৩°৫২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°০৩´ থেকে ৯০°১৬´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।সীমানা: উত্তরে ধামরাই ও মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা, দক্ষিণে নবাবগঞ্জ (ঢাকা) উপজেলা, পূর্বে সাভার ও কেরানীগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা।

**জনসংখ্যা** ২৪৮৬১৫; পুরুষ ১২৬৪১৮, মহিলা ১২২১৯৭।মুসলিম ২৩২০৮৮, হিন্দু ১৬৪৪৯, বৌদ্ধ ২৪ এবং অন্যান্য ৫৪।

**জলাশয়** প্রধান নদী: ধলেশ্বরী, গাজীখালী ও কালীগঙ্গা।

**প্রশাসন** ১৯১৯ সালে সিঙ্গাইর থানা গঠিত হয় এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে।

| উপজেলা | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | | শিক্ষার হার (%) | |
| | | | | | শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম |
| - | ১১ | ১৩৭ | ২৪৬ | ১৩৯৪১ | ২৩৪৬৭৪ | ১১২৩ | ৪৬.৭৭ | ৩৩.৯৯ |

| উপজেলা শহর | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আয়তন (বর্গ কিমি) | মৌজা | লোকসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) |
| ৮.৩১ | ২ | ১৩৯৪১ | ১৬৭৮ | ৪৬.৭৭ |

| ইউনিয়ন | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড | আয়তন (একর) | লোকসংখ্যা | | শিক্ষার হার (%) |
| | | পুরুষ | মহিলা | |
| চানধর ২৫ | ৬৭৮৮ | ১৫৭৫২ | ১৫০২১ | ৩৩.৬৮ |
| চারিগ্রাম ৩৪ | ২৮৩৫ | ৬৯৪৮ | ৬৯৪১ | ৩৩.৭৬ |
| জয়মন্ডপ ৫১ | ৩৪১৪ | ১১৮৫৩ | ১১০৩৪ | ৩৩.০৩ |
| জামশা ৬৯ | ৫০৯৩ | ৯৩৮৯ | ৯৩৭৯ | ৩৮.৩০ |
| জামির্তা ৬০ | ৪১৪৪ | ১০৮৫১ | ১০৬৩২ | ৩০.১৮ |
| তালিবপুর ৯৪ | ৩৬৫৪ | ৭৭৭৫ | ৭৬১২ | ৪৫.৮৭ |
| ধল্লা ৪৩ | ৫৩০৭ | ১৫১৭৭ | ১৪০৮৯ | ২৭.৯৮ |
| বলধারা ১৭ | ৭৪৮৯ | ১২৭৩৪ | ১২৭০৫ | ৪০.৭০ |
| বয়রা ০৮ | ৩৬১০ | ১০৪৬৭ | ১০৩২৪ | ৩৭.২৫ |
| শায়েস্তা ৭৭ | ৪৬৩৬ | ১২১৮২ | ১১৫৭৭ | ২৬.৮৯ |
| সিঙ্গাইর ৮৬ | ৪৯০১ | ১৩২৯০ | ১২৮৮৩ | ৩৯.০০ |

সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৩। সাটুরিয়া উপজেলা: ইউনিয়ন ১০টি

ক) বরাইদ
খ) দিঘুলিয়া
গ) বালিয়াটি
ঘ) দরগ্রাম
ঙ) তিল্লি
চ) হরজগ
ছ) সাটুরিয়া
জ) ফকুরহাটী
ঝ) ধানকোড়া
ঞ) আটিগ্রাম

## সাটুরিয়া উপজেলার মানচিত্র :

**সাটুরিয়া উপজেলা (মানিকগঞ্জ জেলা) আয়তন:** ১৪০.১২ বর্গ কিমি।অবস্থান: ২৩°৫১´ থেকে ২৪°০৩´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৫৫´ থেকে ৯০°০৮´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে নাগরপুর ও ধামরাই উপজেলা, দক্ষিণে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা, পূর্বে ধামরাই উপজেলা, পশ্চিমে দৌলতপুর (মানিকগঞ্জ) ও ঘিওর উপজেলা।

**জনসংখ্যা** ১৫৫১৩৭; পুরুষ ৭৮১৪৭, মহিলা ৭৬৯৯০।মুসলিম ১৪১৮৫২, হিন্দু ১৩২৬৯, খ্রিস্টান ৮ এবং অন্যান্য ৮।

**জলাশয়** প্রধান নদী: ধলেশ্বরী, বংশী ও গাজীখালি।

**প্রশাসন** সাটুরিয়া থানা গঠিত হয় ১৯১৯ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে।

**উপজেলা**

| পৌরসভা | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | | শিক্ষার হার (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম |
| - | ৯ | ১৬৬ | ২২৫ | ৮৩০৮ | ১৪৬৮২৯ | ১১০৭ | ৫২.৪২ | ৩৫.৯৯ |

উপজেলা শহর

| আয়তন (বর্গ কিমি) | মৌজা | লোকসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| ৩.৬২ | ২ | ৩৮০৮ | ২৫৪৮ | ৫২.৪৮ |

ইউনিয়ন

| ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড | আয়তন (একর) | লোকসংখ্যা | | শিক্ষার হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | পুরুষ | মহিলা | |
| তিল্লী ৯৫ | ৫১০৫ | ৯২৬৫ | ৯০৪০ | ২৮.৬৫ |
| দড়গ্রাম ৩৮ | ৩৯৭১ | ৮৮৭৮ | ৮৮০০ | ৪০.২৮ |
| দিঘলিয়া ৪৭ | ৩২২৭ | ৬৬৯৬ | ৬৮১২ | ৩৮.২৯ |
| ধানকোড়া ৫৭ | ৫০৫১ | ১২৯৩৪ | ১২৪৯০ | ৩৯.৪৩ |
| ফুকুরহাটি ৬৬ | ৩৩৪২ | ৮১৪৫ | ৮১৩১ | ৩২.৬৬ |
| বরাইদ ২৮ | ৪৬৪১ | ৯০৩০ | ৯০৮৯ | ৩৩.৩১ |
| বালিয়াটি ১৯ | ২৬৮৩ | ৭১৪৫ | ৭৩৫২ | ৪১.৫৯ |
| সাটুরিয়া ৮৫ | ৩৩১২ | ৯৬১৫ | ৯০৬৯ | ৪১.১০ |
| হরগজ ৭৬ | ২৮২৮ | ৬৪৩৯ | ৬২০৭ | ৩৬.০৫ |

*সূত্র* আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৪। ঘিওর উপজেলা: ইউনিয়ন ৭টি

ক) ঘিওর

খ) পয়লা

গ) সিংজরী

ঘ) বারটিয়া

ঙ) বালিয়াখোড়া

চ) বানিয়াজুরী

ছ) নালী

**ঘিওর উপজেলার মানচিত্র :**

**ঘিওর উপজেলা** (মানিকগঞ্জ জেলা) আয়তন: ১৪৫.৯৫ বর্গ কিমি।অবস্থান: ২৩°৪৭´ থেকে ২৩°৫৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৪৯´ থেকে ৮৯°৫৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে দৌলতপুর (মানিকগঞ্জ) উপজেলা, দক্ষিণে শিবালয় ও হরিরামপুর উপজেলা, পূর্বে মানিকগঞ্জ সদর ও সাটুরিয়া উপজেলা, পশ্চিমে শিবালয় ও দৌলতপুর উপজেলা।

**জনসংখ্যা** ১৩৮৪৭৯; পুরুষ ৬৯১৭১, মহিলা ৬৯৩০৮।মুসলিম ১১৯৪০৩, হিন্দু ১৯০৪২, বৌদ্ধ ২১ এবং অন্যান্য ১৩।

**জলাশয়** প্রধান নদী: পুরাতন ধলেশ্বরী, কালীগঙ্গা, ইছামতি ও গাঙডুবি।

**প্রশাসন** থানা গঠিত হয় ১৯১৯ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে।

| **উপজেলা** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম | জনসংখ্যা | | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | |
| | | | | শহর | গ্রাম | | শহর | গ্রাম |
| - | ৭ | ১৭০ | ১৮৬ | ৬৪০৫ | ১৩২০৭৪ | ৯৪৯ | ৭০.৮৫ | ৪৮.৬১ |

| **উপজেলা শহর** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আয়তন (বর্গ কিমি) | মৌজা | লোকসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) |
| ৪.২৪ | ২ | ৬৪০৫ | ১৫১১ | ৭০.৮৫ |

| ইউনিয়ন | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড | আয়তন (একর) | লোকসংখ্যা | | শিক্ষার হার (%) |
| | | পুরুষ | মহিলা | |
| ঘিওর | ৪৬৪৯ | ১১৭০৭ | ১১৩৬১ | ৫৯.৫৪ |
| নলি | ৪৯৭৬ | ৭৩৬৬ | ৭৫০২ | ৪৬.৫২ |
| পয়লা | ৫১৭০ | ৯৮৬৯ | ৯৮৪০ | ৪৫.৮৭ |
| বড়টিয়া | ৫১৩৭ | ১০০৪৮ | ১০১০৬ | ৪৮.৬৯ |
| বানিয়াজুড়ি | ৪৮৯৩ | ১১৪০৮ | ১১৬৯৮ | ৫৭.৩৭ |
| বালিয়াখোড়া | ৫৭৬৮ | ৯৮৬২ | ৯৮৮৭ | ৪৭.৯২ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সিংজুড়ি | ৫১৩৬ | ৮৯১১ | ৮৯১৪ | ৩৬.১৭ |

সূত্র  আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৫। দৌলতপুর উপজেলা: ইউনিয়ন ৮টি

ক) চরকাটারি

খ) বাঘুটিয়া

গ) বাচামারা

ঘ) খলসি

ঙ) জিয়নপুর

চ) চকমিরপুর

ছ) কালিয়া

জ) ধামশর

**দৌলতপুর উপজেলার মানচিত্র :**

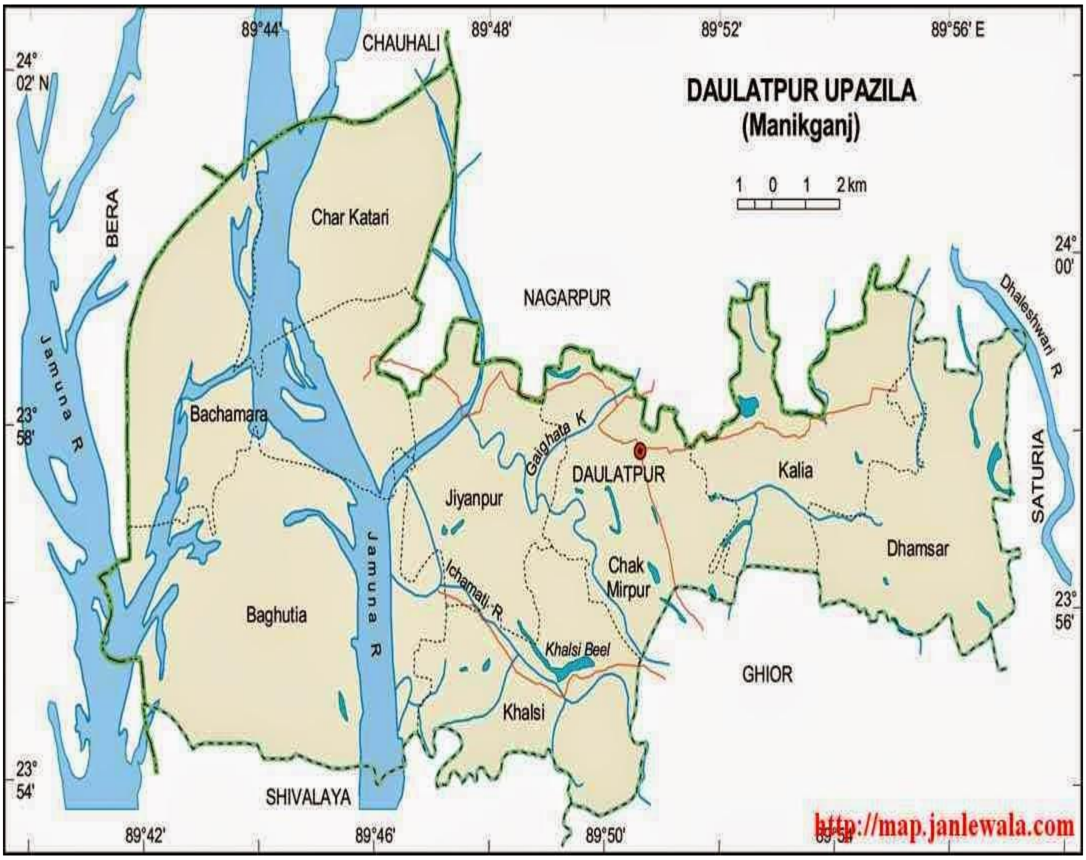

**দৌলতপুর উপজেলা** (মানিকগঞ্জ জেলা) আয়তন: ২১৬.২৪ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°৫৪´ থেকে ২৪°০২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৪১´ থেকে ৮৯°৫৭´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।সীমানা: উত্তরে চৌহালি ও নাগরপুর উপজেলা, দক্ষিণে শিবালয় ও ঘিওর উপজেলা, পূর্বে সাটুরিয়া উপজেলা, পশ্চিমে বেড়া উপজেলা ও যমুনা নদী।

**জনসংখ্যা** ১৫৫৬৭৪; পুরুষ ৭৮৫৫৭, মহিলা ৭৭১১৭। মুসলিম ১৪৬৮৩৪, হিন্দু ৮৮১৪, বৌদ্ধ ২০ এবং অন্যান্য ৬।

**জলাশয়** প্রধান নদী: যমুনা, ধলেশ্বরী ও ইছামতি; গাইঘাটা খাল ও খলসি বিল উল্লেখযোগ্য।

**প্রশাসন** ১৯১৯ সালে থানা গঠিত হয় এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে।

| উপজেলা | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম | জনসংখ্যা | | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | |
| | | | | শহর | গ্রাম | | শহর | গ্রাম |
| - | ৮ | ১৭২ | ১৮৬ | ৫৮৩১ | ১৪৯৮৪৩ | ৭২০ | ৪৫.৩৪ | ২৭.৬৯ |

| উপজেলা শহর | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আয়তন (বর্গ কিমি) | মৌজা | লোকসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) |
| ৪.১৩ | | ৫৮৩১ | ১৪১২ | ৪৫.৩৪ |

| ইউনিয়ন | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড | আয়তন (একর) | লোকসংখ্যা | | শিক্ষার হার (%) |
| | | পুরুষ | মহিলা | |
| কলিয়া | ৫৬৬৪ | ১০১০৯ | ১০০৩২ | ৪০.০৮ |
| খলসী | ৫৫২০ | ৯২০৪ | ৯৩৩৮ | ৩১.০৩ |
| চকমিরপুর | ৫২০৩ | ১০৪৯৩ | ১০৬৬৮ | ৪১.১৬ |
| চরকাটারী | ৪৬৯৮ | ৭৫২২ | ৬৮৩৭ | ২২.৮৬ |
| জিয়নপুর | ৪৮৭২ | ৯৬৮৫ | ৯৪৩৭ | ২৮.৩৯ |
| ধামস্বর | ৫৭৯৫ | ৯৭৭৯ | ৯৫১৫ | ২৩.৪১ |
| বাঘুটিয়া | ১১১২৪ | ১১০৭৫ | ১০৬৯১ | ১৯.৭০ |
| বাঁচামারা | ৯৫৮৩ | ১০৬৯০ | ১০৫৯৯ | ১৭.৪৮ |

সূত্র : আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৬। হরিরামপুর উপজেলা: ইউনিয়ন ১৩টি

ক) বাল্লা
খ) গালা
গ) কাঞ্চনপুর
ঘ) গোপীনাথপুর
ঙ) রামকৃষ্ণপুর
চ) চালা
ছ) লেছরাগঞ্জ
জ) বয়রা
ঝ) বলড়া
ঞ) হারুকান্দি
ট) সুতালরী
ঠ) আজিমনগর
ড) ধুলসুরা

**হরিরামপুর উপজেলার মানচিত্র :**

**হরিরামপুর উপজেলা** (মানিকগঞ্জ জেলা) আয়তন: ২৪৫.৪২ বর্গ কিমি।অবস্থান: ২৩°৩৮´ থেকে ২৩°৪৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৫০´ থেকে ৯০°০৩´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।সীমানা: উত্তরে শিবালয়, ঘিওর ও মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা, দক্ষিণে চরভদ্রাসন ও ফরিদপুর সদর উপজেলা, পূর্বে মানিকগঞ্জ সদর, নবাবগঞ্জ (ঢাকা) ও দোহার উপজেলা, পশ্চিমে শিবালয়, গোয়ালন্দঘাট এবং ফরিদপুর সদর উপজেলা।

**জনসংখ্যা** ১৭১২৭৪; পুরুষ ১৮৪৯৯৪, মহিলা ৮৬২৮০।মুসলিম ১৫০০৪১, হিন্দু ২১২০২, বৌদ্ধ ১০ এবং অন্যান্য ২১।

**জলাশয়** পদ্মা নদী ও ইছামতি নদী এবং ভাতশালা বিল ও ঘারিলপুর বিল উল্লেখযোগ্য।

**প্রশাসন** হরিরামপুর থানা গঠিত হয় ১৮৪৫ সালে।থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে।

| উপজেলা | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | | শিক্ষার হার (%) | |
| | | | | | শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম |
| - | ১৩ | ১৯৬ | ২৩৮ | ৩২৪১ | ১৬৮০৩৩ | ৬৯৮ | ৫১.৪৮ | ৪১.২৭ |

| উপজেলা শহর | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আয়তন (বর্গ কিমি) | মৌজা | লোকসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) |
| ১১.১০ | ১ | ৩২৪১ | ২৯২ | ৫১.৪৮ |

| ইউনিয়ন | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড | আয়তন (একর) | লোকসংখ্যা | | শিক্ষার হার (%) |
| | | পুরুষ | মহিলা | |
| আজিমনগর ০৭ | ৪২৪৪ | ৬৭৪৯ | ৬০২২ | ৩৪.৮২ |
| কাঞ্চনপুর ৭৩ | ৭৭২৫ | ৩৩৩০ | ৩১৯০ | ৩.৪৫ |
| গালা ৫১ | ৪৮৯৮ | ১১০৪৩ | ১০৯৭৫ | ৫১.৪৮ |
| গোপীনাথপুর ৫৮ | ৪৪০৬ | ৭১৯০ | ৬৯০৫ | ৩৭.১৯ |
| চালা ৩৬ | ৪৯৫২ | ৯৪৯৪ | ১০০২১ | ৪৩.৩২ |
| ধুলসুরা ৪৩ | ৪১৬৯ | ৩৭৬৯ | ৪১৭২ | ৪৫.৫৩ |
| বয়ড়া ২৯ | ৪০৩৭ | ৫৮৪৬ | ৬৫৪০ | ৫৩.৬৩ |
| বলড়া ২১ | ২৭০৭ | ৮০১৩ | ৯৩৯৬ | ৪৬.৮৫ |
| বল্লা ১৪ | ৩৪৯৭ | ১১৫৭৭ | ১১০৫৭ | ৪০.৪৭ |
| রামকৃষ্ণপুর ৮৭ | ৩৮৯৭ | ৫৩৫৪ | ৬০১১ | ৩৮.৫৪ |
| লেছড়াগঞ্জ ৮০ | ৮৩১০ | ৬৯৩৩ | ৬২৫৭ | ১৫.৪১ |
| সুতালড়ি ৯৪ | ২৮৬৬ | ৩৭০৫ | ৩৫৩৬ | ৪৪.৯৬ |
| হারুকান্দি ৬৫ | ৩৯২৮ | ১৯৯১ | ২১৯৮ | ৪৬.৩৪ |

সূত্র : আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৭। শিবালয় উপজেলা: ইউনিয়ন ৭টি

ক) তেওতা

খ) শিবালয়

গ) উথলি

ঘ) উলাইলা

ঙ) আড়ুয়া

চ) মহাদেবপুর

ছ) শিমুলিয়া

**শিবালয় উপজেলার মানচিত্র :**

**শিবালয় উপজেলা** (মানিকগঞ্জ জেলা) আয়তন: ১৯৯.০৭ বর্গ কিমি।অবস্থান: ২৩°৪৪´ থেকে ২৩°৫৫´ উত্তর অক্ষাংশ ৮৯°৪২´ থেকে ৮৯°৫৬´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।সীমানা: উত্তরে দৌলতপুর (মানিকগঞ্জ) ও ঘিওর উপজেলা, দক্ষিণে হরিরামপুর ও গোয়ালন্দ উপজেলা, পূর্বে ঘিওর ও হরিরামপুর উপজেলা, পশ্চিমে বেড়া উপজেলা।

**জনসংখ্যা** ১৫৪২৩৯; পুরুষ ৭৯৭১০, মহিলা ৭৪৫২৯।মুসলিম ১৩২৫৭৭, হিন্দু ২১৫৪২, বৌদ্ধ ১০৩, খ্রিস্টান ১৩ এবং অন্যান্য ৪।জলাশয় প্রধান নদী: পদ্মা, যমুনা, ইছামতি।

**প্রশাসন** শিবালয় থানা গঠিত হয় ১৯১৯ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে।

| উপজেলা | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | | শিক্ষার হার (%) | |
| | | | | | শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম |
| - | ৭ | ২০২ | ২৫৩ | ৪১৭৫ | ১৫০০৬৪ | ৭৭৫ | ৫০.৯৬ | ৪০.৬৭ |

| উপজেলা শহর | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আয়তন (বর্গ কিমি) | মৌজা | লোকসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) |
| ২.৮৩ | ৫ | ৪১৭৫ | ১৪৭৫ | ৫০.৯৬ |

| ইউনিয়ন | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড | আয়তন (একর) | লোকসংখ্যা | | শিক্ষার হার (%) |
| | | পুরুষ | মহিলা | |
| আরুয়া ১১ | ৫০০০ | ৬৭২৩ | ৬৪৮৯ | ৩৩.৮৮ |
| উথলী ৮৩ | ৫৮৫৪ | ১০৭২৯ | ১০২৯৮ | ৪৩.০৫ |
| উলাইল ৭১ | ৪৮৭৭ | ১১২৪৭ | ১০৯৬৫ | ৪১.৪৪ |
| তেওতা ৫৯ | ১২৫০৫ | ১৫৭১৬ | ১৫০১১ | ৩৫.২৪ |
| মহাদেবপুর ২৩ | ৫৪২১ | ১০৭৭৬ | ১০৩৭৮ | ৪০.১১ |
| শিবালয় ৪৭ | ৪৬৯৭ | ১৩৪৬০ | ১০৭৮৪ | ৪৯.৫২ |
| শিমুলিয়া ৩৫ | ৬৭০০ | ১১০৫৯ | ১০৬০৪ | ৪১.৫৫ |

সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

## ৪.১.২ মানিকগঞ্জ জেলায় ইসলাম শিক্ষা বিস্তারে কতিপয় মনীষী :

১২০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুসলিম শাসক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বৃহত্তর মানিকগঞ্জ এলকায় বাঁধ-ভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় মুসলমানদের আগমন ঘটতে থাকে। মধ্যে এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আফগান, তুর্কি ও মুঘল সৈন্যদের সাথে ব্যবসায়ী এবং ধর্মপ্রচারকদের মানিকগঞ্জের বিভিন্ন জনপদে আগমন ঘটে এবং তাদের অনেকেই স্থানীয় রমনীদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন গ্রামে বসতি গড়ে তোলেন। আর তৎকালীন সময়ে নদীপথই যেহেতু ছিল যোগাযোগের মাধ্যম সেহেতু প্রাচীন ইছামতি তীরবর্তী অঞ্চলেই অধিক হারে মুসলমানরা নিবাস গড়ে তুলেন। পরবর্তীকালে বাদশাহী ফরমান বলে অনেকেই ভূখন্ড প্রাপ্ত হয়ে মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেন। মানিকগঞ্জ জেলায় যারা ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরীতে অবদান রেখেছেন নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হল-

### ১.মীর শাহ সায়্যেদ সুলতান মাহমুদ বলখী (রহ.)

হযরত শাহ সায়্যেদ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহী সওয়ার (রহ.) সমুদ্রপথে বাংলায় আসেন। এ দেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে যে সকল মুসলিমগণ এদেশে আসেন, তিনি তাঁদের মাঝে অন্যতম।

জনশ্রুতি আছে যে, তিনি ছিলেন বলখের সুলতান আগর শাহের পুত্র। পিতার ইন্তিকালের পর সুলতান মাহমুদ শাহ ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সংহাসনের আরোহণ করে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন। মাহমুদ ধীরে ধীরে রাজকার্যে অমনোযোগী হয়ে পড়েন। এমনসময় একদিন তার এক কৃতদাসী তাঁর শয্যা প্রস্তুত করতে গিয়ে, শাহী বিছানায় কী আরাম তা অনুভব করার জন্য তাতে শুয়ে পড়ে এবং ঘুমিয়ে যায়। সুলতান এসে তাকে তাঁর শয্যায় শায়িত দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বেত্রাঘাত করতে থাকেন। তিনি তাকে যতই আঘাত করেন, দাসী ততই হাসতে থাকে। পরে তিনি সংযত হয়ে তার হাসির কারণ জানতে চাইলেন। ক্রীতদাসী বললো- এ বিলাস শয্যায় সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্য যখন এত শাস্তি, তখন সুলতানের সারা জীবনের আরাম আয়েশের জন্যে যে কত শাস্তি জমে আছে তার হিসাব কে রাখে? এ কথা শুনে তাঁর ভাবান্তর হল। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি রাজকার্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং দুনিয়ার অসারতা উপলব্ধি করে মানসিক শান্তির প্রয়াসে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রাজ সিংহাসন ছেড়ে দামেশক চলে যান। সেখানে সেকালের বিখ্যাত সূফী-সাধক শায়খ তওফীকের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় দীক্ষিত হন। ছত্রিশ বছর পীরের খিদমতে কাটিয়ে দিয়ে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর মুর্শিদ তাঁকে তখন পূর্ব দিকে বঙ্গাল মুল্লুকে গিয়ে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন।

ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস, তিনি বলখের সুলতান ছিলেন বলেই তাকে 'শাহ সুলতান বলখী' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু এ নামে বলখে বা তার আশেপাশে কোথাও শাসক ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সূফী দরবেশগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান রাজ্যের বাদশাহ। তাই তাদেরকে 'শাহ' বলা হয়। আর 'সুলতান' শব্দটির একটি অর্থ হচ্ছে দলিল বা প্রমাণ। সূফী দরবেশদের অধিকাংশ ওলীরা তাঁর নিজ মুর্শিদ কর্তৃক দলীল বা সনদ নিয়ে বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচারের জন্যে প্রেরিত হতেন। এ হিসেবে তাদের বলা হয় সুলতান। এভাবেই তিনি 'শাহ সুলতান' উপাধীতে ভূষিত হন। আর যেহেতু তিনি বলখের বাসিন্দা ছিলেন তাই তাকে বলখী বলা হত।

জনশ্রুতি তিনি মাছের পিঠে সাওয়ার হয়ে সমুদ্র পথে এ দেশে আসেন। তাই তাঁকে 'মাহী সাওয়ার' আখ্যা দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি মৎসাকৃতির বাণিজ্য জাহাজে চড়ে তৎকালীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ বন্দর সন্দীপে আসেন। এজন্য তাকে 'মাহী সাওয়ার' বলা হয়। মাহী অর্থ মাছের সাথে সম্পর্কিত। সন্দীপে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি ঢাকা জেলার হরিরামপুর তথা মানিকগঞ্জে আসেন। হরিরামপুর তখন জনবহুল ও সুরক্ষিত ছিল। সে সময় হরিরামপুরে বলরাম নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন কালীর উপাসক। তার অত্যাচারে প্রজাবর্গ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এই উৎপীড়নের কথা শুনেই 'সুলতান মাহমুদ বলখী' সন্দীপ থেকে ঢাকায় আসেন (বর্তমানে মানিকগঞ্জ)। তিনি সরাসরি বলরামের কালী মন্দিরে উপস্থিত হন। মন্দিরের মধ্যে ছোট বড় বহু দেব দেবীর মুর্তির মধ্যে এক বিরাট কালী মূর্তি স্থাপিত ছিল। মন্দিরে পৌছেই তিনি আযান দিলেন। কথিত আছে যে, আযান দেয়ার সাথে সাথে পাথর ও মাটির মুর্তিগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে গেল। এ অলৌকিক ঘটনা দর্শনের জন্য বহু লোক সমবেত হল। এ খবর রাজার কানে গেলে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তার সেনাবাহিনী পাঠালেন। কিন্তু সেনাবাহিনী দরবেশের কোন ক্ষতি করতে পারলোনা। তখন রাজা নিজে রাও সেনাবল নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে নিহত হন এবং তার স্ত্রী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রক্ষা পান। শাহ সলতান বলখী (রহ.) তাকেই এ অঞ্চলের শাসনভার দিয়ে তাওহীদ প্রচারে নিয়োজিত হলেন। এখানে অবস্থানকালেই তিনি বগুড়ার মহাস্থানগড়ের অত্যাচারী শাসক পরশুরামের কথা শুনতে পান। রাজার অধীনস্থ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ করে বৌদ্ধদের প্রতি তাঁর উৎপীড়ন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। মহাস্থানের এ অত্যাচার কাহিনী শুনে সুলতান মাহমুদ বলখী (রহ.) হরিরামপুর থেকে মহাস্থানে চলে গেলেন। শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহী সাওয়ার ৪৩৯ হিজরী মুতাবিক ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে মহাস্থানে এসেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু এর কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে তিনি এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগেই আসেন ও ইসলাম প্রচার করেন। এ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৪৯]

---

৩৪৯ ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ, "বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ, " অগ্রপথিক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সংখ্যা-ফেব্রুয়ারী'৮৯, পৃ.৯০

## ২. হযরত গাজীউল মুলক ইকরাম ইব্রাহিম বাগদাদী শাহ (রহ.)

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বঙ্গ বিজয়ের পর এয়োদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে হযরত শাহ্জালাল (রহ.) এর সফরসঙ্গী (১২১৪ খ্রি.) বিখ্যাত দরবেশ হযরত গাজীউল মূলক ইকরামুল হক ইব্রাহিম বোগদাদী শাহ (রহ.) সিংগাইর উপজেলার পারিল গ্রামে আগমন করেন ও খানকা প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম প্রচার করেন। স্থানীয় অগণিত নারী-পুরুষ ভক্ত তাঁর নিকট ইসলামের দীক্ষায় দীক্ষিত হন। উক্ত দরবেশের কবরে তার সঙ্গে আনীত বড় বড় পাথর খন্ড এখনও আছে। কবরের সমাধিগাত্রে উৎকলিত শিলালিপি হতে তাঁর পরিচয় ও আগমন তারিখ জানা যায়। নিঃসন্দেহে উক্ত কবর বা সমাধিস্থলই সমগ্র মানিকগঞ্জ জেলার সর্ব প্রাচীন মুসলিম পুরাকীর্তি।

## ৩. হযরত শাহ মুখদম রূপোস (রহ.)

তিনি শাহ্ রুস্তম এর সমসাময়িক। দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার পথে রূপসা গ্রামে যাত্রাবিরতি করে এই স্থানেই কানকা প্রতিষ্ঠা করত: ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর উক্ত স্থান হতে তিনি রাজশাহী গমন করে সেই অঞ্চলের প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার এবং কুআচার দূর করার জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। রাজশাহীতে তাঁর সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। এ অঞ্চলে তিনি সত্যিকার ইসলামের বীজ বপন করেন। তাঁর ব্যবহারে সততা, চরিত্রের দৃঢ়তা দিয়ে তিনি স্থানীয় বাসীদের মন জয় করেন। [৩৫০]

## ৪. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)

তিনি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তেরশ্রীর সম্ভ্রান্ত সিদ্দিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাল থেকেই তিনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি লালায়িত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ভাষার সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি জীবনের যে দিকেই গিয়েছেন সফলতার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহন করেছেন।

মানিকগঞ্জ জেলায় ইসলাম প্রচারে তিনি ব্যাপক অবদান রাখেন। শুধু মানিকগঞ্জ নয় বাংলাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর জীবন দর্শন আজ বিশ্ব দরবারে স্বীকৃত। ইসলামের সুমহান সাক্ষ্যের বাণীই তিনি জীবনভর প্রচার করছেন। ভারতের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদে হিন্দুদের হামলাকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানের ন্যায় মানিকগঞ্জের হিন্দু-মন্দির ভাঙ্গার জন্য সর্বস্তরের মুসলিমগণ একত্রিত হলে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা থেকে এ এলাকাটি রক্ষা পায়। এজন্য তিনি সকলের চোখেই ছিলেন একজন আদর্শ মানব।

৩৫০ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পা), অগ্রপথিক সংকলন, "আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম," ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই,২০০৪, পৃ.৬৯-৭০

তিনি নিজে শিক্ষানুরাগী হওয়াল দরুণ মানিকগঞ্জ শহরের অদূরে সিদ্দিকনগরে গড়ে তুলেন ছিদ্দিকীয়া দারুল উলুম বহুমুখী মাদরাসা। সাথে সাথে তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর ভক্তবৃন্দদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন হিফ্জ মাদরাসা, মক্তব, কওমি মাদরাসা ও আলিয়া নিসাবের অসংখ্য মাদরাসা।

## ৫. শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ মনযুরুল  ইসলাম সিদ্দিকী (দামাত বারকাতুহু)

তিনি ১৯৬৬ খি. মানিকগঞ্জের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত সিদ্দিক ও পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল হতে তিনি ব্যতিক্রম ছিলেন। ইসলামী শিক্ষার প্রতি তীব্র আকাঙ্খার ফলে ইতি মধ্যেই তিনি ‘তা’লিমে ইসলাম’, মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ এর পক্ষ হতে সারা বাংলাদেশে ৬৫টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন। তার এই ঘোষণার বাস্তবায়ণ ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার বাসভবনের নিকট প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘জামিয়া আরাবিয়া ছিদ্দিকিয়া দারুল উলূম মাদরাসা’। যাতে হাদীস, তাফসীর, আদব ও ফিকহ বিভাগ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য এই মাদরাসাটি বর্তানে কওমী শিক্ষা ব্যবস্থা সারা মানিকগঞ্জের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাদরাসা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এছাড়া অত্র এলাকার বিখ্যাত মনীষীগণের মধ্যে সোনাহাজারা সিংঙ্গাইরের শাহ সাহেব, বিশিষ্ট কারী ও পীর সাহেব মাওলানা আব্দুল জলিল সাহেব, মানিকগঞ্জ সরকারী দেবেন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও পীর আব্দুল বাসিত সাহেব এবং মেহেদীপুরের জনাব লুৎফার রহমান সাহেব এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

### ৪.১.৩ একনজরে মানিকগঞ্জ জেলার শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

| ক্রমিক নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিররণ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্থা |
|---|---|---|
| ১. | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৪০ টি |
| ২. | শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১টি |
| ৩. | আনন্দ স্কুল কেন্দ্র | ৪৮টি |
| ৪. | সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় | ১৭টি |
| ৫. | নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৩ টি |
| ৬. | বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যারয় | ১৪৩ টি |
| ৭. | সরকারী স্নাতক কলেজ | ০৩ টি |
| ৮. | সরকারী স্নাতকোত্তর কলেজ | ১টি |
| ৯. | বে-সরকারি কলেজ | ২০টি |
| ১০. | ইন্টার মিডিয়েট | ৩টি |
| ১১. | বে-সরকারী স্নাতকোত্তর | - |
| ১২. | মানিকগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল এবং কলেজ | ১টি |
| ১৩. | পেটি আই | ১টি |
| ১৪. | কামিল মাদরাসা | ১টি |
| ১৫. | উচ্চতর মাদরাসা | ২৪টি |
| ১৬. | ইবতিদায়ী মাদরাসা (স্বতন্ত্র) | ৩টি |
| ১৭. | স্বাক্ষরতার হার | ৪১.৩৪% |

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ৪.২.১ মানিকগঞ্জ জেলার মাদরাসা সমূহ :

শিক্ষা খাতে মানিকগঞ্জ জেলা বিশেষ কৃতিত্ত্বের স্বাক্ষর বহন করে আছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরসহ সকল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহনের ফলে মানিকগঞ্জ জেলায় শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর হয়েছে। ৭টি উপজেলায় বিভক্ত মানিকগঞ্জ জেলায় 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোড' এর আওতায় মোট মাদরাসা রয়েছে ২৭টি। যার মধ্যে একক মহিলা মাদরাসাও রয়েছে। নৈতিক ও মানবিক গুণ সম্পন্ন শিক্ষার্থী, নারীর বিভিন্ন মৌলিক অধিকারসহ পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং ইসলামের শিক্ষা ও এর প্রচার প্রসারে মাদরাসা শিক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূণ, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে মাদরাসা সমূহের নাম উপস্থাপিত হলো :

১. মানিকগঞ্জ জেলার **সদর উপজেলায়** বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট **৫টি** মাদরাসা রয়েছে :

ক) মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা

খ) হাজী জহির উদ্দিন দারুস সালাম দাখিল মাদরাসা

গ) সরুপাই আলহাজ্ব আ: হালীম দাখিল মাদরাসা

ঘ) বনপাড়িল দাখিল মাদরাসা

ঙ) দোয়াত আলী আলিম মাদরাসা

২. মানিকগঞ্জ জেলার **সাটুরিয়া উপজেলায়** বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট **৪টি** মাদরাসা রয়েছে :

ক) দরগ্রাম সিনিয়র মাদরাসা

খ) বালিয়াটি দাখিল মাদরাসা

গ) গোলড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

ঘ) পাতিলাপাড়া এম.বি. দাখিল মাদরাসা

৩. মানিকগঞ্জ জেলার **সিংগাইর উপজেলায়** বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট **৬টি** মাদরাসা রয়েছে :

ক) চরজামালপুর ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা

খ) খাসেরচর মাহমুদিয়া আলিম মাদরাসা

গ) কালিয়াকৈর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

ঘ) চররাজনগর মানিকনগর দাখিল মাদরাসা

ঙ) ভাটিরচর গাউছিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা

চ) ধল্লা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

সিংগাইল উপজেলায় এই ৬টি মাদরাসার সাথেই আরো ৩টি মাদরাসা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড হতে এ ৩টি মাদরাসা পাঠদানের কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি পেয়েছে। মাদরাসা ৩টি হলো-

১) কলিমুদ্দিন মুন্সি বালিকা মাদরাসা

২) শিরিন আলী চৌধুরী আদর্শ মহিলা মাদরাসা

৩) হাসান নগর এতিমখানা

৪. মানিকগঞ্জ জেলার **শিবালয় উপজেলায়** বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট **২টি** মাদরাসা রয়েছে :

ক) কাজী সফিউদ্দিন দাখিল মাদরাসা

খ) শিবালয় রামদিয়া দাখিল মাদরাসা

৫. মানিকগঞ্জ জেলার **ঘিওর উপজেলায়** বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট **৩টি** মাদরাসা রয়েছে :

ক) ঘিওর সিনিয়র মাদরাসা

খ) বৈকুন্টপুর দাখিল মাদরাসা

গ) সাহেব আলী খান মহিলা মাদরাসা

৬. মানিকগঞ্জ জেলার **হরিরামপুর উপজেলায়** বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট **২টি** মাদরাসা রয়েছে :

ক) ঝিটকা গাউসুল আজম আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) দাখিল মাদরাসা

খ) আন্দার মানিক ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

৭. মানিকগঞ্জ জেলার **দৌলতপুর উপজেলায়** বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট **৫টি** মাদরাসা রয়েছে :

ক) দৌলতপুর দাখিল মাদরাসা

খ) চর কালিকাপুর শুকুরিয়া দাখিল মাদরাসা

গ) ঘড়িয়ালা উম্মে কুলসুম দাখিল মাদরাসা

ঘ) বাঘুটিয়া আলিম মাদরাসা

ঙ) প্রিন্সিপাল আবু বক্স খান মহিলা মাদরাসা।

## মানিকগঞ্জ জেলায় স্বতন্ত্র ইবতিদায়ী মাদরাসা সমূহ :

মানিকগঞ্জ জেলার স্বতন্ত্র ইবতিদায়ী মাদরাসার সংখ্যা ৩টি

১) চরকাটারী মানসুরীয়া ইবতিদায়ী মাদরাসা।

২) কল্যানপুর ইবতিদায়ী মাদরাসা।

৩) চরমস্তুল ইবতিদায়ী মাদরাসা। মাদরাসাটি সরকারি অনুদানের অভাবে ৬ বছর আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

## ৪.২.২ মানিগঞ্জ জেলার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) মাদরাসা সমূহের পরিচিতি ও ইতিহাস

### মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার মাদরাসা সমূহের  পরিচিতি ও ইতিহাস

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় মাদরাসা রয়েছে মোট ৫টি । যাদের পরিচিতি ও ইতিহাস নিচে আলোচনা করা হলো :

**১ মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা**

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| মাদরাসার নাম | মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা[৩৫১] |
| স্থাপিত সাল | ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ |
| প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক | ক্বারী আব্দুল খালেক রেজা |
| জমির পরিমাণ | ৫১ শতাংশ[৩৫২] |
| জমির দাতা | মাওলানা বশির রেজা[৩৫৩] |
| প্রিন্সিপাল | প্রফেসর আব্দুল হান্নান আনছারী (ভারপ্রাপ্ত) |
| শিক্ষক সংখ্যা | ৩৫ জন |
| ভবন সংখ্যা | চার তলা বিশিষ্ট U আকৃতির পাকা ভবন। |
| শিক্ষার্থীর সংখ্যা | ৯৯৩ (২০১৮ খ্রি. হিসাব অনুযায়ী)। |
| ইবতিদায়ী প্রধান | সালেহা ইয়াসমিন |
| ঠিকানা | মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ। |
| সমস্যাসমূহ | ছাত্রীদের জন্য পৃথক কমন রুম ও পৃথক বাথরুমের ব্যবস্থা নেই। যা দূর দূরান্ত থেকে আগত ছাত্রীদের বেশ সমস্যায় ফেলে দেয়। |

১৯৫৩খ্রিস্টাব্দে মাদরাসার বর্তমান পরিচালক মাওলানা বশির রেজা সাহেবের পিতা ক্বারী আব্দুল খালেক রেজা সাহেব সর্বপ্রথম এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। মাত্র ২২ জন ছাত্র নিয়ে তিনি মাদরাসা যাত্রা শুরু করেন। প্রায় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই মাওলানা ইশার আলী এই মাদরাসার সাথে যুক্ত ছিলেন। মানিকগঞ্জ জেলার বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ অধ্যাপক (অব.) মাওলানা মুহাম্মদ আজহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (র.) সাহেব এই মাদরাসার বরকতের জন্য বিশেষ দূয়া করেন। তারই দূয়ার বরকত আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে। মাদরাসাটির বর্তমান ক্যাম্পাসের সংকুলোন না হওয়ায় নতুন ক্যাম্পাস নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বর্তমান পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাওলানা বশির রেজা সাহেবের সাথে কথা বলে জানা যায় বর্তমানে মাদরাসার বর্ধিত ক্যাম্পাসে শুধু ছাত্রাবাস ও মসজিদ

---

[৩৫১] পুরো মানিকগঞ্জ জেলার ধার্মিক শিক্ষানুরাগীদের জন্য একমাত্র কামিল মাদরাসা

[৩৫২] মাদরাসার মূল ক্যাম্পাস ১৫ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানিকগঞ্জ শহরের অদূরে শিববাড়ী নামক স্থানে ছাত্রদের জন্য ৩৬ শতাংশ জায়গায় ছাত্রাবাস নির্মিত হয়েছে।

[৩৫৩] মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বর্তমানে তিনি মাদরাসার পরিচালনা কমিটির সভাপতি

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অদূঢ় ভবিষ্যতে ইনশা আল্লাহ মাদরাসার জন্য দ্বিতীয় ক্যাম্পাস শিববাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

**২ সরুপাই আলহাজ্ব আব্দুল হালিম দাখিল মাদরাসা**

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| মাদরাসার নাম | সরুপাট আলহাজ্ব আব্দুল হালিম দাখিল মাদরাসা[৩৫৪] |
| স্থাপিত সাল | ১৯৮৬ খ্রি. |
| এমপিও ভুক্ত | ১০/১২/১৯৯২ খ্রি. |
| জমির পরিমাণ | ১৩৯ শতাংশ |
| জমি দাতা | গাজী মাসুদা আক্তার, মো: আ: হালিম তালুকদার, মো: সোনামুদ্দিন, ইয়াকুব আলী ও আ: জমিল |
| প্রতিষ্ঠাতা | এলাকাবাসী |
| সুপারিনটেনডেন্ট | মাওলানা ইউসুফ আলী |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মাও. মো: নুরুজ্জামান |
| ভবন | ৭ কক্ষ বিশিষ্ট একতলা পাকা ভবন, তিন কক্ষ বিশিষ্ট চৌচালা টিনের ঘর। |
| ঠিকানা | গ্রাম : সরুপাই, পো: নবগ্রাম, ইউনিয়ন : নবগ্রাম, থানা: মানিকগঞ্জ সদর। |
| সমস্যা | ইবতিদায়ী শাখার জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ জরুরী। |

অত্র মাদরাসাটি যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল খুবই করুণ। বলতে গেলে মোটামুটি তখন মাদরাসাটি এক জনশূণ্য গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে কালের বিবর্তনে সেই জায়গা

[৩৫৪] মূল মাদরাসা ক্যাম্পাস ৯৩ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাকী ৪৬ শতাংশ জমি সরুপাই বাজারে মাদরাসা মার্কেট অবস্থিত। যার আয় মাদরাসা ফান্ডে জমা হয়।

আজ জনবহুল এলাকা পরিণত হয়েছে। গ্রামে হয়েছে নতুন পাকা রাস্তা। ফলে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের ব্যবস্থার সুবিধা হয়েছে ও শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩ হাজী জহির উদ্দিন দারুস সালাম দাখিল মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| মাদরাসার নাম | হাজী জহির উদ্দিন দারুস সালাম দাখিল মাদরাসা[৩৫৫] |
| প্রতিষ্ঠা | ০১/০১/১৯৮৪ খ্রি. এমপিও ১/৩/১৯৮৫ |
| প্রতিষ্ঠাতা | জনাব আব্দুল গণি ( চেয়ারম্যান) |
| প্রতিষ্ঠান কালীন সুপার | মাওলানা মুহা: সালেহ আহমদ ভুইয়্যা |
| ঠিকানা | গ্রাম: ফারির চর, ডাকঘর, থানা: মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ |
| জমির পরিমাণ | ১৮৭ শতাংশ |
| জমি দাতা | আব্দুলগণি চেয়ারম্যান সাহেব ও তার পরিবারে অন্য ওয়ারিসগণ। |
| শিক্ষক সংখ্যা | ১২ জন কর্মচারী ১, চতুর্থশ্রেণী ২ জন |
| বর্তমান সুপার | মাওলানা মু. ফজলুর রহমান |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মো: সমির উদ্দিন শেখ |
| ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা | ৪৩০ জন (২০১৮ খ্রি.) |
| ইবতিদায়ীর শিক্ষার্থী | ৭৯ জন |
| ছাত্র-ছাত্রীর হার | ৪০% ছাত্র ও ৬০% ছাত্রী |

যোগাযোগের উন্নতির যুগেও প্রায় ৫ কিলোমিটার মাটির রাস্তা পাড় হয়ে শিক্ষার্থীরা এ মাদরাসায় আসে। বৃষ্টি বা বন্যার মৌসুমে শিক্ষার্থীদের মাদরাসায় আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে পরে। চেয়ারম্যান আব্দুল গণি সাহেবের একান্ত চেষ্টায় আজ মাদরাসাটি পাঁকা ভবনের উপর দাড়িয়ে আছে। শিক্ষার পরিবেশ ও সুন্দর।

অত্র মাদরাসার প্রতিষ্ঠা লগ্নের ইতিহাস থেকেই চেয়ারম্যান আব্দুল গণি ও তার পরিবারবর্গের অন্যান্য সদস্যরা মাদরাসার জন্য নিবেদিত প্রাণ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে আসছে।

[৩৫৫] জমিদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল গণি চেয়ারম্যান সাহেবের মরহুম পিতার নাম অনুসারে মাদরাসার নামকরন।

**৪ বনপাড়িল দাখিল মাদরাসা**

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| মাদরাসার নাম | বনপাড়িল দাখিল মাদরাসা |
| স্থাপিত | ০১/০১/২০০০ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | জনাব মো: মাসুদুর রহমান |
| ঠিকানা | গ্রাম:বন পারিল, ডাকঘর : বংখুড়ি, থানা: মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ[৩৫৬] |
| জমি | ১১২.৭৫ শতাংশ |
| EIIN | ১১০৯৯৩ |
| সুপারিনটেনডেন্ট | মাওলানা কাজী আব্দুর রহমান |
| শিক্ষক সংখ্যা | ১৪ জন; স্টাফ ২ জন |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মোসা. সালমা আক্তার |
| শিক্ষার্থী সংখ্যা | ২৫৮ জন[৩৫৭] |
| ইবতিদায়ী শিক্ষার্থী | ১০৫ জন [৩৫৮] |
| সমস্যা | ইবতিদায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ভবন নেই। |

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মাদরাসাটি শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যন্য স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে। বর্তমানে এখন যেই খোলা মাঠে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত পূর্বে সেখানে ছিল বিরাট জলাশয়। এলাকাবাসী তাদের নিজ উদ্যোগে ইসলামী শিক্ষার পরিবেশ সমাজে বাস্তবায়িত করার জন্য ৬৭ জন ছাত্র নিয়ে মাদরাসাটি তার যাত্রা শুরু করে।

[৩৫৬] সদর উপজেলার মাদরাসা হলেও মাদরাসাটি প্রান্তিক এলাকায় অবস্থিত। বিশাল ধলেশ্বরী নদী পার হয়ে শিক্ষার্থীগণ যাতায়াত করেন।

[৩৫৭] মোট শিক্ষার্থীর ৬৫% মেয়ে।

[৩৫৮] ২০১৭ সনের হিসাবানুযায়ী। ছেলে ৪৩ জন ও মেয়ে ৬২ জন্

**৫ দোয়াত আলী আলিম মাদরাসা**

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| মাদরাসার নাম | দোয়াত আলী আলিম মাদরাসা [৩৫৯] |
| স্থাপিত | ১৯৯৮ খ্রি. |
| এমপিও | মে ২০০৪ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | মেয়র মোঃ রমজান আলী [৩৬০] |
| জমি | ৮৬ শতাংশ। [৩৬১] |
| কমিটি | ১৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো: বিল্লাল হোসেন। |
| EIIN | ১১০৯৯২ |
| সুপার | মাওলানা মো: মতিউর রহমান |
| শিক্ষক সংখ্যা | |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মো: নজির আহমেদ |
| মোট শিক্ষার্থী | ৪৭০ জন। [৩৬২] |
| আলিম | অনুমতিও স্বীকৃতি ২০০২ সালে |
| সমস্যা | মেয়েদের জন্য আলাদা কমন রুম নেই। |

মানিকগঞ্জের সাবেক মেয়র মোঃ রমজান আলী তার পিতার স্মৃতিকে অম্লান করার জন্য এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার স্মৃতি চারণে বলেছেন : আমাদের পীর সাহেব হুজুরের উৎসাহেই মূলত মাদরাসা প্রতিষ্ঠার চিন্তা করি। তার এই চিন্তার ফসলই আজকের দোয়াত আলী আলিম মাদরাসা। মাদরাসাটি এমপিও ভুক্ত হওয়ার আগে থেকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ফলে নতুন

[৩৫৯] প্রতিষ্ঠাতা মো: রমজান আলীর পিতার নামে নাম করণ।
[৩৬০] তিনি মানিকগঞ্জ জেলার সফল চেয়ারম্যান ও পরে মেয়ের নিযুক্ত হন।
[৩৬১] ৭৫ শতাংশ জমিতে মাদরাসা ভবন ও খেলার মাঠ। বাকী ১১ শতাংশ জমিতে কাঠ বাগান করা হয়েছে।
[৩৬২] মোট শিক্ষার্থীর ৭০ শতাংশ মেয়ে।

মাদরাসা হলেও অন্যান্য মাদরাসার তুলনায় এ মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় আশা সঞ্চার করেছে।

## মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার মাদরাসা সমূহের  পরিচিতি ও ইতিহাস :

**মানিকগঞ্জ সিংগাইর উপজেলায় মাদরাসা রয়েছে মোট ৬টি। যার আলোচনা বিস্তারিত নিচে করা হলো-**

১ চর জামালপুর ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| মাদরাসার নাম | চরজামালপুর ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা |
| স্থাপিত | ১৯৬০ খ্রি. |
| এমপিও | ১/৯/১৯৮৪ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | এলাকাবাসী [৩৬৩] |
| জমি | ২৬৭:৭৫ শতাংশ |
| জমিদাতা | এলাকাবাসী [৩৬৪] |
| শিক্ষক | ১৯ জন, স্টাফ ৩ জন। |
| ১ম সুপার | মো: গোলাম মর্তুজা আলী |
| বর্তমান সুপারিনটেনডেন্ট | মাওলানা আলী আহমদ [৩৬৫] |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মাও. আব্দুস সালাম |
| শিক্ষার্থী সংখ্যা | ৪২৪ জন[৩৬৬] |
| EIIN | ১১১০৭৮ |
| ঠিকানা | গ্রাম জামালপুর, ডাকঘর: বায়রা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ |
| সমস্যা | টয়লেট সমস্যা প্রকট। |

সিংগাইর উপজেলার মানুষ প্রাচীনকাল হতেই ধার্মিক। বিভিন্ন অলি দরবেশদের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসারের ফলে দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থায় মানিকগঞ্জের অন্যান্য উপজেলা থেকে সিংগাইর উপজেলা অগ্রগামী।

[৩৬৩] এলাকাবাসীর মধ্যেঅন্যতম : মরহুম জমির উদ্দিন, আ: জলির মোল্লা, আ: হাই, উফাজ উদ্দিন মুন্সি, আ: গফুর মাস্টার, মো: রজব আলী, আলীবক্স, ফেরাজী, আজগর বেপারী, আ: লতিফ মোল্লা, মরহুম নাজিম উদ্দিন, আ: হকিম ফেরাজী, মোখলেছুর রহমান, আ: মজিদ মেম্বার, কুতুব উদ্দিন, কাচাই মোল্যা, আ: রহমান মোল্লা, মনির উদ্দিন ফেরাজী, মোহাম্মদ আরী বেপারী, জামাল মোল্যা জিয়ারত মোল্যা।

[৩৬৪] জমিদাতা এলাকাবাসীর মধ্যে সদস্যগণ হলেন হারুনুর রশিদ, আ: রহিম মোল্যা, সাহাজ উদ্দিন বেপারী, জয়গুননেছা, আবুল বাশার/আবুল বাহের, হাজী জুড়ান, দিদার মোল্যা, সোনামুদ্দিন/জুলমত, আ: আজিজ, মাইনুদ্দিন, আ: মান্নান মাস্টার, পরিস্কার বিব/আব্দুল বাহের, তারাবান, আম্বিয়া,আফছার মোল্যা গং, আ: রশিদ মোল্যা গং, আলহাজ মঈজুদ্দিন

[৩৬৫]। ১/১১/১৯৯২ খ্রি. নিয়োগ প্রাপ্ত

[৩৬৬] শুধু মেয়ে শিক্ষার্থী ২৪৮ জন

২ খাসের চর মাহমুদিয়া আলিম মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | খাসেরচর মাহমুদিয়া আলিম মাদরাসা |
| স্থাপিত | ১৯৬২ খ্রি. |
| এমপিও | ১/৯/১৯৮৪ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | মরহুম তালেব আলী মোল্লা |
| জমি | ৫০৫ শতাংশ [৩৬৭] |
| শিক্ষক | ২০ জন, স্টাফ ৩ জন |
| সুপারিটেনডেন্ট | আ.জ.ম. সাদেকুর রহমান |
| ইবতিদায়ী প্রধান | পদ খালি |
| শিক্ষার্থী | ৪৮২ জন [৩৬৮] |
| ইবতিদায়ী শিক্ষার্থী | ১৬৩ জন [৩৬৯] |
| কমিটি | ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সভাপতি মো: আ: খালেক |
| EIIN | ১১১০৮০ |
| ঠিকানা | গ্রাম : খাসেরচর, ডকঘর উল্লাবাজার, সিংগাইর |
| সমস্যা | ইবতিদায়ী শিক্ষক অপ্রতুল |

মরহুম তালেব আলী মোল্লার অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরুর দিকে মাদরাসার ভূ-সম্পত্তি পর্যাপ্ত হলেও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার অভাবে মাদরাসাটি ধুকেছে। তৎকালীন সময়ে অনেক শিক্ষকই বিনা বেতনে পাঠ দান করেছেন। যা আজও মাদরাসা কমিটি স্বীকার করে।

এলাকাবাসী ও মাদরাসার পিছনে বিরাট অবদান রয়েছে। শুরুরদিকে এলাকাবাসী তাদের বাৎসরিক ফসলের একাংশ মাদরাসা ফান্ডে দান করত।  যার বদৌলতে মাদরাসাটি আজ প্রায় ৫০ বছরের উপর তার শিক্ষাকাল অতিক্রম করেছে।

[৩৬৭] মাদরাসা ক্যাম্পাস ৭৬ শতাংশ জমির উপর। যার ৪৬ শতাংশ দান করেছেন প্রতিষ্ঠাতা মরহুম তালের আলী গং। বাকী জমি এলাকাবীর দান, যা বর্গা চাষীদের দেয়া হয়েছে। লভ্যাংশ মাদরাসা ফান্ডে জমা হয়।

[৩৬৮] মোট শিক্ষার্থীর ৬৫% মেয়ে।

[৩৬৯] ৯৩ জন মেয়ে। ২০১৭ সনের হিসাবানুযায়ী

৩ কালিয়াকৈর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

| | |
|---|---|
| বিষয় | বিবরণ |
| নাম | কালিয়াকৈর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা |
| স্থাপিত | ০১/০১/১৯৮৭ |
| এমপিও | ০১/০৭/১৯৯৩ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | মো: রফিকুল ইসলাম |
| শিক্ষক | ১০ জন, স্টাফ ৩ জন |
| সুপারিনটেনডেন্ট | মাও. মো: আবুল হোসেন |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মো: নুর আলম |
| শিক্ষার্থী | ৫২০ জন |
| জমি | ১৩০ শতাংশ |
| ১ম সুপার | মাও. মো: আব্দুল হাকিম |
| EIIN | ১১১০৮৩ |
| ঠিকানা | গ্রাম: কালিয়াকৈর, ইউনিয়ন বলধারা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ |

অত্র মাদরাসাটি দাখিল স্তরে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে আজও রাখছে। অত্র মাদরাসার বর্তমান প্রধান চাহিদা হলো শিক্ষার পরিবেশ থাকার পরও আলিম শ্রেণির জন্য মঞ্জুরি না পাওয়া। বর্তমান মাদরাসার সুপার মাওলানা মো: আবুল হোসেন তার দায়িত্ব কর্তব্য ও নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন।

৪ চররাজনগর মানিকনগর মাহমুদিয়া দাখিল মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | চররাজনগর মানিকনগর মাহমুদিয়া দাখিল মাদরাসা |
| স্থাপিত | ১৯৬২ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | সৈয়দ মাহমুদ মোস্তাফা আল মাদানী |
| সুপার | মাও. মো: দেলোয়ার হোসেন |
| শিক্ষক | ১২ জন, স্টাফ ৩ জন |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মো: হাসানুজ্জামান |
| শিক্ষার্থী | ৩৮৮ |
| জমি | ১৬৯ শতাংশ [৩৭০] |
| কমিটি | ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সভাপতি হাজী মোঃ শাহজাহান মিয়া। |
| ইবতিদায়ী শিক্ষার্থী | ১৪৭ জন [৩৭১] |
| EIIN | ১১১০৭৯ |
| ঠিকানা | গ্রাম: চর রাজনগর, ডাকঘর: চান্দহর, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। |

চররাজনগর মাদরাসাটি ইবতিদায়ী শাখার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। অন্যান্য মাদরাসার তুলনায় এ মাদরাসার ইবতিদায়ী শিক্ষার্থী সংখ্যা আশানুরূপ। তবে ইবতিদায়ী স্তর অতিক্রম করার পর ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ঝরে যায়।

[৩৭০] মাদরাসা ক্যাম্পাস ৩৬ শতাংশ জমির উপর। বাকী জমি কটে রাখা হয়েছে। যার আয় মাদরাসা ফন্ডে জমা হয়।

[৩৭১] মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯০ জন মেয়ে

৫ ভাটিরচর গাউছিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | ভাটিরচর গাউছিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা |
| স্থাপিত | ১৯৭৮ খ্রি. |
| এমপিও | ০১/০৭/১৯৮৫খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | হাজী ফরিদ হোসেন মোল্লা |
| শিক্ষক সংখ্যা | ১৩জন, স্টাফ ৩ জন |
| সুপারিনটেনডেন্ট | খন্দকার মো: সেকন্দর আলী |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মো: আ: জলিল মিয়া |
| জমি | ১৭১ শতাংশ |
| শিক্ষার্থী সংখ্যা | ৩৪১ জন [৩৭২] |
| ইবতিদাযী সংখ্যা | ১৫০ জন [৩৭৩] |
| কমিটি | ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সভাপতি আ: রাজ্জাক মোল্লা। |
| ঠিকানা | গ্রাম, ভাটিরচর, ডাকঘর : ধল্লাবাজার, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ |

মাদরাসাটিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা আশানুরূপ হলেও আজও মাদরাসাটি পাঁকা ভবনের উপর স্থাপিত হয়নি। বৃষ্টির মৌসুমে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির অন্ত নেই।

[৩৭২] মোট শিক্ষার্থীর ২০৫ জন মেয়ে
[৩৭৩] ইবতিদাযী শাখার ৮০ জন মেয়ে

৬ ধল্লা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | ধল্লা ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা |
| স্থাপিত | ১৯৮৪ খ্রি. [৩৭৪] |
| এমপিও | এমপিও ভুক্ত নয়। |
| প্রতিষ্ঠাতা | গোলাম গাউস মিয়া। |
| জমি | ১৭৮ শতাংশ [৩৭৫] |
| জমিদাতা | হাজী আ: হাকিম, মো: ফজলুল হক, শকত আলী |
| ঠিকানা | গ্রাম : উল্লা, ডাকঘর : উল্লাবাজার, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ |
| শিক্ষক সংখ্যা | ১৪ জন, স্টাফ ৩ জন |
| সুপারিনটেনডেন্ট | মাওলানা আবদুল্লাহ আল মুসাইব |
| ইবতিদায়ী প্রধান | জয়নাল আবেদীন |
| শিক্ষার্থী | ৩৭০ জন |
| ইবতিদায়ী | ১৯০ জন |
| EIIN | ১১১০৮২ |
| ভবন | প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ৪ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মানাধীন। |

ধল্লা মাদরাসাটি আর্থিকভাবে মোটামোটি স্বচ্ছল হলেও এমপিও ভুক্ত না হওয়ার কারণে মাদরাসাটির শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। মাদরাসাটি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও আজও এমপিও ভুক্ত হয়নি। যা সত্যিই মানবেতর ব্যাপার।

[৩৭৪] ১৯৮৪ খ্রি. মাদরাসা শরু হয়ে স্থানীয় নেতাদের চাপে ১৯৮৯ খ্রি. মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। তা পুনরায় চালু হয় ২০০৬ খ্রি.।
[৩৭৫] ৬২ শতাংশের উপর মাদরাসা ক্যাম্পাস। বাকী ১১৬ শতাংশ জমি বর্গা চাষীদের চেষ্টা

## মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার মাদরাসা সমূহের  পরিচিতি ও ইতিহাস :

মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় মাদরাসা রয়েছে মোট ৪টি। যার আলোচনা নিচে করা হলো-

১ দড়গ্রাম ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | দড়গ্রাম ইসলামিয়া সিনিয়ম মাদরাসা |
| স্থাপিত | ১৯৭৪ খ্রি. |
| এমপিও | ০১/০৯/১৯৮৪ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠানের সুপার নাম | মাওলানা মো. লুৎফর রহমান |
| সুপারিনটেনডেন্ট | মাওলানা মো: আবুল হোসেন |
| প্রতিষ্ঠাতা | মো: গাজীয়ার রহমান |
| জমি | ২২৪ শতাংশ |
| শিক্ষক সংখ্যা | ২০ জন, ৪জন মহিলা শিক্ষিকা |
| কর্মচারী | ৩ জন |
| ইবতিদায়ী প্রধান | বর্তমানে খালি [৩৭৬] |
| শিক্ষার্থী সংখ্যা | ৩১৮ জন [৩৭৭] |
| ইবতিদায়ী শিক্ষার্থী | ১৩৩ জন [৩৭৮] |
| EIIN | ১১১০২৩ |
| ভবন | একটি পাকা ভবন সহ দুটি টিনের ঘর |

[৩৭৬] ২০১৮ খ্রি. এর জরিপ অনুযায়ী
[৩৭৭] ২০১৮ খ্রি. এর হিসাব অনুযায়ী
[৩৭৮] ইবতিদায়ী শিক্ষার্থীর ৬০% মেয়ে

অত্র মাদরাসাটি যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন ৩ কক্ষ বিশিষ্ট টিনের ঘরে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। আজ মাদরাসাটি ইসলামি শিক্ষায় তার অবদান রেখে চলেছে।

২ বালিয়াটি দাখিল মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | বালিয়াটি দাখিল মাদরাসা |
| প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৮৫ খ্রি. |
| এমপিও | ১৯৯৫ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | তৎকালীন TNO মহোদয়[৩৭৯] |
| শিক্ষক | ১৩ জন, ২জন শিক্ষিকা |
| ছাত্র-ছাত্রী | ৩৭০ জন [৩৮০] |
| সুপারিনটেনডেন্ট | মাওলানা মো: লিয়াকত আলী |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মো: আশরাফ আলী |
| জমির পরিমাণ | ১৪৯ শতাংশ [৩৮১] |
| কর্মচারী | ৩ জন |
| ইবতিদায়ী শিক্ষার্থী | ১১৫ জন |
| EIIN | |
| ভবন | দ্বিতল পাকা ভবন ও পাশে পুরাতন টিনের ভবন দৃশ্যমান। |

অত্র মাদরাসাটি বালিয়াটি জমিদার বাড়ীর সম্মুখে অবস্থিত। মাদরাসাটির পরিবেশ মনোরম। মাদরাসাটির সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা মো: লিয়াকত আলী সার্বিকভাবে মাদরাসার দায় দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

[৩৭৯] বালিয়াটি জমিদার বাড়ীর সম্মুখে জমিদারী ওয়াকফ সম্পত্তিতে সরকারী পৃষ্ঠ পোষকতায় অত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত

[৩৮০] ২০১৮ সনের হিসাব অনুযায়ী

[৩৮১] ১০০ শতাংশ জমির উপর মাদরাসা ভবন, খেলার মাঠ মসজিদ ও পুকুর অবস্থিত। বাকী ৪৯ শতাংশে দানী জমি। যার আয় সরাসরি মাদরাসা ফান্ডে জমা হয়।

৩ গোলড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | গোলড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা |
| প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৮৪ খ্রি. |
| এমপিও | ২০১৯ খ্রি.। |
| প্রতিষ্ঠাতা | এলাকাবাসীর দানে প্রতিষ্ঠিত। |
| জমির পরিমাণ | ২০৭ শতাংশ [৩৮২] |
| শিক্ষক সংখ্যা | ১৫ জন, কর্মচারী ৩ জন। |
| ভবন সংখ্যা | পাকা ০১টি, টিনসেট ৩টি |
| শিক্ষার্থী সংখ্যা | ৬২৩ জন [৩৮৩] |
| সুপারিনটেনডেন্ট | মাওলানা মো: লিয়াকত হাসান |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মো: শফিউল আলম |
| EIIN | ১১১০২৪ |
| ঠিকানা | গ্রাম : গোলড়া, ডাকঘর, কৈট্টা, উপজেলা: সাটুরিয়া, জেলা: মানিকগঞ্জ। |

অত্র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা মোঃ লিয়াকত হাসান মাদরাসার জন্য নিবেদিত প্রাণ। ইবতিদায়ী প্রাথমিক শিক্ষাসহ সমাগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায়  মাদরাসাটি অন্যন্য। যার স্বীকৃতি স্বরূপ গোলড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা এবছর এমপিও ভুক্ত হয়েছে।  পুরো মানিকগঞ্জ জেলার মধ্যে মাত্র একটি মাদরাসা এমপিও ভুক্ত হয়েছে।

---

[৩৮২] ১২০শতাংশ জমির উপর মাদরাসা কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত। অবশিষ্ঠ ৮৭ শতাংশ জমি চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত হয়, যার লভ্যাংশ মাদরাসা পায়।

[৩৮৩] ছাত্র সংখ্যা ২০১৮ সনের হিসাব অনুযায়ী। মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যার মধ্যে ৩৪৪ জন ছাত্রী।

৪ পাতিলাপাড়া এম.বি.দাখিল মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | পাতিলাপাড়া এম.বি. দাখিল মাদরাসা |
| প্রতিষ্ঠা কাল | ১৯৯৫ খ্রি. |
| এমপিও | এমপিও ভুক্ত নয়। |
| প্রতিষ্ঠাতা | এম হাবিবুল্লাহ [৩৮৪] |
| প্রতিষ্ঠানকালীন সুপার | মাওলানা আশরাফ আলী |
| বর্তমান সুপার | মাওলানা মো: আব্দুর রহীম |
| শিক্ষক | ৯ জন |
| মাদরাসা কোড | ১৬২৯১ |
| EIIN নম্বর | ১১১০২২ |
| ঠিকানা | ডাকঘর-আগ-সাভার, উপজেলা, সাটুরিয়া, জেলা-মানিকগঞ্জ |
| ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা | ৩০৫ জন, ৮০% ছাত্রী। |
| ভবন | ৩টি টিনসেড ও ১টি দ্বিতল পাকা ভবন |
| জমির পরিমাণ | ১২০ শতাংশ [৩৮৫] |

অত্র মাদরাসাটি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলেও আজও এমপিও ভুক্ত হয়নি। ফলে মাদরাসা শিক্ষকদের বেতন ও মাদরাসার অন্যান্য খরচ পরিচালনা করা মাদরাসা কমিটির জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মাদরাসা কমিটি সদস্যদের ডোনেশন, মাদরাসা সম্পত্তিতে মোবাইল কোম্পানির টাওয়ার ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে ৮৪ হাজার টাকা ও স্থানীয় জনসাধারণের অনুদান থেকে আয়কৃত অর্থ হতে মাদারাসা শিক্ষকদের বেতন আংশিকভাবে পরিশোধ করা হয়।

[৩৮৪] তিনি একজন সাবেক যুগ্ম সচিব। ২০০৬ সালে পেনশনের পর সম্পূর্ণ-ধর্মীয় অনুভূতি থেকে নিজ গ্রামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।
[৩৮৫] মাদরাসার জমিতে মোবাইল কোম্পানীর টাওয়ার ভাড়া দেয়া হয়েছে। যার আয় মাদরাসা ফান্ডে জমা হয়।

**মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার মাদরাসা সমূহের  পরিচিতি ও ইতিহাস :**

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় মাদরাসা রয়েছে মোট ২টি। যার আলোচনা নিচে করা হলো-

১ কাজী সফিউদ্দিন দাখিল মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | কাজী সফিউদ্দিন দাখিল মাদরাসা |
| প্রতিষ্ঠাকাল | ১০/০১/১৯৮৮ [৩৮৬] |
| প্রতিষ্ঠাতা | কাজী সিরাজ |
| এমপিও | ২০০১ খ্রি |
| ঠিকানা | গ্রাম ও পোষ্ট : জাফরগঞ্জ, উপজেলা: শিবালয়, জেলা : মানিকগঞ্জ |
| সুপার | মাওলানা মো: আফজাল হোসেন |
| শিক্ষক | ১৪ জন, ৩ জন স্টাফ |
| ইবতিদায়ী প্রধান | ৬ মাসের অধিক সময় হতে খালি |
| শিক্ষার্থী | দাখিল পর্যন্ত ৬০৮ জন। [৩৮৭] ৬০% মেয়ে। |
| ইবতিদায়ী ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা | ১৮৪ জন যার মধ্যে ৫৪ জন মেয়ে। |
| EIIN | ১১১০৫২১ |
| জমি | ১০১ শতাংশ |
| ভবন | মাদরাসায় দুটি টিনের ঘর ও ১টি পাঁকা দ্বিতল ভবন। |

মাদরাসার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে খরস্রোতা নদী যমুনা। ৫ প্রায় কিলোমিটার নদী পথ পার হয়ে প্রায় ২০০ শিক্ষার্থী দৈনিক মাদরাসায় আসে। যার অধিকাংশ মেয়ে শিক্ষার্থী।  ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির

[৩৮৬] কাজী সিরাজ তার পিতা কাজী সফিউদ্দিনের নামে নিজ উদ্যোগে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।
[৩৮৭] ২০১৮ সনের হিসাব অনুযায়ী

সভাপতি আব্দুল করিম এলাকার বিশিষ্ট্য ব্যবসায়ী তিনি মাদরাসার খোজ খবর সবসময় নেওয়ার চেষ্টা করেন।

**২ শিবালয় রশিদীয়া দাখিল মাদরাসা**

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | শিবালয় রশিদীয়া দাখিল মাদরাসা |
| স্থাপিত | ১৯৮৮ খ্রি. |
| এমপিও | ২০১৮ সনের তথ্য মতে এমপিও ভুক্ত হয় নি। |
| প্রতিষ্ঠাতা | আনোয়ার হোসেন বাবুল |
| সুপার | মাওলানা মো: নূরুল আলম |
| শিক্ষক | ১৩ জন, ৩ জন স্টাফ |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মো: শাহজাহান |
| শিক্ষার্থী | ৩২৬ জন [৩৮৮] |
| জমি | ১৩১ শতাংশ [৩৮৯] |
| EIIN নম্বর | ১১০৫২ |

এমপিও ভুক্ত না হওয়ার কারণে শিক্ষকগণ মানবেতর জীবন যাপন করছেন। মাদরসায় ভাল কোন ভবনও নেই। মেয়েদের জন্য আলাদা কোন কমনরুম নেই। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট এর ব্যবস্থা একান্ত জরুরী।

[৩৮৮] জানুয়ারী ২০১৮ খ্রি. হিসাব অনুযায়ী। যার ৪৬% মেয়ে।
[৩৮৯] মাদরাসা কমপ্লেক্সটি ৭৬ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাকী ৫৫ শতাংশ জমি হতে মাদরাসা বাৎসরিক কিছু আয় করে।

## মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার মাদরাসা সমূহের  পরিচিতি ও ইতিহাস :

মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলায় মাদরাসা রয়েছে মোট ৩টি। যার আলোচনা নিচে করা হলো-

### ১ ঘিওর সিনিয়র মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | ঘিওর সিনিয়র মাদরাসা |
| স্থাপিত | ১৯৬৩ খ্রি. |
| এমপিও | ০১/০১/১৯৮০ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | মাওলানা শেখ মোঃ আবদুল হাই (র.) [৩৯০] |
| অধ্যক্ষ | মাওলানা মোঃ ইউনুছ মিয়া |
| শিক্ষক | ১৯ জন, ২ জন দপ্তরী, ৩ জন গার্ড |
| ইবতিদায়ী প্রদান | মোঃ আবুল কায়ের ফারুকী |
| জমি | ২১০ শতাংশ [৩৯১] |
| শিক্ষার্থী | ৪২২ জন |
| ইবতিদাযী শিক্ষার্থী | ১১৮ জন। ৫৬ জন মেয়ে |
| EIIN নম্বর | ১১০৯২৭ |
| ভবন | মাদরাসার ৩টি ভবনই পাকা। ১টি ৪ তলা বিশিষ্ট ভবন |

মাদরাসাটি ঘিওর উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশিষ্ট্য দায়ী শেখ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল হাই শুরুর দিকে মাদরাসাটি সরকারি জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মাদরাসার সুচনালগ্নে বহু সংগ্রাম ও টিকে থাকার চেষ্টা করেছিল। আজ মাদরাসাটি এক বিরাট প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। এই মাদরাসায় মেয়ে শিক্ষার্থী ছেলে শিক্ষার্থীর তুলনায় বেশি তবে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী সংকটে ভুগছে।

---

[৩৯০] তিনি মানিকগঞ্জ জেলার একজন সুপরিচিত দায়ী। তিনি প্রথমে সরকারী জমি ভরাট করে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।
[৩৯১] মাদরাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স ১১৩ শতাংশ জমির উপর নির্মিত। বাকী ৯৭ শতাংশ মাদরাসা সংলগ্ন কৃষি জমি।

## ২ বৈকুন্টপুর কে. এ. দাখিল মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | বৈকুণ্ঠপুর কে.এ. দাখিল মাদরাসা [৩৯২] |
| স্থাপিত | ১৯৮৮ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | মরহুম শাহ কাজী ইসমাঈল হোসেন |
| এমপিও | ১৯৯৫ খ্রি. |
| জমিদাতা | কাজী ইসমাইল ও বসুন্ধরা গ্রুপ |
| EIIN | ১১০৯২৮ |
| সুপার | মাওলানা মো: সোলায়মান হোসেন সিদ্দিকী |
| শিক্ষিক | ১৬ জন, ৩ জন স্টাফ |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মো: ওয়াজেদ আলী |
| ছাত্র-ছাত্রী | ৪৬৫ জন [৩৯৩] |
| জমি | ৯৪.৫ শতাংশ |

অত্র মাদরাসায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক টয়লেট এর ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। সাধারণভাবে টয়লেট ব্যবস্থাপনাও ভালো নয়। এছাড়াও নানান সমস্যায় জর্জরিত মাদরাসাটি। সরকারি পদক্ষেপে যদি মাদরাসার জন্য নতুন ভবন নির্মিত হয় তাহলে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত হয়।

---

[৩৯২] পুরো নাম বৈকুন্টপুর খাগ্রাটা আহমাদি য়া দাখিল মাদরাসা
[৩৯৩] ২০১৮ সনের হিসাব অনুযায়ী। মোট শিক্ষার্থী ৭০% মেয়ে।

### ৩ সাহেব আলী খান মহিলা মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | সাহেব আলী খান মহিলা দাখিল মাদরাসা |
| স্থাপিত | ২০০৪ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | ডা. আব্দুর রহিম খান [৩৯৪] |
| এমপিও | স্বীকৃতির জন্য আবেদন করা হয়েছে। |
| সুপার | মো: আবুল হাসান (ভারপ্রাপ্ত) |
| শিক্ষক | ১৪ জন [৩৯৫] |
| ইবতিদায়ী প্রধান | সাবিনা ইয়াসমিন |
| EIIN নম্বর | ১৩১৬৫৯ |
| শিক্ষার্থী | ২৯০ জন |
| ইবতিদায়ী ছাত্রী সংখ্যা | ১৩৩ জন |
| ছাত্রী নিবাস | ১টি (আফছার আলী খান ছাত্রী নিবাস) [৩৯৬] |
| ভবন | ২টি দিনের ঘরের মাদরাসা L আকৃতির |
| জমি | ১৩৫ শতাংশ |

ড. আব্দুর রহিম খান মাদরাসা ও মাদরাসা সংলগ্ন একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুরু থেকেই লন্ডন প্রবাসী ড. সাহেবের একক চেষ্টায় মাদরাসাটি ভালোই চলছিলো। ড. সাহেবের মৃত্যুর পর মাদরাসাটি আর্থিক সংকটে পরে। মাদরাসাটিতে সমস্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে অধ্যায়ন ও শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত ৪ একর জমি থেকে আসে। বর্তমানে যা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সরকারের সুদৃষ্টি ও এমপিও ভুক্ত না হওয়ার কারণে বর্তমান শিক্ষা পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। মাদরাসাটি সরেজমিন পরিদর্শন কালে জানা যায় বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আজও এমপিও ভুক্ত হয়নি।

---

[৩৯৪] লন্ডন প্রবাসী ডাক্তার আব্দুর রহিম খান তাঁর পিতার নামে মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার নিজেস্ব অর্থায়নে তিনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার ইন্তেকালের পর মাদরাসা আর্থিক সংকটে রয়েছে

[৩৯৫] ১৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ৬ জন মেয়ে শিক্ষিকা।

[৩৯৬] ডা. আ. রহিম সাহেবের বড় ভাইয়ের নামে ছাত্রীদের আবাসিক হল।

## মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার মাদরাসা সমূহের পরিচিতি ও ইতিহাস :

মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলায় মাদরাসা রয়েছে মোট ২টি। যার আলোচনা নিচে করা হলো-

১ ঝিটকা গাউসুল আজম আ: কাদির জিলানী (র.) দা: মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | ঝিটকা গাউসুল আজম আব্দুল কাদির জিলানী (র.) দাখিল মাদরাসা |
| স্থাপিত | ১৯৭৪ খ্রি. |
| এপিও | ১৯৭৯ সনে স্বীকৃতি পায়। |
| প্রতিষ্ঠাতা | মরহুম আব্দুর রউফ |
| জমি | ৯৪ শতাংশ |
| সুপার | মো: আকরাম হোসেন |
| শিক্ষক | ১৫ জন, স্টাফ ৩ জন। [৩৯৭] |
| ইবতিদায়ী প্রধান | আব্দুর রউফ |
| শিক্ষার্থী | ৪১৭ জন [৩৯৮] |
| EIIN নম্বর | ১১০৯৪৫ |
| ভবন | দ্বিতলা পাকা ভবন দুই টি |

মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠি এ মাদরাসার শিক্ষার্থী। তারপরও এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় ও সরকারের সদ্বিচ্ছায় মাদরাসাটি শিক্ষাক্ষেত্রে ভালো অবদান রাখছে।

[৩৯৭] ১৫ জন শিক্ষকদের মধ্যে ২জন মহিলা শিক্ষিকা।
[৩৯৮] ৪১৭ জন শিক্ষর্থীর মধ্যে ৩৭% মেয়ে। ২০১৮ খ্রি. হিসাব অনুযায়ী

## ২ আন্দার মানিক ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | আন্দার মানিক ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা |
| প্রতিষ্ঠা কাল | ১৯৯৫ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | এলাকাবাসী [৩৯৯] |
| জমি | ১০৪.৫ শতাংশ |
| জমিদাতা | আ: মুমিন ব্যাপরী, মো: মুজহার উদ্দিন |
| সুপার | মাওলানা মো: হানিফ মিয়া |
| শিক্ষক | ৯ জন [৪০০] |
| শিক্ষার্থী | ১২৪ জন [৪০১] |
| EIIN | ১১০৯৪৬ |
| সমস্যা | নতুন ভবন নির্মানে জরুরী |

বর্তমান মাদরাসাটির জন্য সরকারি অনুদান জরুরী। শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না থাকার জন্য প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে মাদরাসাটি ভুগছে। এলাকার দুই বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল মুমিন ব্যাপারী ও মুহাম্মদ মুজহার উদ্দিন মাদরাসাটির জন্য নিবেদিত প্রাণ।

---

[৩৯৯] এলাকাবাসীর অনুদানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৪.৫ শতাংশ জমি এলাকাবাসীর অনুদানের কেনা হয়।
[৪০০] ৭ জন পুরুষ শিক্ষক ও ২ জন মেয়ে শিক্ষিকা।
[৪০১] ২০১৮ সনের হিসাব অনুযায়ী

## মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার মাদরাসা সমূহের  পরিচিতি ও ইতিহাস :

মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলায় মাদরাসা রয়েছে মোট ৫টি। যার আলোচনা নিচে করা হলো-

১ : দৌলতপুর দাখিল মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | দৌলতপুর দাখিল মাদরাসা |
| প্রতিষ্ঠা | ১৯৯২ খ্রি. [৪০২] |
| এমপিও | ২০১ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | এলাকাবাসী [৪০৩] |
| সুপার | মাওলানা মো: নাজমুল হক |
| শিক্ষক | ১৩ জন, স্টাফ ৩ জন |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মো: আব্দুল বাতেন |
| শিক্ষার্থী | ৩৬০ জন [৪০৪] |
| জমি | ১৫৭ শতাংশ |
| ভবন | ১টি পাকা ভবন ও ১টি টিনের ঘর |

মাদরাসাটি দৌলতপুর উপজেলা অফিসের সন্নিকটে অবস্থিত। শুরুর দিকে আর্থিক সংকটে ভুগলেও সরকারের সৎ ইচ্ছায় ও এলাবাসীর অনুদানে আজ মাদরাসাটি শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অবদান রেখে চলেছে। মারদাসাটির সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা নাজমুল হক সাহেব তার বলিষ্ট নেতৃত্বে শিক্ষার সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করেছেন।

[৪০২] ১৯৯২ খ্রি. প্রতিষ্ঠা হলেও পাঠদানের অনুমতি পায় ২৭ জানুয়ারী ২০০৩ খ্রি. দাখিল পরীক্ষায় প্রথম অংশগ্রহণ ২০০৫ খ্রি.
[৪০৩] ১৯৮৫-১৯৮৬ খ্রি. প্রথম মাদরাসার জন্য এলাকার মুরুব্বিদের মাসিক ১০০ টাকা অনুদানের টাকায় প্রথম মজি কেনা হয়
[৪০৪] ২০১৮ সনের হিসাব অনুযায়ী

## ২ চরকালিকাপুর শুকুরিয়া দাখিল মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | চরকালিকাপুর শুকুরিয়া দাখিল মাদরাসা |
| প্রতিষ্ঠা | ০১/০১/১৯৮১ খ্রি. |
| এমপিও | ১/১২/১৯৮৪ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | জনাব শুকুর আলী মোল্লা |
| সুপারিনটেনডেন্ট | মাওলানা মো: বাকী বিল্লাহ |
| শিক্ষক | ১২ জন |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মো: আবু সাঈদ |
| জমি | ২০২ শতাংশ [৪০৫] |
| শিক্ষার্থী | ৮৩০ জন [৪০৬] |
| ভবন | ২টি পাকা ভবন |
| সমসা | সুপেয় পানির সংক্রান্ত, পাঠাগারের অপর, ক্লাস রুম অপ্রতুল। মেয়েদের জন্য পৃথক কমনরুম ও টয়লেট প্রয়োজন। |

মাদরাসাটি দৌলতপুর উপজেলার প্রান্তিক এলাকায় অবস্থিত। তারপরও এলাকাবাসীর চেষ্টায় ও বর্তমানে গুরুত্বর অসুস্থ শুকুর আলী মোল্লার একান্ত আগ্রহে মাদরাসাটি আজ ইসলামী শিক্ষার এক মহিরূহে পরিণত হয়েছে। অত্র এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠী নারী পুরুষ প্রায় সকলেই মাদরাসার প্রতি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন।

[৪০৫] জনাব শুকুর আলী মোল্লার একার চেষ্টায় ১৯৮১ সনে প্রথম ১ একর জমি ১০,০০০ টাকায় অধিগ্রহণ করা হয়। পরে ১৯৯৩ সালে পুনরায় মাদরাসার জন্য ৪০ শতাংশ জমি কেনা হয়।

[৪০৬] দৌলতপুর উপজেলায় পিছিয়ে পরা তথা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ইউনিয়ন হচ্ছে চরকালিকাপুর তথাপি এ মাদরাসার শিক্ষার্থী সংখ্যা দেখে সহজেই অনুমেয় অত্র এলাকার জনসাধারণ কতটা ধার্মিক ও শিক্ষা দিক্ষায় অগ্রসর।

## ৩ ঘড়িয়ালা উম্মে কুলসুম দাখিল মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | ঘড়িয়ালা উম্মে কুলসুম দাখিল মাদরাসা |
| প্রতিষ্ঠা | ১৯৭৬ খ্রি. |
| প্রতিষ্ঠাতা | মাওলানা নুরুল ইসলাম [৪০৭] |
| এমপিও | ১/১২/১৯৮৬ খ্রি. |
| সুপার | মো গাজীয়ান রহমান |
| শিক্ষক | ১২ জন, স্টাফ ৩ জন |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মোঃ আহসানুল হক |
| জমি | ৬৮ শতাংশ, ৫১ শতাংশ লেবু বাগান [৪০৮] |
| ছাত্র/ছাত্র | ৫৩২ জন [৪০৯] |
| EIIN | ১১০৯০৩ |
| ভবন | ২টি টিনের ভবন, ১টি পাকা বহুতল ভবন ১টি পুরাতন পাকা ভবন। |
| সমস্যা | প্রতি বছর বন্যায় মাদরাসা অঙ্গিনায় পানি উঠে মাদরাসার নতুন ভবন নির্মান জরুরী। |

ঘড়িয়ালা এলাকাবাসীর সুপরিচিত সৎজন ব্যক্তি ছিলেন মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেব। তার একান্ত চেষ্টায় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তার নিজ জমিতে তার মায়ের নামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর হতে শিক্ষাক্ষেত্রে মাদরাসাটি ভালো অবদান রাখছে। কলিয়া ইউনিয়ন দৌলতপুর উপজেলার মধ্যে শিক্ষাঞ্চল হিসেবে পরিচিত। অত্র এলাকায় শিক্ষার সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতের পাশাপাশি এলাকাবাসী মাদরাসার প্রতি সু-নজর রাখেন। অত্র মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখা বাদে মেয়ে শিক্ষার জন্য একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান। ইবতিদায়ী শাখায় মাদরাসাটি মেয়ে শিক্ষার্থীর সংকটে ভুগছে। তারপরও দাখিল স্তরে আশানুরূপ মেয়েদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাদরাসার সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে।

---

[৪০৭] মাওলানা নুরুল ইসলাম তার নিজেস্ব অর্থায়নে ১৯.৫ শতাংশ জমি কিনে সর্ব প্রথম মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা কালীন সুপার ছিলেন। ঘড়িয়ালা এলাকায় তিনি তুলা মৌলভী নামে বিখ্যাত।

[৪০৮] বর্তমানে মাদরাসা কমপ্লেক্স ৬৮ শতাংশ জমির উপর দন্ডায়মান। হাসমত হোসেন মাদবর ও নূর ইসলাম ১৯৯৫ সনে ৫১ শতাংশের একটি লেবু বাগান মাদরাসাতে দান করেন।

[৪০৯] ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী ৩০% মেয়ে শিক্ষার্থী

## ৪ বাঘুটিয়া আলিম মাদরাসা

| | |
|---|---|
| বিষয় | বিবরণ |
| নাম | বাঘুটিয়া আলিম মাদরাসা |
| স্থাপিত | ১৯৩৯ খ্রি. [৪১০] |
| এমপিও | ১/১/১৯৮৪ খ্রি. |
| ইউনিয়ন | বাঘুটিয়া, উপজেলা, দৌলতপুর |
| শিক্ষক | ৭৫০ জন [৪১১] |
| অধক্ষ | মাওলনা মো: তাজুল ইসলাম |
| ইবতিদায়ী প্রধান | মো: আশরাফুল আলম |
| জমি | ১২ একর [৪১২] |
| EIIN নম্বর | ১১০৯০২ |

দৌলতপুর উপজেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অঞ্চল হিসেবে বাঘুটিয়া সুপরিচিত। মাদরাসাটি বাগুটিয়া হতে প্রায় ২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। মাদরাসাটির ভূ-সম্পত্তি হতে আয়কৃত অর্থ মাদরাসা উন্নয়নে প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতেই ব্যয় হয়ে আসছে।

[৪১০] মানিকগঞ্জ জেলার মধ্যে আলিয়া নিসাবে এটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বৃটিশ শাসনের শেষ দিকে মানিকগঞ্জের কতিপয় আলিম ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বাঘুটিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

[৪১১] মূল দৌলতপুর উপজেলা হতে অনেকটা পিছিয়ে থাকা বাঘুটিয়া ইসলাম শিক্ষায় ঠিকই অগ্রগামী। উল্লেখ্য মাদরাসার ৬৫% শিক্ষার্থীই নারী।

[৪১২] ৮৭ শতাংশ জমির উপর মাদরাসা কমপ্লেক্স। বাকী জমি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। এর আয় মাদরাসা ফান্ডে জমা হয়।

## ৫ আবু বক্স খান মহিলা মাদরাসা

| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| নাম | আবু বক্স খান মহিলা মাদরাসা |
| প্রতিষ্ঠা | ১৯৯৭ খ্রি. [৪১৩] |
| এমপিও | অনুমোদন পায় নি |
| প্রতিষ্ঠাতা | মাওলানা আব্দুস সালাম |
| শিক্ষক | ৯ জন |
| সুপারিনটেনডেন্ট | মাওলানা আবদুস সালাম |
| ইবতিদায়ী প্রধান | পদ খালি রয়েছে। |
| জমি | ৭৫ শতাংশ [৪১৪] |
| শিক্ষার্থী | ১১০ জন [৪১৫] |
| ভবন | ১টি পাকা ভবন ৩টি ভিটি পাকা, টিনশেড ভবন |

সরকারী অনুমোদনের অভাবে নারী শিক্ষার পথ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। দৌলতপুর উপজেলার প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত এই মাদরাসা যদি এমপিও ভুক্ত হয় তাহলে মেয়েদের ইসলামী শিক্ষার পথ সুগম হয়। মাদরাসা কমিটি এমপিও ভুক্তির জন্য সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করে। মাওলানা আব্দুস সালাম সাহেবের সাথে আলাপকালে জানা যায়, যদি মাদরাসাটি সরকারি অনুদান পায় তাহলে শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পর মাদরাসা উন্নয়ন সম্ভব।

---

[৪১৩] ১৯৯৭ খ্রি. মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলেও পাবলিক পরীক্ষায় বসার অনুমোদন পায় ২০০৯ খ্রি. হতে।
[৪১৪] ৫০ শতাংশ জমিতে মাদরাসা কমপ্লেক্স। অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ কৃষি জমি
[৪১৫] ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী।

## মানিকগঞ্জ জেলায় স্বতন্ত্র ইবতিদায়ী মাদরাসা সমূহের পরিচয় ও ইতিহাস :

মানিকগঞ্জ জেলার স্বতন্ত্র ইবতিদায়ী মাদরাসার সংখ্যা ৩টি

১) চরকাটারী মানসুরীয়া ইবতিদায়ী মাদরাসা :

স্বতন্ত্র ইবতিদায়ী মাদরাসা সমূহের মধ্যে একমাত্র চরকাটারী মানসুরীয়া ইবতিদায়ী মাদরাসাটি সরকারি অনুদান প্রাপ্ত হওয়ায় তার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২) কল্যানপুর ইবতিদায়ী মাদরাসা :

সরকারি অনুদানের অভাবে মাদরাসাটি বন্ধের উপক্রম।

৩) চরমস্তুল ইবতিদায়ী মাদরাসা :

দৌলতপুর উপজেলার চকমিরপুর ইউনিয়নে মাদরাসাটি ১৪ বছর আগে ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সরকারি অনুদানের অভাবে মাদরাসাটি ছয় বছর পূর্বে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

## ৪.২.৩ মানিকগঞ্জ জেলার মাদরাসা সমূহের প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ : একটি সমীক্ষা

মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরে মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন মাদরাসায় ছেলে শিশু শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি মেয়ে শিশু শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করে। তাদের এই অংশগ্রহণের চিত্র আশার সঞ্চার করেছে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে মানিকগঞ্জ জেলার বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সকল মাদরাসা সমূহে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের সমীক্ষা উপস্থাপন করা হলো-

### ৪.৩.১ মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মোট ৫টি মাদরাসা রয়েছে-

১) মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা :

মানিকগঞ্জের ইসলামিয়া কামিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ | ২০১০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ৯ | ১৫ | ১১ | ১২ | ১২ | ৯ | ৬ | ৯ |
| ২য় শ্রেণী | ১২ | ১৩ | ১১ | ১২ | ১২ | ৭ | ৬ | ১৩ |
| ৩য় শ্রেণী | ১৯ | ১৩ | ১২ | ১৪ | ১৫ | ৯ | ৬ | ১৩ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ২৫ | ১৩ | ১২ | ১৪ | ১৫ | ৯ | ১১ | ১৭ |
| ৫মশ্রেণী | ১৭ | ১৪ | ১২ | ১৪ | ১৭ | ১২ | ১১ | ১৮ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১০ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

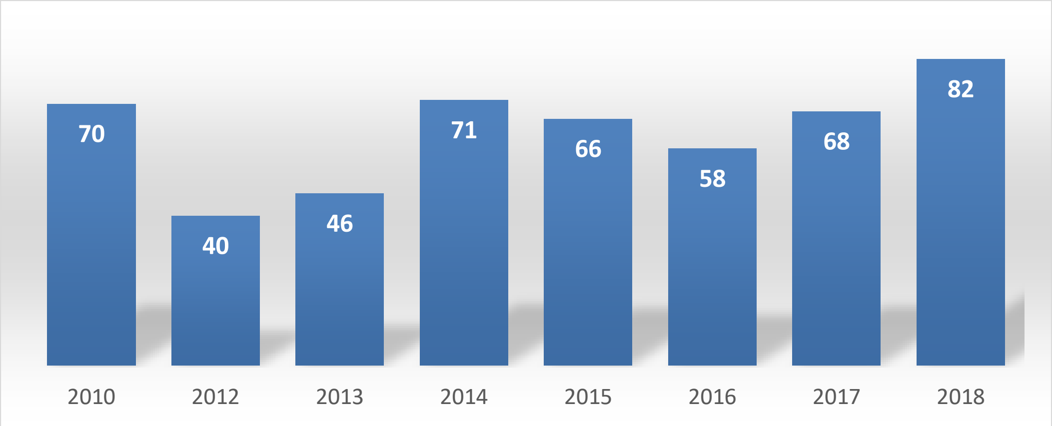

২। হাজী জহির উদ্দিন দারুস সালাম দাখিল মাদরাসা

হাজী জহির উদ্দিন দারুস সালাম দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ২৯ | ১৫ | ১৩ | ৯ | ২০ | ১৩ | ১২ |
| ২য় শ্রেণী | ২৬ | ১৫ | ১২ | ৯ | ২০ | ১২ | ১৯ |
| ৩য় শ্রেণী | ১২ | ১৬ | ১৫ | ১৩ | ২২ | ২২ | ১৬ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ২০ | ১৬ | ১৫ | ১০ | ২২ | ১৮ | ১৫ |
| ৫মশ্রেণী | ১৮ | ১৬ | ৯ | ২৩ | ১৮ | ১৫ | ১৭ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের হাজী জহির উদ্দিন দারুস সালাম দাখিল মাদরাসার ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

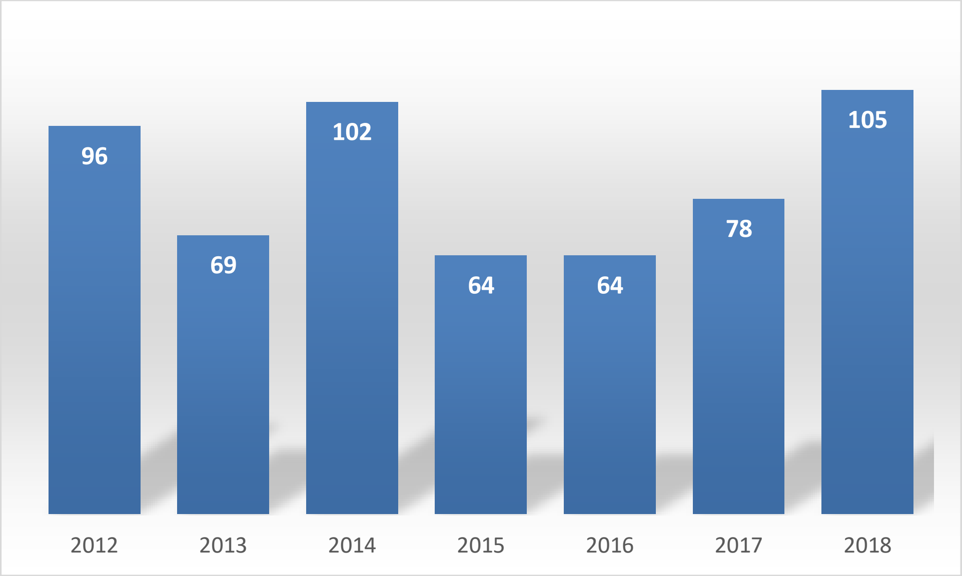

৩। সরুপাই আলহাজ্ব আ: হালীম দাখিল মাদরাসা

সরুপাই আলহাজ্ব আ: হালীম দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ১১ | ২০ | ১৮ | - | ২১ | ১৯ | ১৫ |
| ২য় শ্রেণী | ১৬ | ১১ | ১২ | - | ১৭ | ২১ | ১৫ |
| ৩য় শ্রেণী | ১৩ | ১৮ | ১৩ | - | ২২ | ২০ | ১৫ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ২০ | ১৬ | ১৭ | ১১ | ১৫ | ১৯ | ১৬ |
| ৫ম শ্রেণী | ১৬ | ১৯ | ১১ | ১৭ | ২৬ | ২২ | ১৮ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের সরুপাই আলহাজ্ব আ: হালীম দাখিল মাদরাসার ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

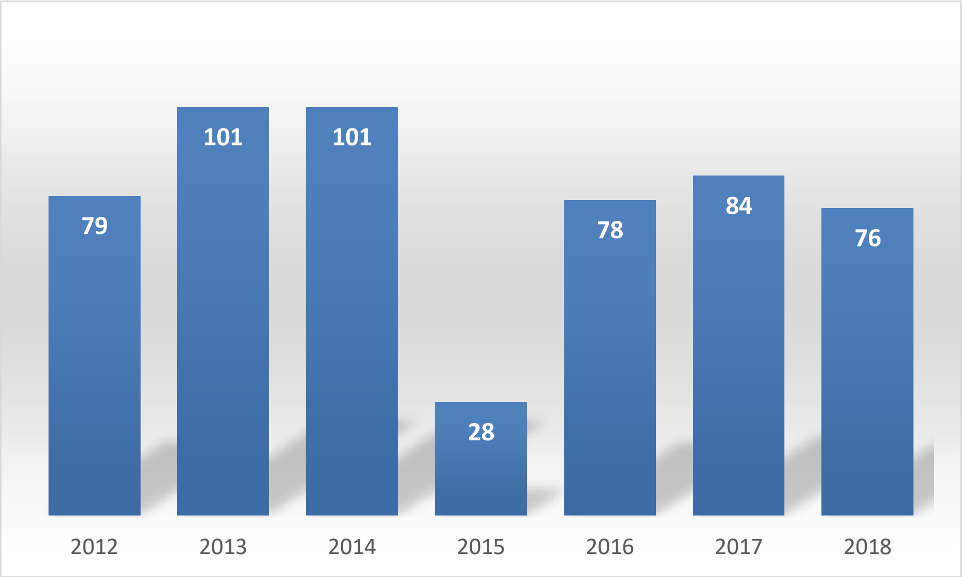

৪। বনপাড়িল দাখিল মাদরাসা

বনপাড়িল দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ১১ | ৮ | ২০ | ১৬ | ১৩ | ২০ | ৮ |
| ২য় শ্রেণী | ৮ | ১২ | ১৮ | ১৬ | ১৩ | ২০ | ৬ |
| ৩য় শ্রেণী | ১৬ | ১৪ | ১২ | ১৩ | ২৮ | ৬ | ১৪ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ২০ | ১৯ | ২০ | ১৯ | ৭ | ১৫ | ২০ |
| ৫ম শ্রেণী | ১৯ | ১৪ | ১৫ | ৭ | ১৫ | ২০ | ১২ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের বনপাড়িল দাখিল মাদরাসার ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

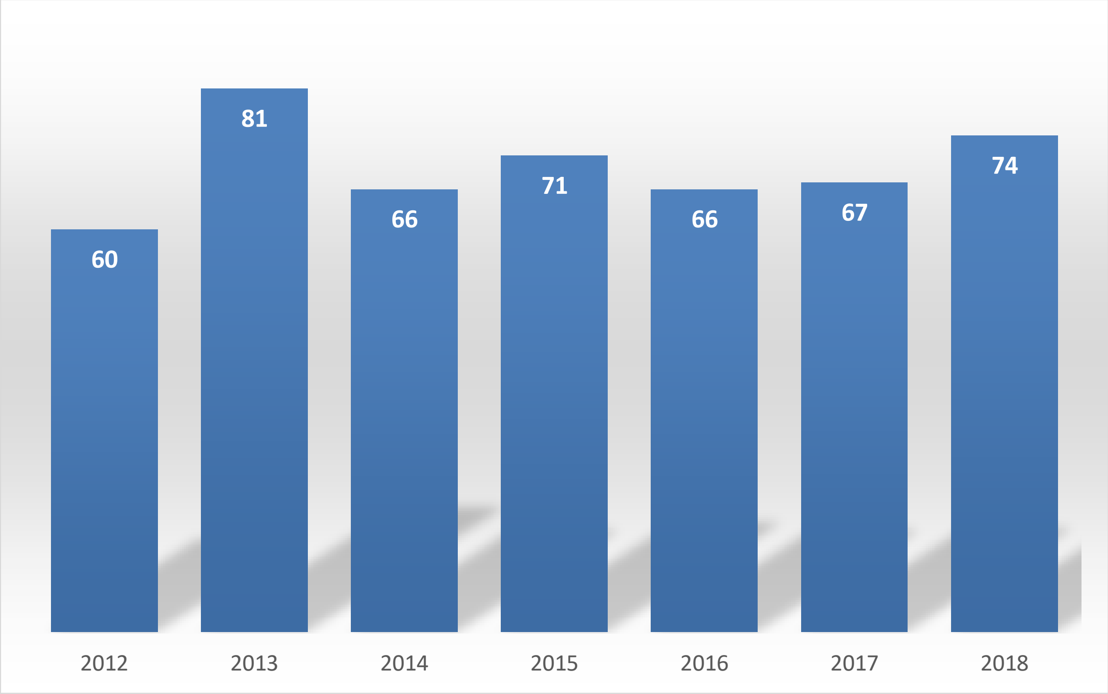

৫। দোয়াত আলী আলিম মাদরাসা

দোয়াত আলী আলিম মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ১৯ | ২১ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ৩০ | ১৮ |
| ২য় শ্রেণী | ১৭ | ৯ | ১৯ | ২৮ | ২৮ | ১৮ | ১৭ |
| ৩য় শ্রেণী | ১৫ | ২০ | ১৫ | ২০ | ১৬ | ১৭ | ৯ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ২২ | ১৬ | ২৩ | ১৯ | ১৮ | ১০ | ১২ |
| ৫ম শ্রেণী | ১৬ | ২৫ | ১৯ | ১৭ | ১১ | ১২ | ১৮ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের দোয়াত আলী আলিম মাদরাসার ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

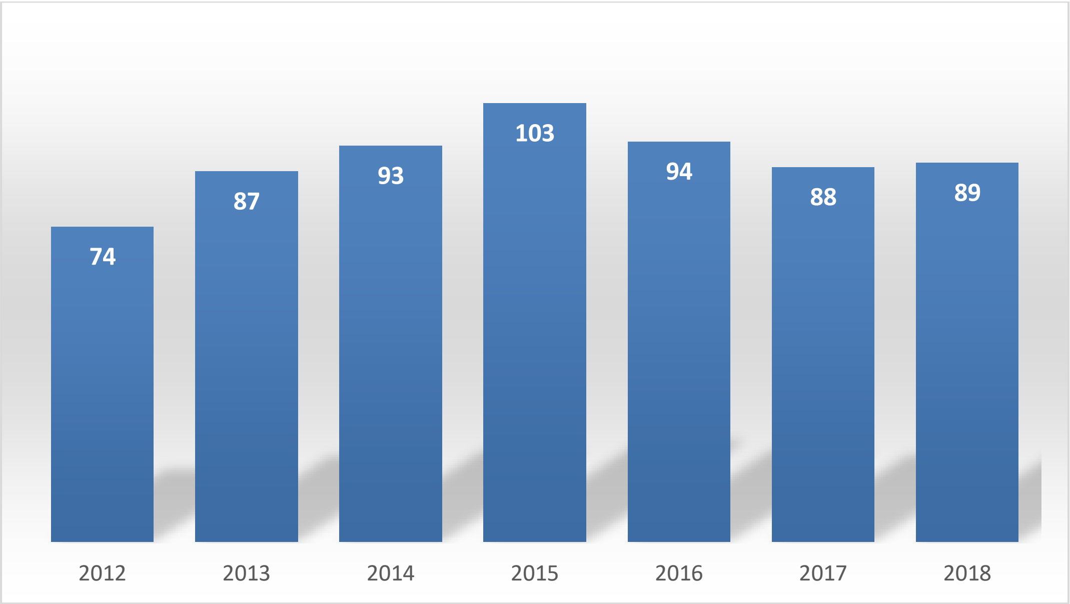

## ৪.৩.২ মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় মোট ৪টি মাদরাসা রয়েছে-

১। দরগ্রাম সিনিয়র মাদরাসা

দরগ্রাম সিনিয়র মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ১৭ | ১২ | ১৩ | ৭ | ১২ | ৯ | ১৬ |
| ২য় শ্রেণী | ১২ | ১৫ | ১০ | ২০ | ৯ | ১৮ | ১০ |
| ৩য় শ্রেণী | ১৫ | ১৩ | ২১ | ৯ | ২০ | ১০ | ১৭ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ১৩ | ২৪ | ১০ | ২০ | ১২ | ১৮ | ২০ |
| ৫ম শ্রেণী | ২৪ | ৪ | ২০ | ১০ | ১৯ | ১৯ | ১৯ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের দরগ্রাম সিনিয়র মাদরাসার ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

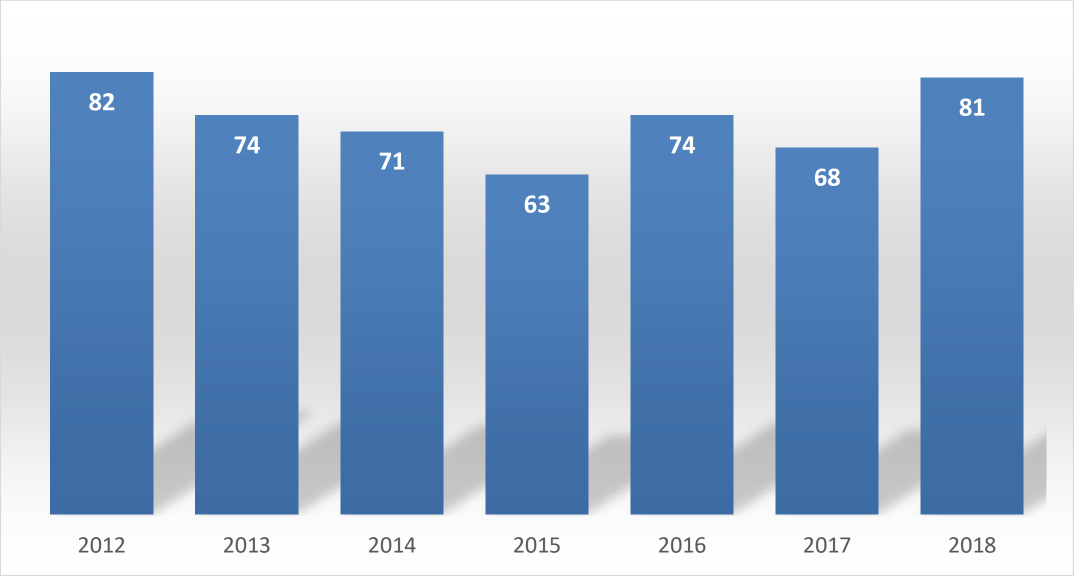

২। বালিয়াটি দাখিল মাদরাসা

বালিয়াটি দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ১২ | ১৮ | ১১ | ১৫ | ১৫ | ১৬ | ১৯ |
| ২য় শ্রেণী | ৩২ | ১১ | ১২ | ১৫ | ১৬ | ১৮ | ২৪ |
| ৩য় শ্রেণী | ২৭ | ১২ | ১৬ | ১৪ | ১৩ | ২০ | ১৪ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ১৫ | ১৭ | ১২ | ১৪ | ১৩ | ১৮ | ১৩ |
| ৫ম শ্রেণী | ১৬ | ১৩ | ১৯ | ১২ | ১৯ | ১২ | ২৯ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের বালিয়াটি দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

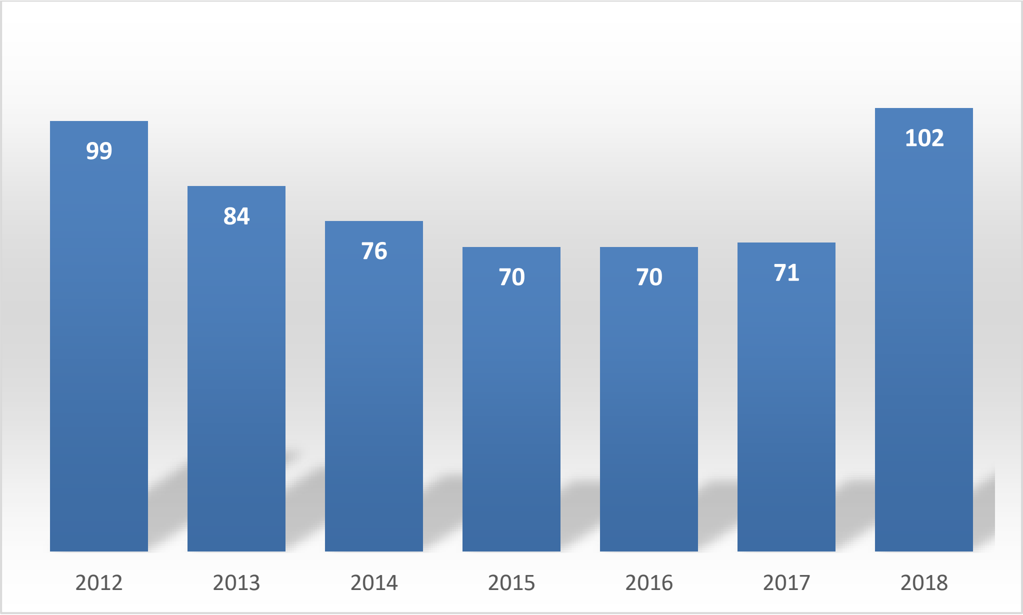

৩। গোলড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

গোলড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ | ২০১১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ৩০ | ৩৮ | ২২ | ১৮ | ২৪ | ২৭ | ২১ | ১৮ |
| ২য় শ্রেণী | ১৯ | ১৮ | ২০ | ৩০ | ২৭ | ২১ | ১৮ | ১৭ |
| ৩য় শ্রেণী | ১২ | ২১ | ৩১ | ২৮ | ২২ | ১৮ | ১৭ | ১১ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ২২ | ৩৩ | ৩০ | ২৫ | ১৯ | ১৮ | ১৮ | ১২ |
| ৫ম শ্রেণী | ৩১ | ৩০ | ২৩ | ২৪ | ১৮ | ১৯ | ৭ | ২৪ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের গোলড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

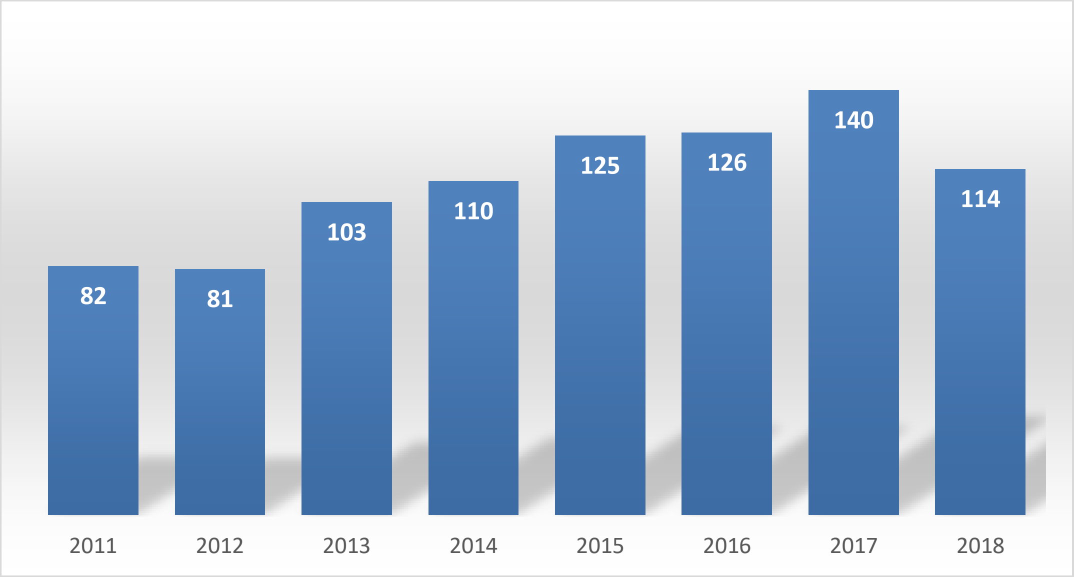

৪। পাতিলাপাড়া এম.বি. দাখিল মাদরাসা

পাতিলাপাড়া এম.বি. দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ৬ | ৬ | ৯ | ১০ | ৬ | ৭ | ৬ |
| ২য় শ্রেণী | ৮ | ৯ | ১০ | ৭ | ৭ | ৬ | ৬ |
| ৩য় শ্রেণী | ৯ | ১২ | ৮ | ৩ | ১০ | ৮ | ৮ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ১২ | ৮ | ৩ | ১০ | ৮ | ৮ | ৮ |
| ৫ম শ্রেণী | ১০ | ৩ | ৬ | ১০ | ৭ | ১১ | ১০ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের পাতিলাপাড়া এম.বি. দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

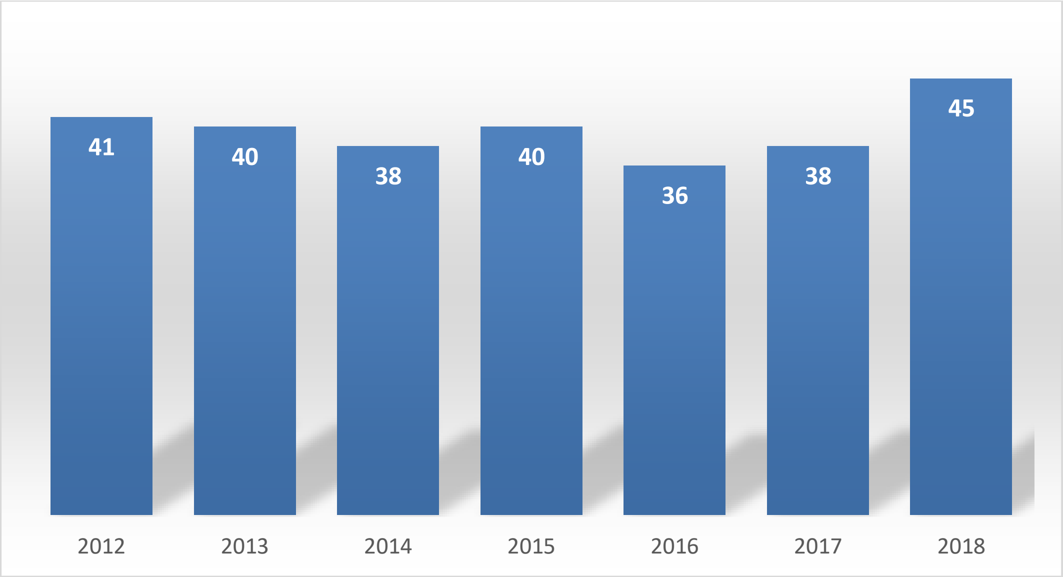

## ৪.৩.৩ মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় মোট ৬টি মাদরাসা রয়েছে-

১। চরজামালপুর ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা

চরজামালপুর ইসলামিয়া আলিম মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ | ২০১১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ২০ | ২০ | ১২ | ১৩ | ১৯ | ১৪ | ১৬ | ১২ |
| ২য় শ্রেণী | ১৮ | ১৩ | ১২ | ১৮ | ১৪ | ১৯ | ১০ | ৯ |
| ৩য় শ্রেণী | ১৫ | ১২ | ১৮ | ১৪ | ১৯ | ১০ | ১১ | ২৪ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ১২ | ১৭ | ১৩ | ১৯ | ১০ | ১১ | ২৫ | ৩০ |
| ৫ম শ্রেণী | ১৭ | ১২ | ১৮ | ৮ | ১১ | ২১ | ২৭ | ২২ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের চরজামালপুর ইসলামিয়া আলিম মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

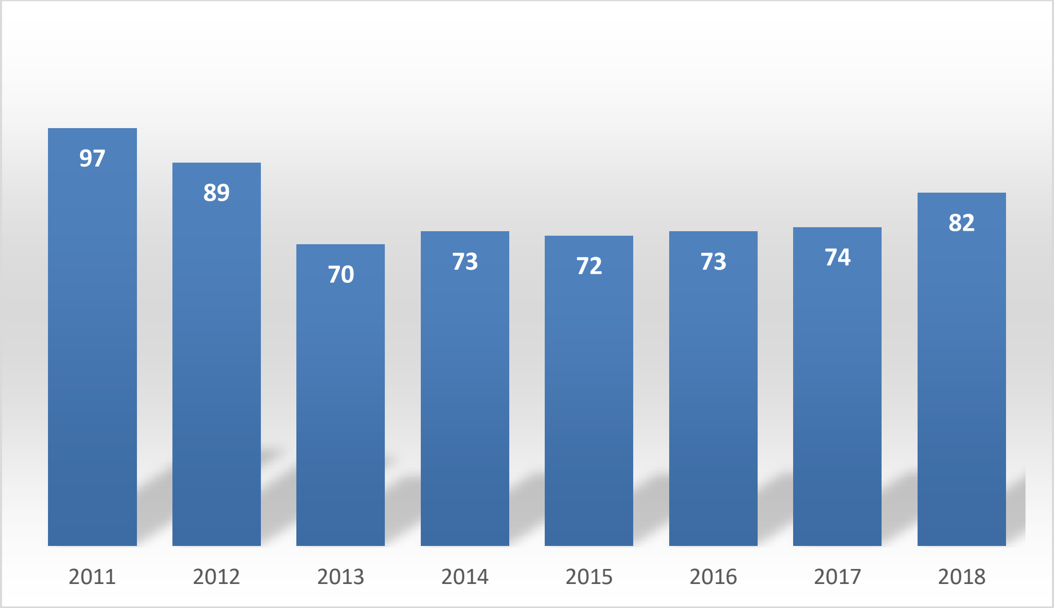

২। খাসেরচর মাহমুদিয়া আলিম মাদরাসা

খাসেরচর মাহমুদিয়া আলিম মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ | ২০১১ | ২০১০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ১৮ | ১৫ | ১৮ | ২৯ | ৩৫ | - | ২৬ | ১১ | ২৮ |
| ২য় শ্রেণী | ২৬ | ১১ | ২১ | ২২ | ১৯ | - | ২৪ | ১৫ | ১৭ |
| ৩য় শ্রেণী | ৩১ | ১৭ | ২২ | ৩৫ | ২৬ | - | ৩৩ | ১৬ | ২৭ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ২৭ | ১৬ | ৩৬ | ১৯ | ২২ | - | ২৬ | ২২ | ২১ |
| ৫ম শ্রেণী | ২০ | ৩৫ | ১৯ | ২৭ | ২৭ | - | ২৫ | ২৭ | ২০ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের খাসেরচর মাহমুদিয়া আলিম মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১০ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

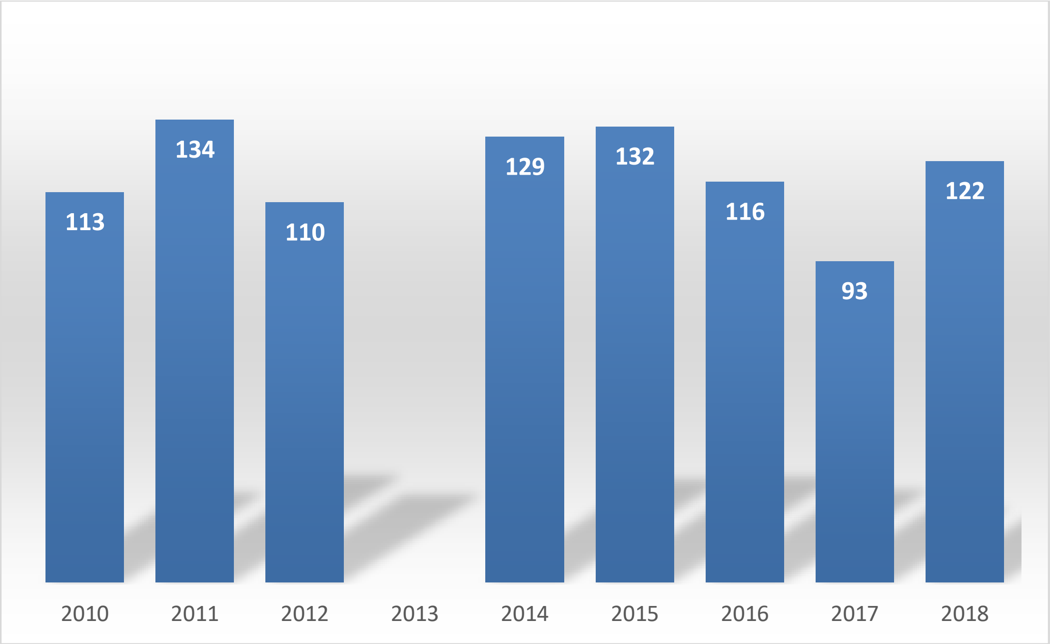

৩। কালিয়াকৈর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

কালিয়াকৈর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ | ২০১১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ৫৩ | ৬০ | ৩৮ | ৪০ | ৪০ | ৮৭ | ৬০ | ৪২ |
| ২য় শ্রেণী | ৫৮ | ৪৪ | ৪০ | ৪২ | ৮২ | ৬০ | ৪০ | ৩৬ |
| ৩য় শ্রেণী | ৫৫ | ৪২ | ৪০ | ৭০ | ৬২ | ৪২ | ৩৬ | ২৯ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ৪২ | ৪১ | ৮০ | ৬০ | ৪১ | ৩৯ | ২৮ | ২৭ |
| ৫ম শ্রেণী | ৪৩ | ৭৮ | ৫২ | ৪১ | ৩৬ | ২৯ | ২৭ | ২২ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের কালিয়াকৈর ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

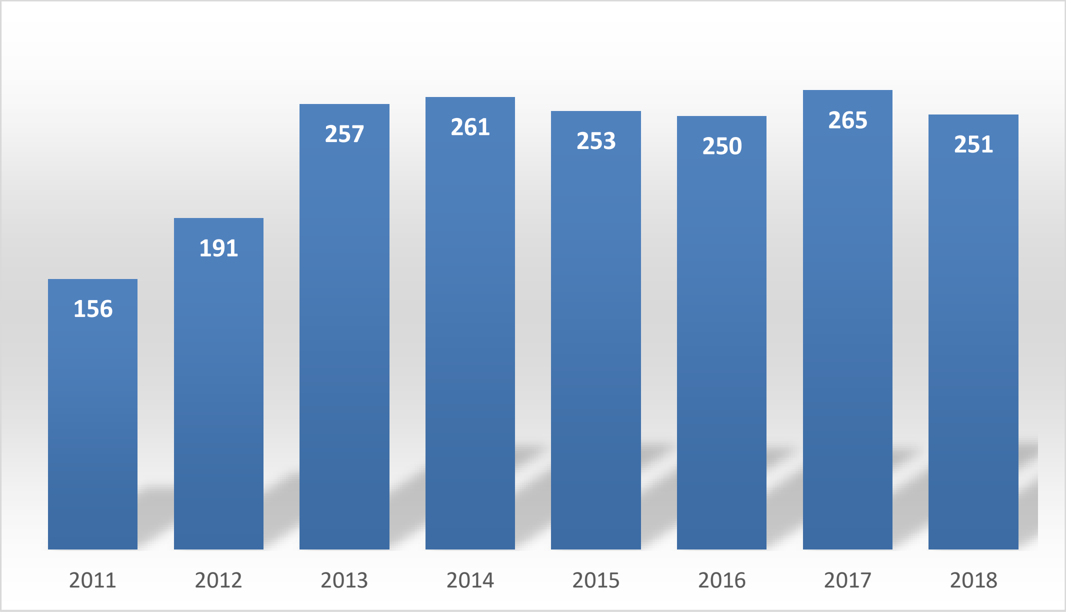

৪। চররাজনগর মানিকনগর দাখিল মাদরাসা

চররাজনগর মানিকনগর দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ২০ | ১৮ | ১২ | ১১ | ২৭ | ২২ |
| ২য় শ্রেণী | ১২ | ২০ | ২৩ | ১৪ | ১৮ | ১৭ |
| ৩য় শ্রেণী | ১৪ | ২২ | ২৭ | ১১ | ১৯ | ২০ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ২০ | ২৬ | ২০ | ১৯ | ২৫ | ২৬ |
| ৫ম শ্রেণী | ২৪ | ২৭ | ২৪ | ৪৩ | ৩৬ | ৩৬ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের চররাজনগর মানিকনগর দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১৩ খ্রিস্টাব্দতে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

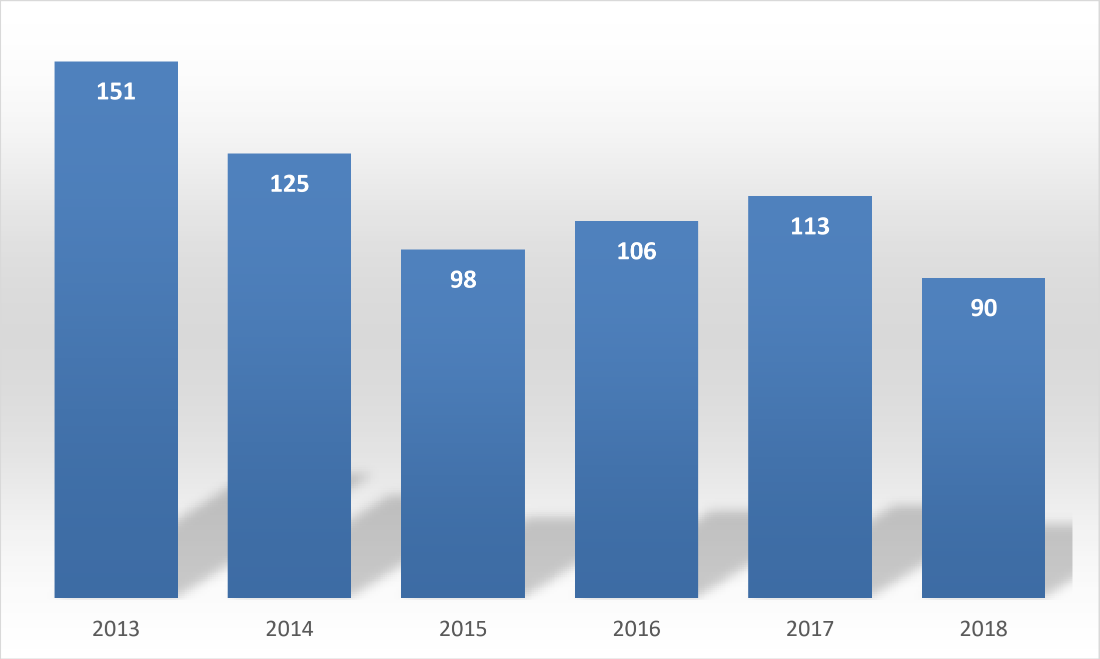

৫। ভাটিরচর গাউছিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা

ভাটিরচর গাউছিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ | ২০১১ | ২০১০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ১৭ | ১৯ | ১৬ | ৯ | ১৮ | ১৪ | ১৯ | ২৩ | ২০ |
| ২য় শ্রেণী | ১৩ | ১০ | ১৮ | ১৯ | ১৪ | ১৮ | ২৬ | ২১ | ১৯ |
| ৩য় শ্রেণী | ১০ | ১৯ | ১৭ | ১৩ | ১৮ | ২৬ | ২৪ | ২০ | ১২ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ১৯ | ২১ | ১০ | ২০ | ২২ | ২০ | ২১ | ১৬ | ৯ |
| ৫ম শ্রেণী | ২১ | ৯ | ১৯ | ২৫ | ২২ | ২১ | ১৮ | ১০ | ১১ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের ভাটিরচর গাউছিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১০ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

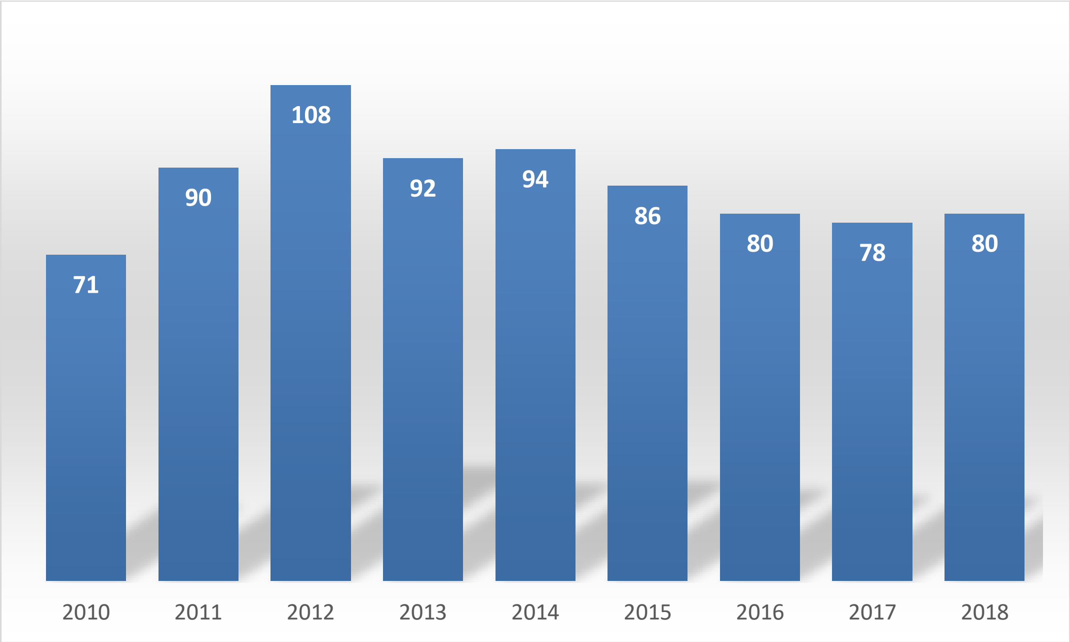

৬। ধল্লা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

ধল্লা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ১৯ | ১২ | ১৯ | ১৭ |
| ২য় শ্রেণী | ১২ | ১৫ | ২১ | ১৮ |
| ৩য় শ্রেণী | ১৬ | ২৩ | ২০ | ২০ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ২৬ | ২০ | ২১ | ২২ |
| ৫ম শ্রেণী | ১৭ | ২৪ | ২০ | ২০ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের ধল্লা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

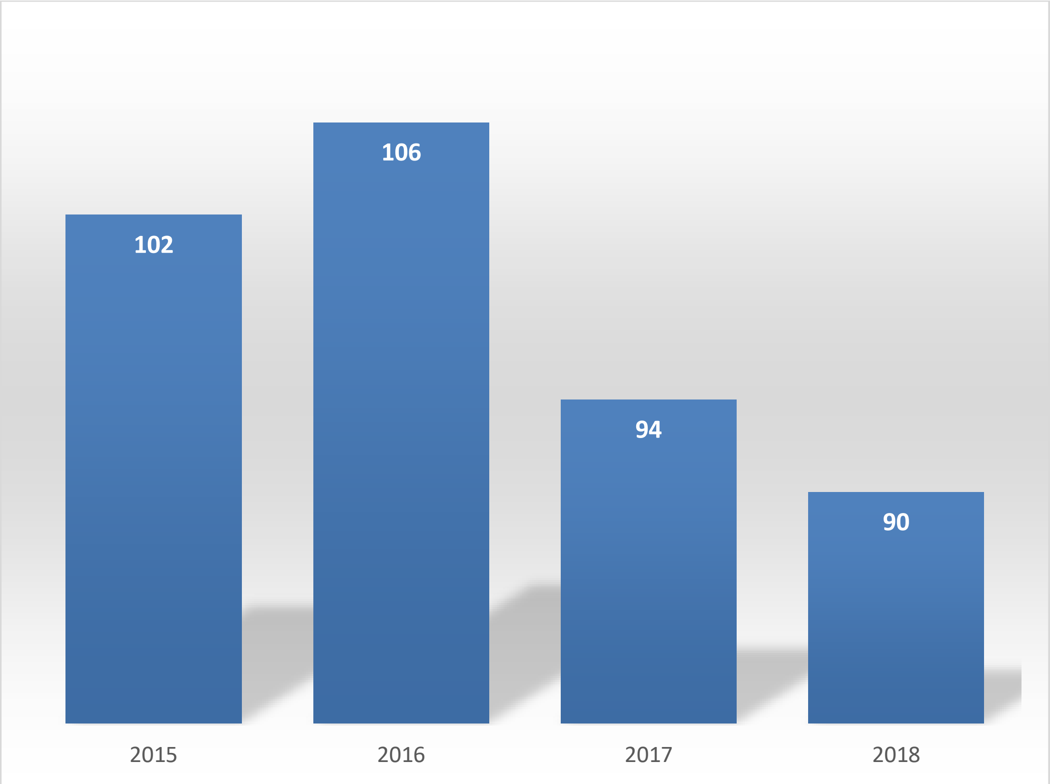

## ৪.৩.৪ মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ২টি মাদরাসা রয়েছে :

১। কাজী সফিউদ্দিন দাখিল মাদরাসা

কাজী সফিউদ্দিন দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ১০ | ৭ | ৯ | ১০ | ১০ | ৭ |
| ২য় শ্রেণী | ৪ | ৯ | ১৩ | ১২ | ৫ | ৭ |
| ৩য় শ্রেণী | ৯ | ১৫ | ১২ | ৫ | ৭ | ১০ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ১৬ | ১৩ | ৬ | ৫ | ১২ | ৮ |
| ৫ম শ্রেণী | ১৫ | ৬ | ৫ | ১৬ | ৯ | ৮ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের কাজী সফিউদ্দিন দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

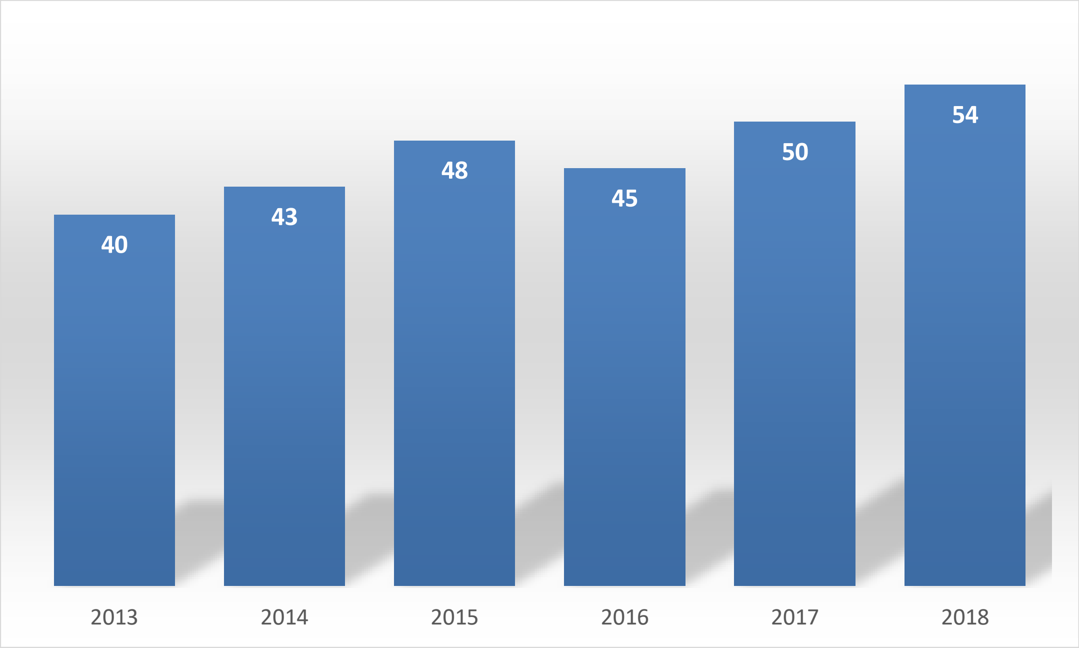

২। শিবালয় রামদিয়া দাখিল মাদরাসা

শিবালয় রামদিয়া দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ১৪ | ৬ | ৯ | ৯ | ১০ | ৪ |
| ২য় শ্রেণী | ১৩ | ১০ | ৭ | ৭ | ১০ | ৫ |
| ৩য় শ্রেণী | ১৭ | ৭ | ৭ | ১২ | ৬ | ৮ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ১৪ | ১৫ | ১২ | ৬ | ৮ | ৫ |
| ৫ম শ্রেণী | ১৩ | ১০ | ১০ | ৮ | ৬ | ৮ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের শিবালয় রামদিয়া দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

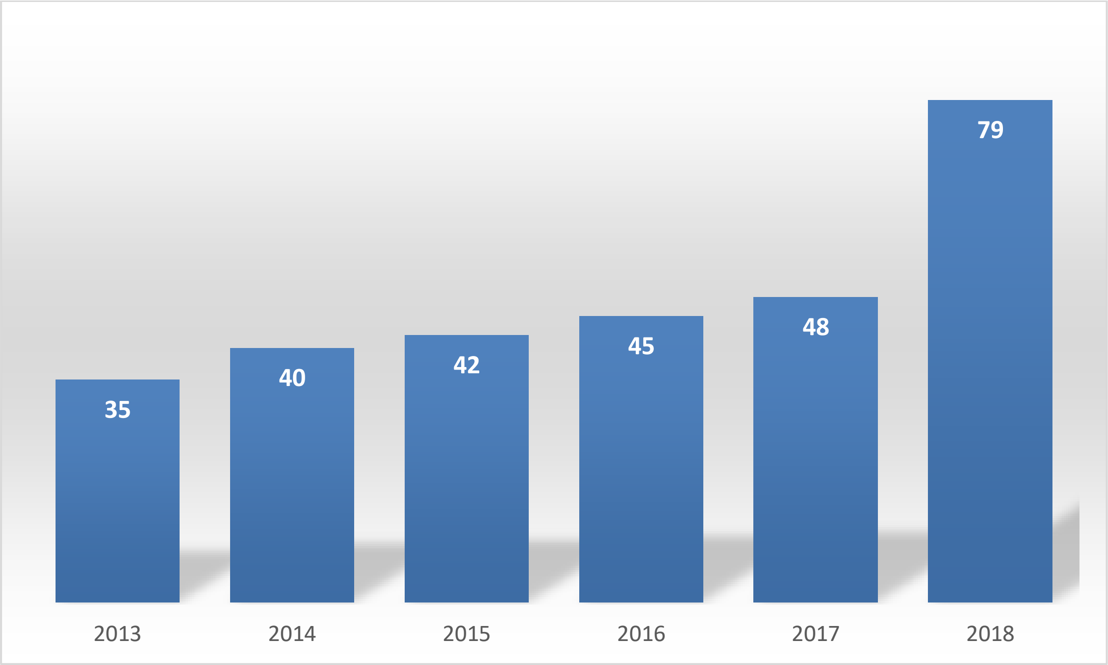

## ৪.৩.৫ মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ৩টি মাদরাসা রয়েছে :

১। ঘিওর সিনিয়র মাদরাসা

ঘিওর সিনিয়র মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ২২ | ১৭ | ৯ | ৫ | ১২ |
| ২য় শ্রেণী | ১৮ | ১০ | ৫ | ৩ | ৭ |
| ৩য় শ্রেণী | ১২ | ৬ | ৪ | ১২ | ৯ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ৮ | ৯ | ৬ | ৮ | ১২ |
| ৫ম শ্রেণী | ৯ | ৬ | ৭ | ৪ | ৬ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের ঘিওর সিনিয়র মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

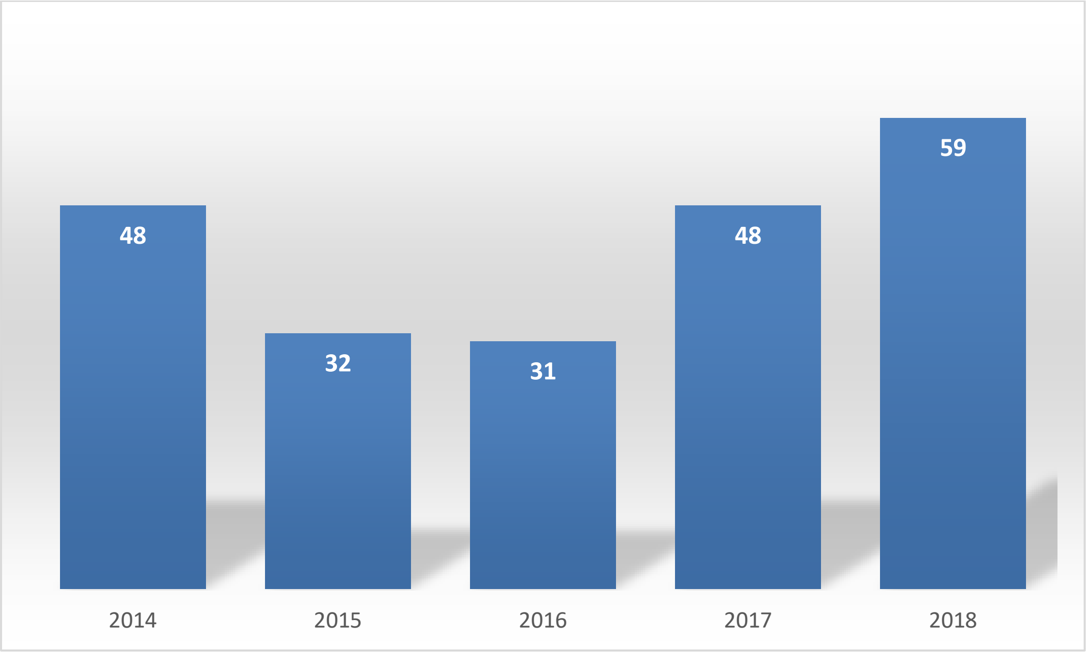

২। বৈকুন্টপুর দাখিল মাদরাসা

বৈকুন্টপুর দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ২৭ | ১০ | ১২ | ১৬ | ১৭ | ৬ |
| ২য় শ্রেণী | ১১ | ১২ | ১৭ | ৮ | ১৮ | ৮ |
| ৩য় শ্রেণী | ১৮ | ১৭ | ১০ | ২০ | ১০ | ১৮ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ১৬ | ১২ | ১৮ | ১০ | ২০ | ২০ |
| ৫ম শ্রেণী | ১৪ | ১৬ | ৯ | ২২ | ২০ | ১৮ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের বৈকুন্টপুর দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

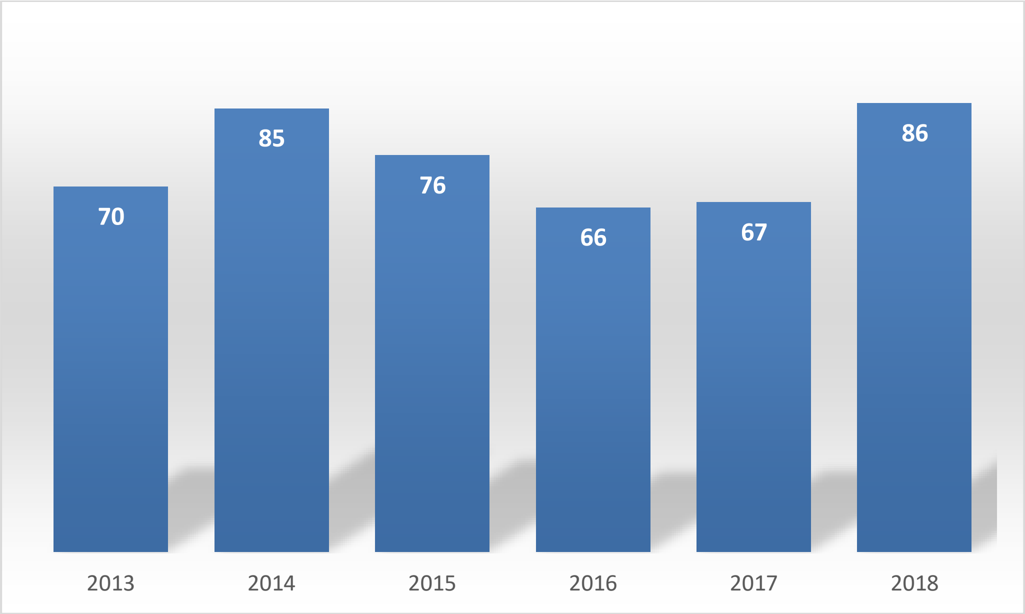

৩। সাহেব আলী খান মহিলা মাদরাসা

সাহেব আলী খান মহিলা মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ২০ | ২১ | ৩০ | ৩০ | ১৩ | ১৬ |
| ২য় শ্রেণী | ২৫ | ৩১ | ৩২ | ১৩ | ৮ | ১২ |
| ৩য় শ্রেণী | ৩৫ | ৩৬ | ১৪ | ১০ | ১০ | ১৯ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ৩৮ | ১৫ | ১২ | ১২ | ১৭ | ২৬ |
| ৫ম শ্রেণী | ১৫ | ১৩ | ১৪ | ১৮ | ২৮ | ২৩ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের সাহেব আলী খান মহিলা মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

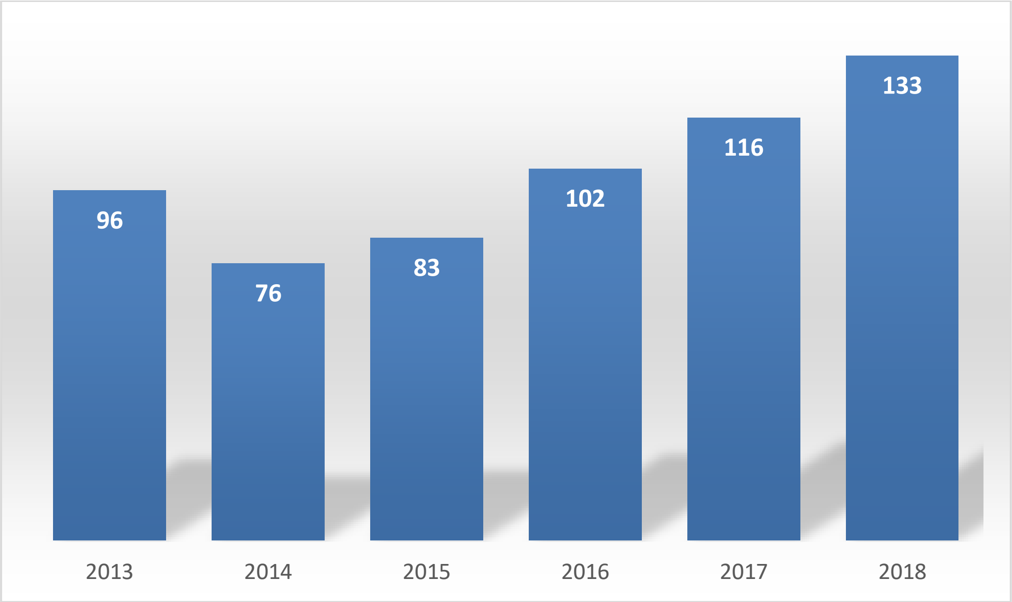

৬. মানিকগঞ্জ জেলার **হরিরামপুর উপজেলায়** বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট **২টি** মাদরাসা রয়েছে :

১। ঝিটকা গাউসুল আজম আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) দাখিল মাদরাসা

ঝিটকা গাউসুল আজম আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা :

| **শিক্ষাবর্ষ** | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ |
|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ৮ | ৭ | ৯ | ৮ |
| ২য় শ্রেণী | ১৯ | ৮ | ৮ | ১২ |
| ৩য় শ্রেণী | ১৪ | ৯ | ১২ | ৬ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ১২ | ৭ | ৬ | ৪ |
| ৫ম শ্রেণী | ১৫ | ১৪ | ১২ | ১৩ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের ঝিটকা গাউসুল আজম আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

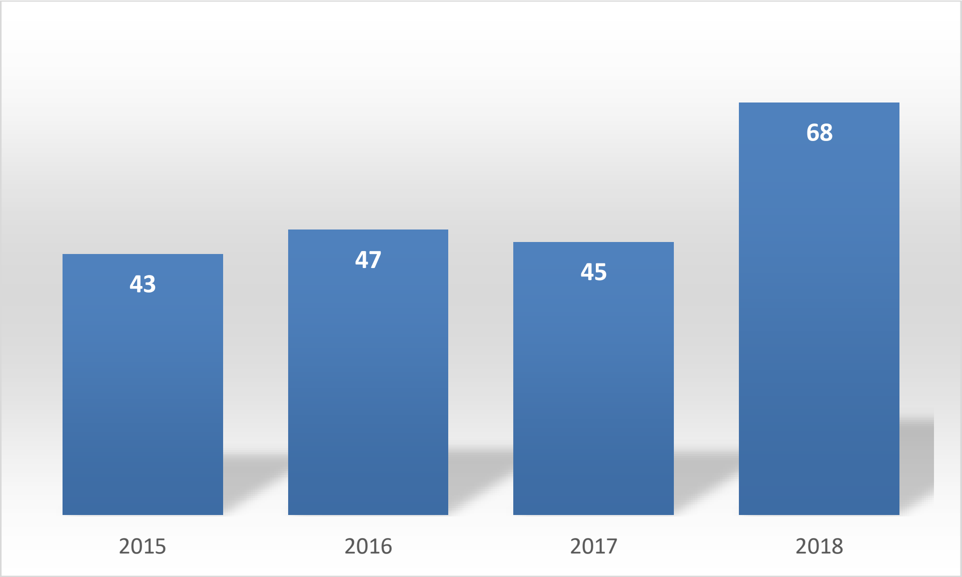

২। আন্দার মানিক ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

আন্দার মানিক ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা:

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ৭ | ৯ | ৯ | ৮ | ৭ | ৬ |
| ২য় শ্রেণী | ২ | ৮ | ৪ | ৭ | ৩ | ৩ |
| ৩য় শ্রেণী | ৮ | ৩ | ৬ | ৫ | - | ২ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ৪ | ৬ | ৫ | ৭ | - | - |
| ৫ম শ্রেণী | ৬ | ৫ | ৭ | ৮ | - | ৯ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের আন্দার মানিক ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

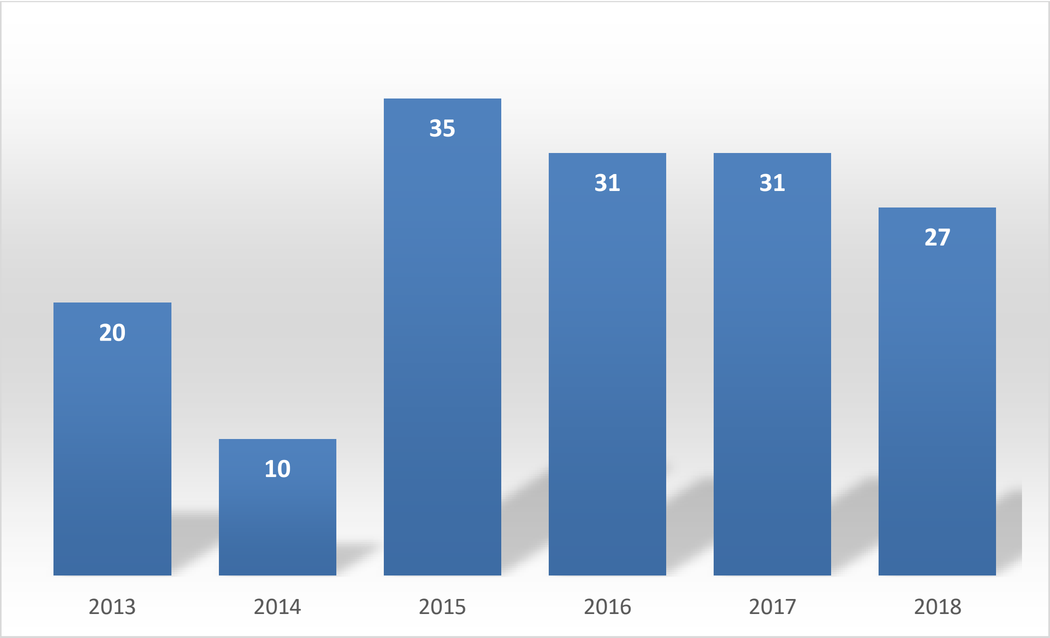

৭. মানিকগঞ্জ জেলার **দৌলতপুর উপজেলায়** বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট **৫টি** মাদরাসা রয়েছে :

১। দৌলতপুর দাখিল মাদরাসা

দৌলতপুর দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা:

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ১৮ | ১৮ | ৯ | ৬ | ৩ | ৮ |
| ২য় শ্রেণী | ২৪ | ৭ | ২১ | ৬ | ৮ | ৬ |
| ৩য় শ্রেণী | ২১ | ৯ | ৬ | ৫ | ৬ | ১০ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ৬ | ৩ | ৮ | ৪ | ১০ | ৭ |
| ৫ম শ্রেণী | ২ | ৬ | ৭ | ৬ | ৭ | ১২ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের দৌলতপুর দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

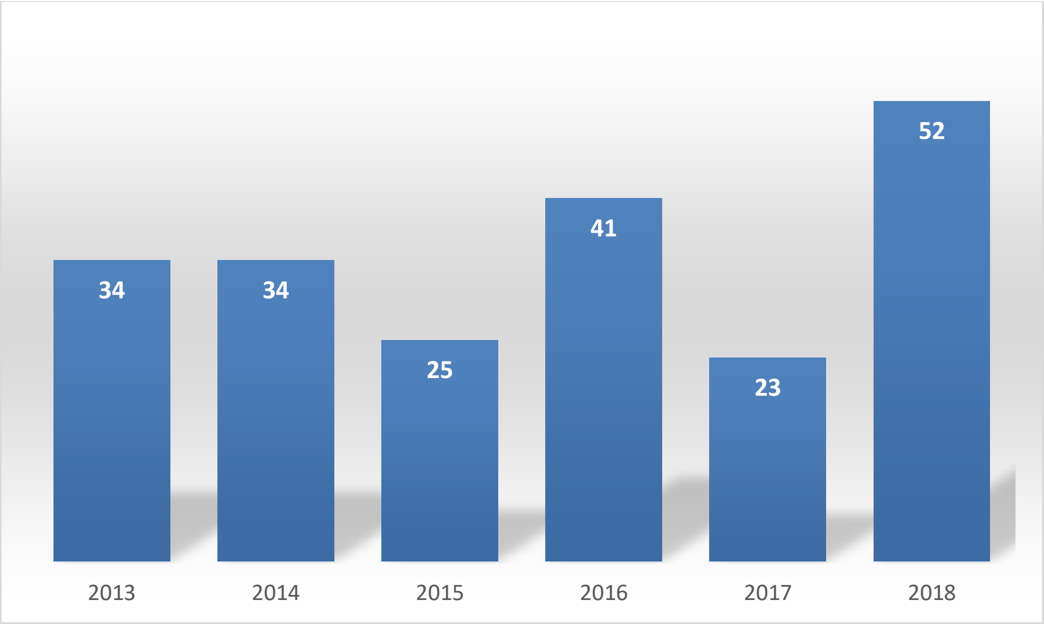

২। চরকালিকাপুর শুকুরিয়া দাখিল মাদরাসা

চরকালিকাপুর শুকুরিয়া দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা:

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ | ২০১১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ৬০ | ৪৭ | ৩২ | ৩২ | ৩১ | ২৯ | ৪৭ | ৩৩ |
| ২য় শ্রেণী | ৪৯ | ৩০ | ৩৩ | ৩৫ | ৩০ | ৪৭ | ২৯ | ৩৯ |
| ৩য় শ্রেণী | ৩২ | ৩৮ | ৩৫ | ৩০ | ৪৭ | ২৯ | ৩৮ | ৩৫ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ৩৮ | ৩৪ | ৩০ | ৪৮ | ৩২ | ৩৮ | ৩৫ | ৩৬ |
| ৫ম শ্রেণী | ৩৪ | ৩২ | ৬০ | ৩৭ | ৩৭ | ৩৫ | ৩৬ | ২৫ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের চরকালিকাপুর শুকুরিয়া দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

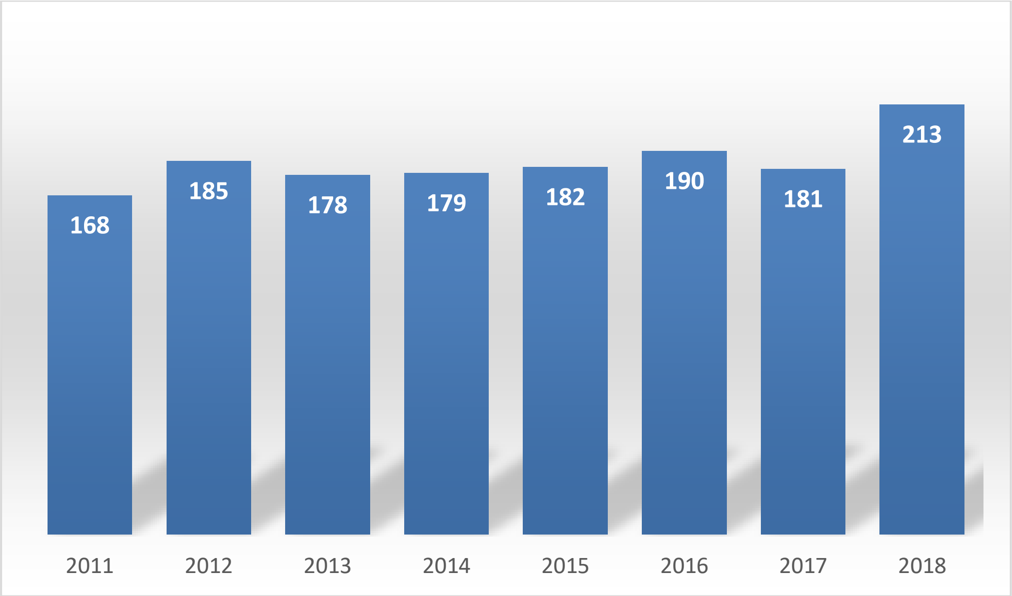

৩। ঘড়িয়ালা উম্মে কুলসুম দাখিল মাদরাসা

ঘড়িয়ালা উম্মে কুলসুম দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা:

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ | ২০১১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ২২ | ১৮ | ১৮ | ১৩ | ২০ | ৯ | ৮ | ১৭ |
| ২য় শ্রেণী | ১৮ | ২০ | ১২ | ২১ | ১০ | ৮ | ১৭ | ২০ |
| ৩য় শ্রেণী | ২২ | ১৭ | ২১ | ১০ | ৮ | ১৭ | ২০ | ২১ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ১৮ | ২১ | ১০ | ৯ | ১৬ | ১৭ | ১৫ | ১১ |
| ৫ম শ্রেণী | ২২ | ১২ | ৯ | ১৫ | ১৬ | ১৫ | ১১ | ১৯ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের ঘড়িয়ালা উম্মে কুলসুম দাখিল মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

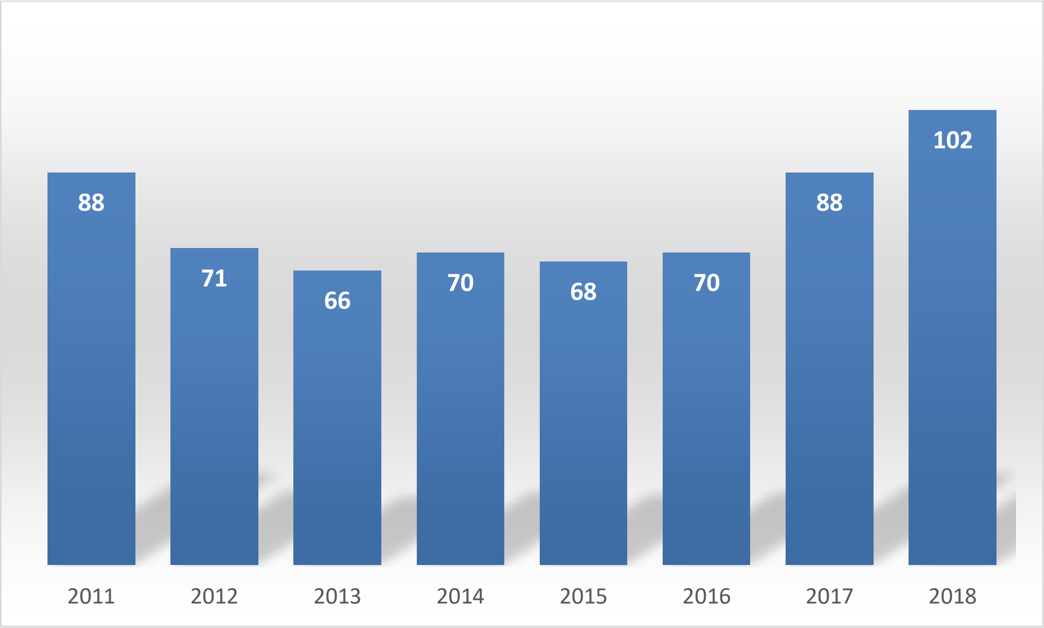

৪। বাঘুটিয়া আলিম মাদরাসা

বাঘুটিয়া আলিম মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা:

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ৫১ | ২১ | ৩০ | ১৯ | ২৬ | - | ১২ |
| ২য় শ্রেণী | ৩২ | ২৮ | ২৭ | ২১ | ৩১ | - | ২৬ |
| ৩য় শ্রেণী | ২৯ | ২৮ | ৩৬ | ৩৮ | ৩২ | - | ২১ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ২৬ | ৩৮ | ৩৫ | ২৮ | ২৭ | - | ২৭ |
| ৫ম শ্রেণী | ৪১ | ৩৭ | ৩৯ | ১২ | ১৮ | - | ৯ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের বাঘুটিয়া আলিম মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র :

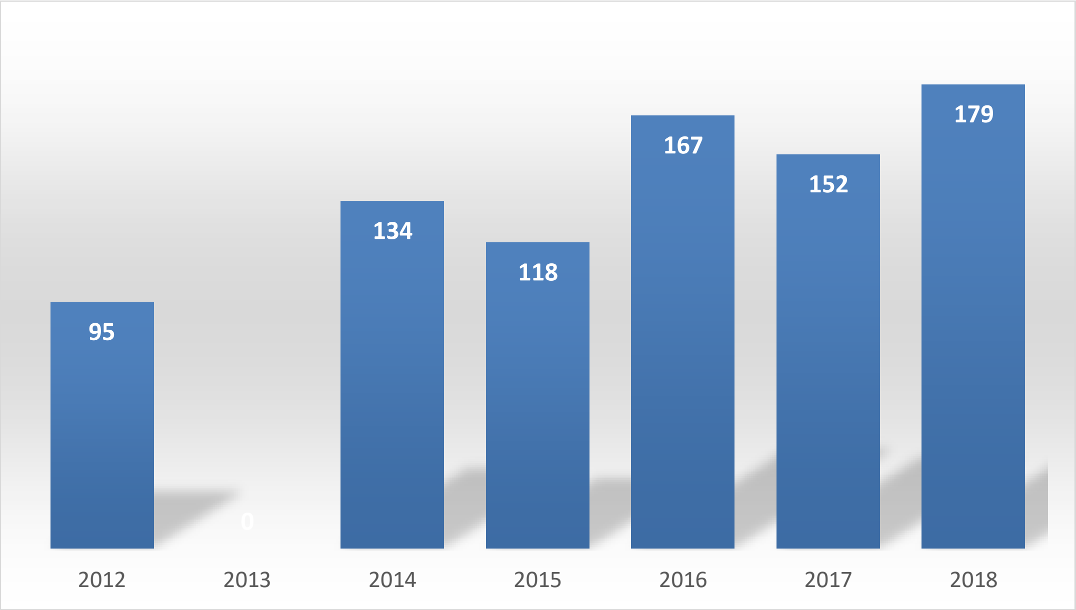

৫। প্রিন্সিপাল আবু বক্স খান মহিলা মাদরাসা।

প্রিন্সিপাল আবু বক্স খান মহিলা মাদরাসায় ইবতিদায়ী শাখায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের তালিকা:

| শিক্ষাবর্ষ | ২০১৮ | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৫ | ২০১৪ | ২০১৩ | ২০১২ | ২০১১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম শ্রেণী | ১২ | ৮ | ৬ | ৫ | ১৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ২য় শ্রেণী | ৯ | ৭ | ৭ | ১৪ | ৩ | ২ | ১ | ৮ |
| ৩য় শ্রেণী | ১১ | ১২ | ১৭ | ৩ | ২ | ১ | ১০ | - |
| ৪র্থ শ্রেণী | ১৭ | ১০ | ৬ | ৩ | ১২ | ১১ | - | ৮ |
| ৫ম শ্রেণী | ১১ | ২১ | ৭ | ১২ | ৩ | ৪ | ৩ | ৫ |

উল্লেখ্য এখানে শুধু মেয়ে শিশদের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরের প্রিন্সিপাল আবু বক্স খান মহিলা মাদরাসায় ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ইবতিদায়ী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র ঃ

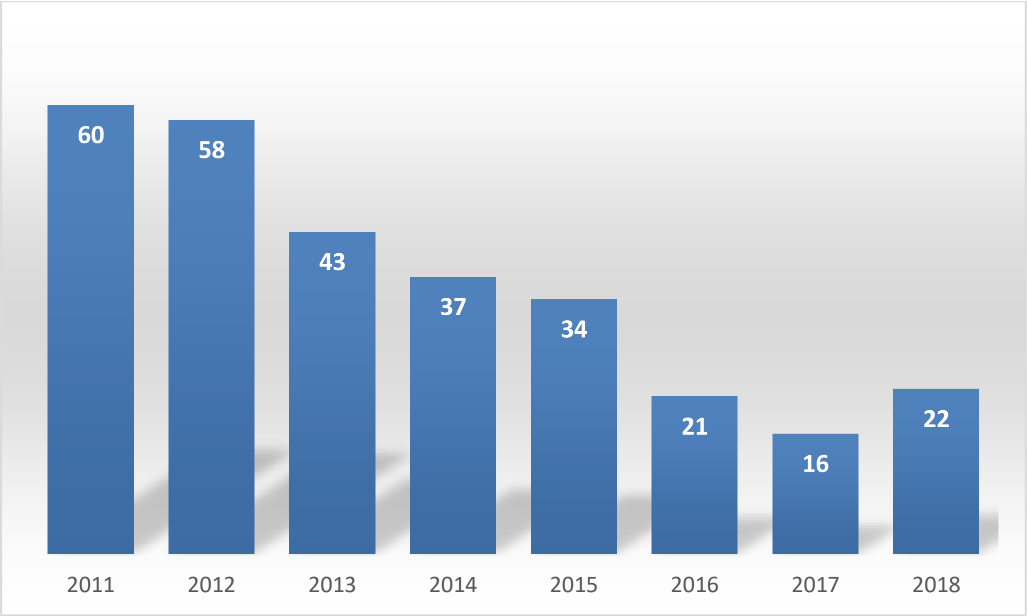

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ৪.৩.১ মানিকগঞ্জ জেলার ইব্তিদায়ী মাদরাসা সমূহের পরীক্ষাঃ

ইবতিদায়ী সমাপনী পরীক্ষা বা পি.ডি.সি হল প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষা সার্টিফিকেট সমমানের পঞ্চম শ্রেণীতে বাংলাদেশের শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সরকারি পরীক্ষা, যা প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশের অধীনে নেয়া হয়। এ পরীক্ষা প্রাথমিক ইবতিদায়ী সমাপনী পরীক্ষা হিসেবে পরিচিত। ইবতিদায়ী সমাপনী পরীক্ষা পি.ডি.সি ২০০৯ সাল হতে চালূ হয়। প্রথম দুই বছর বিভাগ ভিত্তিক ফল দেয়া হলেও ২০১১ সাল থেকে গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল দেয়া হচ্ছে। ২০১১ সাল থেকে এ পরীক্ষার সময় আধা ঘণ্টা (৩০ মিনিট) বাড়িয়ে আড়াই ঘন্টা (২:৩০ মিনিট) করা হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতিঃ

ন্যাপ (জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী) কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে সমগ্র দেশে একই সময়ে এই পরীক্ষার আয়োজন করে থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। উল্লেখ্য অন্যান্য স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা  জে.এস.সি, এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি.) বাংলাদেশের শিক্ষাবোর্ডসমূহ কর্তৃক আয়োজিত হলেও কেবল প্রাথমিক ও সমমানের পরীক্ষাগুলো আয়োজন করে থাকে মন্ত্রণালয়। প্রায় প্রতিবছরই প্রশ্নকাঠামোতে পরিবর্তণ আনা হলেও সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও সমমানের পরীক্ষা ৬টি বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হয়। যার প্রতিটি মোট ১০০ নম্বর করে থাকে এবং পাস নম্বর থাকে ৩৩।

সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল

সাধারণত পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়।

## ৪.৩.২ ইবতিদায়ী সিলেবাস ও মানবন্টন প্রকাশ :

ইবতিদায়ী প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী এবং ইবতিদায়ী সমাপনী পরীক্ষার সিলেবাস ও মানবন্টন প্রকাশ করেছে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। গত ০৯ জুন ২০১৯ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড সিলেবাস ও মানবন্টন প্রকাশ করে।

২০১৯ শিক্ষাবর্ষের পাঁচ মাসেরও বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এ সিলেবাস ও মানবন্টন প্রকাশ হল।

# বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২ অরফ্যানেজ রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd. E-mail: info@bmeb.gov.bd Fax-58616681, 58617908, 9615576


## ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা-২০১৯
## বিষয় কাঠামো ও নম্বর বন্টন

২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ইবতেদায়ি স্তর (১ম-৫ম শ্রেণি) ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থীদের বিষয় কাঠামো ও বিষয়ভিত্তিক নম্বর বন্টন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নে প্রকাশ করা হলো।

### ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি

| ক্রমিক নং | বিষয়ের নাম | মোট নম্বর |
|---|---|---|
| ১. | কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ | ১০০ |
| ২. | আকাইদ ও ফিকহ | ১০০ |
| ৩. | আরবি | ১০০ |
| ৪. | বাংলা | ১০০ |
| ৫. | ইংরেজি | ১০০ |
| ৬. | গণিত | ১০০ |
| | সর্বমোট | ৬০০ |

### ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণি ও চতুর্থ শ্রেণি

| | | |
|---|---|---|
| ১. | কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ | ১০০ |
| ২. | আকাইদ ও ফিকহ | ১০০ |
| ৩. | আরবি | ১০০ |
| ৪. | বাংলা | ১০০ |
| ৫. | ইংরেজি | ১০০ |
| ৬. | গণিত | ১০০ |
| ৭. | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ১০০ |
| ৮. | বিজ্ঞান | ১০০ |
| | সর্বমোট | ৮০০ |

### ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

| | | |
|---|---|---|
| ১. | কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ | ১০০ |
| ২. | আকাইদ ও ফিকহ | ১০০ |
| ৩. | আরবি ১ম পত্র | ১০০ |
| ৪. | আরবি ২য় পত্র | ১০০ |
| ৫. | বাংলা | ১০০ |
| ৬. | ইংরেজি | ১০০ |
| ৭. | গণিত | ১০০ |
| ৮. | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ১০০ |
| ৯. | বিজ্ঞান | ১০০ |
| | সর্বমোট | ৮০০ |

## ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার নম্বর বন্টন

**সর্বমোট নম্বর: ৬০০**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ এবং আকাইদ ও ফিকহ (৫০+৫০) | = ১০০ |
| ২. | আরবি ১ম ও ২য় পত্র (৫০+৫০) | = ১০০ |
| ৩. | বাংলা | = ১০০ |
| ৪. | ইংরেজি | = ১০০ |
| ৫. | গণিত | = ১০০ |
| ৬. | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বিজ্ঞান (৫০+৫০) | = ১০০ |
| | | **সর্বমোট ৬০০** |

**বি:দ্র: *** ইবতেদায়ি ১ম শ্রেণি থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত অর্ধবার্ষিক এবং বার্ষিক পরীক্ষায় আরবি কথোপকথনে ১০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ইবতেদায়ি ৫ম শ্রেণিতে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় আরবি কথোপকথনে ১০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

****** ইবতেদায়ি ৫ম শ্রেণিতে ৯০০ নম্বরের কোর্স/কারিকুলাম অনুসারে শ্রেণি কার্যক্রম এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গৃহীত হবে। তবে পি, ই, সি পরীক্ষার সাথে মিল রেখে ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ৬০০ নম্বরে গৃহীত হবে।

## ১। বিষয়: কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ এবং আকাইদ ও ফিকহ

**পূর্ণমান: ১০০** — **সময়: ২.৩০ ঘন্টা**

### ১) কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ: পূর্ণমান– ৫০

**নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ, ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা**

**প্রশ্নধারা ও বিস্তারিত নম্বর বণ্টন**

**(ক) কুরআন মাজিদ: ৩৫**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | ২০টি প্রশ্ন থেকে ১৫টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে হবে | ১×১৫ = ১৫ |
| ২. | পাঠ্যপুস্তকের ১টি সুরা/৩টি আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লিখতে হবে | ১×১০ = ১০ |
| ৩. | পাঠ্যপুস্তকের ২টি সুরা থেকে ১টি সুরা বাংলায় অনুবাদ লিখতে হবে | ১×১০ = ১০ |

**(খ) তাজবিদ: ১৫**

| | | |
|---|---|---|
| ৪. | ৭টি প্রশ্ন থেকে ৫টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে হবে | ১×৫ = ৫ |
| ৫. | রচনামূলক ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে | ৫×১ = ৫ |
| ৬. | শব্দের চিহ্নিত অংশের তাজবিদের কায়দা লিখতে হবে<br>**অথবা**<br>বামপাশের অংশের সাথে ডানপাশের পাঁচটি অংশের মিল করতে হবে | ৫×১ = ৫ |
| | | **সর্বমোট = ৫০** |

## ২) আকাইদ ও ফিকহ: পূর্ণমান– ৫০

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: আকাইদ ও ফিকহ, ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**প্রশ্নধারা ও বিস্তারিত নম্বর বণ্টন**

**গ) আকাইদ: ২০**

| | |
|---|---|
| ৭. ৭টি প্রশ্ন থেকে ৫টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে হবে | ১×৫ = ৫ |
| ৮. ২টি রচনামূলক প্রশ্ন থেকে ১টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে | ৬×১ = ৬ |
| ৯. ২টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থেকে ১টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে | ৪×১ = ৪ |
| ১০. ৭টি বাক্য থেকে ৫টি বাক্যের শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে | ১×৫ = ৫ |

**ঘ) ফিকহ: ২০**

| | |
|---|---|
| ১১. ৭টি প্রশ্ন থেকে ৫টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে হবে | ১×৫ = ৫ |
| ১২. ২টি রচনামূলক প্রশ্ন থেকে ১টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে | ৬×১ = ৬ |
| ১৩. ২টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থেকে ১টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে | ৪×১ = ৪ |
| ১৪. ৭টি বাক্য থেকে ৫টি বাক্যের শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে | ১×৫ = ৫ |

**ঙ) আখলাক: ১০**

| | |
|---|---|
| ১৫. ৭টি প্রশ্ন থেকে ৫টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে হবে | ১×৫ = ৫ |
| ১৬. ২টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থেকে ১টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে | ৫×১ = ৫ |
| | **সর্বমোট নম্বর = ৫০** |

## ২। বিষয়: আরবি

**পূর্ণমান: ১০০** **সময়: ২.৩০ ঘণ্টা**

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: আদ-দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ওয়াল কাওয়াইদ, ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**প্রশ্নধারা ও বিস্তারিত নম্বর বণ্টন**

**ক) আদ-দুরূসুল আরাবিয়্যাহ: ৫০**

| | |
|---|---|
| ১. ১৪টি আরবি শব্দ থাকবে। ১০টি শব্দের বাংলা অর্থ লিখতে হবে | ১×১০ = ১০ |
| ২. গদ্যাংশ থেকে ২টি অনুচ্ছেদ থাকবে; ১টির অনুবাদ লিখতে হবে | ৭×১ = ০৭ |
| ৩. ৪টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে; ২টি প্রশ্নের আরবিতে উত্তর লিখতে হবে | ৪×২ = ৮ |
| ৪. শূন্যস্থানসহ ৮টি আরবি বাক্য উল্লেখ থাকবে; ৫টি পূরণ করতে হবে | ১×৫ = ৫ |
| ৫. ৮টি আরবি শব্দ থাকবে; ৫টি শব্দ দ্বারা আরবি বাক্য গঠন করতে হবে | ১×৫ = ৫ |
| ৬. صحيح و خطأ নির্ণয়ের জন্য শব্দ থাকবে: ৮টি থেকে ৫টির উত্তর দিতে হবে | ১×৫ = ৫ |
| ৭. পাঠ্যপুস্তকের ২টি আরবি কবিতা থেকে ১টি মুখস্থ লিখতে হবে (৫ লাইন) | ১০×১ = ১০ |

**খ) কাওয়াইদ: ৫০**

| | |
|---|---|
| ৮. সরফ অংশ থেকে ৬টি প্রশ্ন থাকবে; ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে | ৫×৪ = ২০ |
| ৯. নাহু অংশ থেকে ৩টি প্রশ্ন থাকবে; ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে | ৫×২ = ১০ |
| ১০. ৮টি বাংলা বাক্য থাকবে; ৫টি আরবিতে অনুবাদ করতে হবে | ১×৫ = ০৫ |
| ১১. ৮টি আরবি বাক্য থাকবে; ৫টি বাংলায় অনুবাদ করতে হবে | ১×৫ = ০৫ |
| ১২. ৪টি রচনা দেওয়া থাকবে; ১টি আরবিতে লিখতে হবে | ১০×১ = ১০ |
| | **সর্বমোট = ১০০** |

## ৩। বিষয়: বাংলা

পূর্ণমান: ১০০ সময়: ২.৩০ ঘন্টা

**নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: আমার বাংলা বই, ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি, এনসিটিবি, ঢাকা**

| | |
|---|---|
| ১. সঠিক উত্তর বাছাইকরণ: ১৪টি প্রশ্ন হতে ১০ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে | ১×১০ = ১০ |
| ২. শব্দার্থ লিখন: ১৫টি হতে ১০ টির উত্তর দিতে হবে | ১×১০ = ১০ |
| ৩. কবির নামসহ কবিতা মুখস্থ লিখন: ২টি হতে ১টি | ১০×১ = ১০ |
| ৪. কবিতার সারমর্ম লিখন: ২টি হতে ১টি | ১০×১ = ১০ |
| ৫. গদ্যের রচনামূলক/বর্ণনামূলক প্রশ্ন: ২টি হতে ১টি | ১০×১ = ১০ |
| ৬. পদ্যের রচনামূলক/বর্ণনামূলক প্রশ্ন: ২টি হতে ১টি | ১০×১ = ১০ |
| ৭. শব্দ দিয়ে বাক্যগঠন: ৮টি হতে ৫টি | ১×৫ = ৫ |
| ৮. বামপার্শ্বের শব্দ /বাক্যের সাথে ডানপার্শ্বের শব্দ/বাক্যের মিলকরণ: ৫টি হতে ৫টি | ১×৫ = ৫ |
| ৯. ব্যাকরণগত প্রশ্ন: ৬টি হতে ৪টি (সংজ্ঞা লিখন, শ্রেণিবিন্যাসকরণ, বিপরীত শব্দ, এককথায় প্রকাশ, পদ নির্ণয়, সন্ধিবিচ্ছেদ) | ৫×৪ = ২০ |
| ১০. রচনা লিখন: ৪টি হতে ১টি | ১০×১ = ১০ |
| | **সর্বমোট = ১০০** |

## ৪। Sub: English

**Full Marks- 100** **Time: 2.30 Hrs**

**Textbook: English for Today by NCTB, Dhaka**

**a) Text : 60**
**b) Grammar & composition : 40**

**a) Text : 60**

**1. Read the following text and answer the questions:**

| | |
|---|---|
| a) Multiple choice question (Five) | 5 |
| b) True or false (Five) | 5 |
| c) Answering questions (Five) | 5 |
| d) Matching (Five) | 5 |
| e) Fill in the blanks (Five) | 5 |
| 2. Word meaning (Ten) | 10 |
| 3. Making sentences from substitution table (Five) | 05 |
| 4. Making sentences with the given words (Ten) | 10 |
| 5. Writing 8 lines of mentioned poem by heart | 10 |
| | **60** |

**b) Grammar & Composition : 40**

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Re-writing the sentences using punctuations and capital letters where necessary (Five) | 05 |
| 7. | Making dialogue | 05 |
| 8. | Letter/Application writing | 05 |
| 9. | Paragraph writing | 10 |
| 10. | Essay writing (One) | 15 |
| | | **40** |

**Total: 100**

## ৫। বিষয়: গণিত

**পূর্ণমান: ১০০** **সময়: ২.৩০ ঘন্টা**

**নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: গণিত, ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি, এনসিটিবি, ঢাকা**

**প্রশ্নধারা ও নম্বর বন্টন**

**১৩নং প্রশ্নসহ যে কোন ১০টি প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্ন উত্তরের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।** ১০×১০ = ১০০

১. গুণ, ভাগ সম্পর্কিত সমস্যাবলি ১টি প্রশ্ন

২. চার নিয়ম সংক্রান্ত সমস্যাবলি ১টি প্রশ্ন

৩. গড় নিয়ম সংক্রান্ত সমস্যাবলি ১টি প্রশ্ন

৪. গ.সা.গু ও ল.সা.গু সংক্রান্ত সমস্যাবলি ১টি প্রশ্ন

৫. গাণিতিক প্রতীক সংক্রান্ত সমস্যাবলি ১টি প্রশ্ন

৬. সাধারণ ভগ্নাংশ (যোগ, বিয়োগ) সংক্রান্ত সমস্যাবলি ১টি প্রশ্ন

৭. সাধারণ ভগ্নাংশ (গুণ, ভাগ) সংক্রান্ত সমস্যাবলি ১টি প্রশ্ন

৮. দশমিক ভগ্নাংশ সংক্রান্ত সমস্যাবলি ১টি প্রশ্ন

৯. শতকরা নিয়ম সংক্রান্ত সমস্যাবলি ১টি প্রশ্ন

১০. পরিমাপ সংক্রান্ত সমস্যাবলি ১টি প্রশ্ন

১১. সময়, ক্যালকুলেটর ও কম্পিউটার সংক্রান্ত সমস্যাবলি ১টি প্রশ্ন

১২. উপাত্ত বিন্যাস্তকরণ

১৩. চিত্রসহ সংজ্ঞা লিখ: (২×৫)

## ৬। বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বিজ্ঞান

**পূর্ণমান: ১০০** **সময়: ২.৩০ ঘন্টা**

**১) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: ৫০**

**নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি, এনসিটিবি, ঢাকা**

**প্রশ্নের ধারা ও মানবন্টন**

| | |
|---|---|
| ১. সঠিক উত্তর লিখন: ৭টি প্রশ্ন থাকবে; ৫টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে হবে | ১×৫ = ৫ |
| ২. শূন্যস্থান পূরণ: ৭টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে | ১×৫ = ৫ |
| ৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডানপাশের কথাগুলোর মিলকরণ (৫টি) | ১×৫ = ৫ |
| ৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ৭টি প্রশ্নের মধ্যে ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে | ৩×৫ = ১৫ |
| ৫. বর্ণনামূলক প্রশ্ন: ৬টি প্রশ্নের মধ্যে ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে | ৫×৪ = ২০ |
| | **সর্বমোট = ৫০** |

## ২) বিজ্ঞান- ৫০
**নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: বিজ্ঞান, ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি, এনসিটিবি, ঢাকা**

**প্রশ্নের ধারা ও মানবন্টন**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | সঠিক উত্তর লিখন: ৭টি প্রশ্ন থাকবে; ৫টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে হবে | ১×৫ = ৫ |
| ২. | শূন্যস্থান পূরণ: ৭টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে | ১×৫ = ৫ |
| ৩. | বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডানপাশের কথাগুলোর মিলকরণ (৫টি) | ১×৫ = ৫ |
| ৪. | সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ৭টি প্রশ্নের মধ্যে ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে | ৩×৫ = ১৫ |
| ৫. | বর্ণনামূলক প্রশ্ন: ৬টি প্রশ্নের মধ্যে ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে | ৫×৪ = ২০ |
| | | **সর্বমোট = ৫০** |

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

০৩/০৮/১৯

(ড. রিয়াদ চৌধুরী)
প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন: ৯৬১১৫৪০

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## ৪.৪ ইবতিদায়ী শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষায় মানিকগঞ্জ জেলার অংশগ্রহণকারী সকল মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ফলাফল ২০১৫

### ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৫

বিভাগ: ঢাকা    জেলা: মানিকগঞ্জ    উপজেলা: মানিকগঞ্জ সদর

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩.৫৮ | ২ | ৩.৮৩ | ৩ | ৩.৬৭ | ৪ | ৩.০৮ | ৫ | ২.৯২ | ৬ | ২.৯২ |
| ৭ | ৩.০০ | ৮ | ৩.৫০ | ৯ | ২.৪২ | ম-১০ | ৩.৫৮ | ম-১১ | ৩.৪২ | ম-১২ | ৩.৬৭ |
| ম-১৩ | ৩.২৫ | ম-১৪ | ৩.১৭ | ম-১৫ | ৩.১৭ | ম-১৬ | ৩.০০ | ম-১৭ | ৩.২৫ | ম-১৮ | ৩.৬৭ |
| ম-১৯ | ৩.৩৩ | ম-২০ | ৩.১৭ | ম-২১ | ৩.২৫ | ম-২২ | ৩.০০ | ম-২৩ | ২.৪২ | ম-২৪ | ২.১৭ |
| ম-২৫ | ২.৬৭ | ম-২৬ | ৩.৬৭ | ২৭ | ২.৪২ | ৩০ | ১.৭৫ | ৩২ | ২.৪২ | ৩৩ | ২.৫০ |
| ৩৪ | ২.১৭ | ৩৫ | ১.৬৭ | ৩৬ | ১.৬৭ | ৩৭ | ১.৩৩ | ৩৮ | ১.০০ | ৩৯ | ১.৩৩ |
| ৪২ | ১.৩৩ | ৪৩ | ১.৬৭ | ম-৪৮ | ২.৫০ | ম-৪৯ | ২.৬৭ | ম-৫০ | ২.১৭ | ম-৫১ | ১.৮৩ |
| ম-৫২ | ১.৬৭ | ম-৫৩ | ২.৫০ | ম-৫৫ | ২.৭৫ | ম-৫৬ | ২.৮৩ | ম-৫৭ | ৪.৫৮ | ম-৫৮ | ২.৫৮ |
| ম-৫৯ | ২.৭৫ | ম-৬০ | ২.৫৮ | ম-৬১ | ২.১৭ | ম-৬২ | ১.৫০ | ম-৬৩ | ৩.৩৩ | ম-৬৪ | ২.৪২ |
| ম-৬৫ | ২.০০ | ম-৬৬ | ২.২৫ | ম-৬৭ | ২.৫০ | ম-৬৮ | ২.২৫ | ম-৬৯ | ২.৫৮ | ম-৭০ | ২.৫৮ |
| ম-৭২ | ৪.০০ | ৭৩ | ১.৫০ | ৭৪ | ৩.১৭ | ৭৫ | ৩.৫৮ | ৭৬ | ৩.০৮ | ৭৭ | ৩.৬৭ |
| ৭৮ | ৩.৪২ | ৮০ | ৩.০০ | ৮১ | ২.৮৩ | ৮২ | ২.১৭ | ৮৩ | ৩.০৮ | ৮৪ | ১.৩৩ |
| ম-৮৫ | ৪.৮৩ | ম-৮৬ | ৪.১৭ | ম-৮৭ | ৪.১৭ | ম-৮৮ | ৪.৬৭ | ম-৮৯ | ৪.৫৮ | ম-৯০ | ৪.০০ |
| ম-৯১ | ৩.৯২ | ৯২ | ২.৯২ | ৯৩ | ৩.০৮ | ৯৪ | ৩.৪২ | ৯৫ | ৫.০০ | ৯৬ | ৪.৮৩ |
| ৯৭ | ৫.০০ | ৯৮ | ৪.৮৩ | ৯৯ | ৪.৬৭ | ১০০ | ৪.১৭ | ১০১ | ৩.৪২ | ১০২ | ২.৮৩ |
| ১০৩ | ৩.৩৩ | ১০৪ | ৩.৪২ | ১০৫ | ৩.৫০ | ১০৬ | ৩.৪২ | ১০৭ | ৩.২৫ | ১০৮ | ২.০৮ |
| ১১০ | ৪.২৫ | ১১১ | ৪.৮৩ | ১১২ | ৫.০০ | ১১৩ | ৫.০০ | ১১৪ | ৪.২৫ | ১১৫ | ৪.৫০ |
| ১১৬ | ৪.৮৩ | ১১৭ | ২.৭৫ | ১১৮ | ২.৪২ | ১১৯ | ২.৫৮ | ১২০ | ২.৫০ | ১২২ | ৩.০০ |
| ১২৩ | ৩.২৫ | ম-১২৪ | ৪.৮৩ | ম-১২৫ | ৪.৮৩ | ম-১২৬ | ৪.৮৩ | ম-১২৭ | ৪.২৫ | ম-১২৮ | ৪.৭৫ |
| ম-১২৯ | ৪.০৮ | ম-১৩০ | ৩.৫৮ | ম-১৩১ | ৩.৭৫ | ম-১৩২ | ৩.৬৭ | ম-১৩৩ | ৩.৫৮ | ম-১৩৪ | ৩.৭৫ |
| ম-১৩৫ | ৩.৩৩ | ম-১৩৬ | ১.৫০ | ম-১৩৭ | ২.৮৩ | ১৩৮ | ৪.৮৩ | ১৩৯ | ৪.৩৩ | ১৪০ | ৪.৪২ |
| ১৪১ | ৩.৪২ | ১৪২ | ৩.০৮ | ১৪৪ | ২.৯২ | ১৪৫ | ২.৬৭ | ১৪৬ | ২.৫৮ | ১৪৮ | ৩.১৭ |
| ১৪৯ | ৩.১৭ | ১৫০ | ২.৫৮ | ১৫১ | ২.০৮ | ১৫২ | ২.০৮ | ১৫৩ | ৩.২৫ | ১৫৪ | ২.৮৩ |
| ১৫৫ | ১.৯২ | ১৫৭ | ২.৬৭ | ম-১৫৯ | ৪.৬৭ | ম-১৬০ | ৪.৫০ | ম-১৬১ | ৪.৬৭ | ম-১৬২ | ৩.৪২ |
| ম-১৬৩ | ৩.৫০ | ম-১৬৪ | ৩.৫৮ | ম-১৬৫ | ৩.৬৭ | ম-১৬৬ | ২.০৮ | ম-১৬৭ | ২.৮৩ | ম-১৬৮ | ২.৬৭ |
| ম-১৬৯ | ৩.১৭ | ম-১৭০ | ৩.০০ | ম-১৭১ | ৩.০৮ | ম-১৭২ | ৩.১৭ | ম-১৭৩ | ৩.১৭ | ম-১৭৫ | ৩.০০ |

মোট: ১৫৬

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৫

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: ঘিওর**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪.৮৩ | ২ | ৪.৮৩ | ৩ | ৪.৮৩ | ৪ | ৪.৫৮ | ৫ | ৪.৫০ | ৬ | ৪.৮৩ |
| ৭ | ৩.৬৭ | ৮ | ৪.০৮ | ৯ | ৩.০০ | ১১ | ২.৮৩ | ১২ | ৪.২৫ | ১৩ | ৪.৫০ |
| ম-১৪ | ৫.০০ | ম-১৫ | ৪.৪২ | ম-১৬ | ৪.৬৭ | ম-১৭ | ৪.৫০ | ম-১৮ | ৪.৪২ | ম-১৯ | ৪.৫৮ |
| ম-২০ | ৪.৫৮ | ম-২১ | ২.৬৭ | ম-২২ | ২.৯২ | ম-২৩ | ২.৮৩ | ম-২৪ | ২.৯২ | ম-২৫ | ২.৭৫ |
| ম-২৬ | ৪.১৭ | ম-২৭ | ৩.৪২ | ম-২৮ | ৪.০০ | ম-২৯ | ৩.৫০ | ম-৩০ | ৩.২৫ | ম-৩১ | ৩.৪২ |
| ম-৩২ | ২.৭৫ | ম-৩৩ | ২.৯২ | ম-৩৪ | ২.৯২ | ম-৩৫ | ৪.৫৮ | ৩৬ | ১.৫৮ | ৩৭ | ৩.৫০ |
| ৩৮ | ৩.১৭ | ৩৯ | ১.৭৫ | ৪০ | ২.০৮ | ৪১ | ১.৮৩ | ৪২ | ৪.০৮ | ৪৩ | ৪.০৮ |
| ৪৪ | ৪.১৭ | ৪৫ | ২.৮৩ | ৪৬ | ১.৮৩ | ৪৮ | ২.০৮ | ৪৯ | ২.১৭ | ৫০ | ৩.৮৩ |
| ৫২ | ৩.৪২ | ম-৫৩ | ৩.৬৭ | ম-৫৪ | ৩.১৭ | ম-৫৮ | ৩.৯২ | ম-৫৯ | ৩.৭৫ | ম-৬১ | ৩.৫৮ |
| ম-৬২ | ৩.৫০ | ম-৬৩ | ৩.২৫ | ম-৬৬ | ২.০৮ | ম-৬৮ | ২.৭৫ | ম-৬৯ | ৩.০০ | ম-৭০ | ২.৫০ |
| ম-৭১ | ৩.৩৩ | ম-৭২ | ৩.০৮ | ম-৭৪ | ১.৮৩ | ম-৭৭ | ২.১৭ | ম-৭৯ | ৪.০৮ | মোট: ৬৫ | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৫

বিভাগ: ঢাকা　　জেলা: মানিকগঞ্জ　　উপজেলা: সিংগাইর

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩.৫০ | ২ | ৩.০০ | ৬ | ৩.৫০ | ৭ | ৩.০৮ | ৮ | ৩.২৫ | ৯ | ১.৮৩ |
| ১০ | ৩.৬৭ | ১১ | ৩.৫৮ | ১২ | ৩.৭৫ | ম-১৪ | ৩.৮৩ | ম-১৫ | ৩.৬৭ | ম-১৬ | ৩.৩৩ |
| ম-১৭ | ৩.৪২ | ম-১৮ | ৩.৪২ | ম-১৯ | ৪.০০ | ম-২০ | ৪.০০ | ম-২১ | ৩.১৭ | ২৩ | ৩.৫০ |
| ২৫ | ১.৬৭ | ২৬ | ৩.৩৩ | ২৭ | ৪.০০ | ২৮ | ২.৪২ | ৩০ | ১.০০ | ম-৩২ | ৪.৫০ |
| ম-৩৩ | ৩.৭৫ | ম-৩৪ | ৪.০৮ | ম-৩৫ | ৩.৯২ | ম-৩৬ | ৩.৫০ | ম-৩৭ | ৩.৪২ | ম-৩৮ | ৩.১৭ |
| ম-৩৯ | ২.৬৭ | ম-৪০ | ২.২৫ | ম-৪১ | ৩.৮৩ | ৪২ | ৪.৭৫ | ৪৩ | ৩.৬৭ | ৪৪ | ২.৮৩ |
| ৪৫ | ৩.৩৩ | ৪৬ | ১.৩৩ | ৪৭ | ১.৫০ | ৪৮ | ২.০৮ | ৪৯ | ২.৮৩ | ৫০ | ১.৬৭ |
| ৫২ | ৩.৫৮ | ৫৩ | ২.৩৩ | ৫৪ | ৩.৬৭ | ৫৫ | ৩.৫০ | ৫৬ | ১.০০ | ৫৭ | ২.৫৮ |
| ৫৮ | ৩.০০ | ৫৯ | ১.০০ | ৬০ | ১.৮৩ | ৬১ | ১.১৭ | ৬২ | ২.৫৮ | ৬৩ | ১.৪২ |
| ৬৫ | ১.৫০ | ৬৭ | ১.৩৩ | ৬৮ | ৩.১৭ | ম-৭১ | ৫.০০ | ম-৭২ | ৪.৫৮ | ম-৭৩ | ৪.০০ |
| ম-৭৪ | ৪.২৫ | ম-৭৫ | ৩.৩৩ | ম-৭৬ | ২.০০ | ম-৭৭ | ৩.৩৩ | ম-৭৮ | ১.৩৩ | ম-৭৯ | ২.৫৮ |
| ম-৮০ | ১.১৭ | ম-৮১ | ৩.০৮ | ম-৮২ | ২.১৭ | ম-৮৩ | ৪.৫০ | ম-৮৪ | ৩.৯২ | ম-৮৫ | ৪.১৭ |
| ম-৮৬ | ৪.০৮ | ম-৮৭ | ৩.৫০ | ম-৮৮ | ৩.৮৩ | ম-৮৯ | ২.৯২ | ম-৯০ | ১.৮৩ | ম-৯১ | ১.৩৩ |
| ম-৯২ | ৪.৩৩ | ম-৯৬ | ৩.৬৭ | ম-৯৭ | ৩.৫০ | ম-৯৮ | ২.৬৭ | ম-৯৯ | ২.৬৭ | ম-১০১ | ৪.৭৫ |
| ম-১০২ | ৪.৭৫ | ম-১০৩ | ৫.০০ | ম-১০৫ | ৪.৭৫ | ম-১০৬ | ৩.৬৭ | ম-১০৮ | ৪.৩৩ | ম-১০৯ | ৪.৮৩ |
| ম-১১০ | ৩.৮৩ | ম-১১১ | ৪.৫৮ | ম-১১২ | ৩.৩৩ | ১১৩ | ২.৯২ | ১১৪ | ৩.২৫ | ১১৫ | ৩.১৭ |
| ১১৬ | ৩.০৮ | ১১৭ | ২.১৭ | ১১৮ | ৩.০০ | ১১৯ | ১.৮৩ | ১২০ | ৩.১৭ | ১২১ | ২.৪২ |
| ১২৩ | ২.০০ | ১২৫ | ১.৮৩ | ১২৮ | ২.৬৭ | ১২৯ | ২.৬৭ | ম-১৩০ | ৩.৩৩ | ম-১৩১ | ৩.৮৩ |
| ম-১৩২ | ৩.৫০ | ম-১৩৩ | ৩.৬৭ | ম-১৩৪ | ৩.২৫ | ম-১৩৫ | ৩.০০ | ম-১৩৬ | ৩.০০ | ম-১৩৭ | ৩.০০ |
| ম-১৩৮ | ২.৯২ | ম-১৩৯ | ৩.০০ | ম-১৪০ | ২.২৫ | ম-১৪১ | ১.৬৭ | ম-১৪২ | ২.১৭ | ম-১৪৩ | ২.৮৩ |
| ম-১৪৪ | ২.৩৩ | ম-১৪৫ | ২.৭৫ | ম-১৪৬ | ২.৪২ | ম-১৪৭ | ৩.৩৩ | ম-১৪৮ | ২.২৫ | ম-১৪৯ | ২.৩৩ |
| ম-১৫০ | ২.৫৮ | ম-১৫১ | ২.০০ | ম-১৫২ | ২.২৫ | ম-১৫৪ | ২.৬৭ | ম-১৬৩ | ২.৫৮ | ম-১৬৮ | ৩.১৭ |
| ম-১৬৯ | ২.৯২ | ম-১৭১ | ২.৩৩ | ম-১৭৩ | ৪.২৫ | ম-১৭৪ | ৫.০০ | ম-১৭৫ | ৫.০০ | ম-১৭৬ | ৫.০০ |
| ম-১৭৭ | ৫.০০ | ম-১৭৮ | ৫.০০ | ১৭৯ | ৪.২৫ | ১৮০ | ৩.৪২ | ১৮১ | ৩.৫০ | ১৮২ | ৩.৯২ |
| ১৮৩ | ৩.৪২ | ১৮৪ | ৪.০০ | ১৮৫ | ৩.১৭ | ১৮৬ | ২.৮৩ | ১৮৮ | ২.৯২ | ১৯০ | ২.৬৭ |
| ম-১৯১ | ৪.১৭ | ম-১৯২ | ৪.২৫ | ম-১৯৩ | ৪.১৭ | ম-১৯৪ | ৩.৫৮ | ম-১৯৫ | ৪.১৭ | ম-১৯৬ | ৩.৮৩ |
| ম-১৯৭ | ৩.৯২ | ম-১৯৮ | ৩.৪২ | ম-১৯৯ | ৩.৯২ | ম-২০০ | ৩.৯২ | ম-২০১ | ৪.০০ | ম-২০৩ | ২.২৫ |
| ম-২০৫ | ২.৯২ | ম-২০৬ | ২.৭৫ | ম-২০৭ | ২.০০ | ম-২০৮ | ২.৪২ | ম-২০৯ | ১.৭৫ | ম-২১২ | ২.৮৩ |
| ২১৮ | ৪.০০ | ২১৯ | ৩.৪২ | ২২০ | ৩.৭৫ | ২২১ | ৩.২৫ | ২২২ | ১.৮৩ | ২২৪ | ২.৮৩ |
| ২২৫ | ৩.০৮ | ২২৭ | ৩.১৭ | ২৩১ | ৩.৯২ | ২৩২ | ৪.০৮ | ২৩৩ | ৪.৫০ | ২৩৪ | ৩.৪২ |
| ২৩৭ | ১.৫৮ | ২৩৮ | ২.২৫ | ম-২৩৯ | ৪.৪২ | ম-২৪০ | ৪.০০ | ম-২৪১ | ৩.০০ | ম-২৪২ | ২.৮৩ |
| ম-২৪৩ | ২.৯২ | ম-২৪৫ | ২.৪২ | ম-২৪৬ | ২.৩৩ | ম-২৪৭ | ২.০০ | ম-২৪৮ | ১.৬৭ | ম-২৪৯ | ১.৬৭ |
| ম-২৫০ | ১.৮৩ | ম-২৫১ | ৩.১৭ | ম-২৫২ | ৩.০৮ | ম-২৫৩ | ২.১৭ | ম-২৫৪ | ২.০০ | ম-২৫৫ | ৩.০৮ |
| ম-২৫৬ | ২.০০ | ম-২৫৭ | ২.৮৩ | ম-২৫৮ | ২.১৭ | ম-২৫৯ | ২.৯২ | ম-২৬০ | ২.৩৩ | ম-২৬৫ | ২.৬৭ |
| ২৬৬ | ২.২৫ | ২৬৭ | ২.১৭ | ২৬৮ | ১.৫০ | ২৬৯ | ২.২৫ | ২৭০ | ১.৮৩ | ২৭১ | ১.৯২ |
| ২৭২ | ৩.২৫ | ২৭৩ | ২.০০ | ২৭৫ | ১.৬৭ | ২৭৬ | ৩.০০ | ম-২৭৭ | ৩.১৭ | ম-২৭৮ | ৩.০৮ |
| ম-২৭৯ | ২.৮৩ | ম-২৮০ | ২.৮৩ | ম-২৮১ | ১.৯২ | ম-২৮২ | ২.৫০ | ম-২৮৩ | ২.১৭ | ম-২৮৪ | ২.৯২ |
| ম-২৮৫ | ৩.০০ | ম-২৮৬ | ২.৫৮ | ম-২৮৭ | ১.৫০ | ম-২৮৮ | ২.৬৭ | ম-২৮৯ | ২.১৭ | ম-২৯০ | ২.০০ |
| ম-২৯১ | ১.৩৩ | ম-২৯২ | ১.৮৩ | ম-২৯৩ | ২.০০ | ম-২৯৪ | ২.০০ | ম-২৯৫ | ২.৯২ | ম-২৯৬ | ১.৮৩ |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৫

বিভাগ: ঢাকা জেলা: মানিকগঞ্জ উপজেলা: সিংগাইর

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ম-২৯৮ | ২.৬৭ | ম-৩০১ | ৩.৩৩ | ম-৩০২ | ২.৭৫ | ম-৩০৩ | ২.৫৮ | ম-৩০৪ | ১.৬৭ | মোট: ২৩৯ | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৫

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: সাটুরিয়া**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২.৪২ | ২ | ১.৮৩ | ৩ | ২.০০ | ৪ | ২.৪২ | ৫ | ১.৯২ | ৮ | ১.৬৭ |
| ৯ | ২.০৮ | ম-১১ | ২.১৭ | ম-১২ | ২.১৭ | ম-১৩ | ২.৩৩ | ম-১৪ | ২.৫০ | ম-১৫ | ২.৯২ |
| ম-১৬ | ২.৫০ | ম-১৭ | ২.২৫ | ম-১৮ | ২.৩৩ | ম-১৯ | ১.৫৮ | ম-২১ | ১.৬৭ | ২৩ | ২.৫৮ |
| ২৬ | ৩.৫৮ | ২৭ | ২.৬৭ | ২৮ | ৩.৪২ | ২৯ | ৩.০০ | ৩০ | ৩.৪২ | ম-৩১ | ৪.৬৭ |
| ম-৩২ | ৪.০৮ | ম-৩৩ | ৩.৯২ | ম-৩৪ | ৩.৫০ | ম-৩৫ | ৪.৫৮ | ম-৩৬ | ৪.৮৩ | ম-৩৭ | ৪.৬৭ |
| ম-৩৮ | ৩.৯২ | ম-৩৯ | ৪.০০ | ম-৪০ | ৪.৩৩ | ম-৪১ | ৪.০০ | ম-৪২ | ৩.৭৫ | ম-৪৩ | ৩.০৮ |
| ম-৪৪ | ৩.৭৫ | ৪৬ | ৪.৫০ | ৪৭ | ৪.৩৩ | ৪৮ | ৩.৭৫ | ৪৯ | ৩.৭৫ | ৫০ | ৩.৫০ |
| ৫১ | ৩.৭৫ | ৫২ | ২.১৭ | ৫৩ | ৩.০০ | ৫৫ | ২.০০ | ম-৫৬ | ৪.৩৩ | ম-৫৮ | ৩.৫০ |
| ম-৫৯ | ৩.৩৩ | ম-৬০ | ১.৫০ | ম-৬২ | ২.৯২ | ম-৬৩ | ৩.২৫ | ম-৬৫ | ১.৬৭ | ম-৬৬ | ২.১৭ |
| ম-৬৭ | ৩.৯২ | ৬৮ | ৪.৩৩ | ৬৯ | ৩.৫০ | ৭০ | ৩.৪২ | ৭১ | ২.০৮ | ৭২ | ২.৯২ |
| ৭৩ | ২.৩৩ | ৭৪ | ৩.৫০ | ৭৫ | ১.৬৭ | ৭৬ | ৪.৩৩ | ৭৭ | ৪.০৮ | ৭৮ | ৪.৬৭ |
| ৭৯ | ৪.৮৩ | ৮০ | ৩.৭৫ | ৮১ | ৪.৫৮ | ৮২ | ৪.৮৩ | ৮৩ | ৪.২৫ | ৮৪ | ৪.৫০ |
| ৮৫ | ৪.৫০ | ৮৬ | ৫.০০ | ৮৭ | ৪.০৮ | ৮৮ | ৪.৫৮ | ম-৮৯ | ৪.৫০ | ম-৯০ | ৩.৫৮ |
| ম-৯১ | ৪.৫৮ | ম-৯৩ | ৪.২৫ | ম-৯৪ | ২.০৮ | ম-৯৫ | ২.১৭ | ম-৯৬ | ৩.৫০ | ম-৯৭ | ৪.৪২ |
| ম-৯৮ | ২.৯২ | ম-৯৯ | ৪.০০ | ম-১০০ | ৪.৫০ | ম-১০১ | ৩.০৮ | ম-১০২ | ৩.৭৫ | ম-১০৪ | ৫.০০ |
| ম-১০৫ | ৪.৫৮ | ম-১০৬ | ৪.২৫ | ম-১০৭ | ৪.৬৭ | ম-১০৮ | ৪.২৫ | ম-১০৯ | ৩.৯২ | ম-১১০ | ৪.৭৫ |
| ম-১১১ | ৩.৮৩ | ম-১১২ | ৩.৯২ | মোট: ৯৮ | | | | | | | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৫

বিভাগ: ঢাকা　　জেলা: মানিকগঞ্জ　　উপজেলা: হরিরামপুর

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২.৯২ | ২ | ২.৫০ | ৩ | ১.১৭ | ৫ | ১.১৭ | ৬ | ৩.৯২ | ৭ | ৩.০৮ |
| ৮ | ৩.৪২ | ম-৯ | ১.৮৩ | ম-১০ | ২.৬৭ | ম-১১ | ২.৪২ | ম-১২ | ২.০৮ | ম-১৩ | ২.০০ |
| ম-১৪ | ৩.০০ | ম-১৫ | ২.৫৮ | ম-১৬ | ২.৮৩ | ম-১৭ | ৩.৫৮ | ম-১৮ | ৩.৫৮ | ম-১৯ | ৩.১৭ |
| ম-২০ | ৩.৪২ | ম-২১ | ২.১৭ | ২২ | ৩.২৫ | ২৩ | ৩.১৭ | ২৪ | ২.৪২ | ২৫ | ২.২৫ |

মোট: ২৪

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৫

বিভাগ: ঢাকা　　জেলা: মানিকগঞ্জ　　উপজেলা: শিবালয়

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪.০৮ | ২ | ৪.০৮ | ৩ | ৪.০০ | ৪ | ৩.৩৩ | ৫ | ৩.০৮ | ৬ | ২.৫০ |
| ৭ | ২.৭৫ | ৮ | ২.৬৭ | ৯ | ৩.৫০ | ১০ | ২.৭৫ | ১১ | ৩.৩৩ | ১২ | ২.০০ |
| ১৪ | ২.৫০ | ১৫ | ২.৫০ | ১৬ | ২.৬৭ | ১৭ | ৩.৭৫ | ১৮ | ২.৮৩ | ২০ | ১.৬৭ |
| ২১ | ৩.২৫ | ২৪ | ৩.২৫ | ২৫ | ৪.১৭ | ম-২৬ | ৪.৫০ | ম-২৭ | ৪.৫০ | ম-২৮ | ৩.২৫ |
| ম-২৯ | ২.৮৩ | ম-৩০ | ২.৪২ | ম-৩৩ | ৩.৯২ | ম-৩৪ | ৩.৫৮ | ম-৩৬ | ২.০০ | ম-৩৭ | ১.৮৩ |
| ম-৩৮ | ২.৩৩ | ৪০ | ২.৭৫ | ৪১ | ৩.০৮ | ৪৩ | ১.৯২ | ৪৬ | ২.০৮ | ৪৭ | ২.৮৩ |
| ম-৪৯ | ২.৮৩ | ৫৩ | ৩.৪২ | ৫৫ | ২.৮৩ | ৫৬ | ২.৭৫ | ম-৫৮ | ২.০০ | ম-৬০ | ৩.৪২ |
| ম-৬২ | ২.৯২ | ম-৬৩ | ২.৯২ | ম-৬৪ | ২.৮৩ | | | | | | |

মোট: ৪৫

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৫

বিভাগ: ঢাকা জেলা: মানিকগঞ্জ উপজেলা: দৌলতপুর

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩.০০ | ম-২ | ২.০৮ | ম-৩ | ২.২৫ | ম-৪ | ১.৮৩ | ম-৫ | ২.৯২ | ৬ | ৩.৭৫ |
| ৭ | ৩.৮৩ | ৮ | ৩.৫৮ | ৯ | ৩.৬৭ | ১০ | ৩.৮৩ | ১১ | ৪.৪২ | ১২ | ৪.২৫ |
| ১৩ | ৪.৭৫ | ১৪ | ৪.০০ | ১৫ | ৩.৯২ | ১৬ | ২.৩৩ | ১৭ | ৩.১৭ | ১৮ | ২.২৫ |
| ১৯ | ৩.০০ | ২০ | ৩.১৭ | ২১ | ৩.৭৫ | ২২ | ৩.৪২ | ২৩ | ৩.০০ | ২৪ | ৪.১৭ |
| ২৭ | ৩.৮৩ | ২৮ | ৩.৫৮ | ২৯ | ৪.১৭ | ৩০ | ৩.৮৩ | ৩১ | ৪.১৭ | ৩২ | ৪.৫০ |
| ৩৩ | ২.৪২ | ৩৫ | ৩.০০ | ৩৬ | ২.২৫ | ৩৮ | ৪.১৭ | ৩৯ | ৪.৫৮ | ৪০ | ২.৭৫ |
| ৪২ | ৩.৭৫ | ৪৩ | ৩.৮৩ | ৪৪ | ৩.৩৩ | ৪৫ | ৩.৯২ | ৪৬ | ৩.২৫ | ৪৮ | ৩.৪২ |
| ৫৩ | ৩.৫৮ | ৫৫ | ৪.৭৫ | ৫৬ | ৩.৪২ | ৫৭ | ৩.৫৮ | ৫৮ | ৩.৫৮ | ৫৯ | ৪.২৫ |
| ৬০ | ৩.১৭ | ম-৬১ | ২.৮৩ | ম-৬২ | ২.৯২ | ম-৬৪ | ৪.২৫ | ম-৬৫ | ৩.৯২ | ম-৬৬ | ৩.৮৩ |
| ম-৬৭ | ৫.০০ | ম-৬৮ | ৪.২৫ | ম-৭০ | ৩.৮৩ | ম-৭১ | ২.২৫ | ম-৭২ | ৩.১৭ | ম-৭৩ | ৪.১৭ |
| ম-৭৪ | ৩.১৭ | ম-৭৫ | ৪.২৫ | ম-৭৬ | ৩.৫৮ | ম-৭৮ | ৪.৩৩ | ম-৭৯ | ৩.০০ | ম-৮০ | ৩.১৭ |
| ম-৮১ | ২.০৮ | ম-৮২ | ২.৮৩ | ম-৮৩ | ৩.৪২ | ম-৮৪ | ২.৫০ | ম-৮৫ | ৩.০৮ | ম-৮৬ | ২.৮৩ |
| ম-৮৭ | ২.৫০ | ম-৮৮ | ৪.৫০ | ম-৮৯ | ৩.৮৩ | ম-৯০ | ২.৬৭ | ম-৯১ | ৪.৬৭ | ম-৯২ | ১.৮৩ |
| ম-৯৩ | ৩.৮৩ | ম-৯৫ | ২.৮৩ | ম-৯৬ | ৪.১৭ | ম-১০০ | ৩.০০ | ম-১০২ | ১.৮৩ | ম-১০৪ | ২.৬৭ |
| ম-১০৫ | ৩.৫৮ | ম-১০৬ | ২.৫০ | ১০৭ | ৪.৮৩ | ১০৮ | ৪.৪২ | ১০৯ | ৪.৪২ | ১১০ | ৪.১৭ |
| ১১১ | ৪.৫০ | ১১২ | ৪.০৮ | ১১৩ | ৪.৬৭ | ১১৪ | ৪.০৮ | ১১৫ | ৩.৭৫ | ১১৬ | ৪.১৭ |
| ১১৭ | ৪.৮৩ | ১১৮ | ৪.১৭ | ১১৯ | ৩.৮৩ | ১২০ | ৪.০০ | ১২১ | ৩.৭৫ | ১২২ | ৩.৭৫ |
| ১২৩ | ৩.২৫ | ১২৪ | ৪.০০ | ১২৫ | ৩.৮৩ | ১২৬ | ৪.১৭ | ১২৭ | ৩.৬৭ | ১২৮ | ৩.০০ |
| ১২৯ | ৪.০৮ | ১৩০ | ৪.০০ | ১৩১ | ৪.১৭ | ১৩২ | ৩.৯২ | ১৩৩ | ৩.৬৭ | ১৩৪ | ২.৮৩ |
| ১৩৬ | ৩.৫৮ | ১৩৭ | ২.৮৩ | ১৩৮ | ৩.৩৩ | ১৩৯ | ৩.৪২ | ১৪০ | ৪.৩৩ | ১৪১ | ৩.৮৩ |
| ১৪২ | ৪.৫০ | ১৪৪ | ৩.৯২ | ১৪৫ | ৩.৬৭ | ১৪৬ | ৩.৫৮ | ১৪৭ | ২.৩৩ | ১৪৮ | ২.৬৭ |
| ১৪৯ | ৪.২৫ | ১৫০ | ৪.৬৭ | ১৫১ | ৩.৫০ | ১৫২ | ৪.২৫ | ১৫৩ | ২.৬৭ | ১৫৪ | ৩.৪২ |
| ১৫৫ | ৩.৬৭ | ১৫৬ | ৩.৪২ | ১৫৭ | ৩.৭৫ | ১৫৯ | ৩.৭৫ | ১৬০ | ৪.০৮ | ১৬১ | ৩.৮৩ |
| ১৬২ | ৪.২৫ | ১৬৩ | ৪.০৮ | ১৬৪ | ৩.৫৮ | ১৬৫ | ২.৪২ | ১৬৭ | ৩.৬৭ | ১৬৮ | ৩.১৭ |
| ১৭০ | ৪.৪২ | ম-১৭১ | ৪.২৫ | ম-১৭২ | ৪.১৭ | ম-১৭৩ | ৪.০৮ | ম-১৭৪ | ৪.০০ | ম-১৭৫ | ৪.২৫ |
| ম-১৭৬ | ৪.৭৫ | ম-১৭৭ | ৪.৪২ | ম-১৭৮ | ৩.৩৩ | ম-১৭৯ | ৪.৩৩ | ম-১৮০ | ৪.১৭ | ম-১৮১ | ২.৯২ |
| ম-১৮২ | ৪.০৮ | ম-১৮৩ | ৩.১৭ | ম-১৮৪ | ৪.০০ | ম-১৮৫ | ৪.৫৮ | ম-১৮৬ | ৪.১৭ | ম-১৮৭ | ৩.০৮ |
| ম-১৮৮ | ৩.৭৫ | ম-১৮৯ | ৪.৫০ | ম-১৯০ | ৩.৫৮ | ম-১৯১ | ৪.০০ | ম-১৯২ | ৩.৫৮ | ম-১৯৩ | ২.৪২ |
| ম-১৯৪ | ৩.৫০ | ম-১৯৫ | ৪.৫০ | ম-১৯৬ | ২.১৭ | ম-১৯৭ | ৪.২৫ | ম-১৯৮ | ৪.২৫ | ম-১৯৯ | ৩.৫০ |
| ম-২০০ | ৩.৯২ | ম-২০১ | ৩.৭৫ | ম-২০২ | ৪.২৫ | ম-২০৩ | ৩.৬৭ | ম-২০৪ | ৩.৭৫ | ম-২০৫ | ৩.৪২ |
| ম-২০৬ | ২.৮৩ | ম-২০৭ | ৪.২৫ | ম-২০৮ | ২.৮৩ | ম-২০৯ | ৪.৭৫ | ম-২১০ | ৩.৮৩ | ম-২১১ | ৩.৫৮ |
| ম-২১২ | ৪.৩৩ | ম-২১৩ | ৪.৩৩ | ম-২১৪ | ৪.১৭ | ম-২১৫ | ৪.১৭ | ম-২১৬ | ২.০০ | ম-২১৭ | ৩.১৭ |
| ম-২১৯ | ৪.০০ | ম-২২০ | ৩.৫০ | ম-২২১ | ৩.৮৩ | ম-২২২ | ৪.১৭ | ম-২২৩ | ৩.৩৩ | ম-২২৪ | ২.৫০ |
| ম-২২৫ | ৩.০০ | ম-২২৬ | ৩.৩৩ | ম-২২৭ | ২.৯২ | ম-২২৮ | ৩.২৫ | ম-২২৯ | ৩.১৭ | ম-২৩০ | ৪.০০ |
| ম-২৩১ | ৪.৬৭ | ম-২৩২ | ৩.৩৩ | ম-২৩৪ | ৪.৩৩ | ম-২৩৬ | ২.৫৮ | ম-২৩৭ | ২.৯২ | ম-২৩৮ | ৩.২৫ |
| ম-২৩৯ | ২.১৭ | ম-২৪১ | ২.৮৩ | ২৪২ | ৪.১৭ | ২৪৩ | ২.৫৮ | ২৪৬ | ২.১৭ | ২৪৭ | ১.৩৩ |
| ২৪৮ | ২.৬৭ | ২৪৯ | ১.৯২ | ২৫১ | ২.৯২ | ম-২৫২ | ৩.০০ | ম-২৫৩ | ৩.০৮ | ম-২৫৪ | ২.৩৩ |
| ম-২৫৫ | ২.৭৫ | ২৫৭ | ৪.৩৩ | ২৫৮ | ৩.৩৩ | ২৫৯ | ৩.০৮ | ২৬০ | ৩.৮৩ | ২৬১ | ৩.৫৮ |
| ২৬২ | ২.৫৮ | ২৬৩ | ৩.১৭ | ২৬৪ | ৩.০০ | ২৬৫ | ৩.৮৩ | ২৬৬ | ৩.৩৩ | ২৬৭ | ৪.২৫ |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৫

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: দৌলতপুর**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৬৮ | ৪.২৫ | ২৬৯ | ৪.৫৮ | ম-২৭০ | ৪.৬৭ | ম-২৭১ | ৪.২৫ | ম-২৭২ | ৩.৮৩ | ম-২৭৩ | ৩.৫০ |
| ম-২৭৪ | ৪.০০ | ম-২৭৫ | ৩.৩৩ | ম-২৭৬ | ২.৩৩ | ম-২৭৭ | ২.৩৩ | ম-২৭৮ | ২.৫০ | ম-২৭৯ | ২.১৭ |
| ম-২৮০ | ৩.০৮ | ম-২৮১ | ২.৭৫ | ম-২৮২ | ১.৬৭ | ম-২৮৩ | ২.৮৩ | ম-২৮৬ | ৩.০০ | মোট: ২৫১ | |

## ৪.৩.২ ইবতিদায়ী শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষায় মানিকগঞ্জ জেলার অংশ গ্রহণকারী সকল মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ফলাফল ২০১৬

### ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৬

বিভাগ: ঢাকা জেলা: মানিকগঞ্জ উপজেলা: মানিকগঞ্জ সদর

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪.৬৭ | ২ | ৪.৭৫ | ৩ | ৪.৫০ | ৪ | ৪.০০ | ৫ | ৪.৬৭ | ৬ | ৩.৩৩ |
| ৭ | ৩.৭৫ | ৮ | ২.৮৩ | ম-৯ | ৪.৪২ | ম-১১ | ৪.৪২ | ম-১৩ | ৪.০৮ | ম-১৪ | ১.৮৩ |
| ম-১৫ | ৪.০০ | ম-১৬ | ৩.১৭ | ম-১৭ | ২.৫০ | ম-১৮ | ৩.১৭ | ম-১৯ | ১.১৭ | ২০ | ২.৬৭ |
| ২১ | ৩.৭৫ | ২২ | ৩.৫৮ | ২৩ | ২.৬৭ | ২৪ | ২.৮৩ | ২৫ | ৩.০০ | ২৭ | ২.০০ |
| ২৮ | ৩.১৭ | ২৯ | ২.৮৩ | ৩০ | ২.৮৩ | ৩১ | ২.৯২ | ৩২ | ৩.১৭ | ৩৩ | ৩.৩৩ |
| ৩৪ | ৩.০০ | ৩৫ | ২.৬৭ | ৩৭ | ২.৯২ | ম-৪৮ | ২.৮৩ | ম-৪৯ | ৩.০০ | ম-৫০ | ৩.০৮ |
| ম-৫১ | ৩.৩৩ | ম-৫২ | ৩.০০ | ম-৫৩ | ২.৭৫ | ম-৫৪ | ২.৮৩ | ম-৫৫ | ২.৯২ | ম-৫৬ | ২.৮৩ |
| ৫৮ | ২.৭৫ | ৫৯ | ১.৬৭ | ৬০ | ২.৬৭ | ৬১ | ২.৯২ | ৬৩ | ২.৩৩ | ৬৪ | ৩.২৫ |
| ৬৫ | ২.৩৩ | ম-৬৬ | ৩.২৫ | ম-৬৭ | ৩.৫৮ | ম-৬৮ | ৪.৮৩ | ম-৬৯ | ৪.৫০ | ম-৭০ | ৩.৪২ |
| ম-৭১ | ৩.১৭ | ম-৭২ | ৩.০০ | ম-৭৩ | ২.৮৩ | ম-৭৪ | ১.০০ | ম-৭৫ | ৪.৪২ | ম-৭৬ | ১.৮৩ |
| ম-৭৭ | ২.০৮ | ম-৭৮ | ২.০০ | ম-৭৯ | ১.০০ | ম-৮০ | ১.৬৭ | ৮১ | ৪.৩৩ | ম-৮৩ | ৩.৭৫ |
| ম-৮৪ | ৪.৬৭ | ম-৮৫ | ৪.৪২ | ম-৮৬ | ৪.৫০ | ম-৮৭ | ২.২৫ | ৮৮ | ৫.০০ | ৮৯ | ৪.৮৩ |
| ৯০ | ৩.৬৭ | ৯১ | ৪.৮৩ | ৯২ | ৪.৫০ | ৯৩ | ৪.৬৭ | ৯৪ | ৪.৪২ | ৯৫ | ৪.০৮ |
| ৯৬ | ৩.২৫ | ৯৮ | ৪.৩৩ | ৯৯ | ৩.৬৭ | ১০০ | ৩.৯২ | ১০১ | ৪.২৫ | ১০২ | ৩.০০ |
| ১০৩ | ৪.০৮ | ১০৪ | ২.৬৭ | ১০৫ | ৪.৮৩ | ১০৬ | ৩.৩৩ | ১০৮ | ৫.০০ | ১০৯ | ৪.৫৮ |
| ১১০ | ৪.০০ | ১১১ | ৪.১৭ | ১১২ | ৩.৫৮ | ১১৩ | ৩.৬৭ | ১১৪ | ৩.২৫ | ১১৫ | ৪.৫৮ |
| ১১৬ | ৫.০০ | ১১৭ | ৫.০০ | ১১৮ | ৪.২৫ | ১১৯ | ৪.০০ | ১২০ | ২.৯২ | ১২১ | ২.৪২ |
| ম-১২৩ | ৪.৬৭ | ম-১২৪ | ৫.০০ | ম-১২৫ | ৫.০০ | ম-১২৬ | ৪.৭৫ | ম-১২৭ | ৫.০০ | ম-১২৮ | ৩.৭৫ |
| ম-১২৯ | ৪.২৫ | ম-১৩০ | ৩.৫৮ | ম-১৩১ | ৩.৬৭ | ম-১৩২ | ৪.৩৩ | ম-১৩৪ | ৪.০০ | ম-১৩৫ | ২.১৭ |
| ১৩৭ | ৪.৭৫ | ১৩৮ | ৪.০০ | ১৩৯ | ৩.০৮ | ১৪০ | ৪.১৭ | ১৪১ | ৩.৮৩ | ১৪২ | ৪.১৭ |
| ১৪৩ | ৩.৭৫ | ১৪৪ | ৩.৯২ | ১৪৭ | ৩.৫০ | ১৪৯ | ৩.০০ | ১৫০ | ৪.০৮ | ১৫১ | ২.৫৮ |
| ১৫২ | ৩.০০ | ম-১৫৩ | ৪.৩৩ | ম-১৫৪ | ৩.০৮ | ম-১৫৫ | ২.৫০ | ম-১৫৬ | ৩.৫০ | ম-১৫৭ | ৪.৫০ |
| ম-১৫৮ | ৪.৫০ | ম-১৫৯ | ৩.৫৮ | ম-১৬০ | ৪.৩৩ | ম-১৬১ | ৪.১৭ | ম-১৬২ | ৩.৫০ | ম-১৬৪ | ৩.৭৫ |
| ম-১৬৫ | ৩.৯২ | ম-১৬৬ | ৩.০৮ | ম-১৬৭ | ৩.২৫ | ম-১৬৮ | ৩.০০ | ম-১৬৯ | ৪.১৭ | ম-১৭১ | ২.৫৮ |

মোট: ১৪৪

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৬

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: ঘিওর**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪.৫৮ | ২ | ৪.৫৮ | ৩ | ৪.৫৮ | ৪ | ৩.৭৫ | ৫ | ৪.৫৮ | ৬ | ২.৫০ |
| ৭ | ২.৭৫ | ম-৯ | ৪.৮৩ | ম-১০ | ৪.৮৩ | ম-১১ | ৪.২৫ | ম-১২ | ৪.৪২ | ম-১৩ | ৪.০৮ |
| ম-১৪ | ৪.০৮ | ম-১৫ | ৪.০০ | ম-১৬ | ৪.৩৩ | ম-১৭ | ৩.৭৫ | ১৮ | ৪.১৭ | ১৯ | ৪.২৫ |
| ২০ | ১.৯২ | ২১ | ২.৪২ | ২২ | ২.০০ | ২৩ | ২.২৫ | ২৪ | ২.২৫ | ২৭ | ২.৪২ |
| ২৮ | ২.৫০ | ম-৩৪ | ৩.১৭ | ম-৩৫ | ৩.১৭ | ম-৩৬ | ৩.৩৩ | ম-৩৭ | ৩.৩৩ | ম-৩৮ | ৩.২৫ |
| ম-৩৯ | ৩.২৫ | ম-৪০ | ৩.০০ | ম-৪১ | ২.৯২ | ম-৪২ | ২.৬৭ | ম-৪৩ | ২.৬৭ | ম-৪৪ | ২.৪২ |
| ম-৪৫ | ২.১৭ | ম-৪৭ | ১.৬৭ | মোট: ৩৮ | | | | | | | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৬

বিভাগ: ঢাকা    জেলা: মানিকগঞ্জ    উপজেলা: সিংগাইর

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২.৫০ | ২ | ৩.২৫ | ৩ | ২.৫০ | ৪ | ৩.০৮ | ৬ | ৩.২৫ | ৭ | ৩.৫৮ |
| ৮ | ২.৭৫ | ৯ | ২.৫০ | ১০ | ৩.০৮ | ১১ | ২.০৮ | ১২ | ৩.৭৫ | ম-১৪ | ৪.০০ |
| ম-১৫ | ৪.২৫ | ম-১৬ | ৩.৫৮ | ম-১৭ | ৩.৬৭ | ম-১৮ | ৩.২৫ | ম-১৯ | ২.৭৫ | ম-২০ | ২.৯২ |
| ম-২১ | ২.৭৫ | ম-২২ | ২.৭৫ | ম-২৩ | ৩.৫৮ | ম-২৪ | ২.০৮ | ম-২৫ | ২.১৭ | ম-২৬ | ২.২৫ |
| ম-২৭ | ৩.০০ | ম-২৮ | ২.৯২ | ম-২৯ | ২.৬৭ | ম-৩০ | ৩.৫০ | ৩১ | ৩.৩৩ | ৩২ | ২.৮৩ |
| ৩৩ | ২.৩৩ | ৩৪ | ৩.১৭ | ৩৫ | ২.১৭ | ম-৩৬ | ৫.০০ | ম-৩৭ | ৩.৫৮ | ম-৩৮ | ৫.০০ |
| ম-৩৯ | ৩.৯২ | ম-৪০ | ৪.৪২ | ম-৪১ | ২.৮৩ | ম-৪২ | ৩.০৮ | ম-৪৩ | ৩.০০ | ম-৪৪ | ৩.৩৩ |
| ম-৪৫ | ৩.৭৫ | ৪৬ | ৪.৬৭ | ৪৭ | ৫.০০ | ৪৮ | ৪.০০ | ৪৯ | ৩.২৫ | ৫০ | ২.৫০ |
| ৫১ | ৩.৩৩ | ৫২ | ১.৯২ | ৫৩ | ১.৪২ | ম-৬৪ | ৫.০০ | ম-৬৫ | ৫.০০ | ম-৬৬ | ৫.০০ |
| ম-৬৭ | ৫.০০ | ম-৬৮ | ৫.০০ | ম-৬৯ | ৪.২৫ | ম-৭১ | ৪.০৮ | ম-৭২ | ৪.০৮ | ম-৭৩ | ৪.৫০ |
| ম-৭৪ | ৪.৩৩ | ম-৭৫ | ৩.৫০ | ম-৭৬ | ৩.৮৩ | ম-৭৭ | ৩.৫৮ | ম-৭৮ | ৩.৭৫ | ম-৭৯ | ৩.০০ |
| ম-৮০ | ৩.২৫ | ম-৮১ | ৩.০৮ | ম-৮২ | ৩.০০ | ম-৮৩ | ২.৩৩ | ম-৮৪ | ২.৭৫ | ম-৮৫ | ২.২৫ |
| ম-৮৬ | ২.৪২ | ম-৮৭ | ২.৩৩ | ম-৮৮ | ২.০০ | ম-৮৯ | ২.২৫ | ম-৯১ | ২.২৫ | ম-৯২ | ১.৮৩ |
| ম-৯৪ | ২.০০ | ম-৯৬ | ১.৫০ | ম-৯৭ | ১.৮৩ | ম-৯৮ | ২.৫০ | ম-১০০ | ২.৬৭ | ম-১০১ | ২.২৫ |
| ম-১০২ | ২.০৮ | ম-১০৪ | ২.৯২ | ম-১০৫ | ২.৫৮ | ম-১০৭ | ৩.৬৭ | ম-১০৮ | ৩.৩৩ | ম-১০৯ | ৪.০০ |
| ম-১১০ | ৪.৪২ | ম-১১১ | ৩.০৮ | ম-১১২ | ৩.৬৭ | ম-১১৪ | ৪.০৮ | ম-১১৫ | ৪.০০ | ম-১১৬ | ৪.০৮ |
| ১১৮ | ৪.০৮ | ১১৯ | ৩.৫৮ | ১২০ | ৪.১৭ | ১২১ | ৩.০৮ | ১২২ | ২.৫৮ | ১২৩ | ১.৩৩ |
| ১২৪ | ৩.৫০ | ১২৫ | ৩.৫৮ | ১২৬ | ২.৫৮ | ১২৭ | ২.৫০ | ১২৮ | ২.৯২ | ১২৯ | ১.৫০ |
| ১৩০ | ৩.৩৩ | ১৩১ | ২.৪২ | ১৩২ | ২.৫০ | ১৩৪ | ১.১৭ | ১৩৫ | ৩.৪২ | ১৩৬ | ২.৯২ |
| ম-১৩৭ | ৪.৪২ | ম-১৩৮ | ৪.৫০ | ম-১৩৯ | ৪.০০ | ম-১৪০ | ৪.০০ | ম-১৪১ | ২.৭৫ | ম-১৪৩ | ৩.০০ |
| ম-১৪৪ | ১.৮৩ | ম-১৪৬ | ২.৫৮ | ম-১৪৭ | ২.৬৭ | ম-১৪৯ | ২.৯২ | ম-১৫০ | ১.৫০ | ম-১৫৩ | ২.০০ |
| ম-১৫৪ | ১.৫০ | ম-১৫৭ | ২.৪২ | ম-১৫৮ | ৩.৯২ | ম-১৬১ | ৫.০০ | ম-১৬২ | ৫.০০ | ম-১৬৩ | ৫.০০ |
| ম-১৬৪ | ৫.০০ | ম-১৬৫ | ৫.০০ | ম-১৬৬ | ৫.০০ | ম-১৬৭ | ৪.৬৭ | ম-১৬৮ | ৪.৭৫ | ১৬৯ | ২.৪২ |
| ১৭০ | ৩.১৭ | ১৭১ | ৩.১৭ | ১৭২ | ২.২৫ | ১৭৩ | ২.৩৩ | ১৭৪ | ১.৮৩ | ম-১৭৬ | ৪.৫৮ |
| ম-১৭৭ | ৪.৫৮ | ম-১৭৮ | ৪.২৫ | ম-১৭৯ | ৩.৫০ | ম-১৮০ | ৩.৫০ | ম-১৮১ | ২.৮৩ | ম-১৮২ | ২.৭৫ |
| ম-১৮৩ | ২.৭৫ | ম-১৮৪ | ২.৯২ | ম-১৮৫ | ২.৫৮ | ম-১৮৭ | ১.৫০ | ম-১৮৮ | ১.৯২ | ম-১৮৯ | ১.৮৩ |
| ম-১৯০ | ৪.৭৫ | ম-১৯১ | ৪.২৫ | ম-১৯২ | ২.১৭ | ম-১৯৩ | ২.৫০ | ১৯৪ | ২.৭৫ | ১৯৫ | ৩.০০ |
| ১৯৬ | ২.৮৩ | ১৯৭ | ৪.৫৮ | ১৯৯ | ৩.৫৮ | ম-২০০ | ৪.১৭ | ম-২০১ | ৪.১৭ | ম-২০২ | ৪.১৭ |
| ম-২০৩ | ৩.৫০ | ম-২০৪ | ৩.১৭ | ম-২০৫ | ২.৩৩ | ম-২০৬ | ৩.১৭ | ম-২০৭ | ৩.৫৮ | ম-২০৮ | ৩.৪২ |
| ম-২০৯ | ২.৩৩ | ম-২১০ | ৩.০৮ | ম-২১১ | ১.৮৩ | ম-২১২ | ২.৩৩ | ম-২১৩ | ২.৯২ | ম-২১৪ | ২.৪২ |
| ম-২১৫ | ২.৫০ | ম-২১৮ | ১.৩৩ | ২২১ | ৪.০৮ | ২২২ | ২.৫০ | ২২৩ | ২.৫০ | ২২৪ | ২.৭৫ |
| ২২৫ | ২.৪২ | ২২৬ | ১.৬৭ | ২২৭ | ২.০০ | ২২৮ | ২.৫৮ | ২৩০ | ২.৩৩ | ২৩১ | ২.১৭ |
| ২৩২ | ১.৬৭ | ম-২৩৪ | ৩.৮৩ | ম-২৩৫ | ৪.৩৩ | ম-২৩৬ | ৩.৪২ | ম-২৩৭ | ৩.০৮ | ম-২৩৮ | ৩.১৭ |
| ম-২৩৯ | ২.২৫ | ম-২৪০ | ২.৫০ | ম-২৪১ | ২.০০ | ম-২৪২ | ২.৭৫ | ম-২৪৩ | ১.০০ | ম-২৪৪ | ১.১৭ |
| ম-২৪৫ | ১.৩৩ | ম-২৪৬ | ১.৩৩ | ম-২৪৭ | ৩.১৭ | ম-২৪৮ | ২.৬৭ | ম-২৪৯ | ২.৪২ | ম-২৫২ | ১.৩৩ |
| ম-২৫৩ | ২.৫০ | ম-২৫৫ | ২.৫৮ | ম-২৫৭ | ১.৫৮ | ম-২৫৮ | ২.১৭ | মোট: ২১৪ | | | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৬

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: সাটুরিয়া**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ম-৫ | ৩.৯২ | ম-৬ | ৩.৫৮ | ম-৭ | ৩.১৭ | ম-৯ | ২.৬৭ | ম-১০ | ৩.৪২ | ম-১২ | ১.৯২ |
| ম-১৩ | ২.০৮ | ম-১৫ | ২.০৮ | ম-১৬ | ২.৬৭ | ম-১৭ | ২.২৫ | ২০ | ৩.৩৩ | ২১ | ৩.৭৫ |
| ২২ | ৪.১৭ | ২৩ | ২.৬৭ | ২৪ | ৩.৫৮ | ২৫ | ৩.২৫ | ২৬ | ২.৫০ | ২৭ | ৪.০০ |
| ২৮ | ২.৭৫ | ম-৩০ | ৩.৭৫ | ম-৩১ | ৪.৫০ | ম-৩২ | ৪.২৫ | ম-৩৩ | ২.৬৭ | ম-৩৪ | ৪.৫৮ |
| ম-৩৫ | ৪.৬৭ | ম-৩৬ | ২.২৫ | ম-৩৮ | ৩.৩৩ | ম-৩৯ | ৩.৫৮ | ম-৪০ | ৩.২৫ | ম-৪১ | ৪.০৮ |
| ম-৪২ | ৩.৬৭ | ম-৪৩ | ৩.৬৭ | ম-৪৪ | ১.১৭ | ম-৪৫ | ২.৫৮ | ম-৪৬ | ২.৪২ | ম-৪৭ | ৩.০০ |
| ম-৪৮ | ১.৫০ | ৪৯ | ৪.৩৩ | ৫০ | ৪.১৭ | ৫১ | ৪.৪২ | ৫২ | ৪.২৫ | ৫৩ | ৩.৬৭ |
| ৫৪ | ৩.৪২ | ম-৫৫ | ৩.৪২ | ম-৫৬ | ৪.৩৩ | ম-৫৭ | ৪.৪২ | ম-৫৮ | ৩.৫৮ | ম-৫৯ | ৩.২৫ |
| ম-৬০ | ২.৪২ | ম-৬১ | ২.৮৩ | ম-৬২ | ২.৩৩ | ম-৬৩ | ২.৮৩ | ম-৬৪ | ৩.৬৭ | ম-৬৫ | ৪.১৭ |
| ম-৬৬ | ৩.০৮ | ম-৬৭ | ১.৯২ | ম-৬৮ | ২.৯২ | ম-৭০ | ১.১৭ | ম-৭১ | ৩.২৫ | ৭৫ | ২.০৮ |
| ৭৬ | ২.৩৩ | ৭৭ | ১.৭৫ | ৭৯ | ২.২৫ | ৮১ | ১.১৭ | ৮৩ | ১.৬৭ | ৮৪ | ৩.৯২ |
| ৮৫ | ৩.৮৩ | ৮৬ | ৪.৫৮ | ৮৭ | ৩.৩৩ | ৮৮ | ৪.১৭ | ৮৯ | ৪.৪২ | ৯০ | ৪.৫৮ |
| ৯১ | ৪.১৭ | ম-৯২ | ২.৮৩ | ম-৯৩ | ৩.৮৩ | ম-৯৪ | ২.৬৭ | ম-৯৫ | ৩.০০ | ম-৯৬ | ৩.৫৮ |
| ম-৯৭ | ২.৭৫ | ম-৯৮ | ২.৮৩ | ম-৯৯ | ৩.৫৮ | ম-১০০ | ৩.০৮ | ম-১০১ | ২.৪২ | ম-১০২ | ২.৪২ |
| ম-১০৩ | ৪.২৫ | ম-১০৪ | ৩.০০ | ম-১০৫ | ২.২৫ | ম-১০৭ | ৩.০৮ | ম-১০৯ | ৫.০০ | ম-১১০ | ৪.৬৭ |
| ম-১১১ | ৫.০০ | ম-১১২ | ৪.৬৭ | ম-১১৩ | ৪.৭৫ | ম-১১৪ | ৪.৮৩ | মোট: ৯৪ | | | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৬

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: হরিরামপুর**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১.৩৩ | ৪ | ২.১৭ | ৬ | ২.০০ | ৭ | ৪.৮৩ | ৯ | ২.৩৩ | ১০ | ১.৮৩ |
| ম-১১ | ১.৩৩ | ম-১৩ | ১.৫০ | ম-১৪ | ৪.৮৩ | ম-১৫ | ৫.০০ | ম-১৬ | ৪.২৫ | ম-১৭ | ৩.৬৭ |
| ম-১৮ | ৪.২৫ | ম-১৯ | ৩.৯২ | ম-২০ | ৩.৮৩ | ম-২১ | ৩.৬৭ | ম-২২ | ৩.৮৩ | ২৪ | ১.৯২ |
| ২৫ | ১.৪২ | ২৬ | ২.০৮ | ২৭ | ১.৯২ | মোট: ২১ | | | | | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৬

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: শিবালয়**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০ | ৩.০৮ | ১১ | ৩.১৭ | ১২ | ৩.০০ | ১৩ | ২.১৭ | ১৪ | ১.৭৫ | ১৫ | ১.৭৫ |
| ১৬ | ১.৬৭ | ১৭ | ১.৬৭ | ১৮ | ১.৬৭ | ১৯ | ২.৩৩ | ২০ | ২.১৭ | ২১ | ১.৩৩ |
| ২২ | ১.১৭ | ২৩ | ৩.৪২ | ২৫ | ৪.০৮ | ২৬ | ৩.৪২ | ২৭ | ৩.০৮ | ৩০ | ৩.১৭ |
| ৩৪ | ২.৫৮ | ৩৫ | ২.৩৩ | ম-৩৬ | ২.১৭ | ম-৩৮ | ২.১৭ | ম-৩৯ | ১.৮৩ | ম-৪০ | ১.৬৭ |
| ৪৪ | ২.০৮ | ৪৫ | ১.৮৩ | ৪৭ | ২.৯২ | ৪৮ | ২.৬৭ | ৪৯ | ১.৯২ | ম-৫১ | ২.২৫ |
| ম-৫২ | ২.৬৭ | ম-৫৩ | ৩.০৮ | ম-৫৪ | ২.৫৮ | ম-৫৫ | ২.৮৩ | মোট: ৩৪ | | | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৬

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: দৌলতপুর**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১.৯২ | ২ | ৩.১৭ | ৩ | ৩.৪২ | ৪ | ৩.০৮ | ম-৬ | ২.৫০ | ৭ | ৪.৪২ |
| ৮ | ৪.০৮ | ৯ | ৪.৭৫ | ১০ | ৪.৪২ | ১১ | ৪.০০ | ১২ | ৩.৬৭ | ১৩ | ৪.৫০ |
| ১৪ | ৪.৬৭ | ১৫ | ৪.৪২ | ১৬ | ৪.০০ | ১৭ | ৩.৫০ | ১৮ | ৩.৫৮ | ১৯ | ৩.৫৮ |
| ২০ | ৪.৪২ | ২২ | ৪.৪২ | ২৩ | ৩.৫০ | ২৪ | ৩.২৫ | ২৫ | ৩.৫৮ | ২৬ | ৩.৯২ |
| ২৭ | ৪.০০ | ২৮ | ৩.৫০ | ২৯ | ৪.৩৩ | ৩০ | ৩.৭৫ | ৩১ | ৩.৩৩ | ৩২ | ৩.৭৫ |
| ৩৩ | ৩.২৫ | ৩৪ | ৩.০৮ | ৩৫ | ৩.৯২ | ৩৭ | ৪.০৮ | ৪১ | ৩.৮৩ | ৪৪ | ৩.৬৭ |
| ৪৫ | ৩.০০ | ৪৬ | ৩.৭৫ | ৪৮ | ৪.৪২ | ৫১ | ৩.৯২ | ৫৩ | ৩.২৫ | ৫৪ | ৩.৮৩ |
| ৫৫ | ৪.৩৩ | ৫৬ | ৩.৫৮ | ৫৭ | ৩.৭৫ | ৫৯ | ৪.১৭ | ৬১ | ৪.২৫ | ৬৩ | ৩.৫৮ |
| ৬৫ | ৪.০৮ | ৬৬ | ৩.৫৮ | ৬৭ | ৪.১৭ | ৬৮ | ৩.৭৫ | ৬৯ | ৩.৫৮ | ৭১ | ৪.৩৩ |
| ৭২ | ৩.৬৭ | ৭৫ | ৪.৫০ | ৭৬ | ৩.৫০ | ৭৭ | ৩.৪২ | ৭৯ | ৪.৫০ | ম-৮০ | ৪.৬৭ |
| ম-৮১ | ৪.৫০ | ম-৮২ | ৪.৬৭ | ম-৮৩ | ৪.০০ | ম-৮৪ | ৪.২৫ | ম-৮৫ | ৪.১৭ | ম-৮৬ | ৪.১৭ |
| ম-৮৭ | ৪.০৮ | ম-৮৮ | ৪.০০ | ম-৮৯ | ৩.৮৩ | ম-৯০ | ৪.০০ | ম-৯১ | ৪.০৮ | ম-৯২ | ৩.৪২ |
| ম-৯৪ | ৩.৬৭ | ম-৯৫ | ৩.৭৫ | ম-৯৬ | ৩.৫০ | ম-৯৭ | ৩.৯২ | ম-৯৮ | ৪.২৫ | ম-৯৯ | ৩.৮৩ |
| ম-১০০ | ৩.৪২ | ম-১০১ | ৩.২৫ | ম-১০২ | ৩.৩৩ | ম-১০৩ | ৩.৭৫ | ম-১০৪ | ৪.৪২ | ম-১০৫ | ৩.৩৩ |
| ম-১০৬ | ৪.৩৩ | ম-১০৭ | ৪.৩৩ | ম-১০৮ | ২.৮৩ | ম-১১০ | ৪.৮৩ | ম-১১১ | ৪.০৮ | ম-১১৩ | ৪.২৫ |
| ম-১১৪ | ২.৯২ | ম-১১৫ | ৩.২৫ | ম-১১৬ | ৩.৩৩ | ম-১১৭ | ৩.৭৫ | ম-১১৮ | ৩.৫০ | ম-১১৯ | ৩.১৭ |
| ম-১২০ | ৩.৮৩ | ম-১২৩ | ২.৬৭ | ম-১২৪ | ৩.৩৩ | ম-১২৬ | ৩.৫০ | ম-১২৭ | ৩.৬৭ | ম-১২৮ | ২.৩৩ |
| ম-১২৯ | ৩.৫৮ | ম-১৩০ | ৩.৭৫ | ম-১৩১ | ৩.৪২ | ম-১৩২ | ২.৫৮ | ম-১৩৩ | ৪.৮৩ | ম-১৩৪ | ৪.০০ |
| ম-১৩৫ | ৪.৭৫ | ম-১৩৬ | ৪.২৫ | ম-১৩৭ | ৩.৫০ | ম-১৩৮ | ৪.৫০ | ম-১৩৯ | ২.৮৩ | ১৪০ | ৪.৮৩ |
| ১৪১ | ৪.৬৭ | ১৪২ | ৪.৪২ | ১৪৩ | ৪.০০ | ১৪৪ | ৪.৫৮ | ১৪৫ | ৪.৬৭ | ১৪৬ | ৪.৩৩ |
| ১৪৭ | ৪.৪২ | ১৪৮ | ৪.৫০ | ১৪৯ | ৪.৬৭ | ১৫০ | ৪.০৮ | ১৫২ | ৩.৫০ | ১৫৩ | ৪.২৫ |
| ১৫৪ | ২.০০ | ১৫৫ | ৪.৭৫ | ১৫৬ | ৩.৬৭ | ১৫৭ | ২.৫০ | ১৫৮ | ৩.৪২ | ১৫৯ | ৪.৬৭ |
| ১৬১ | ৪.৭৫ | ১৬২ | ৪.৪২ | ১৬৫ | ৪.২৫ | ১৬৬ | ৪.১৭ | ১৬৭ | ৪.১৭ | ১৬৮ | ৪.০৮ |
| ১৬৯ | ৪.৫০ | ১৭০ | ১.৯২ | ১৭১ | ৩.৭৫ | ১৭২ | ৩.১৭ | ১৭৩ | ৪.০০ | ১৭৪ | ৪.৮৩ |
| ১৭৫ | ৪.৩৩ | ১৭৬ | ৪.২৫ | ১৭৮ | ৩.১৭ | ১৭৯ | ৪.৪২ | ১৮০ | ৪.০০ | ১৮১ | ৪.৬৭ |
| ১৮২ | ৩.৭৫ | ১৮৩ | ৪.৮৩ | ১৮৫ | ৪.৫৮ | ১৮৬ | ৪.৪২ | ১৯০ | ৩.৫৮ | ম-১৯২ | ৫.০০ |
| ম-১৯৩ | ৪.৫৮ | ম-১৯৪ | ৪.৮৩ | ম-১৯৫ | ৫.০০ | ম-১৯৬ | ৪.৫৮ | ম-১৯৭ | ৪.৬৭ | ম-১৯৮ | ৪.৫০ |
| ম-১৯৯ | ৪.০৮ | ম-২০০ | ৪.২৫ | ম-২০৩ | ৪.৬৭ | ম-২০৪ | ৪.৬৭ | ম-২০৫ | ৫.০০ | ম-২০৬ | ৪.৭৫ |
| ম-২০৭ | ৪.৪২ | ম-২০৯ | ৩.৩৩ | ম-২১১ | ২.৬৭ | ম-২১২ | ৪.০৮ | ম-২১৩ | ৪.০০ | ম-২১৪ | ৪.৮৩ |
| ম-২১৫ | ৪.২৫ | ম-২১৬ | ২.৫০ | ম-২১৮ | ৪.৫৮ | ম-২১৯ | ৪.৬৭ | ম-২২০ | ৪.৫৮ | ম-২২১ | ৫.০০ |
| ম-২২২ | ৪.৫০ | ম-২২৩ | ৪.৫০ | ম-২২৪ | ৪.৫৮ | ম-২২৫ | ২.১৭ | ম-২২৬ | ৪.৪২ | ম-২২৭ | ৪.১৭ |
| ম-২২৮ | ৫.০০ | ম-২২৯ | ২.৩৩ | ম-২৩০ | ৪.৬৭ | ম-২৩১ | ৪.৮৩ | ম-২৩৩ | ৪.০০ | ম-২৩৪ | ৪.১৭ |
| ম-২৩৬ | ৪.০৮ | ম-২৩৭ | ৩.৭৫ | ২৩৮ | ৪.০৮ | ২৩৯ | ৩.৯২ | ২৪০ | ৩.৬৭ | ২৪১ | ৩.৬৭ |
| ২৪২ | ৩.৪২ | ২৪৩ | ৪.২৫ | ২৪৫ | ৩.৭৫ | ২৪৬ | ৩.৬৭ | ২৪৭ | ৩.৪২ | ২৪৮ | ৩.৩৩ |
| ২৪৯ | ৩.১৭ | ২৫০ | ৩.৪২ | ২৫১ | ৪.৩৩ | ২৫৩ | ৪.৫৮ | ২৫৪ | ৪.০৮ | ২৫৫ | ৪.৪২ |
| ২৫৬ | ৪.০০ | ২৫৭ | ৪.৩৩ | ম-২৫৮ | ৪.৫০ | ম-২৫৯ | ৪.৫৮ | ম-২৬০ | ৪.৪২ | ম-২৬১ | ৪.২৫ |
| ম-২৬২ | ৩.৯২ | ম-২৬৩ | ৪.৪২ | ম-২৬৪ | ৩.৬৭ | ম-২৬৫ | ৪.৫০ | ম-২৬৬ | ৩.৫৮ | মোট: ২২১ | |

৪.৩.৩ ইবতিদায়ী শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষায় মানিকগঞ্জ জেলার অংশ গ্রহণকারী সকল মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ফলাফল ২০১৭

## ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৭

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: মানিকগঞ্জ সদর**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩.৪২ | ২ | ৩.৩৩ | ৩ | ৩.৩৩ | ৪ | ৩.২৫ | ৫ | ৩.১৭ | ৬ | ৩.২৫ |
| ৭ | ৩.৪২ | ৮ | ৩.০০ | ৯ | ২.৮৩ | ১০ | ২.৮৩ | ১১ | ২.৯২ | ১২ | ২.৫০ |
| ১৪ | ৩.৫০ | ১৫ | ২.৪২ | ১৭ | ১.৫০ | ম-১৮ | ৪.৩৩ | ম-১৯ | ৪.০৮ | ম-২০ | ৩.১৭ |
| ম-২১ | ৩.৭৫ | ম-২২ | ২.২৫ | ম-২৩ | ৩.০০ | ম-২৪ | ৩.২৫ | ম-২৫ | ৩.৩৩ | ম-২৬ | ৩.৭৫ |
| ম-২৮ | ২.৭৫ | ম-৩০ | ৩.২৫ | ম-৩১ | ২.৯২ | ম-৩২ | ৩.০০ | ম-৩৩ | ৩.০০ | ম-৩৬ | ৩.৯২ |
| ৩৭ | ৩.৫৮ | ৩৮ | ৪.০০ | ৩৯ | ৩.৮৩ | ৪০ | ৩.৫৮ | ৪২ | ৩.০৮ | ৪৩ | ২.৫৮ |
| ৪৪ | ২.৫০ | ৪৫ | ২.৩৩ | ম-৪৭ | ৩.৫৮ | ম-৪৮ | ৩.৩৩ | ম-৪৯ | ৩.১৭ | ম-৫০ | ২.৮৩ |
| ম-৫১ | ৩.০৮ | ম-৫৩ | ৪.৬৭ | ম-৫৪ | ৪.০০ | ম-৫৫ | ৩.১৭ | ম-৫৬ | ৩.৪২ | ম-৫৭ | ২.৮৩ |
| ম-৫৮ | ৩.২৫ | ম-৫৯ | ২.৮৩ | ম-৬১ | ৩.২৫ | ম-৬২ | ২.৮৩ | ৬৩ | ৩.০৮ | ৬৪ | ২.৫০ |
| ৬৬ | ৩.৮৩ | ৬৭ | ৩.০৮ | ৬৮ | ২.৫০ | ৬৯ | ২.৬৭ | ৭০ | ৪.০০ | ৭২ | ৩.১৭ |
| ম-৭৩ | ৪.৪২ | ম-৭৪ | ৩.০৮ | ম-৭৫ | ৪.০৮ | ম-৭৬ | ৪.০০ | ম-৭৭ | ৩.০০ | ম-৭৮ | ৩.১৭ |
| ম-৭৯ | ৩.০০ | ম-৮০ | ২.২৫ | ম-৮১ | ৩.৮৩ | ম-৮২ | ২.৪২ | ম-৮৩ | ৩.৯২ | ম-৮৪ | ২.৮৩ |
| ম-৮৫ | ২.৮৩ | ম-৮৬ | ১.৯২ | ৮৭ | ৪.৮৩ | ৮৮ | ৪.৩৩ | ৮৯ | ৪.৬৭ | ৯০ | ৪.৬৭ |
| ৯১ | ৪.৬৭ | ৯২ | ৪.৩৩ | ৯৩ | ৩.৩৩ | ৯৪ | ৪.০৮ | ৯৫ | ৪.৬৭ | ম-৯৬ | ৪.৮৩ |
| ম-৯৭ | ৪.৮৩ | ম-৯৮ | ৪.৮৩ | ম-৯৯ | ৪.৬৭ | ম-১০১ | ৪.৫৮ | ১০২ | ৫.০০ | ১০৩ | ৫.০০ |
| ১০৪ | ৫.০০ | ১০৫ | ৪.৫০ | ১০৬ | ৪.৮৩ | ১০৭ | ৪.৫০ | ১০৮ | ৪.৪২ | ১০৯ | ৪.০০ |
| ১১০ | ৪.০০ | ১১১ | ৪.৬৭ | ১১২ | ৪.০৮ | ১১৩ | ৪.২৫ | ১১৪ | ২.৮৩ | ১১৫ | ২.৮৩ |
| ১১৬ | ৩.৭৫ | ১১৭ | ৩.৬৭ | ১১৮ | ৪.৩৩ | ১২০ | ৪.৫৮ | ১২১ | ২.৫০ | ম-১২২ | ৫.০০ |
| ম-১২৩ | ৫.০০ | ম-১২৪ | ৪.৮৩ | ম-১২৫ | ৪.৮৩ | ম-১২৬ | ৫.০০ | ম-১২৭ | ৪.৮৩ | ম-১২৮ | ৪.৮৩ |
| ম-১২৯ | ৪.৫০ | ম-১৩০ | ৪.৬৭ | ম-১৩১ | ৪.৩৩ | ম-১৩২ | ৪.১৭ | ম-১৩৩ | ৪.০০ | ম-১৩৪ | ৪.৫০ |
| ম-১৩৫ | ৪.৫৮ | ১৩৬ | ৪.৬৭ | ১৩৮ | ৩.৪২ | ১৩৯ | ৪.০০ | ১৪০ | ৩.৮৩ | ১৪১ | ৩.৪২ |
| ১৪২ | ২.৬৭ | ১৪৩ | ২.৪২ | ১৪৪ | ৩.১৭ | ১৪৫ | ১.৭৫ | ১৪৬ | ১.৫০ | ম-১৫০ | ৪.৫৮ |
| ম-১৫১ | ৪.৫৮ | ম-১৫২ | ৪.১৭ | ম-১৫৩ | ৩.৪২ | ম-১৫৪ | ৩.৭৫ | ম-১৫৫ | ৪.৩৩ | ম-১৫৬ | ৪.৩৩ |
| ম-১৫৮ | ২.৩৩ | ম-১৫৯ | ৩.৩৩ | ম-১৬০ | ২.৪২ | ম-১৬১ | ৪.০০ | ম-১৬৪ | ২.০৮ | ম-১৬৫ | ২.১৭ |
| ম-১৬৬ | ৩.৫০ | ম-১৬৭ | ৪.৮৩ | ম-১৬৯ | ৪.০০ | ম-১৭২ | ৪.১৭ | ম-১৭৩ | ৩.৭৫ | ম-১৭৪ | ২.৫০ |

মোট: ১৫০

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৭

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: ঘিওর**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪.৮৩ | ২ | ৪.৮৩ | ৩ | ৪.৬৭ | ৪ | ৩.৮৩ | ৫ | ২.৪২ | ৬ | ২.১৭ |
| ৭ | ১.৫০ | ম-৮ | ৫.০০ | ম-৯ | ৫.০০ | ম-১০ | ৪.৮৩ | ম-১১ | ৪.৩৩ | ম-১২ | ৪.৩৩ |
| ম-১৩ | ৩.৯২ | ম-১৪ | ৩.৫০ | ম-১৫ | ২.৯২ | ম-১৬ | ২.৬৭ | ম-১৭ | ৩.১৭ | ম-১৮ | ১.৫০ |
| ম-১৯ | ২.৩৩ | ম-২০ | ২.৪২ | ম-২১ | ৩.১৭ | ম-২২ | ২.০৮ | ম-২৩ | ২.২৫ | ২৪ | ৩.১৭ |
| ২৫ | ২.৪২ | ২৬ | ১.৫০ | ২৭ | ১.৫০ | ২৮ | ১.৫০ | ম-৩২ | ৩.৩৩ | ম-৩৩ | ৩.৯২ |
| ম-৩৪ | ৩.১৭ | ম-৩৫ | ১.৯২ | ম-৩৬ | ১.৬৭ | ম-৩৭ | ২.২৫ | ম-৩৯ | ৩.৪২ | ম-৪০ | ২.০০ |
| ম-৪১ | ৩.০৮ | ম-৪২ | ২.৫০ | ম-৪৩ | ২.০৮ | ম-৪৪ | ২.৮৩ | ম-৪৫ | ২.১৭ | ম-৪৬ | ২.৬৭ |
| ম-৪৭ | ২.২৫ | ম-৪৮ | ২.০০ | ম-৪৯ | ১.৮৩ | ম-৫০ | ৩.৩৩ | ম-৫১ | ২.১৭ | মোট: ৪৭ | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৭

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: সিংগাইর**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২.০০ | ২ | ২.৩৩ | ৩ | ২.১৭ | ৪ | ১.৭৫ | ৫ | ৩.১৭ | ৬ | ২.২৫ |
| ৭ | ৩.৪২ | ৮ | ২.৯২ | ১৩ | ১.৩৩ | ১৬ | ২.৪২ | ১৭ | ৩.১৭ | ম-১৮ | ২.৫৮ |
| ম-১৯ | ৩.৭৫ | ম-২০ | ৩.৭৫ | ম-২১ | ৩.৮৩ | ম-২২ | ২.৫৮ | ম-২৩ | ২.৫০ | ম-২৪ | ২.০৮ |
| ম-২৫ | ২.২৫ | ম-২৬ | ৩.৭৫ | ম-২৭ | ৩.৭৫ | ম-২৮ | ২.৩৩ | ম-২৯ | ২.৫৮ | ৩১ | ২.৭৫ |
| ৩২ | ২.৭৫ | ম-৩৩ | ২.৮৩ | ম-৩৪ | ৩.১৭ | ম-৩৫ | ৩.১৭ | ম-৩৬ | ২.৫৮ | ম-৩৭ | ২.৪২ |
| ম-৩৮ | ৩.৭৫ | ম-৩৯ | ৩.১৭ | ম-৪০ | ২.০৮ | ম-৪১ | ২.৭৫ | ম-৪২ | ১.৬৭ | ম-৪৩ | ৩.০৮ |
| ৪৫ | ৫.০০ | ৪৬ | ৪.৮৩ | ৪৭ | ৪.৩৩ | ৪৮ | ৪.৩৩ | ৪৯ | ৩.৫৮ | ৫০ | ৩.৫০ |
| ৫১ | ২.৬৭ | ৫২ | ৪.২৫ | ৫৩ | ৩.০৮ | ৫৪ | ৩.২৫ | ৫৬ | ২.৮৩ | ৬০ | ২.৫৮ |
| ৬১ | ১.৯২ | ম-৬৪ | ৪.৬৭ | ম-৬৫ | ৪.৮৩ | ম-৬৬ | ৪.৮৩ | ম-৬৭ | ৪.৫৮ | ম-৬৮ | ৩.৮৩ |
| ম-৭০ | ৩.০৮ | ম-৭১ | ৩.২৫ | ম-৭২ | ৪.৮৩ | ম-৭৩ | ৩.৫০ | ম-৭৪ | ৩.৪২ | ম-৭৫ | ২.০০ |
| ম-৭৭ | ২.৩৩ | ম-৭৮ | ২.১৭ | ম-৭৯ | ২.১৭ | ম-৮০ | ২.০০ | ম-৮১ | ২.১৭ | ম-৮২ | ২.৫০ |
| ম-৮৩ | ২.১৭ | ম-৮৬ | ২.১৭ | ম-৯১ | ১.০০ | ম-৯৫ | ১.১৭ | ম-৯৭ | ২.৪২ | ম-১০০ | ৪.৪২ |
| ম-১০১ | ৩.৯২ | ম-১০২ | ২.৪২ | ম-১০৩ | ৪.৪২ | ম-১০৬ | ৪.১৭ | ম-১০৮ | ৪.৮৩ | ম-১০৯ | ৫.০০ |
| ম-১১০ | ৫.০০ | ম-১১১ | ৫.০০ | ম-১১২ | ৫.০০ | ম-১১৩ | ৫.০০ | ম-১১৪ | ৪.৪২ | ম-১১৫ | ৪.৭৫ |
| ম-১১৬ | ৪.৭৫ | ম-১১৭ | ৪.৭৫ | ম-১১৮ | ৪.৮৩ | ম-১১৯ | ৪.৫০ | ম-১২০ | ৪.০৮ | ম-১২১ | ৪.৬৭ |
| ম-১২২ | ৪.৩৩ | ম-১২৩ | ৪.১৭ | ম-১২৪ | ৪.৫০ | ম-১২৫ | ৩.৬৭ | ম-১২৬ | ৩.০৮ | ম-১২৭ | ৩.২৫ |
| ম-১৪১ | ২.৩৩ | ম-১৪২ | ৩.০০ | ১৪৮ | ২.১৭ | ১৫৫ | ২.১৭ | ১৫৬ | ১.৮৩ | ১৬০ | ১.৯২ |
| ম-১৬২ | ৪.৩৩ | ম-১৬৩ | ৪.২৫ | ম-১৬৪ | ৩.২৫ | ম-১৬৫ | ৩.০০ | ম-১৬৬ | ২.৫০ | ম-১৬৭ | ৩.১৭ |
| ম-১৬৮ | ৩.১৭ | ম-১৬৯ | ২.৬৭ | ম-১৭০ | ২.৫৮ | ম-১৭৩ | ২.৪২ | ম-১৭৪ | ২.০৮ | ম-১৭৫ | ১.৩৩ |
| ম-১৭৬ | ১.১৭ | ম-১৭৭ | ২.১৭ | ম-১৭৮ | ১.৫৮ | ম-১৮৪ | ২.৬৭ | ১৯৭ | ২.৩৩ | ১৯৯ | ২.৮৩ |
| ২০০ | ২.৪২ | ২০৩ | ২.৩৩ | ২০৭ | ২.৮৩ | ম-২০৮ | ৩.৬৭ | ম-২০৯ | ৩.০৮ | ম-২১০ | ২.৭৫ |
| ম-২১১ | ২.৬৭ | ম-২১২ | ২.৫৮ | ম-২১৩ | ২.০৮ | ম-২১৪ | ১.৫০ | ম-২১৬ | ২.৩৩ | ২২৮ | ৩.১৭ |
| ২২৯ | ২.৯২ | ২৩০ | ৩.২৫ | ২৩১ | ৩.৫০ | ২৩২ | ৩.২৫ | ২৩৩ | ৩.৩৩ | ২৩৪ | ২.৫০ |
| ২৩৭ | ১.৯২ | ২৪২ | ২.৬৭ | ম-২৪৯ | ৩.২৫ | ম-২৫০ | ৩.৩৩ | ম-২৬২ | ৩.০৮ | ম-২৬৩ | ২.২৫ |
| ম-২৬৪ | ২.৭৫ | ম-২৬৬ | ৫.০০ | ম-২৬৯ | ২.২৫ | ম-২৭৩ | ২.৩৩ | মোট: ১৪৮ | | | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৭

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: সাটুরিয়া**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩.১৭ | ২ | ২.৬৭ | ৩ | ২.১৭ | ৪ | ১.৬৭ | ৫ | ৩.২৫ | ৬ | ২.৭৫ |
| ৭ | ২.৯২ | ম-৮ | ২.০০ | ম-৯ | ২.১৭ | ম-১০ | ১.৯২ | ১১ | ৩.৬৭ | ১২ | ৫.০০ |
| ১৩ | ৪.৫০ | ১৫ | ৩.৫৮ | ১৬ | ৩.৪২ | ১৭ | ২.৫৮ | ১৮ | ৪.৫৮ | ১৯ | ৪.০০ |
| ২০ | ৪.০০ | ২১ | ৩.৯২ | ২২ | ৩.৯২ | ম-২৩ | ৪.৬৭ | ম-২৪ | ৪.২৫ | ম-২৫ | ৩.১৭ |
| ম-২৬ | ৪.১৭ | ম-২৮ | ৪.১৭ | ম-২৯ | ৩.৫০ | ম-৩০ | ৩.৬৭ | ম-৩১ | ৪.১৭ | ম-৩২ | ৩.৭৫ |
| ম-৩৩ | ৩.৫০ | ম-৩৪ | ৪.১৭ | ম-৩৫ | ৩.৭৫ | ম-৩৬ | ৩.১৭ | ৩৭ | ৩.১৭ | ৩৮ | ৪.৫৮ |
| ৩৯ | ৩.৯২ | ৪০ | ৪.৫০ | ৪১ | ৪.০৮ | ৪২ | ৩.৫০ | ৪৩ | ৩.৫৮ | ৪৪ | ২.৫০ |
| ৪৫ | ১.৮৩ | ৪৬ | ৩.০০ | ম-৪৮ | ২.০৮ | ম-৪৯ | ২.২৫ | ম-৫০ | ২.৩৩ | ৫২ | ৪.২৫ |
| ৫৩ | ৩.২৫ | ৫৪ | ২.৯২ | ৫৫ | ৩.৫০ | ৫৬ | ৩.১৭ | ৫৭ | ৩.৩৩ | ৫৮ | ১.৮৩ |
| ৫৯ | ২.৬৭ | ৬০ | ২.৭৫ | ৬১ | ৩.৪২ | ৬২ | ২.৬৭ | ৬৩ | ২.৫০ | ৬৫ | ৩.৭৫ |
| ৬৬ | ৪.৭৫ | ৬৭ | ৩.৮৩ | ৬৮ | ৫.০০ | ৬৯ | ৪.৮৩ | ৭০ | ৫.০০ | ৭২ | ৪.৮৩ |
| ম-৭৩ | ৪.১৭ | ম-৭৪ | ৩.০৮ | ম-৭৫ | ২.৯২ | ম-৭৬ | ১.৮৩ | ম-৭৭ | ২.১৭ | ম-৭৮ | ২.৪২ |
| ম-৭৯ | ২.০৮ | ম-৮০ | ২.১৭ | ম-৮১ | ৩.৩৩ | ম-৮৪ | ৩.৫৮ | ম-৮৫ | ৪.৩৩ | ম-৮৬ | ৪.০০ |
| ম-৮৭ | ৩.৫০ | ম-৮৮ | ২.৮৩ | ম-৯০ | ৫.০০ | ম-৯১ | ৫.০০ | ম-৯২ | ৫.০০ | ম-৯৩ | ৪.৭৫ |
| ম-৯৪ | ৫.০০ | ম-৯৫ | ৫.০০ | ম-৯৬ | ৫.০০ | ম-৯৭ | ৫.০০ | ম-৯৮ | ৫.০০ | ম-৯৯ | ৫.০০ |
| ম-১০০ | ৫.০০ | ম-১০১ | ৪.৭৫ | মোট: ৯২ | | | | | | | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৭

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: হরিরামপুর**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২.৪২ | ২ | ৪.০০ | ৩ | ৪.৫০ | ৪ | ৪.৬৭ | ৫ | ৩.৮৩ | ৬ | ৪.৫০ |
| ৭ | ৪.৫০ | ৮ | ৪.৫০ | ৯ | ৪.০৮ | ১০ | ৪.১৭ | ১১ | ১.৮৩ | ম-১২ | ২.৬৭ |
| ম-১৩ | ২.০০ | ম-১৪ | ২.৪২ | ম-১৫ | ৪.৪২ | ম-১৬ | ৪.০০ | ম-১৭ | ১.৫০ | ম-১৮ | ৩.৮৩ |
| ম-১৯ | ৪.২৫ | ম-২০ | ৪.৫০ | ম-২১ | ৪.৫০ | ম-২২ | ৩.০৮ | ম-২৩ | ৩.৬৭ | ম-২৪ | ১.৬৭ |
| ম-২৫ | ১.৬৭ | ৩০ | ১.৮৩ | ৩৪ | ২.১৭ | ৩৫ | ২.৮৩ | ৩৬ | ২.০০ | মোট: ২৯ | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৭

বিভাগ: ঢাকা　　জেলা: মানিকগঞ্জ　　উপজেলা: শিবালয়

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩.৪২ | ২ | ৪.৩৩ | ৩ | ২.৭৫ | ৫ | ২.৭৫ | ৬ | ৩.০৮ | ৮ | ৪.২৫ |
| ৯ | ৪.৪২ | ১০ | ৩.৪২ | ১১ | ৩.৫০ | ১২ | ৩.৫০ | ১৪ | ৩.৯২ | ১৫ | ২.৬৭ |
| ম-১৬ | ২.৩৩ | ম-১৮ | ১.১৭ | ম-২০ | ২.০০ | ম-২১ | ২.২৫ | ২৩ | ২.৫৮ | ২৪ | ২.২৫ |
| ২৫ | ২.৩৩ | ম-২৭ | ৪.১৭ | ম-২৮ | ২.৮৩ | ম-২৯ | ৩.৬৭ | ম-৩৪ | ২.৬৭ | ম-৩৫ | ২.৯২ |
| ম-৩৬ | ৩.৯২ | মোট: ২৫ | | | | | | | | | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৭

বিভাগ: ঢাকা    জেলা: মানিকগঞ্জ    উপজেলা: দৌলতপুর

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩.২৫ | ২ | ৩.৪২ | ৩ | ৩.৩৩ | ৪ | ৩.৫০ | ৫ | ৩.৫৮ | ম-৬ | ২.৭৫ |
| ম-৭ | ৩.৫০ | ম-৮ | ২.৫০ | ম-৯ | ৪.০৮ | ১০ | ৫.০০ | ১১ | ৪.৩৩ | ১২ | ৪.৩৩ |
| ১৩ | ৩.৯২ | ১৪ | ৪.৭৫ | ১৫ | ৪.৭৫ | ১৬ | ৪.৫০ | ম-১৮ | ৪.৫৮ | ম-১৯ | ৪.৬৭ |
| ম-২০ | ৪.৫৮ | ম-২১ | ৪.৫৮ | ম-২২ | ৪.৪২ | ম-২৩ | ৪.৭৫ | ম-২৪ | ৪.৩৩ | ম-২৫ | ৪.৩৩ |
| ম-২৬ | ৪.০০ | ম-২৭ | ২.৫৮ | ম-২৮ | ৩.৯২ | ম-২৯ | ৪.০০ | ৩১ | ৩.৯২ | ম-৩২ | ৩.২৫ |
| ম-৩৩ | ৩.৫৮ | ম-৩৫ | ২.৭৫ | ম-৩৬ | ২.৮৩ | ম-৩৭ | ৩.২৫ | ৩৮ | ৪.৫০ | ৩৯ | ৪.৩৩ |
| ম-৪০ | ৩.৫০ | ৪১ | ৩.২৫ | ৪২ | ৪.৫০ | ৪৩ | ২.৩৩ | ৪৪ | ৪.১৭ | ৪৫ | ৩.৬৭ |
| ৪৬ | ২.৬৭ | ৪৭ | ৩.০৮ | ৪৮ | ৩.৩৩ | ৪৯ | ৪.০৮ | ৫০ | ৪.০৮ | ৫১ | ৪.৪২ |
| ৫২ | ৪.১৭ | ৫৩ | ৩.২৫ | ৫৪ | ৪.০৮ | ৫৫ | ৪.০৮ | ৫৬ | ২.৮৩ | ৫৭ | ৩.৮৩ |
| ৫৮ | ৪.০০ | ৬০ | ৪.৩৩ | ৬২ | ৪.০৮ | ৬৩ | ৩.০৮ | ৬৪ | ৩.৮৩ | ৬৫ | ৩.৬৭ |
| ৬৬ | ৪.০৮ | ৬৭ | ৪.০৮ | ৬৮ | ৩.৯২ | ৬৯ | ৪.৬৭ | ৭০ | ৩.১৭ | ৭১ | ৪.৮৩ |
| ৭২ | ৪.০৮ | ৭৩ | ৪.৫৮ | ৭৪ | ৩.৮৩ | ৭৫ | ৪.০০ | ৭৭ | ২.৮৩ | ৭৮ | ৩.০৮ |
| ৮০ | ৪.৩৩ | ৮৫ | ৩.১৭ | ৮৯ | ৩.২৫ | ৯০ | ৪.৫০ | ৯১ | ৩.৯২ | ৯৪ | ৩.৫৮ |
| ম-৯৫ | ৫.০০ | ম-৯৭ | ৪.১৭ | ম-৯৮ | ৪.৬৭ | ম-৯৯ | ৪.৩৩ | ম-১০০ | ৪.০০ | ম-১০১ | ৩.৬৭ |
| ম-১০২ | ৩.৮৩ | ম-১০৩ | ৪.৪২ | ম-১০৪ | ৩.৮৩ | ম-১০৫ | ৩.৩৩ | ম-১০৬ | ২.৭৫ | ম-১০৭ | ৪.৩৩ |
| ম-১০৮ | ৫.০০ | ম-১০৯ | ৩.০৮ | ম-১১০ | ৩.০৮ | ম-১১১ | ৩.১৭ | ম-১১৩ | ২.৭৫ | ম-১১৪ | ৩.৫০ |
| ম-১১৫ | ৪.৫০ | ম-১১৬ | ৪.৩৩ | ম-১১৭ | ৩.৫০ | ম-১১৮ | ৪.৮৩ | ম-১১৯ | ৪.০৮ | ম-১২২ | ৩.৮৩ |
| ম-১২৩ | ৩.৪২ | ম-১২৫ | ৪.৫০ | ম-১২৭ | ৫.০০ | ম-১২৮ | ৩.৯২ | ম-১২৯ | ২.১৭ | ম-১৩৩ | ২.৫৮ |
| ম-১৩৪ | ৩.০০ | ম-১৩৯ | ৪.৫০ | ম-১৪০ | ৪.৮৩ | ১৪১ | ৪.৬৭ | ১৪৩ | ৪.০০ | ১৪৪ | ৩.৯২ |
| ১৪৫ | ৪.৭৫ | ১৪৬ | ৪.২৫ | ১৪৭ | ৩.৮৩ | ১৪৮ | ৩.৫০ | ১৪৯ | ৩.৯২ | ১৫০ | ৩.৪২ |
| ১৫১ | ৪.০৮ | ১৫২ | ৩.৫৮ | ১৫৩ | ৪.০৮ | ১৫৪ | ৩.৭৫ | ১৫৫ | ৩.৫০ | ১৫৬ | ৩.০০ |
| ১৫৭ | ৪.২৫ | ১৫৯ | ৪.৩৩ | ১৬০ | ৪.৬৭ | ১৬১ | ৪.৫৮ | ১৬২ | ৩.৯২ | ১৬৩ | ২.৫৮ |
| ১৬৫ | ৩.৪২ | ১৬৬ | ৩.৮৩ | ১৬৭ | ৪.১৭ | ১৬৮ | ৪.৪২ | ম-১৭১ | ৪.৫০ | ম-১৭২ | ৫.০০ |
| ম-১৭৩ | ৪.৩৩ | ম-১৭৫ | ৪.৫০ | ম-১৭৬ | ৩.৮৩ | ম-১৭৭ | ৪.৫৮ | ম-১৭৯ | ৪.৫০ | ম-১৮০ | ৪.২৫ |
| ম-১৮১ | ৩.৪২ | ম-১৮২ | ৪.৩৩ | ম-১৮৩ | ৩.২৫ | ম-১৮৪ | ৩.৯২ | ম-১৮৫ | ১.৮৩ | ম-১৮৭ | ৩.৩৩ |
| ম-১৮৮ | ৩.৭৫ | ম-১৮৯ | ৩.৭৫ | ম-১৯০ | ২.৯২ | ম-১৯১ | ২.৮৩ | ম-১৯২ | ৪.১৭ | ম-১৯৩ | ৩.৮৩ |
| ম-১৯৪ | ৩.৭৫ | ম-১৯৫ | ৩.৪২ | ম-১৯৬ | ৪.৫৮ | ম-১৯৭ | ৪.৬৭ | ম-১৯৮ | ৪.৫০ | ম-১৯৯ | ৩.১৭ |
| ম-২০০ | ২.৮৩ | ম-২০১ | ৩.৬৭ | ম-২০২ | ৪.৮৩ | ম-২০৩ | ৪.৫০ | ম-২০৪ | ৪.৪২ | ম-২০৫ | ৪.১৭ |
| ম-২০৬ | ৩.৯২ | ম-২০৭ | ৩.৫৮ | ম-২০৯ | ৩.২৫ | ম-২১০ | ৪.২৫ | মোট: ১৭২ | | | |

## ৪.৩.৪ ইবতিদায়ী শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষায় মানিকগঞ্জ জেলার অংশ গ্রহণকারী সকল মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ফলাফল ২০১৮

### ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৮

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: মানিকগঞ্জ সদর**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩.৮৩ | ২ | ৩.২৫ | ৩ | ৩.৪২ | ৪ | ১.৭৫ | ৫ | ১.৮৩ | ৬ | ৩.৫৮ |
| ৭ | ২.৭৫ | ৮ | ২.১৭ | ৯ | ২.৩৩ | ১০ | ২.২৫ | ১২ | ২.৪২ | ১৩ | ১.৭৫ |
| ১৪ | ২.৩৩ | ১৫ | ১.৫০ | ১৬ | ১.৯২ | ম-২০ | ৪.২৫ | ম-২১ | ৪.০০ | ম-২২ | ৪.৩৩ |
| ম-২৩ | ৩.৭৫ | ম-২৪ | ৩.৯২ | ম-২৫ | ৩.৮৩ | ম-২৬ | ৩.৪২ | ম-২৭ | ৩.৪২ | ম-২৮ | ৩.০০ |
| ম-২৯ | ২.২৫ | ম-৩০ | ৩.৩৩ | ম-৩১ | ২.৬৭ | ম-৩২ | ১.৯২ | ম-৩৩ | ২.৯২ | ম-৩৫ | ৩.৪২ |
| ম-৩৬ | ২.৬৭ | ৩৭ | ২.২৫ | ৩৮ | ৩.১৭ | ৩৯ | ২.৫৮ | ৪০ | ২.৭৫ | ৪১ | ২.৪২ |
| ৪২ | ৩.১৭ | ৪৩ | ৩.১৭ | ৪৪ | ২.৪২ | ৪৫ | ৩.১৭ | ৪৮ | ২.৭৫ | ৪৯ | ২.০৮ |
| ৫০ | ২.৩৩ | ম-৫১ | ৩.৫০ | ম-৫৩ | ৪.০০ | ম-৫৪ | ২.৯২ | ম-৫৫ | ৪.০০ | ম-৫৬ | ২.৫৮ |
| ম-৫৭ | ৩.১৭ | ম-৫৮ | ২.৬৭ | ম-৫৯ | ৩.৩৩ | ম-৬০ | ৩.৪২ | ম-৬১ | ৩.০৮ | ম-৬২ | ২.৯২ |
| ম-৬৩ | ২.৪২ | ম-৬৫ | ১.৬৭ | ম-৬৬ | ২.৯২ | ম-৬৭ | ৩.০০ | ম-৬৮ | ৩.০০ | ৬৯ | ১.৭৫ |
| ৭০ | ৩.৩৩ | ৭১ | ২.৫০ | ৭২ | ১.৫৮ | ৭৩ | ৩.১৭ | ৭৪ | ৪.০৮ | ৭৬ | ২.৩৩ |
| ৭৭ | ৩.৩৩ | ৭৮ | ১.৬৭ | ৭৯ | ৩.৭৫ | ৮০ | ৪.০০ | ৮২ | ৩.০৮ | ৮৩ | ৪.০০ |
| ৮৪ | ৩.২৫ | ৮৫ | ৩.২৫ | ৮৬ | ৩.৩৩ | ৮৭ | ৪.৩৩ | ম-৮৯ | ৪.৫৮ | ম-৯০ | ৪.৮৩ |
| ম-৯১ | ৩.৬৭ | ম-৯২ | ৪.৩৩ | ম-৯৩ | ৩.২৫ | ম-৯৪ | ৪.৪২ | ম-৯৫ | ৩.৭৫ | ম-৯৬ | ৩.৭৫ |
| ম-৯৭ | ৩.৮৩ | ম-৯৮ | ৩.৩৩ | ম-৯৯ | ৩.৬৭ | ১০১ | ৫.০০ | ১০২ | ৪.৮৩ | ১০৩ | ৫.০০ |
| ম-১০৪ | ৪.৮৩ | ম-১০৫ | ৫.০০ | ম-১০৬ | ৪.৭৫ | ম-১০৭ | ৪.৫০ | ম-১০৮ | ৪.৭৫ | ম-১০৯ | ৪.৫০ |
| ম-১১১ | ৫.০০ | ম-১১২ | ৪.৩৩ | ১১৩ | ৩.৬৭ | ১১৪ | ৪.৫৮ | ১১৫ | ৫.০০ | ১১৬ | ৫.০০ |
| ১১৭ | ৫.০০ | ১১৮ | ৪.৮৩ | ১১৯ | ৪.৩৩ | ১২০ | ৪.৭৫ | ১২১ | ৪.৪২ | ১২২ | ৪.৫০ |
| ১২৩ | ৪.৫০ | ১২৫ | ৪.৬৭ | ম-১২৮ | ৫.০০ | ম-১২৯ | ৫.০০ | ম-১৩০ | ৫.০০ | ম-১৩১ | ৪.৬৭ |
| ম-১৩২ | ৪.৫০ | ম-১৩৩ | ৩.৯২ | ম-১৩৪ | ৪.৭৫ | ম-১৩৫ | ৪.৫০ | ম-১৩৬ | ৪.০০ | ম-১৩৭ | ৪.৫৮ |
| ম-১৩৮ | ৪.৪২ | ম-১৩৯ | ৪.৪২ | ম-১৪০ | ৫.০০ | ম-১৪২ | ৩.৫৮ | ম-১৪৩ | ৫.০০ | ম-১৪৪ | ৩.০০ |
| ম-১৪৫ | ৪.৫০ | ১৪৬ | ৪.৫০ | ১৪৭ | ৪.৪২ | ১৪৮ | ৪.৪২ | ১৪৯ | ৪.২৫ | ১৫০ | ২.৯২ |
| ১৫১ | ৩.৪২ | ১৫৩ | ৩.০৮ | ১৫৪ | ৩.০০ | ১৫৫ | ২.৬৭ | ১৫৬ | ৩.৮৩ | ম-১৫৭ | ৫.০০ |
| ম-১৫৮ | ৪.৮৩ | ম-১৫৯ | ৪.৪২ | ম-১৬০ | ৪.৬৭ | ম-১৬১ | ৫.০০ | ম-১৬২ | ৪.৬৭ | ম-১৬৩ | ৫.০০ |
| ম-১৬৪ | ৪.২৫ | ম-১৬৫ | ৪.৩৩ | ম-১৬৬ | ৪.৩৩ | ম-১৬৭ | ৩.৬৭ | ম-১৬৮ | ৩.২৫ | ম-১৬৯ | ৪.০৮ |
| ম-১৭০ | ৩.৩৩ | ম-১৭১ | ২.৫৮ | ম-১৭২ | ৪.০৮ | মোট: ১৫৩ | | | | | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৮

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: ঘিওর**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ | ৪.০০ | ৩ | ৪.০০ | ৪ | ২.৭৫ | ৫ | ২.০৮ | ৬ | ২.৮৩ | ম-১০ | ৫.০০ |
| ম-১১ | ৫.০০ | ম-১২ | ৫.০০ | ম-১৩ | ৫.০০ | ম-১৪ | ৪.০০ | ম-১৫ | ৪.২৫ | ম-১৬ | ৩.২৫ |
| ম-১৭ | ৪.৫০ | ম-১৮ | ৪.৪২ | ম-১৯ | ১.৭৫ | ম-২০ | ৩.৭৫ | ম-২১ | ৩.৭৫ | ম-২২ | ২.২৫ |
| ম-২৩ | ৪.১৭ | ২৫ | ৩.৪২ | ২৭ | ১.৯২ | ২৮ | ২.৩৩ | ২৯ | ১.৮৩ | ৩০ | ২.২৫ |
| ৩১ | ৪.১৭ | ম-৩২ | ২.৮৩ | ম-৩৩ | ২.৭৫ | ম-৩৪ | ২.৩৩ | ম-৩৭ | ২.৬৭ | ম-৩৮ | ৩.৫৮ |
| ম-৩৯ | ২.৫০ | ম-৪০ | ৩.৩৩ | ম-৪১ | ৩.০০ | ম-৪৩ | ২.০০ | ম-৪৪ | ২.১৭ | মোট: ৩৫ | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৮

**বিভাগ: ঢাকা** | **জেলা: মানিকগঞ্জ** | **উপজেলা: সিংগাইর**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২.০৮ | ৪ | ২.৫৮ | ম-৫ | ৩.৫৮ | ম-৬ | ৩.১৭ | ম-৭ | ৩.২৫ | ম-৮ | ২.৪২ |
| ম-৯ | ২.৯২ | ম-১০ | ২.১৭ | ম-১১ | ২.০০ | ম-১২ | ১.৭৫ | ম-১৩ | ৩.৩৩ | ম-১৪ | ৩.১৭ |
| ম-১৫ | ১.৮৩ | ম-১৬ | ৩.৫০ | ম-১৯ | ২.৫০ | ২০ | ২.৯২ | ২১ | ২.৪২ | ২৩ | ১.৮৩ |
| ২৪ | ২.০০ | ২৫ | ২.০৮ | ম-২৬ | ৩.৩৩ | ম-২৭ | ৩.৩৩ | ম-২৮ | ২.৯২ | ম-২৯ | ৩.০০ |
| ম-৩০ | ৩.৭৫ | ম-৩১ | ৩.৫৮ | ৩৩ | ৪.২৫ | ৩৪ | ৪.০০ | ৩৫ | ৩.৯২ | ৩৬ | ৩.৯২ |
| ৩৭ | ৩.৫০ | ৩৮ | ৩.০৮ | ৩৯ | ৩.২৫ | ৪০ | ১.৬৭ | ম-৪১ | ৪.০৮ | ম-৪২ | ৪.৪২ |
| ম-৪৩ | ৩.৭৫ | ম-৪৪ | ৩.৭৫ | ম-৪৫ | ৩.৯২ | ম-৪৬ | ৩.৯২ | ম-৪৭ | ৪.৩৩ | ম-৪৮ | ৩.৭৫ |
| ম-৪৯ | ৩.৮৩ | ম-৫০ | ৩.৫০ | ম-৫১ | ৩.৫০ | ম-৫২ | ৩.৫৮ | ম-৫৬ | ২.৪২ | ম-৫৭ | ৪.০০ |
| ম-৫৮ | ৩.৩৩ | ম-৫৯ | ৪.৫৮ | ম-৬০ | ৪.০৮ | ম-৬২ | ৩.৭৫ | ম-৬৪ | ৩.৮৩ | ম-৬৫ | ৪.৬৭ |
| ম-৬৬ | ৪.৮৩ | ম-৬৭ | ৪.৭৫ | ম-৬৮ | ৪.৭৫ | ম-৬৯ | ৪.৭৫ | ম-৭০ | ৪.৭৫ | ম-৭১ | ৪.৩৩ |
| ম-৭৩ | ৪.৩৩ | ম-৭৪ | ৪.৪২ | ম-৭৫ | ৪.৫৮ | ম-৭৭ | ৪.৫৮ | ম-৭৮ | ৪.৫৮ | ম-৭৯ | ৪.৫৮ |
| ম-৮০ | ৪.৫৮ | ম-৮১ | ৪.৫০ | ম-৮২ | ৪.১৭ | ম-৮৩ | ৪.০৮ | ম-৮৪ | ৩.৫৮ | ৮৫ | ৪.৩৩ |
| ৮৬ | ৪.৩৩ | ৮৭ | ৩.০৮ | ৮৮ | ৩.২৫ | ৮৯ | ৩.১৭ | ৯০ | ২.৫৮ | ৯১ | ৩.০০ |
| ৯২ | ৩.১৭ | ৯৩ | ২.৫০ | ৯৪ | ২.৮৩ | ৯৫ | ২.৫০ | ৯৬ | ২.২৫ | ৯৭ | ২.২৫ |
| ৯৮ | ২.৪২ | ৯৯ | ২.৫৮ | ১০০ | ২.১৭ | ১০২ | ১.৬৭ | ১০৩ | ১.৬৭ | ১০৪ | ২.৪২ |
| ১০৫ | ৩.৩৩ | ১০৬ | ৪.১৭ | ম-১০৭ | ৩.৬৭ | ম-১০৮ | ৩.৫৮ | ম-১০৯ | ৩.৭৫ | ম-১১০ | ২.৪২ |
| ম-১১১ | ৩.৬৭ | ম-১১২ | ৩.৭৫ | ম-১১৩ | ৩.৭৫ | ম-১১৪ | ৩.২৫ | ম-১১৫ | ৩.৫৮ | ম-১১৬ | ৩.২৫ |
| ম-১১৭ | ৩.২৫ | ম-১১৮ | ৪.০৮ | ম-১১৯ | ৩.৭৫ | ম-১২০ | ৩.৫৮ | ম-১২২ | ৩.৫৮ | ম-১২৩ | ২.৯২ |
| ম-১২৪ | ৩.১৭ | ম-১২৫ | ৩.০০ | ম-১২৬ | ১.৮৩ | ম-১২৭ | ১.৯২ | ম-১২৯ | ৩.৮৩ | ম-১৩০ | ৩.৪২ |
| ম-১৩১ | ২.৮৩ | ম-১৩৩ | ৩.৫০ | ম-১৩৫ | ৩.৫৮ | ম-১৩৯ | ১.৮৩ | ম-১৪০ | ৩.০০ | ম-১৪২ | ৩.০০ |
| ম-১৪৪ | ৩.৩৩ | ম-১৪৫ | ৩.৪২ | ম-১৪৬ | ৪.৭৫ | ম-১৪৭ | ৪.০০ | ম-১৪৯ | ৪.০৮ | ম-১৫০ | ৪.৩৩ |
| ম-১৫১ | ৪.২৫ | ম-১৫২ | ৪.৬৭ | ম-১৫৩ | ৪.৬৭ | ম-১৫৪ | ৩.৯২ | ম-১৫৫ | ৪.০০ | ১৫৮ | ৩.৩৩ |
| ১৫৯ | ৪.০৮ | ১৬১ | ৪.৬৭ | ১৬২ | ৪.০০ | ১৬৩ | ২.৭৫ | ১৬৪ | ৪.৩৩ | ১৬৫ | ৪.০০ |
| ১৬৬ | ৪.২৫ | ১৬৮ | ৪.৪২ | ১৭০ | ২.৬৭ | ১৭২ | ৩.৩৩ | ১৭৩ | ৩.৫০ | ১৭৪ | ৪.৩৩ |
| ১৭৫ | ৩.৭৫ | ১৭৬ | ৪.২৫ | ১৭৭ | ৪.০০ | ১৭৮ | ৪.২৫ | ১৮০ | ৩.৫৮ | ১৮১ | ৩.৯২ |
| ১৮২ | ৪.০০ | ১৮৩ | ৩.৪২ | ম-১৮৮ | ৪.১৭ | ম-১৮৯ | ৪.০৮ | ম-১৯০ | ৩.৫৮ | ম-১৯১ | ৩.৯২ |
| ম-১৯২ | ২.৭৫ | ম-১৯৩ | ৪.৫৮ | ম-১৯৪ | ৪.১৭ | ম-১৯৫ | ৪.৩৩ | ম-১৯৬ | ৪.০৮ | ম-১৯৭ | ৪.৫০ |
| ম-১৯৮ | ৩.২৫ | ম-১৯৯ | ৩.৩৩ | ম-২০০ | ৪.২৫ | ম-২০১ | ৪.৪২ | ম-২০২ | ৩.৪২ | ম-২০৩ | ৩.৯২ |
| ম-২০৪ | ১.৫০ | ম-২০৬ | ২.০০ | ম-২০৭ | ৩.৬৭ | ২০৮ | ৩.৮৩ | ২০৯ | ৩.৩৩ | ২১০ | ৩.৮৩ |
| ২১১ | ৩.০৮ | ২১২ | ৩.৮৩ | ২১৪ | ৪.০০ | ২১৫ | ৩.৯২ | ২১৬ | ৩.৪২ | ২১৭ | ৩.৭৫ |
| ২১৮ | ৩.৩৩ | ২১৯ | ২.৫০ | ম-২২২ | ৪.৮৩ | ম-২২৩ | ৪.৫৮ | ম-২২৪ | ৪.৫৮ | ম-২২৫ | ৪.৪২ |
| ম-২২৬ | ৪.২৫ | ম-২২৭ | ৪.৩৩ | ম-২২৮ | ৪.০০ | ম-২৩১ | ৩.৯২ | ম-২৩২ | ৩.৫০ | ম-২৩৩ | ৩.৮৩ |
| ম-২৩৪ | ৩.৯২ | ম-২৩৫ | ৩.৮৩ | ম-২৩৬ | ৩.৯২ | ম-২৩৭ | ৩.৯২ | ম-২৩৮ | ৩.৫৮ | ম-২৩৯ | ৪.০০ |
| ম-২৪০ | ২.৬৭ | ম-২৪১ | ২.৬৭ | ম-২৪২ | ৩.৪২ | ম-২৪৩ | ৩.৫৮ | ম-২৪৪ | ৩.৬৭ | ম-২৪৫ | ৪.০৮ |
| ২৪৬ | ৩.০৮ | ২৪৮ | ২.৬৭ | ২৪৯ | ৩.৭৫ | ২৫০ | ২.২৫ | ২৫১ | ২.৩৩ | ২৫২ | ২.৫০ |
| ২৫৪ | ৩.৫৮ | ২৫৫ | ৩.৬৭ | ম-২৫৭ | ৪.৬৭ | ম-২৫৮ | ৩.৯২ | ম-২৫৯ | ৪.০০ | ম-২৬০ | ৩.৮৩ |
| ম-২৬১ | ৩.৯২ | ম-২৬২ | ৩.৯২ | ম-২৬৩ | ৩.৮৩ | ম-২৬৪ | ৩.১৭ | ম-২৬৫ | ৩.৭৫ | ম-২৬৬ | ৩.১৭ |
| ম-২৬৭ | ৩.৭৫ | ম-২৬৮ | ৩.০৮ | ম-২৬৯ | ৩.৩৩ | ম-২৭০ | ১.৯২ | ম-২৭১ | ৩.০৮ | ম-২৭২ | ৩.৮৩ |
| ম-২৭৩ | ৩.৭৫ | | | | | | | | | | |

মোট: ২২৯

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৮

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: সাটুরিয়া**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩ | ৪.০০ | ৫ | ২.৬৭ | ৬ | ৪.১৭ | ম-৮ | ২.৫৮ | ম-৯ | ২.৮৩ | ১২ | ৪.১৭ |
| ১৩ | ৪.৩৩ | ১৪ | ২.৩৩ | ১৫ | ২.৬৭ | ১৬ | ৩.৫০ | ১৭ | ৩.৬৭ | ১৮ | ৩.৫৮ |
| ১৯ | ৩.৫০ | ২০ | ৩.১৭ | ২১ | ২.০৮ | ২৩ | ৩.৮৩ | ২৫ | ১.১৭ | ২৬ | ৪.৪২ |
| ২৭ | ৪.৫০ | ২৮ | ৪.৪২ | ২৯ | ৪.১৭ | ৩০ | ৩.৯২ | ৩১ | ৪.৪২ | ম-৩৩ | ৩.৫৮ |
| ম-৩৪ | ২.২৫ | ম-৩৫ | ৩.৭৫ | ম-৩৬ | ৪.৬৭ | ম-৩৭ | ৩.৬৭ | ম-৩৮ | ৩.৩৩ | ম-৩৯ | ৩.২৫ |
| ম-৪০ | ৩.৭৫ | ম-৪১ | ২.৮৩ | ম-৪২ | ৩.৫০ | ম-৪৩ | ২.৭৫ | ম-৪৪ | ৩.২৫ | ম-৪৭ | ৩.৩৩ |
| ম-৪৮ | ৪.১৭ | ৪৯ | ৪.৫৮ | ৫০ | ৪.৮৩ | ৫১ | ৩.১৭ | ৫২ | ৪.৩৩ | ৫৩ | ৩.৫০ |
| ৫৪ | ৩.৫০ | ৫৫ | ৪.২৫ | ৫৬ | ৩.৮৩ | ৫৭ | ৩.৮৩ | ৫৮ | ৩.৬৭ | ৫৯ | ৩.২৫ |
| ম-৬০ | ৫.০০ | ম-৬১ | ৪.৫৮ | ম-৬২ | ৪.৮৩ | ম-৬৩ | ৪.৬৭ | ম-৬৪ | ৩.৯২ | ম-৬৫ | ৪.৮৩ |
| ম-৬৬ | ৩.১৭ | ম-৬৭ | ৪.৪২ | ম-৬৯ | ৪.২৫ | ম-৭০ | ২.৬৭ | ৭১ | ৩.৪২ | ৭২ | ৪.৬৭ |
| ৭৫ | ৩.৬৭ | ৭৬ | ২.১৭ | ৭৭ | ২.২৫ | ৭৮ | ২.৫৮ | ৭৯ | ২.৭৫ | ৮২ | ৪.২৫ |
| ৮৩ | ৪.৬৭ | ৮৪ | ৪.৮৩ | ৮৫ | ৪.৭৫ | ৮৬ | ৫.০০ | ৮৭ | ৪.৬৭ | ৮৮ | ৪.৮৩ |
| ৮৯ | ৪.৫৮ | ৯০ | ৪.৮৩ | ৯১ | ৪.৭৫ | ৯২ | ৪.৮৩ | ৯৩ | ৫.০০ | ৯৪ | ৪.২৫ |
| ৯৬ | ৪.৮৩ | ৯৭ | ৫.০০ | ৯৮ | ৫.০০ | ৯৯ | ৪.৮৩ | ১০০ | ৪.৭৫ | ১০১ | ৪.৭৫ |
| ম-১০২ | ৩.৭৫ | ম-১০৩ | ৩.২৫ | ম-১০৪ | ৩.৯২ | ম-১০৫ | ২.৭৫ | ম-১০৭ | ৩.০৮ | ম-১০৯ | ৩.৫০ |
| ম-১১১ | ৩.২৫ | ম-১১২ | ৪.৭৫ | ম-১১৩ | ৩.৭৫ | ম-১১৪ | ৫.০০ | ম-১১৫ | ৪.৮৩ | ম-১১৬ | ৪.৮৩ |
| ম-১১৭ | ৪.৭৫ | ম-১১৮ | ৪.৮৩ | ম-১১৯ | ৫.০০ | ম-১২০ | ৪.৫৮ | ম-১২১ | ৫.০০ | ম-১২২ | ৫.০০ |
| ম-১২৩ | ৫.০০ | ম-১২৪ | ৪.৭৫ | ম-১২৫ | ৪.৫০ | ম-১২৬ | ৪.৫৮ | ম-১২৭ | ৪.৮৩ | ম-১২৮ | ৪.৭৫ |

মোট: ১০৮

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৮

বিভাগ: ঢাকা　　জেলা: মানিকগঞ্জ　　উপজেলা: হরিরামপুর

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৫.০০ | ম-৬ | ২.০০ | ম-৭ | ৫.০০ | ম-৮ | ৫.০০ | ম-১০ | ৫.০০ | ম-১৩ | ৪.২৫ |
| ম-১৪ | ৪.০০ | ম-১৫ | ৩.৬৭ | ম-১৬ | ৩.৬৭ | ম-১৭ | ৪.০০ | ম-১৮ | ৪.১৭ | ম-১৯ | ৩.৮৩ |
| ম-২০ | ৪.০৮ | ম-২১ | ৩.৮৩ | ম-২২ | ৩.৭৫ | ২৪ | ৩.৮৩ | ২৫ | ২.৮৩ | ২৬ | ৩.৩৩ |

মোট: ১৮

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৮

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: শিবালয়**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২.২৫ | ৮ | ১.৯২ | ১২ | ২.০০ | ১৩ | ২.৫০ | ১৬ | ২.৯২ | ১৭ | ২.২৫ |
| ১৮ | ২.৫০ | ১৯ | ৩.১৭ | ২১ | ২.০৮ | ২২ | ৩.৫০ | ২৩ | ৪.৫৮ | ২৪ | ৪.৫০ |
| ২৫ | ৪.৪২ | ২৬ | ২.৫০ | ২৭ | ৪.৬৭ | ২৮ | ৪.৫৮ | ম-২৯ | ২.৬৭ | ম-৩৩ | ২.০০ |
| ম-৩৬ | ৩.০৮ | ম-৩৭ | ১.৯২ | ম-৩৮ | ১.৭৫ | ৩৯ | ২.৮৩ | ৪০ | ৩.০০ | ৪১ | ৩.০৮ |
| ম-৪৩ | ৩.০০ | ম-৪৪ | ৩.০৮ | ম-৪৬ | ৩.৩৩ | মোট: ২৭ | | | | | |

# ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৮

**বিভাগ: ঢাকা** **জেলা: মানিকগঞ্জ** **উপজেলা: দৌলতপুর**

| রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ | রোল | জিপিএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২.৮৩ | ৩ | ২.৭৫ | ম-৬ | ৩.৮৩ | ম-৭ | ৪.০৮ | ৮ | ৪.৬৭ | ৯ | ৩.৮৩ |
| ১০ | ৩.০০ | ১১ | ২.৭৫ | ১২ | ১.৬৭ | ১৩ | ২.৭৫ | ১৫ | ২.০০ | ১৬ | ৩.০৮ |
| ১৭ | ২.৮৩ | ১৮ | ৩.৫০ | ১৯ | ৩.৭৫ | ২১ | ২.৮৩ | ২২ | ৩.৩৩ | ২৪ | ৩.৪২ |
| ২৬ | ৩.২৫ | ২৭ | ৩.৪২ | ২৮ | ৩.১৭ | ২৯ | ৪.০৮ | ৩২ | ২.৭৫ | ৩৩ | ৩.৬৭ |
| ৩৪ | ৪.২৫ | ৩৬ | ৪.০৮ | ৩৭ | ৪.০৮ | ৩৮ | ৩.৫৮ | ৩৯ | ৩.২৫ | ৪০ | ৩.১৭ |
| ৪১ | ৩.০৮ | ৪২ | ৪.০৮ | ৪৩ | ৩.৫০ | ৪৬ | ৩.৯২ | ৪৭ | ৩.৫৮ | ৪৯ | ২.৬৭ |
| ৫০ | ৩.৮৩ | ম-৫১ | ৩.৯২ | ম-৫২ | ৪.৮৩ | ম-৫৩ | ৪.৬৭ | ম-৫৪ | ৩.৭৫ | ম-৫৫ | ৩.৩৩ |
| ম-৫৬ | ৪.০৮ | ম-৫৭ | ৩.৯২ | ম-৫৮ | ৩.৩৩ | ম-৫৯ | ৪.০০ | ম-৬০ | ৩.৫০ | ম-৬১ | ৩.৯২ |
| ম-৬২ | ৩.০৮ | ম-৬৩ | ৩.৩৩ | ম-৬৫ | ৩.৮৩ | ম-৬৬ | ৩.৮৩ | ম-৬৭ | ২.৬৭ | ম-৬৮ | ৩.৬৭ |
| ম-৬৯ | ৩.০৮ | ম-৭০ | ১.৫০ | ম-৭১ | ২.১৭ | ম-৭২ | ২.৩৩ | ম-৭৩ | ৩.২৫ | ম-৭৪ | ২.৫৮ |
| ম-৭৮ | ৩.০৮ | ম-৮২ | ৩.১৭ | ম-৮৩ | ৩.৫৮ | ৮৫ | ৪.৬৭ | ৮৬ | ৩.৫৮ | ৮৭ | ৪.২৫ |
| ৮৮ | ৩.৫৮ | ৮৯ | ৩.৫৮ | ৯১ | ৪.৪২ | ৯২ | ৩.৫৮ | ৯৩ | ২.৯২ | ৯৫ | ৩.৪২ |
| ৯৬ | ২.৯২ | ৯৮ | ২.২৫ | ৯৯ | ২.৭৫ | ১০০ | ২.৫৮ | ১০১ | ৪.৭৫ | ১০২ | ২.৬৭ |
| ১০৩ | ৩.৪২ | ১০৫ | ৩.৭৫ | ১০৬ | ৩.৯২ | ১১৪ | ৩.৫০ | ১১৫ | ৪.৬৭ | ১১৬ | ৪.৫০ |
| ১১৭ | ৪.৫০ | ১২০ | ৩.৮৩ | ম-১২১ | ৪.০৮ | ম-১২২ | ৫.০০ | ম-১২৩ | ৩.২৫ | ম-১২৪ | ৩.২৫ |
| ম-১২৫ | ৩.৭৫ | ম-১২৬ | ৩.৬৭ | ম-১২৮ | ২.৫০ | ম-১২৯ | ২.৪২ | ম-১৩০ | ৩.২৫ | ম-১৩১ | ২.৭৫ |
| ম-১৩২ | ২.৫০ | ম-১৩৩ | ২.৩৩ | ম-১৩৪ | ৩.৮৩ | ম-১৩৬ | ২.৫৮ | ম-১৩৮ | ২.৯২ | ম-১৩৯ | ২.৫৮ |
| ম-১৪১ | ৪.৩৩ | ম-১৪২ | ৩.৮৩ | ম-১৪৫ | ৪.১৭ | ম-১৪৬ | ৩.৭৫ | ম-১৪৭ | ১.৫০ | ম-১৪৮ | ৪.০০ |
| ম-১৫০ | ২.৯২ | ম-১৫১ | ২.৫০ | ম-১৫২ | ৩.১৭ | ম-১৫৩ | ৩.৯২ | ম-১৫৪ | ৩.৭৫ | ম-১৫৫ | ৪.৭৫ |
| ম-১৫৬ | ৪.৪২ | ম-১৫৭ | ৩.২৫ | ম-১৫৮ | ৪.৮৩ | ম-১৫৯ | ৪.৫০ | ম-১৬১ | ৩.১৭ | ১৬২ | ৩.৫০ |
| ১৬৩ | ২.০৮ | ১৬৪ | ২.৬৭ | ১৬৫ | ২.৬৭ | ১৬৬ | ৩.৬৭ | ১৬৮ | ৩.৫০ | ১৬৯ | ২.৫৮ |
| ১৭০ | ৩.৫৮ | ম-১৭১ | ৫.০০ | ম-১৭২ | ৫.০০ | ম-১৭৩ | ২.৭৫ | ম-১৭৪ | ২.৫০ | ম-১৭৫ | ২.৭৫ |
| ১৭৬ | ৪.৫০ | ১৭৭ | ৪.৩৩ | ১৭৮ | ৪.৩৩ | ১৭৯ | ৪.০৮ | ১৮০ | ৩.৬৭ | ১৮১ | ২.৬৭ |
| ১৮৩ | ২.৭৫ | ১৮৪ | ৪.৪২ | ১৮৫ | ৩.৩৩ | ১৮৬ | ৪.৪২ | ১৮৭ | ৪.৫৮ | ১৮৮ | ৪.৫৮ |
| ১৮৯ | ৪.২৫ | ১৯০ | ২.৭৫ | ১৯১ | ২.৫৮ | ম-১৯২ | ৪.৪২ | ম-১৯৩ | ৪.৩৩ | ম-১৯৪ | ৪.০০ |
| ম-১৯৫ | ৪.৫০ | ম-১৯৬ | ৩.৮৩ | ম-১৯৭ | ৩.৯২ | ম-১৯৮ | ৩.৪২ | ম-১৯৯ | ৩.৫০ | ম-২০০ | ৩.২৫ |
| ম-২০১ | ৩.৫০ | ম-২০২ | ৩.৬৭ | ম-২০৩ | ২.৫৮ | ম-২০৪ | ২.৭৫ | ম-২০৫ | ৩.০৮ | ম-২০৬ | ৪.৪২ |
| ম-২০৭ | ২.১৭ | ম-২০৮ | ২.৬৭ | ম-২০৯ | ৩.০৮ | ম-২১০ | ২.৫৮ | ম-২১১ | ২.১৭ | ম-২১২ | ৪.০৮ |
| ম-২১৩ | ৪.০০ | ম-২১৪ | ৪.৫৮ | ম-২১৫ | ৪.৫০ | ম-২১৬ | ৪.৩৩ | মোট: ১৭২ | | | |

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## ৪.৫ ইবতিদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ

প্রায় হাজার বছর থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি, নৈতিক বিকাশ, সুনাগরিক হিসেবে চরিত্র গঠনে, দেশাত্ববোধের দৃঢ়তায় এবং আধ্যাত্মিক ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষা এক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। মুসলমানদের ইসলামী সমাজ গঠন এবং অন্যান্য ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সাথে শান্তিপূর্ণ ক সহাবস্থান জাগতিক বস্তুসমূহের গুণাগাগুণ ও তার সমন্বিত রূপকের মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তুভূর্ক্ত করা হয়েছে। মাদরাসার শিক্ষার গুণাগুন শিক্ষার্থীর আচরণে বাস্তব রূপ লাভ করে এবং এভাবে মাদরাসা শিক্ষার্থীর নৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। ইবতিদায়ী শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অধ্যাত্মিক নৈতিক এবং মানবিক বিষয়ে শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ উন্নয়ন সাধন।

সামাজিক এই পরিবর্তনের পিছনে বিরাট অবদান রেখেছে মাদরাসা শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ। বিশেষ করে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই যখন কোমলমতি মেয়ে শিশুরা ইসলামধর্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার সাথে পরিচিতি লাভ করে, তখন এই শিক্ষা তার সারাজীবনের চলার পাথেয় হিসাবে কাজ করে। কোন প্রকার অন্যায় অবিচার ও গর্হিত কাজে মেয়ে শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করে না। ফলে সমাজ হয় শান্তির নীড়, জান্নাতি পরিবেশে সিক্ত।

মানিকগঞ্জ জেলার ২৮টি ইবতিদায়ী মাদরাসার অধীনে অংশগ্রহণকারিনী মেয়ে শিশুদের তুলনামূলক হার ছেলে শিশুদের চেয়ে বেশি। নিচে ছক আকারে তা দেখানো হলো।

### ১. মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় সমাপনী পরীক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ

| সাল | শিক্ষার্থী সংখ্যা | ছেলে শিশু | মেয়ে শিশু | মেয়েদের অংশগ্রহণের হার |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৫ | ১৫৬ | ৭৯ | ৭৭ | ৪৯.৩৫% |
| ২০১৬ | ১৪৪ | ৭৭ | ৬৭ | ৪৬.৫২% |
| ২০১৭ | ১৫০ | ৭২ | ৭৮ | ৫২% |
| ২০১৮ | ১৫৩ | ৭৩ | ৮০ | ৫২.২৪ % |

২. মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় সমাপনী পরীক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ

| সাল | শিক্ষার্থী সংখ্যা | ছেলে শিশু | মেয়ে শিশু | মেয়েদের অংশগ্রহণের হার |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৫ | ৫৬ | ২৭ | ৩৮ | ৬৭.৮৫% |
| ২০১৬ | ৩৮ | ১৬ | ২২ | ৫৭.৮৯% |
| ২০১৭ | ৪৭ | ১২ | ৩৫ | ৭৪.৪৬% |
| ২০১৮ | ৩৫ | ১১ | ২৪ | ৬৮.৫৭% |

৩. মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় সমাপনী পরীক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ

| সাল | শিক্ষার্থী সংখ্যা | ছেলে শিশু | মেয়ে শিশু | মেয়েদের অংশগ্রহণের হার |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৫ | ২৩৯ | ৮৭ | ১৫২ | ৬৩.৫৯% |
| ২০১৬ | ২১৪ | ৬৮ | ১৫০ | ৭০.০৯% |
| ২০১৭ | ১৪৮ | ৪৮ | ১০০ | ৬৭.৫৬% |
| ২০১৮ | ২২৯ | ৭৪ | ১৫৫ | ৬৭.৬৮% |

৪. মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলায় সমাপনী পরীক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ

| সাল | শিক্ষার্থী সংখ্যা | ছেলে শিশু | মেয়ে শিশু | মেয়েদের অংশগ্রহণের হার |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৫ | ৯৮ | ৪৩ | ৫৫ | ৫৬.১২% |
| ২০১৬ | ৯৪ | ২৯ | ৬৫ | ৬৬.৩২% |
| ২০১৭ | ৯২ | ৪৮ | ৪৪ | ৪৭.৮২% |
| ২০১৮ | ১০৮ | ৫৮ | ৫০ | ৪৬.২৯% |

৫. মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলায় সমাপনী পরীক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ

| সাল | শিক্ষার্থী সংখ্যা | ছেলে শিশু | মেয়ে শিশু | মেয়েদের অংশগ্রহণের হার |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৫ | ২৪ | ১১ | ১৩ | ৫৪.১৬% |
| ২০১৬ | ২১ | ১০ | ১১ | ৫২.৩৮% |
| ২০১৭ | ২৯ | ১৫ | ১৪ | ৪৮.২৯% |
| ২০১৮ | ১৮ | ০৪ | ১৪ | ৭৭.৭৭% |

৬. মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় সমাপনী পরীক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ

| সাল | শিক্ষার্থী সংখ্যা | ছেলে শিশু | মেয়ে শিশু | মেয়েদের অংশগ্রহণের হার |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৫ | ২৭ | ১৯ | ০৮ | ২৯.৬২% |
| ২০১৬ | ২৫ | ১৫ | ১০ | ৪০% |
| ২০১৭ | ৩৪ | ২৫ | ০৯ | ২৬.৪৭% |
| ২০১৮ | ৪৫ | ২৯ | ১৬ | ৩৫.৫৬% |

৭. মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলায় সমাপনী পরীক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ

| সাল | শিক্ষার্থী সংখ্যা | ছেলে শিশু | মেয়ে শিশু | মেয়েদের অংশগ্রহণের হার |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৫ | ২৫১ | ১০৩ | ১২৮ | ৫০.৯৯% |
| ২০১৬ | ২২১ | ১১৯ | ১০২ | ৪৬.১৫% |
| ২০১৭ | ১৭২ | ৮০ | ৯২ | ৫৩.৪৮% |
| ২০১৮ | ১৭২ | ৮১ | ৯১ | ৫২.৯০% |

# পঞ্চম অধ্যায়
# প্রথম পরিচ্ছেদ

## ৫.১.১ বাংলাদেশের সমাজ জীবনে মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব

বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় সমগ্র সমাজ জীবনে মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯০ ভাগ মুসলমান। মুসলমানদের সমাজ গঠন, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদি প্রতিপালনের ভিতর দিয়ে সমাজে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সামাজিক সাংস্কৃতিক সৌহার্দ বিনিময়ে মাদরাসা শিক্ষার বিশেষ অবদান রয়েছে। এ কারণে মাদরাসা শিক্ষার নৈতিক ভিত্তি ও সমাজ জীবনে মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব বিস্তারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

## ৫.১.২ ইবতিদায়ী শিক্ষার্থদের নৈতিক ভিত্তি

মুসলমানদের জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আমল-আখলাকের উপর ভিত্তি করে। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ ও উপদেশাবলী, বিভিন্ন নির্দেশনা ও অবগতিমূলক জ্ঞান গবেষণার আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই হলো মাদরাসা শিক্ষার মূল বিষয়। মাদরাসা শিক্ষা নিছক ধর্মীয় শিক্ষা নয়। মুসলমানদের ইসলামী সমাজ গঠন এবং অন্যান্য ধর্মীয় জনগাষ্ঠীর সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জাগতিক বস্তুসমূহের গুণাগুণ ও তার সমন্বিত রূপকেও মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার গুণাগুণ শিক্ষার্থীর আচরণে বাস্তব রূপ লাভ করে এবং এভাবে মাদরাসা শিক্ষার্থীর নৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। । মাদরাসা শিক্ষার কাঠামোগত স্তরের বিভিন্ন ধাপে শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়েছে, তার উদ্দেশ্যাবলী বা গাইড লাইন থেকে সে সম্পর্কে জানা যায়। দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানবিক বিষয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে ইবতিদায়ী শিক্ষার মূল লক্ষ্য। উপরে বর্ণিত মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ইবতিদায়ী শিক্ষার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে হবে।

১. শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা যেন এ বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার। উৎস হিসেবে কাজ করে।

২. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।

৩. ঈমান-ই-মুফাছছিলে বর্ণিত বিষয়াদি আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত ও তকদীর সম্পর্কে জানা ও বিশ্বাস স্থাপন করানো।

৪. পারস্পরিক সমঝোতা এবং সবার প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করানো।

৫. কায়িক শ্রমের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

৬. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে তার অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

৭. দেশ প্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

৮. জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবাধে জাগিয়ে তোলা।

৯. শিক্ষার্থীর শারীরিক বিকাশে সহায়তা করা এবং স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে অভ্যাস ও মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

১০. মাতৃভাষা, সংখ্যাজ্ঞান ও হিসাব সম্পর্কিত মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা ।।

১১. শিখনে দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।

১২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

১৩. শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশকে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করা।

১৪. শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করা।

১৫. শিক্ষার্থীর মনে সৌন্দর্যবোধে জাগিয়ে তোলা এবং পারস্পরিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

১৬. বাঞ্ছিত সামাজিক আচরণ অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।

১৭. সমগ্র মানব জাতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর সৃষ্টিড় এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর মনে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব এবং আর্ন্তজাতিকতাবাধে জাগিয়ে তোলা।

১৮. কুরআন ও হাদীস বোঝার লক্ষ্যে আরবী ভাষায় প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন ও ব্যবহারে সহায়তা করা।

ইবতিদায়ী স্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য এই স্তরের অর্জন উপযোগী নিম্নোক্ত প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো চিহ্নিত করা হলো:

১. সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ও বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহর একত্বে অটল বিশ্বাস স্থাপন করা।

২. আল্লাহ রাব্বল আ'লামীনের অসীম অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ চিত্ত হওয়া এবং সব কাজে তাকে স্মরণের মাধ্যমে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

৩. আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন চরিত জানা এবং তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করা।

৪. রাসূলগণ, কিতাবসমূহ, ফেরেশতামণ্ডলী, আখিরাত ও তকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং সে অনুসারে জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা।

৫. স্রষ্টার সব সৃষ্টিকে ভালবাসা। ৬. সব ধর্মাবলম্বীর প্রতি সম্মান ও সহনশীলতা প্রকাশ করা।

৭. নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, পেশা ও জীবন ধারার বৈচিত্র নির্বিশেষে সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

৮. কায়িক শ্রমযুক্ত কাজে আগ্রহী হওয়া ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৯. পিতা-মাতা, গুরুজন, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও কর্তব্য পালন করা।

১০. পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে জানা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।

১১. বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে জানা এবং নাগরিক দায়িত্ব পালন করা।

১২. অপরের মতামত প্রকাশের সুযোগে দান এবং ব্যক্ত মতামতের প্রতি সহনশীল হওয়া।

১৩. প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে যোগ্য দলনেতা ও দলের সদস্য হিসেবে গড়ে ওঠা।

১৪. দেশকে জানা ও ভালবাসা।

১৫. জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে গর্ববোধ করা।

১৬. জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

১৭. সময়ের অপচয় পরিহার করা।

১৮. সুস্থ জীবন যাপনের জন্য সবলদেহ গঠনের গুরুত্ব বোঝায়।

১৯. খেলাধুলা এবং শরীর চর্চায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবল দেহ ও গঠনে আগ্রহী করে তোলে।

২০. দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্যবিধি জানা ও পালন করা।

২১. সুষম খাদ্য সম্পর্কে জানা, এর গুরুত্ব বোঝা এবং এরূপ খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করা।

২২. সাধারণ রোগ-ব্যাধির কারণ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা এবং সতর্কতা অবলম্বনে আগ্রহী হওয়া।

২৩. সহজ বাংলা ভাষায় ছাপা ও হাতে লেখা বিষয়বস্তু বুঝে শুদ্ধভাবে পড়তে পারা। এবং পাঠদান ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় লিখিত বিষয়বস্তু পড়ে জ্ঞানার্জন। অব্যাহত রাখতে সমর্থ হওয়া।

২৪. সহপাঠী ও অন্যান্যের সাথে মনোভাব ও অনুভূতি সঠিক ও কার্যকরভাবে প্রকাশ ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারা।

২৫. নিজের মনোভাব সহজ বাংলাভাষায় শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে লিখে প্রকাশ করতে পারা এবং দৈনন্দিন কার্যাবলী যা মাতৃভাষায় প্রকাশ করা প্রয়োজন, তা সুষ্ঠুভাবে করতে পারা।

২৬. সহজ বাংলায় কথোপকথন, বক্তৃতা, বর্ণনা ইত্যাদি মনোভাব সহকারে শুনে মূলভাব বুঝতে পারা।

২৭. সংখ্যার মৌলিক ধারণা লাভ করা এবং সংখ্যা ব্যবহার করতে পারা।

২৮. গণিতের মৌলিক চারটি নিয়ম জানা ও ব্যবহার করতে পারা।

২৯. দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে হিসাব-নিকাশের সহজ কৌশলগুলো প্রয়োগ করতে পারা।

৩০. মুদ্রা, দৈর্ঘ্য, ওজন, ক্ষেত্রফল, আয়তন ও সময়ের এককগুলো জানা ও ব্যবহার করতে পারা।

৩১. জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলাতে চেনা ও বোঝা।

৩২. পাঠ বহির্ভূত বই-পুস্তক, সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকা পাঠের অভ্যাস গঠন। করা।

৩৩. স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও নিজের মত ব্যক্ত করার সামর্থ্য অর্জন করা।

৩৪. নিজের উন্নয়নের জন্য অপরের গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ ও ব্যবহারে। আগ্রহী হওয়া।

৩৫. কারণ ও ফলাফলের সম্পর্ক শনাক্ত করা এবং দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ সমস্যা। সম্পর্কিত সহজ পরীক্ষা করা।

৩৬. প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করা।

৩৭. নিজস্ব জিনিসপত্র ও পরিবেষ্টনী সৌন্দর্য মণ্ডিত করার অভ্যাস গঠন করা।

৩৮. নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করা।

৩৯. ব্যক্তিগত ও জনসাধারণের সম্পদের যত্ন নেয়া।

৪০. সময়ানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে  তোলা।

৪১. বিভিন্ন সম্পর্ক যুক্ত ব্যক্তির সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে তা জানা এবং তদনুযায়ী শিষ্টাচার অনুশীলন করা।

৪২. সহজ আরবী ভাষায় লিখিত বিষয় পড়তে ও বুঝতে পারা।

৪৩. পরিচিত বিষয়বস্তুর আরবী নাম বলতে, লিখতে ও পড়তে পারা।

৪৪. কুরআন মজীদ ও হাদীস-এ রাসূলের নির্ধারিত অংশ তাজবীদসহ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়া এবং মুখস্থ করা।

৪৫. ইংরেজি বিষয়াদির ইংরেজি বুঝতে, বলতে, পড়তে ও লিখতে পারা।

মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচির এ শিক্ষার (উপরে বর্ণিত) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সরাসরি, কুরআন, হাদীস, ফিকহ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের মূল বক্তব্যকে কুরআন-

হাদীস তথা ইসলামের শান্তি-সৌহার্দ্যের বাণীকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করা হয়েছে। ১ম শ্রেণী থেকে অন্যান্য শ্রেণীতে ক্রমান্বয়ে আলোচ্য বিষয় বা ভাববস্তু নির্ধারণে ধর্মবোধ, দেশপ্রেম, জীবন গঠন, মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, নীতিবোধ প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। পাঠ্যসূচির আলোচ্য বিষয়কে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার কার্যসূচি বিভিন্ন শ্রেণীতে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা অশিক্ষায়, অজ্ঞানতায়, পাপাচারে, কুশিক্ষায়, জরাজীর্ণ সমাজের বহুমুখী সমস্যার সমাধান ও উদ্ভূত প্রশ্নের সম্মুখীন হলেও কুরআন হাদীসের আলোকে জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। সমাজ দেহে যে কোন সময়, যে কোন স্থানে, যে কোন প্রকার ব্যাধি দেখা দিতে পারে। ব্যাধি সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণ না করে যেমন তার প্রতিকারের স্থায়ী উপায় পাওয়া যায় না, তেমনি সামাজিক ব্যাধিগুলো উৎপাটন করতে হলে তারও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত বহু সূত্রের সাথে শিক্ষার মাধ্যমেই পরিচয় লাভ করে। হাদীসে তার সমাধানের দিকনির্দেশনা পায়। তাই দেখা যায়, মাদরাসা শিক্ষার্থীরা কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে সমাজ বিশ্লেষণ, ইতিহাসের আলোকে সামাজিক রোগ-ব্যাধির কারণ, মানুষের প্রতিকারের প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি আল্লাহর বিচার প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে। এভাবে একজন মাদরাসা ছাত্র সামাজিক মানুষ ও আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা হিসেবে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কাজেই মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমেই শিক্ষার্থীদের নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ৫.২.১ মানব জীবনে মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব

মাদরাসা শিক্ষিত ব্যক্তি এখনো আমাদের সমাজে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। যিনি মাদরাসার শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা মসজিদের ইমাম, বা মাদরাসায় শিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তি, ধর্ম প্রচারক, তার চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, কথা-বার্তা সব কিছুতেই শালীনতা এবং বিনয়ের ভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ কারণে সমাজের অপরাপর ব্যক্তি তাদের শ্রদ্ধার সাথে, সম্মানের সাথে দেখে থাকেন।

একজন সাধারণ মানুষ উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের একজন লোককে দেখলেই সালাম দেন, কুশল বিনিময় করেন। আর বেশি পরিচিত হলে পারিবারিক খোজ-খবরও আদান-প্রদান করতে দেখা যায়। তাদের দোয়া আশীর্বাদ বিনিময় হয়। অধিকন্তু মাদরাসার একজন লোক কোন মুসলমানের সম্মুখে উপস্থিত হলেই অপরিচিত হলেও সালাম বিনিময়কে তার কর্তব্য মনে করেন। আর সুন্নাতে রাসূলের এই ভাব বিনিময় একজন অপরিচিত লোককে সহজেই আন্তরিকতা নিয়ে পরিচিত হতে সাহায্য করে।

আমাদের দেশে বাস্তব চিত্র হল : মানুষ বিপদে পড়লে আলিমদের শরণাপন্ন হন। দোয়া চান। অনেক সময় কিছু হাদিয়া ও উপঢৌকনও দিয়ে থাকেন। আবার কোন আর্থিক বা সামাজিক কাজে সাফল্য লাভ করলেও আলিমদের শরণাপন্ন হন। মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন বা মিলাদ পড়ে দোয়া কামনা করে শুকরিয়া আদায় করেন। এভাবে সুখে-দুঃখে সমাজের মানুষ আলিমদের সান্নিধ্যে এসে থাকেন। আলিমদের ওসিলায় পরকালীন মুক্তির সওয়াব রেসানী চান। সামাজিক বা আর্থিক কোন কাজ আরম্ভ করতে মিলাদ পড়ানোর রেওয়াজ সমাজের প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান। আর এই মিলাদ পড়তে মাদরাসায় পড়ুয়া লোকদেরই প্রয়োজন হয়। যে কোন কাজের প্রারম্ভে আল্লাহ রাব্বল আলামিনের নিকট শুধু নিজের চাওয়াই তৃপ্ত হওয়া যায় না। যারা সর্বদা আল্লাহর দিদারে আছেন বলে মনে হয়, মাদরাসায় পড়া সেসব ব্যক্তিদের অন্তর দৃষ্টিকেও বাংলাদেশের সমাজে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়। বাংলাদেশের শহরে, গ্রামে, সকল স্তরের কিছু কিছু লোককে আলিমদের সান্নিধ্য ও সাহচর্যে সময় কাটাতে দেখা যায়। তারা আহলে সুফফার মত সার্বক্ষণিকভাবে আলিমদের সাথে থেকে ইসলামের মর্মবাণী জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। দীনী শিক্ষায় অনগ্রসর যেসব লোক আলিমদের নিকট অল্প অল্প শুনে শুনে তা নিজেদের আচরণিক জীবনে কাজে

লাগান। এ ক্ষেত্রে সমাজের এক শ্রেণীর লোকের মনোজগতের আধ্যাত্মিক প্রেরণায় মাদরাসায় শিক্ষিত লোকদের বা মাদরাসা শিক্ষার প্রভাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

গ্রাম বাংলায় মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠার প্রারম্ভ থেকেই দুটি ধারায় সমাজ ব্যবস্থা চালু হয়। একটি মসজিদকেন্দ্রিক, অপরটি পঞ্চায়েত[৪১৬] কেন্দ্রিক। বৃটিশ আইন চালু হওয়ার পর হিন্দুদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও অনেকটা লোপ পায়। বর্তমান গ্রাম বাংলা সর্বত্র মুসলিম সমাজ মসজিদকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠিত। যে কোন মুসলিম ব্যক্তি বা পরিবার কোন না কোন মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত। এখনো নবান্নের ফসল উঠলে এবং বিভিন্ন ফলের মৌসুমে, ফল খাবার উপযোগী হওয়ার সময় মসজিদের ইমাম বা সমাজের নির্ধারিত মোল্লা সম্মানসূচক দাওয়াত অথবা তার খেদমতে পাঠিয়ে দেয়ার রেওয়াজ প্রচলিত আছে।

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে মানুষের এই তিনটি স্পর্শকাতর মুহূর্তে মাদরাসায় পড়া লোকদের প্রয়োজন হয়। জন্মের পরই শিশুর একটি সুন্দর নাম রাখার জন্য আত্মীয়-পরিজন ইসলাম ধর্মে শিক্ষিত একজন আলিমের শরণাপন্ন হন। তিনি আল্লাহর গুণাবলী বিশিষ্ট কোন নাম অথবা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তার সাহাবীদের নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোন নাম নির্বাচন করে দেন। ফলে বাংলাদেশের মুসলিম জনসংখ্যার ৯৯.৫০ ভাগ প্রকৃত নামই আল্লাহর গুণাবলী বিশিষ্ট অথবা রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীদের নামের অনুকরণ অনুসরণে রাখা হয়েছে। জন্ম মুহূর্তে আরো একটি বিষয় না বললেই নয়। সন্তান জন্মের সাথে সাথে নবজাতক শিশুকে শুনিয়ে আযান দেয়ার নিয়ম বাংলাদেশের সামাজিক প্রথায় এখনো প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ ছিল "শিশু জন্ম লাভের পর পরই তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত শুনাতে হবে।"

মৃত্যু ও মৃত্যু মানুষের জীবনে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির শেষ ধাপ। জন্মের পর মানুষের শত আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া, ইবাদত-বন্দেগী, জ্ঞান চর্চা, আবিষ্কার সব কিছুরই পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুর মাধ্যমে। লাশের আর কিছুই করার থাকে না। তখনই প্রয়োজন হয় জানাজা দিয়ে কবরস্থ করার। এরূপ স্পর্শকাতর মুহূর্তে

---

[৪১৬] পঞ্চায়েত ও অর্থ-সমাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্থানীয় সরকার বিশেষ। হিন্দু সমাজের আদি থেকেই এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বাংলা-পাক ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন আসার পর ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের বিচার ব্যবস্থা চলে যায় কাযীর দরবারে। তখন হিন্দুদের ধর্মীয় বিচারাদি মুসলিম আইনে করা সম্ভব নয় বলে, হিন্দু ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে হিন্দুদের জন্য এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। কিন্তু বৃটিশ গভঃ তাদের আইন চালু করার পর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সমাজ থেকে ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে।

প্রয়োজন হয় একজন মাদরাসায় শিক্ষিত ব্যক্তির। যিনি মৃত্যুর সময় মৃত্যুপথ যাত্রী ব্যক্তিকে তওবা পড়াবেন।

মৃত্যুর পরে জানাজা পড়াবেন। মাদরাসায় পড়া কোন ব্যক্তির প্রয়োজন এখানেই। শেষ হয় না। মৃত ব্যক্তির নিকট-আত্মীয়-স্বজন কোন আলিমের শরণাপন্ন হন দোয়া পড়া ও সওয়াব রেসানির জন্য, বিয়ে মানুষের জীবনে বিয়ে একটি অনবদ্য সুখ সম্ভাবনার মুহূর্ত। যিনি একজন। মুসলমানের বিয়ে পড়াবেন তাকে অন্যান্য যোগ্যতার সাথে অবশ্যই আলিম হতে হবে। খুতবা ও দোয়া পড়ার জন্য। বিয়ের সময়ও তাই একজন আলিমের শরণাপন্ন হতে হয়। সুন্নাতে রাসূল (সা.)

মাদরাসা শিক্ষার্থী অধিকাংশ এখনো সুন্নাতে রাসূল, আদতে রাসূল বা সুরাতে রাসূলের আকিদা সম্মতভাবে অবস্থান করেন। তাদের দেখেই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কথা স্মরণ হয়। ক্ষণিকের জন্য হলেও মন থেকে দুনিয়াবী কুমন্ত্রণা তিরোহিত হয়। মানুষের মনের লোভ-লালসা, চাতুরী, জিজ্ঞাসা ক্ষণিকের জন্য হলেও প্রশমিত হয়। যেখানে দুনিয়ার কামিয়াবীর চেয়ে আখিরাতের অন্বেষা বেশি সেরূপ পরিবেশে অন্তর জগতের পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। সুন্নাতে রাসূলের এই গুণাবলী মাদরাসায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা পুরোপুরি ধারণ করলে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

### ব্যক্তিগত প্রভাবে মাদরাসা শিক্ষা

শুরু স্বভাবগতভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে। শিক্ষার সমন্বয় হয় পারিবারিক, সামাজিক ও বৃহত্তর কোন সাংগঠনিক কাঠামো পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শিশু বয়সের শিক্ষা পাথরের উপর খোদাই করা নকশার মত। কাজেই মাদরাসা শিক্ষা অতি শিশু বয়সে ব্যক্তিগত পর্যায়ে শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, প্রতিটি শিশুই ইসলামের চরিত্রের উপর জন্ম লাভ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতাই তাদের ইহুদী, নাছারা ও মাজুসীরূপে তৈরি করে। একজন শিক্ষার্থী নিজের নাম, মাতা-পিতার নাম, ঠিকানা, প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা দিয়ে তার শিক্ষা জীবন শুরু করে। ধীরে ধীরে সে জেনে থাকে। একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাম ও তার গুণাবলী। হযরত মুহাম্মদ (সা.)সহ

অন্যান্য নবী ও রাসূলগণের নাম। আল্লাহর সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহারের কলাকৌশল। একজন মাদরাসা শিক্ষার্থী পর্যায়ক্রমে জেনে থাকে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পড়শীদের সাথে তার অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ। সে আরো জেনে থাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নিজের জীবনে কিভাবে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনে কোন নীতি ও নৈতিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এসবই একজন মাদরাসা শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত থাকছে। কাজেই এখানে ফেঁকি বা গোঁজামিল দেয়ার কিছু নেই। আর মাদরাসা শিক্ষার প্রথম কথাই হলো ইলমের সাথে আমলের সম্পর্ক থাকা। উপযুক্ত আলোচনার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী যা শিখল, তা বাস্তবায়নের একটি দিক আছে। ফলে একজন মাদরাসা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত আমল থেকেই শিক্ষার প্রভাব প্রতিফলিত হবে।

### পারিবারিক প্রভাবে মাদরাসা শিক্ষা

একজন শিক্ষার্থী তার সমগ্র পাঠ্যসূচির ইলমকে আমলে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর আদলে গড়ে উঠা একজন শিক্ষার্থী পুরা পরিবারকে প্রভাবিত করে। একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে তার কুরআন-হাদীসভিত্তিক অধিকার। ও কর্তব্য প্রয়োগ করে সে তার ভাই-বোন মাতা-পিতাকে জয় করে থাকে। একজন মাদরাসা শিক্ষার্থী তার পাঠ্যসূচির মাধ্যমেই জেনে থাকে পরিবারে তার নিজের অবস্থান। পরিবারের অন্যান্য সদস্যের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি। পাড়া-প্রতিবেশী এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে সম্পর্ক, দায়িত্ব ও কর্তব্য। তার দেখাদেখি পরিবারের অন্যান্য সদস্যও তার গুণগত প্রভাবে বিকশিত হয়ে থাকে। পরিবারের সবার সাথে একজন মাদরাসা শিক্ষার্থীর সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও কর্তব্যবোধ একটি পরিবারকে খুব সহজেই শান্তির নীড়ে পরিণত করে থাকে। পারিবারিক আনুগত্য এবং সৌহার্দের সাথে আরও একটি বিষয় জড়িত, তা হলো, মানুষের মৃত্যুর পর আর কোন ইবাদত করতে পারে না। তখন তার একমাত্র ভরসা থাকে উত্তরাধিকারীদের দোয়া। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন তার উত্তরাধিকারীগণ ভোগ করার

অধিকার লাভ করে; তেমনি মৃত ব্যক্তির কবর ও পরকালীন সুখ-শান্তির জন্য মহান রাব্বল আলামিনের নিকট মাগফিরাত কামনা করা কর্তব্যের মধ্যে এসে যায়। কিন্তু এ বিষয়টি একমাত্র মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচির মাধ্যমেই পড়ানো হয়ে থাকে। এসব শুধু নিছক শিক্ষার জন্য শিক্ষা নয়। এগুলো বাস্তব জীবনে প্রতিপালনের জন্য কুরআন অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত অবশ্য কর্তব্য ধর্মীয় বিধানেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ফরয-এর কোন একটি থেকে বিমুখ হলে ফরয তরক করা হবে। ফলে একজন মানুষের সব রকম কৃতিত্বের সাথে পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কাজে পরিণত হয়।

**সামাজিক প্রভাবে মাদরাসা শিক্ষা :**

একটি পরিবার যখন ইসলামিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়। এরূপ পরিবারের প্রভাব অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের আকৃষ্ট করে। একটি পরিবার যখন জ্ঞানে-গুণে, সম্প্রীতি, ধৈর্যশীলতা প্রভৃতি বিষয়ে একটি মডেলে গড়ে ওঠে সমাজের অন্যান্য পরিবার তাদের অনুকরণ করতে বাধ্য। এরূপ একটি-দুটি পরিবারের দেখাদেখি পুরো সমাজ পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে আর সে জন্য ইলমের সাথে আমলের সমন্বয় থাকা প্রয়োজন।

## ৫.২.২ শিক্ষা বনাম কর্ম সংস্থান ও মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব :

সামগ্রিকভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন সাধন করা। কিন্তু তা হলো শিক্ষার ব্যবহারিক দিক। শিক্ষার একটি গুণগত ও মানগত দিকও আছে। আর তা হলো শিক্ষার সমমানে কর্ম সংস্থান পাওয়া। কর্ম সংস্থান পাওয়ার উপরই শিক্ষার সুফল নির্ভর করে। বর্তমান সমাজে অনেক শিক্ষিত  লোক আছেন, অথচ সবার কর্ম সংস্থান নেই। অনেকেই বেকার জীবন যাপন করছেন। তারা কর্ম সংস্থানের অন্বেষণে অনেক কাঠ-খড়ি পুড়িয়েও শূন্য হাতে ঘরে ফিরছেন। সময়ের ব্যবধানে তাদের কামনা-বাসনাকে বেশিদিন দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। ধীরে ধীরে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাদের অর্জিত আচরণ নিজের অজান্তেই বিদায় নেয়। তারা তাদের হতাশাকে আড়াল করার জন্য নানা রকম ফন্দি-ফিকির অবলম্বন করেন। কিন্তু তাদের আচরণিক

ছায়াপাত সামাজিক চক্ষুকে ফাকি দিতে পারে না। সে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। নিজের জীবনে অবক্ষয়ের সাথে সামাজিক অবক্ষয়সমূহকে মিলিয়ে দেয়। অবক্ষয়ের বিস্ফোরণে সামাজিক বিবেক থমকে দাঁড়ায়।

এখন প্রশ্ন হলো, জীবনের সম্ভাবনাময় দিনগুলোতে যে অনাগত দিনের সুন্দর আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একজন ছাত্র বিদ্যা অর্জন করে বা আচরণের পরিবর্তন সাধন করে। অথচ বাস্তব জীবনের মুখোমুখি এলে তার সে আচরণের ছক ভেঙে যায়। এক সময়ের অতি ভদ্র ছেলেও অজ্ঞান ও নিষ্ঠুর জীবন যাপনে প্রবৃত্ত হয়। একজন শিক্ষিত মানুষকেও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে দেখা যায়। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃংখলা বিঘ্নিত করে। তবে এখানে দেখার বিষয় হলো এমন কি শিক্ষায় শিক্ষিত হলো যে, অভাবের তাড়নায় তার স্বভাব নষ্ট হলো।

আমাদের দেশে জাতীয় পর্যায়ে দু'ধরনের শিক্ষাধারা বা পদ্ধতি চালু আছে। প্রথমত সাধারণ শিক্ষা, দ্বিতীয়ত মাদরাসা শিক্ষা। এ দুটি শিক্ষাধারা বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন মেরুতে অবস্থান নিয়েছে। প্রথমোক্ত শিক্ষা ধারার ৯০ ভাগ ভাষা ও সাহিত্যসহ নানা প্রকার জাগতিক বস্তুর নাম, গুণ ও ব্যবহারিক নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাদের সমন্বয় সাধনের উপর নির্ভরশীল। আর বাকি ১০ ভাগ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকেন্দ্রিক। দ্বিতীয়ত মাদরাসা শিক্ষা ধারার ৬০ ভাগ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এবং বাকি ৪০ ভাগ ভাষা সাহিত্য এবং জাগতিক বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও তার ব্যবহারিক নিয়মাবলীর সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক, সেসব বিষয়ের উপর স্রষ্টার বাণী, নৈতিকতাবোধ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। এতে দেখা যায় মাদরাসা শিক্ষা শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয়। শুধু জাগতিক বস্তুর নাম বা গুণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নয়।

মাদরাসা শিক্ষা সর্বস্তরের বস্তু, বস্তুর নাম ও গুণ, স্রষ্টা, সৃষ্ট বস্তুর ব্যবহার ও কার্যকারিতা প্রভৃতির আলোচনার সাথে নৈতিক শিক্ষাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এদিকে সাধারণ শিক্ষার ১০ ভাগ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার বিষয় থাকলেও ৯০ ভাগ সাধারণ শিক্ষার চাপে এবং প্রতিষ্ঠানে নৈতিক মূল্যবাধের কড়াকড়ি না থাকায় তা হারিয়ে যেতে বাধ্য। একথা বলার

অর্থ এমন নয় যে, সাধারণ শিক্ষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হচ্ছে। আমাদের প্রচলিত সমাজের শিক্ষার বাজার অর্থনীতি আলোচনা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে হয়।

আজকের একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসে অবাক হতে হয় শিক্ষিত বেকারের বেহাল অবস্থা দেখে । আজকে ছোট্ট একটি কাজের এস এস সি সমতুল্য পাসের কোন পদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়া মাত্র শত শত বি.এ. এম.এ. পাস প্রার্থীর ভিড় জমে যায়। অনেকে অতিরিক্ত উচ্চ শিক্ষার সনদ গোপন করেও ছোট পদে চাকরিতে আবেদন করতে দেখা গেছে। এমন কি গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি নিয়েও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দারোয়ানের চাকরি করতে দেখা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা বাজার অর্থনীতিতে টিকিয়ে রাখা খুবই মুশকিল। বিষয়টির অবতারণা এজন্য করা হলো যে, এরূপ ক্ষেত্রে এখনো বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা তুলনামূলকভাবে এগিয়ে আছে।

মাদরাসা শিক্ষাধারার প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষা, যা-ই হোক এখনো মাদরাসায় শিক্ষিতদের অতটা বেহাল অবস্থা হয়নি। মাদরাসা শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বেকার বা হতাশাগ্রস্ত জীবন যাপন করছে, এমন কোন নজির এখনো দেখা যায়নি। এমনকি মাদরাসায় শিক্ষকতার পদ বহু স্থানে খালি আছে। বার বার বিজ্ঞাপন দিয়েও প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ লোকদের চাকরি দিতে হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৭৬৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতেকটিতে অন্তত একজন করে মাদরাসায় পড়া শিক্ষক আছেন। একইভাবে ১৩৪১৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতেই একজন করে মাদরাসায় পড়া শিক্ষক আছেন। এছাড়া যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকদের মধ্যেও মাদরাসায় পড়া শিক্ষক আছেন।

**মাদরাসা শিক্ষায় নানামুখী কর্ম সংস্থান :**

মাদরাসা শিক্ষা পবিত্র কুরআন হাদীসভিত্তিক একটি নৈতিক শিক্ষা। মাদরাসার শিক্ষার্থীদের বিদ্যার্জন শুরু হয় মুসলমানদের জীবনাচরণের অবিচ্ছিন্ন রূপরেখা অনুসারে। মাদরাসা শিক্ষার প্রথম কথাই হলো যতটুকু জ্ঞান অর্জিত হলো, ততটুকু বাস্তব আমলে পরিণত করতে হবে। এভাবে ইলম এবং

আমলের সমন্বয়ে এ শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। একজন শিক্ষার্থী যতটুকু অর্জন করে ততটুকুই সে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়। অর্জিত জ্ঞানের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাদরাসাসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন, শিক্ষকদের তত্ত্বাবধান, মনিটরিং, পর্যবেক্ষণ, সহযোগিতা এবং কোন বিষয়ে ব্যতিক্রম হলে তাৎক্ষণিক প্রতিকারের ব্যবস্থা মাদরাসার শিক্ষার্থীদের ইলমকে আমলে পরিণত করতে বিশেষ সাহায্য করে। এ পর্যায়ে দেখা যায় একজন শিক্ষার্থী শিক্ষা সম্পাদনের পূর্বেই বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে। একজন শিক্ষার্থী দিনের কোন নির্দিষ্ট সময় শিক্ষা লাভ করে। এর সাথে কোন মসজিদের ইমামতি করে। কোন মক্তবে শিক্ষকতা করে। এতে সে শিক্ষায় বাজার অর্থনীতিতে সফলতা পায়। অন্যদিকে তার সমগ্র কাজকে একটি নিছক চাকরি বা কর্ম সংস্থান হিসেবে ধরা যায় না। কারণ আমাদের দেশে চিকিৎসা এবং কৃষির বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। যা সরকার জনকল্যাণে সেগুলোর লোকবল রেখেছেন। কিন্তু কৈ? কজন চিকিৎসক তার দায়িত্ব পালন করেন। কয়েকজন কৃষিবিদ কৃষকদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। অথচ মাদরাসার একজন শিক্ষার্থী (বেতন যাই পাক) ইমামতি করলে নিজের ইবাদত-বন্দেগির সাথে সাথে সমাজের অপরাপর লোকদের ইবাদত-বন্দেগিতে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। তাদেরকে একামতে দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। মুসল্লিদের নিয়ে সকাল সন্ধ্যায়; এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যেক নামাযের পরেই ইল্‌ম ও আমলের উপর বয়ান রাখেন। একজন ইমাম সপ্তাহান্তে (জুমার দিনে) অবশ্যই বহু লোকের সমাগমে ধর্মীয় বিধিবিধান ও নীতি-নৈতিকতার উপর নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখার সুযোগ পান। মসজিদের দেশ বাংলাদেশ। প্রতি শুক্রবার দুপুর বারটার পরই সারা দেশে একযোগে একামতে দীনের আহ্বানে মুখর হয়ে ওঠে বাংলার গ্রাম ও শহর। সারা দেশে শুধু মাইকযোগে আহবান করতে থাকে পাপাচারকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে ভালর পথে, আলোর পথে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার জন্য। সে ক্ষেত্রে অনেক মসজিদ মাদরাসা। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা ছাত্ররাই ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। সমাজে অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার, রাহাজানি পাপাচারের বিরুদ্ধে আল্লাহর বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেন মসজিদের ইমামগণই।

একজন মাদরাসার শিক্ষার্থী ছাত্র অবস্থায়ই তার কর্ম জীবন শুরু হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন মসজিদকেন্দ্রিক অথবা কোন ব্যক্তির বাংলা ঘর বা কাছারি ঘরে অথবা বৈঠক খানায় গ্রামের ছোট-বড় সর্বস্তরের লোকদের শিশুদের কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তার দ্বারা এ শিক্ষালয়ের জন্য শিক্ষকের

উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। সাধারণত নিম্নমাধ্যমিক স্তরের একজন শিক্ষার্থী দ্বারাও এ জাতীয় শিক্ষালয় বা মক্তব/ফোরকানিয়া মাদরাসা পরিচালনা করা সম্ভব। বাংলাদেশের এমন কোন মহল্লা নেই যেখানে মসজিদ মক্তব নেই। বিশেষ বিশেষ মক্তব ছাড়া এ জাতীয় অধিকাংশ মক্তবই মাদরাসার শিক্ষার্থী দ্বারাই পরিচালিত হয়।

**মক্তব মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র।মক্তবে শিশুদের আল্লাহ ও রাসূলের নামের সাথে প্রথম পরিচয় হয় একজন মুসলিম হিসেবে ঈমানের** ঘোষণা, তার পরিভাষা, ঈমানের বিভিন্ন স্তর ও পূর্ণাঙ্গতা। মুসলিম হিসেবে পাক-পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ইবাদত-বন্দেগির নিয়ম-কানুন, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত প্রভৃতি ইসলামের মৌলিক কর্তব্যসমূহ, হালাল-হারাম, বিভিন্ন স্তরের লাোকদের কর্তব্য, পিতা-মাতা ও সন্তানের অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি সম্পর্কেও মক্তবেই প্রথম পাঠ শুরু হয়। প্রতিবেশীকে ভালবাসা, প্রতিবেশীর উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কচি মনের শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা এ শিক্ষার একটি গুণ। পূর্ণাঙ্গ মাদরাসা শিক্ষায় আলোচ্য বিষয়সমূহ আনুষ্ঠানিকভাবেই পড়ানো হয়। তবে তৃণমূল পর্যায়ে এরূপ কাজের মাধ্যমে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা বাজার অর্থনীতির দিক থেকে নিজেদের স্থান করে নিলেও প্রকারান্তরে তাদের এ কাজ নতুন প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার জন্য একটি আদর্শ স্থানীয় শিক্ষালয় হিসেবে গণ্য হতে পারে। এ পর্যায়ে তারা একদিকে নিজেদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করছে, অপর দিকে এক একটি শিশুর মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে একটি সুন্দর সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে নিজেদের শ্রম দিচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে একটি মহত কাজ। প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাবে মাদরাসা শিক্ষা। মাদরাসা শিক্ষার একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব সব যুগে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়।। যেখানে একটি মাদরাসা গড়ে উঠেছে, তার আশ-পাশের লোকজন মাদরাসায় পড়ার প্রতি বেশি বেশি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। ১৭৮০ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর বাঙালিরা শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হতে দেখা যায়। ১৮১৭ সালে হুগলীতে একটি মাদরাসা, ১৮৭৩ সালে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে তিনটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা কমেনি বরং এ সব মাদরাসায় মুসলমানদের লেখা-পড়ার ব্যাপক আগ্রহ দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকহারে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোন বিশেষ স্থানে মাদরাসা শিক্ষার্থীর সংখ্যার আধিক্য দেখা যায়নি। আবার কোথাও শিক্ষার্থী শূন্য ছিল না; বরং বিভিন্ন অঞ্চলে মাদরাসা গড়ে ওঠায় দূর-দূরান্তে গিয়ে যাদের পক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভব হতো না এমন শিক্ষার্থীরাও নিজ বাসস্থানে থেকে অন্তত মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মাদরাসায়

লেখাপড়া করতে পেরেছে। তাদের অনেকে পরবর্তী সময়ে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষা লাভেও সমর্থ হয়েছিলেন। এমন কি ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চ পদস্থ চাকরিজীবী, শিক্ষক, আইনজীবী, কূটনীতিবিদ, ব্যবসায়ীদের অনেকেই প্রথম জীবনে হাই মাদরাসায় পড়ুয়া ছিলেন। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত হাই মাদারাসার অস্তিত্ব বাংলাদেশে বর্তমান ছিল। আর হাই মাদরাসাই ছিল বৃটিশ বাংলার অভিজাত মুসলিম পরিবারসমূহের শিক্ষার একমাত্র সুযোগ।[৪১৭] অবশ্য মাদরাসা শিক্ষার ওল্ড স্কীম ধারা ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের পূর্বের হাই মাদরাসার সমমানে উন্নীত হয়। এই ধারা শুরু হওয়ায় মাদরাসার ছাত্রদের ফাজিল বা কামিল পাস করে পুনরায় ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে এস. এস. সি. পাস করার ঝামেলা থেকে মুক্ত করে। ১৯৬৪ সাল। থেকে মাদরাসায় ফাজিল পাস করে সরাসরি কলেজে একাদশ (আই, এ.) শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়।

উপরোক্ত বিষয়টি বাংলাদেশের শিক্ষা জগতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাবের ফলে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রতি সাধারণ বিদ্যোৎসাহীদের উৎসাহ দেখা যায়। ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে দুটি সরকারি মাদরাসাসহ সর্বমোট মাদরাসা ছিল ১,১২৯টি, ১৯৭১ সালে দুটি সরকারিসহ মাদরাসার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,০৭৫টিতে। সরকারি গেজেট অনুসারে ১,৮৫,৩১২ জন ছাত্রীসহ সর্বমোট মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৬,৪৮.০৬১জন। এটা নিঃসন্দেহে প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাবেরই ফলাফল।[৪১৮]

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় মাদরাসা শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র)-এর (১৮৪৬-১৯৩৯ সাল) ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে। তিনি প্রায় সারা বছর বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়াজ-নসিহত করেছেন। বিভিন্ন স্থানে তিনি বাংলাদেশের কোন্ তারিখে যাবেন তা নির্ধারিত থাকত। তার সময়ে ইসলামী জিন্দেগী বাস্তবায়নের দিক থেকে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তার প্রতি মানুষের খুবই শ্রদ্ধা ও আগ্রহ ছিল। তিনিও সকল শ্রেণীর মানুষকে ভাল বাসতেন। বাংলাদেশে তার অনেক হিন্দু ভক্ত ছিল। তিনি যেখানেই গিয়েছেন একটি মাদরাসা অথবা মসজিদ প্রতিষ্ঠা না করে ছাড়েননি। মাদরাসা করার সাথে সাথে উপস্থিত। লোকদের সন্তানদের মাদরাসায় পড়ানোর অঙ্গীকারও

---

[৪১৭] ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী থাকা অবস্থায় ঐতিহ্যবাহী হাই মাদরাসা শিক্ষা ধারাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে একীভূত করে দেন। মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক(৬-১১-বছর বয়স) স্তরকেও সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষার সাথে একীভূত করেন । ফলে সে সময় থেকেই মাদরাসা শিক্ষা লেজকাটা অবস্থানে নেমে আসে।

[৪১৮] Q. Dr. A. K. M. Ayub Ali, History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983), P-217

আদায় করতেন। পীরের সাথে। ওয়াদার প্রেক্ষিতে একাধিক সন্তানের অন্তত একটি সন্তান হলেও মাদরাসায় পাঠানো। হতো। বাংলাদেশের মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার। ক্ষেত্রে ফুরফুরার এই পীরের এবং তার পরবর্তী গদ্দীনশীন পীরদের অবদান অনস্বীকার্য। তার অধঃস্তন হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী, আবদুল কাহহার সিদ্দিকী প্রমুখ পিতামহের মতই বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত মুসলমানদের শিক্ষানুরাগ সৃষ্টি এবং আহলে দীনের সমাজ জীবনে মাদরাসা শিক্ষার প্রভাবের বিভিন্ন দিক মেহনত করার কাজে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছেন। ফুরফুরা শরীফের উত্তরাধিকার হিসেবে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে আজও বহু সিদ্দিকীয়া মাদরাসা কালের সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে।[৪১৯] ফুরফুরা শরীফের আত্মিক উত্তরসুরি ছারছিনার পীর হযরত মওলানা নেছার উদ্দীন। ছারছিনা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই তিনি বাংলাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নের এক বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তিনি একদিকে ছিলেন আধ্যাত্মিক পীর, অন্যদিকে ইলমের প্রচার-প্রসারে আপন পীরের মত নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ কামিল ডিগ্রী গ্রহণকারীদের দ্বারা তিনি ইসলামী জীবনাচরণে প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন সমগ্র বরিশাল, খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর প্রভৃতি স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ফুরফুরার পীরদের মত ওয়াজ-নসিহত করতেন। শিক্ষাই মানুষকে অন্ধকার থেকে, অভাব থেকে, অন্যায় থেকে, ভালোর পথে, সমৃদ্ধির পথে, আলোর পথে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এ দাবিই তিনি করতেন। ফলে বাংলাদেশের বড় বড় মাদরাসার অধ্যক্ষদের খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা যায়, তারা মূলত ছারছিনা মাদরাসার ছাত্র ছিলেন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব হিসেবে এবং আঞ্চলিক দূরত্ব অনুপাতে মাদরাসার সংখ্যা খুবই কম। ফলে মাদরাসার ছাত্ররা দূর-দূরান্তে যাতায়াত করা অসুবিধা বিধায় মাদরাসার সীমাবদ্ধ দূরত্বে লজিং থেকে কোন মাদরাসায় পড়াশোনা করাই স্বাভাবিক ছিল। আর একজন মাদরাসার ছাত্র বাড়ির অপরাপর ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষক হিসেবে কাজ করে থাকতেন। বাড়ির ছোট ছোট বাচ্চারা অনেক সময় নিকটতম মানুষের অনুসরণীয়। হিসেবে ধর্মীয় কাজে আকৃষ্ট হতো। আজকে একবিংশ শতাব্দীর সীমানায় এসে বিভিন্ন স্তরের মাদরাসার সংখ্যা ২৫ হাজারের কোঠায় পা রাখলেও এখনো চৌদ্দ কোটি মুসলমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ সংখ্যা বেশি নয়। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায়। মাদরাসা সংখ্যা বেশি হওয়াতেই ব্যাপকহারে ছাত্র-ছাত্রী মাদরাসা শিক্ষায় অংশ নিতে পারছে।

[৪১৯] সম্পাদনা পরিষদ, মাসিক মুঈনুল ইসলাম (চট্টগ্রাম : দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম ভবন, ২০০০ সাল) পৃ. ৭।

রাজবাড়ি জেলার কল্যাণপুর নামক একটি গ্রামের তথ্যানুসন্ধান করে দেখা গেছে, ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত একজন মাত্র শিক্ষার্থী কামিল পাস করে। ১৯৮৬ সালে একটি দাখিল মাদরাসা ও ১৯৮৯ সালে একটি মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি পরিবারে মাদরাসায় পড়ুয়া ছেলে অথবা মেয়ে আছে। আসলে এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের ফল। সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে আরেক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে কওমী মাদরাসাসমূহের মাধ্যমে। আলিয়া মাদরাসাসমূহ সরকারী অনুমোদন, নির্ধারিত পাঠ্যসূচি, পড়ানোর সময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি থাকার ফলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের। করার কিছুই থাকে না। কিন্তু কওমী মাদরাসাসমূহে সরকারি নিয়মনীতি কড়াকড়ি না থাকায় তারা নিজস্ব নিয়মে পরিচালিত হতে পারে। কওমী মাদরাসাসমূহে কোন ছাত্র পাঠ শেষ না করে এবং উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থেকে তার সক্ষমতা প্রমাণ না করে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না। তেমনিভাবে কোন ছাত্র শুধু ইলম হাসিল করে আমলের পাবন্দী না হলেও তাকে পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়া হয় না। কওমী মাদরাসার একজন। শিক্ষার্থী ইলমের সাথে পূর্ণাঙ্গ আমলের নিশ্চয়তা দিয়েই সমাজের কাজে পাঠানো হয়।

কয়েকটি কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি বুঝতে আরো সুবিধা হবে। । বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসা' । উক্ত মাদরাসা থেকে প্রকাশিত মাসিক মঈনুল ইসলাম নামক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, তদানীন্তন বৃটিশ শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের এতদঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিকতা, তাহজিব-তমদুনের অবস্থা ছিল মুসলিম মিল্লাতের প্রতিকূলে। ঈমান, আমল, তাওহীদ, রিসালাত, শরীয়ত ও দীন সম্পর্কে অধিকাংশের অজ্ঞতা ছিল সর্বজন বিদিত। মুসলিম মিল্লাতের বৃহদাংশ শিরক, বিদআত, কবর পূজা, বৃক্ষ পূজা ও ঈমানের পরিপন্থী কুসংস্কার, হানাহানি-রাজাহানি, তথা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে নিমজ্জিত ছিল। মুসলমানদের অধঃপতনের এ চরম যুগসন্ধিক্ষণে পূর্ব বাংলার বন্দর নগরী চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারীতে মুসলমানদেরকে কুরআন-হাদীস ও দীন-শরীয়তের সহীহ্ ইলম শিক্ষাদানের নিমিত্তে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দের অনুকরণে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৪২০] এতে দেখা যায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে যুগের সামাজিক চাহিদাই তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। মুসলিম সমাজ যখন তাদের স্বকীয়তা বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল,

[৪২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

কুসংস্কার যখন সত্যপ্রিয় মানুষকে বিদগ্ধ করেছিল, তখনই তার প্রতিকারের উপায় হিসেবে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্পাদকীয়তে হাটহাজারী মাদরাসার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয় ।

**ইত্তিবায়ে সুন্নাত :** ও দারুল উলুমের সার্বিক কাঠামো পরিচালিত হয়ে আসছে সম্পূর্ণ ইত্তিবায়ে সুন্নাতের ভিত্তিতে। দৈনন্দিন কাজকর্ম, লেখা-পড়া, চলা-ফেরা, লেবাস-পোশাক সর্বত্রই সুন্নাতের অনুকরণ ও অনুসরণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কোন ছাপ। এখানে নেই এবং সরদারে দো জাহান শফীউল মুজনিবীন (সা)-এর বিলুপ্ত সুন্নাতসমূহের। পুনঃপ্রবর্তন তথা প্রচার-প্রসার এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য।”

**৫.২.৩ বিদআত প্রতিরোধে মাদরাসার অবদান :**

ইসলামে বিদ্আত একটি জঘন্যতম পাপ। শরীয়তের পরিভাষায় বিদ্আত বলা হয় দীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু সংযোজন বা সংকোচন করা। প্রত্যেক বিদ্আতই সুনাতের বিলুপ্তি সাধন করে। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস শরীফে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। দারুল উলুম হাটহাজারী প্রথম থেকেই সর্বপ্রকার বিআতের উৎখাত সাধনে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। হাটহাজারী মাদরাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্য আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রথমত আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করা। রাসুলুল্লাহর শিক্ষার মাধ্যমে সুশিক্ষিত, চরিত্রবান, ভদ্র ও একজন জ্ঞানী সমাজ পরিচালক হিসেবে ছাত্রদের গড়ে তোলা।[৪২১]

মাসিক মঈনুল ইসলামের সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়েছে, “প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা লাভ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে বেকারত্বের কোন সমস্যা নেই। সমাজে যেমন রয়েছে তাদের অবদান, তেমনি রয়েছে। তাদের চাহিদা ও মর্যাদা। ইসলামী শিক্ষার অনুপম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা সমাজের কোন না কোন খেদমতে লেগে যায়। তারা বিলাসিতা বা অলসতার দ্বারা সমাজের বোঝা হয়ে থাকে না।[৪২২] “বরং সমাজের ইয়াতীম, দরিদ্র, নিঃস্ব প্রভৃতি অবহেলিত সন্তানদের মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিং-এ রেখে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এ মাদরাসাটি শুধু দীনী শিক্ষা নয়, কউমে মিল্লাতের বহুমুখী সেবাদান, শির্ক-বিদআতের মুকাবিলা, দেশ ও জাতির প্রয়োজনে জানমাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার

[৪২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

[৪২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে।[৪২৩] এতে দেখা যায় মাদরাসাসমূহে শুধু আখিরাতের চর্চাই নয়-উপরন্তু আখিরাতের আলোক সমাজ, দেশ ও জাতির গৌরব গাঁথার চর্চাও হয়। এ মাদরাসার ফারেগ শিক্ষার্থী বা এ মাদরাসার আদলে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগসহ দেশের বহু স্থানে বহু মাদরাসা গড়ে তুলেছে। এ মাদরাসার প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব দেশের সর্বত্রই বিদ্যমান। বর্তমানে দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম একটি আল জামীয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়। এ ছাড়া এ মাদরাসায় একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা বোর্ড আছে। সমাজে মাদরাসা শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাবের নজির স্থাপন করে মহাগর্বের সাথে । হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে তালীমে দীনের শিক্ষা দিচ্ছে জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠার সূত্র থেকে জানা যায় ।

মুসলিম সমাজে দীর্ঘ দিন যাবত কুরআন-হাদীসের সঠিক শিক্ষা না থাকায় মানুষ। গোমরাহীর পথে ধাবিত হচ্ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে কিছু কিছু লোক নামাযী থাকলেও। সমাজের অধিকাংশ লোকের ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছিল না। ফলে পারিপার্শ্বিক হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের মত মুসলমানদের মধ্যেও কথিত পীর-ফকীরদের কবর পূজা, হিন্দুদের অনুকরণে বিভিন্ন পর্ব পালন ইত্যাদি সমাজকে গ্রাস করেছিল। ফলে সামান্য। প্রচার প্রপাগান্ডার দ্বারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বহু লোক কাদিয়ানী মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। এমন কি কাদিয়ানী সম্পর্কে জানার জন্য তদানীন্তন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বি. বাড়িয়া জামে মসজিদের ইমাম আবদুল আহাদকে পাকিস্তানের পূর্ব পাঞ্জাবের বাটলাম (মহকুমা শহর) পাঠান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো : তিনি মুরতাদ হয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং গোপনে কাদিয়ানী ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। তার অল্প দিনের প্রচারণায় অনেক মুসলিম কাদিয়ানীর অনুসারী হয়ে যান। কিন্তু ঈমানদার লোকগণ। আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেন। সমাজের চাহিদার আলোকে আল্লাহর সাহায্য চান ও প্রচেষ্টা চালান। ফলে বি. বাড়িয়ার সেই বিপথগামী সমাজ পুনরায় মুসলিম জামাতে শামিল হয়। একই সাথে স্থানীয়ভাবে একটি দীনী প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় ঘটে। বর্তমানে। বি, বাড়িয়ার সমাজে এ প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব অপরিসীম। এ মাদরাসার একটি কউমী মাদরাসার শিক্ষা বোর্ড রয়েছে।

অনুরূপভাবে চট্টগ্রামের পটিয়া জামেয়া ইসলামিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, পটিয়া শহরটি ঐতিহাসিক কাল থেকেই স্কুল-কলেজ পর্যায়ে শিক্ষায় উন্নত ছিল। কিন্তু দীনী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল

[৪২৩] মোঃ আবদুল হালীম বোখারী, জামেয়া ইসলামিয়া জমীরিয়া কাসেমূল উলুম পটিয়ার সংক্ষিপ্ত।

না। উপরন্তু সে এলাকায় নাস্তিকতা, কুসংস্কার, শিরক বিদ্‌আত ও কবর পূজার প্রথা প্রচলিত ছিল। এরূপ একটি বেহাল অবস্থা থেকে মুসলিম জনসাধারণকে ইসলামী জীবন বিধানের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার অদম্য আগ্রহ নিয়েই ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় পটিয়া জামেয়াই ইসলামিয়া মাদরাসা।[৪২৪] বর্তমানে এই মাদরাসাটি একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদালয়ে উন্নীত হয়েছে। প্রায়। ৪ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী এক সঙ্গে আবাসিক ব্যবস্থাপনায় ইলম ও আমলের মেহনত করছে। প্রতি বছর শত শত শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্ম জীবনে প্রবেশ করছে, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার জন্য এখানে আসছে। একদিনের কুসংস্কার আচ্ছন্ন পটিয়া এখন দীনের শিক্ষায় আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছে। এখানে একটি কউমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শিক্ষা গবেষণা ও আধুনিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা ইংরেজি, বাংলা, গণিত বিষয়কে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করেছে। দাওরায়ে হাদীস শিক্ষা শেষ হওয়ার পর বাংলা, ইংরেজি, ফি, তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী নিতে পারে।

জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি গৌরব উজ্জ্বল ঐতিহ্যের দাবিদার। মুসলিম-সমাজের অনৈসলামিক কার্যকলাপ, আচার-আচরণ, অজ্ঞানতা, প্রভৃতি প্রতিকারের সামাজিক চাহিদা অনুসারেই ১৯৫০ সালে। প্রতিষ্ঠিত হয় এ মাদরাসাটি। মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই যে শিক্ষা কার্যক্রম। চালু হয় তা আজও অক্ষুন্ন আছে। মসজিদের শহর ঢাকার অধিকাংশ মসজিদ এখন কুরআন শিক্ষা ও হাদীসের দারসের আসরে পরিণত হয়েছে। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হতে চলেছে, এ মাদরাসার শিক্ষিত আলিম সমাজ মাদরাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে মানুষকে পাপাচার থেকে বের হয়ে পুণ্যময় জীবনে প্রবেশের আহ্বান জানাচ্ছে। [৪২৫]কুরআন-হাদীস নির্দেশিত জীবন-যাপন করে ইহজগতের সাফল্য ও পরকালীন মুক্তির পথে ফিরে আসার জন্য বারবার তাগিদ দেয়া হচ্ছে। এতে অনেকেই ফিরে আসছে, কেউ তাদের কথায় কর্ণপাত করছে না। আবার অনেকে পাপেও আছে পুণ্যেও আছে। তারপরও দেখা যায়, জামেয়া। কুরআনিয়া আরাবিয়ার প্রভাবে ঢাকায় অনেক মাদরাসা গড়ে উঠেছে। এমন কি বেশ কয়েকটি মহিলা

---

[৪২৪] মওলানা মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, লালবাগ জামেয়া একটি যুগান্তকারী ইতিহাস, আল জামেয়া। স্মরণিকা ঢাকা, লালবাগ জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, ১৯93 সাল, পৃ. ১৩।

[৪২৫] মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, জামেয়া একটি যুগান্তকারী ইতিহাস, আল জামেয়া স্মরণিকা (ঢাকা: লালবাগ জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, ১৯93ইং সন), পৃ. ১৩

মাদরাসাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহিলা অঙ্গনেও মাদরাসা শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। সমাজে দুর্নীতির সংক্রমণ আর নীতি ও পুণ্যের মধ্যে মাদরাসা শিক্ষাই একটা ব্যালেন্সের সৃষ্টি করছে।

### সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

সমগ্র দেশে বড় বড় কিছু মাদরাসা ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট বড় কিছু কিছু মাদরাসা একত্রিত হয়ে বেসরকারিভাবে গঠন করেছে কউমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে । এসব শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার সাথে বৈরী কিছু নয়। সম্পূর্ণ নিজস্ব আর্থিক ও ইসলামকে ভালোবাসার মানসিক উৎস থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা এক একটি ঐক্যবদ্ধ শিক্ষা আন্দোলন প্রচার প্রসারের মাধ্যমে এ সমাজের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তিকে সাহায্য করছে। মানুষের পবিত্র আত্মায় বাসা বাঁধা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মনোজগতে বিপ্লব ঘটিয়ে সুন্দর সমাজ গঠনে নীতিবান, চরিত্রবান, সুনাগরিক গড়ার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এসব শিক্ষাবোর্ডের মধ্যে ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত দীনী কউমী শিক্ষা বোর্ড,[৪২৬] জামেয়া ইসলামিয়া বারকোট, সিলেট, ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, "আজাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশ" কানাইঘাট, দারুল উলুম মাদরাসা, সিলেট । [৪২৭]এছাড়া সমগ্র বাংলাদেশের কউমী মাদরাসাসমূহের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে[৪২৮] ১৯৭৮ সালে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 'বেফাকুল মাদারিরছিল আরাবিয়া বাংলাদেশ' বা 'বাংলাদেশ কউমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড,' ঢাকা।

উপযুক্ত ৩টি বোর্ডের গঠনতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করলে দেখা যায় সমাজে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এসব মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দীনী কউমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, বারকোটের পক্ষে বলা হয়েছে, "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, মানব মুক্তির চাবিকাঠি ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি।' কথাটি চিরন্তন সত্য যা অস্বীকার করা যায় না। বিশাল সাগরে নাবিকবিহীন জাহাজের যে দুরবস্থা শিক্ষাবিহীন জাতির অস্তিত্বও সেরূপ। আর শিক্ষা বলতে একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বের শিক্ষা এবং আল্লাহর সৃষ্ট পৃথিবীতে তাঁর নির্দেশিত শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। সমাজ ও জাতিকে মহান আল্লাহর

---

[৪২৬] বাংলাদেশ দীনী কাউমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ও আসাম প্রদেশের মাদরাসাসমূহকে এই বোর্ডের মাধ্যমে সাহায্য করাই তার লক্ষ্য ছিল। তার পূর্বের নাম। ছিল আসাম প্রাদেশিক আযাদ দ্বীনি-এদারায়ে তালিম'। বর্তমানে ১৯৬টি মাদরাসার ৬টি স্তরের কারিকুলাম নির্ধারণ ও পরীক্ষাসহ অন্যান্য কার্যক্রম এই বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

[৪২৭] প্রগুক্ত, পৃ : ১৩

[৪২৮] আসাম প্রাদেশিক আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালিম এবং একটি অংশ কানাইঘাট দারুল উলূম মাদরাসাকে কেন্দ্র করে সিলেট জেলার ১১২টি মাদরাসা, সুনামগঞ্জের ১১৩টি মাদরাসা, মৌলবী বাজারের ১৬টি মাদরাসা ও নবীগঞ্জের ৬টি মাদরাসা সর্বমোট ২৪৭টি মাদরাসা নিয়ে এই বোর্ড গঠিত ও পরিচালিত।

নির্দেশিত্ শিক্ষা দ্বারাই আল্লাহকে খুশি করা সম্ভব। সেই শিক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে আযাদ দীনী শিক্ষা বোর্ডের পদযাত্রা শুরু হয়েছে।[৪২৯] অনুরূপভাবে আজাদ দ্বীনি এদারায়ে তালিম বাংলাদেশ কানাইঘাট, সিলেট-এর সংবিধানে। লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ক. দীনী শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে খালেস দীনী মাদরাসা ও মক্তবসমূহ প্রতিষ্ঠা করা। মুসলমান ছেলে-মেয়েকে তাজবীদসহ কুরআন পাঠ ও পূর্ণ দীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করে এমন একটি আদর্শ সমাজ গঠন করা যার প্রতি কুরআনে নির্দেশ রয়েছে, আমাদের মধ্যে এমন একটি সমাজ হওয়া চাই, যারা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে।"

খ. প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ও মক্তবসমূহকে একটি ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করে একই সংবিধান ও সিলেবাস অনুসরণে পরিচালিত করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা।

গ. ইসলাম ধর্মের হিফাজত বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লিখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং মুসলিম উম্মার সর্বস্তরে দীনী শিক্ষা ও তাবলীগের মাধ্যমে খায়রুল কুরুন ও সলফে সালেহীনের আদর্শানুরূপ ইসলামী মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের আত্ম প্রত্যয়ী করে দেশের নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেওয়াই সম্মিলিত এই কউমী বোর্ডের উদ্দেশ্য।[৪৩০]

---

[৪২৯] ৭৬তম চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল, জামেয়া ইসলামিয়া বারকোট, সিলেট। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

[৪৩০] সংবিধান পৃ. ১-২, আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম বাংলাদেশ-এর বিগত ১১/২/১৪০৪ হিজরী মজলিশে শূরা কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ৫.৩.১ ইসলাম শিক্ষার সম্ভাবনা :

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে মেয়েদের মাদরাসায় পড়ালেখা করার ব্যাপারে এক ধরনের হীন মানসিকতা কাজ করত। ফলে কাওমী মাদরাসা সংশ্লিষ্টরা মনে করত, মহিলাদের কুরআন তিলাওয়াত করা এবং ধর্মীয় কিছু ইবাদত পালন ব্যতিরেকে অন্য কোন শিক্ষার প্রয়োজন নেই। আলিয়া মাদরাসাগুলোতে সহশিক্ষাকে পর্দার কারণে প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর মহিলাদের পড়ার সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হতো। স্বাধনিতার পর আস্তে আস্তে এসব ভ্রান্ত ধারণার বিলুপ্তি ঘটে। বর্তমানে আলিয়া ও কাওমী উভয় ধারাতেই নারীদের পর্দা রক্ষা করে পড়ালেখার জন্য মহিলা বা বালিকা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ইতোমধ্যে কয়েকটি কামিল স্তরের মহিলা মাদরাসা অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া দাখিল, আলিম ও ফাযিল স্তরের বেশ কিছু মাদরাসা স্থাপিত হয়েছে। এসব মাদরাসায় ছাত্রীদের অধ্যায়নের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় যে, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তবে সাধারণ শিক্ষা ধারায় নারী শিক্ষার জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। এগুলোর অনেকগুলোই মহিলা মাদরাসাগুলোতে নেই। সরকারী বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এ সকল সুযোগ সুবিধা নিম্চিত করতে পারলে মাদরাসা তথা ইসলামী শিক্ষায় বিপুল সংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণ ও শুধু সময়ের ব্যাপার এটা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে।  ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গত তিন দশকে সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ বড় বড় আশা বুকে ধারণ করেছে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ অত্যন্ত সময়োপযোগী সুপারিশসমূহ দাখিল করেছেন।

নীতি-নির্ধারকদের অনভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক সমস্যা, ইসলামী শিক্ষার প্রতি শ্রেণী হয়েছে। নিম্নের ছক থেকে এর সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করা যেতে পারে :

| ক্র. নং | চাহিদা | বাস্তবায়ন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম শিক্ষার বিষয় চালু করণ | কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়েছে | কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার বিষয়ে কোন বিভাগ নেই। |
| ২. | পাঠক্রমকে আধুনিক ও যুযোগপযোগী করণ | প্রাথমিক পর্যায়ে হয়েছে | উদ্যোগ নো হলেও সম্পন্ন হয়নি। |
| ৩. | মাদরাসা শিক্ষার দু'ধারর সমন্বয় সাধন | উদ্যোগ নেয়া হয়নি | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪. | সরকারী বৃত্তির সমতা | তুলনামূলকভাবে কম | আমলাতান্ত্রিক জটিলতার হচ্ছে না। |
| ৫. | মাষ্টার্স পর্যন্ত সমমান প্রদান | আলিমকে এইচ.এস.সি'র মান দেয়া হয়েছে | ফাযিল ও কামিলকে মান দেয়া হয় নি। |
| ৬. | একাধিক মাদরাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠাকরণ | একটি মাত্র বোর্ড সারা দেশের মাদরাসাসমূহের দায়িত্ব পালন করেন | উদ্যোগ নেয়অ হয়নি। |
| ৭. | মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামী | উদ্যোগ নেয়া হয়েছে | মহল বিশেষের অসহযোগিতার কারণে হয়নি। |
| ৮. | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক করণ | উদ্যোগ নেয়া হয়েছে | মহল বিশেষের অসহযোগিতার কারণে হয়নি। |
| ৯. | মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা | মাত্র ১টি চালু করা হলেও অপরাপর চলমান ইন্সটিটিউটগুলোর সাথে মানের সমতা নেই। | মহল বিশেষের অসহযোগীতার ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার শিকার |
| ১০. | প্রাথমিক পর্যায়ে মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের ফ্রি বই প্রদান | বহুবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে | মহল বিশেষের অসহযোগিতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার শিকার |
| ১১. | প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা ছাত্রী-ছাত্রীদের ফ্রি বই প্রদান | উদ্যোগ নেয়া হয়েছে | মহল বিশেষের অসহযোগিতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার শিকার |
| ১২. | ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সাধারণ শিক্ষার সমপরিমাণ সরকারি অনুদান প্রদান | তুলনামূলকভাবে কম | সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসার বেলায় ১০:১ পর্যায়ে হিসাবে দ্বারা উন্নয়ন বন্টন করা হয়। |
| ১৩. | বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে সাধারণ ও ইসলামী শিক্ষার সমতা বিধান | উদ্যোগ নেয়া হয়েছে | উদ্যোগ নেয়া জরুরী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৪. | সরকারি মাদরাসার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ | প্রতি জেলায় ১টি মাদরাসা সরকারি করণের উদ্যোগে নেয়া হয়। | রাজনৈতিক ও আমলা-তান্ত্রিক জটিলতায় ও হয়নি। |
| ১৫. | একাধিক ইসলামী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন | উদ্যোগ নেয়া হয়েছে | রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তা হয় নি। |
| ১৬. | মাদরাসা শিক্ষাধারায় কারিগরী ও বৃত্তিমূরক বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করণ | অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে | এর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। |
| ১৭. | বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বত্র ও সকল বিষয়ে মাদরাসা শিক্ষিতদের ভর্তির সুযোগ দান | প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ভিত্তিতে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তবে সকল বিষয়ে উন্মুক্ত নয় | গত কয়েক বছর যাবৎ নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় ছাড়া ভর্তি সুযোগ দেয়া হয়নি। |
| ১৮. | সকল ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমমান ও মর্যাদা প্রদান | সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে | কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েই গেছে। |
| ১৯. | কামিল শ্রেণীতে অনার্স কোর্স চালু করণ | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার অধীনে অনার্স কার্যক্রম চলমান | |
| ২০. | উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা করণ | বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সীমিত পরিসরে ব্যবস্থা আছে | মাদরাসা শিক্ষা ধারায় ক্ষেত্র তৈরী করা হয়নি। |
| ২১. | ইবতিদায়ী মাদরাসাকে প্রয়োজনীয় মর্যাদা দিয়ে উন্নীত করণ | মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক একাডেমীক স্বীকৃত দান করা হয়েছে। | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে। |
| ২২. | মাদরাসা শিক্ষা ধারায় বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া | গতানুগতিক সিলেবাসের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে | গবেষণামূলক ভাষা ইন্সটিটিউট বা ইসলামী একাডেমী স্থাপিত হয়নি। |
| ২৩. | মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে ইসলামী শিক্ষার সকল বিষয় সমূহের উপর প্রয়োজনীয় বই পত্র রচনা | কিছু কিছু বই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে | পরিকল্পনা মাফিক সকল বিষয়ে সমান্তরালভাবে বই পুস্তক রচিত হয়নি |
| ২৪. | আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা ধারার আদান প্রদানের ব্যবস্থা করুণ | সীমিত ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করা হয়েছে | দেশী ও বিদেশী প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং প্রশাসনিক সহায়তা দানের অভাবে হচ্ছে না। |

## উপসংহার :

মহান আল্লাহর দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। যার অসীম কৃপায় গবেষণাকর্মটি সমাপ্ত হলো। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করেই সকল সৃষ্টিকূলের উপর বনী আদমের মযার্দা সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সকল কিছুর জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। মানুষ হলেন আল্লাহ তা'য়ালার মহান দান 'জ্ঞানের' ধারক বাহক। ইসলামী শিক্ষার যাত্রা তখন থেকেই শুরু। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) আগমণের মাধ্যমে তা আরও বিকশিত হয়েছে। জ্ঞানে পূর্ণতা লাভ হয়েছে বিশ্বনবী সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পয়গম্বর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ তালিমের মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরপর তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরী সাহাবীগণ, বিভিন্ন শাস্ত্রের ইমামগণ, মুজতাহিদগণ ও দ্বীন ইসলাম প্রচার কার্যে নিয়োজিত আল্লাহ পাকের অলী বান্দাগণ ইসলামী শিক্ষা মানবজাতির মধ্যে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়ার মহান দায়িত্ব পূর্ণ এখলাছের সাথে পালন করে এসেছেন।

মানবজীবনের ইসলামী শিক্ষা শুরু হয় মায়ের কোল থেকেই। এজন্যই মায়ের কোলকে শিশুর জন্য সবর্ত্তোম মাদরাসা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জ্ঞানের দ্বার-হযরত আলী (রা.)। একটি পরিবারে মা যদি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তার এ শিক্ষার প্রভাব পুরো পরিবারের উপর পড়ে। পরিবার হয়ে উঠে শান্তির নীড়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১,১৪,১৫,১৭,১৮,১৯,২০ ও বিশেষ করে ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মানবিক ও নৈতিক শিক্ষাগুলো কমলমতি শিশু শিক্ষার্থী বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের জন্য ইবতিদায়ী শিক্ষা ব্যবস্থায় আনা হয়েছে। যাতে করে শতকরা ৯০ শতাংশ মুসলিমদের এ দেশে শিক্ষা বাধাগ্রস্থ না হয়।

মাদরাসা শিক্ষা বাংলাদেশে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আজ পূর্ণাঙ্গ রূপে এসে পৌছেছে। প্রাচীনকাল হতেই এ শিক্ষা ব্যবস্থা তার ঐতিহ্যকে লালন করে আসছে। তবে আধুনিককালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়গুলো ইসলামী করণের মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসভুক্ত হলে মাদরাসা শিক্ষার্থীগণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও বেশী অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। এ জন্য দরকার শুধু মাদরাসা শিক্ষার নীতি নির্ধারকদের সচেতনতা ও সরকারের সৎ ইচ্ছা।

মাদরাসা শিক্ষার বহুমুখী প্রভাব সমাজে বাস্তবায়িত হওয়ার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে মাদরাসা শিক্ষার প্রাথমিক (ইবতিদায়ী) স্তরে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ : মানিকগঞ্জ জেলার উপর একটি সমীক্ষা' গবেষণা

কর্মটিকে যদি আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করেন তবে শ্রম সার্থক হওয়ার আনন্দ মিলবে। নিঃসন্দেহে এই গবেষণা কর্মটি মাদরাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার সম্ভাবনাকে আরও গতিশীল করবে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করে তাঁর ও তাঁর রাসূল (সা.) এর অনুগত্যের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

# গ্রন্থপঞ্জি


১। আল-কুরআনুল কারীম

২। আবু আবদিল্লাহ মুহাম্দ আল-কুরতুবী (রহ.), আল জামি'লি আহকাম *আল-কুরআন*, কায়রো: দুরুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৭

৩। আহমম্দ ইবন আলী আবু বকর আর-রায়ী- আল-হানাফী (রহ.), আহকামুল কুরআন,: বৈরূত: দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১৪০৫ হিজরী।

৪। হাফিয ইমাদউদ্দিন ইবন কাসীর আশ-শাফিঈ (রহ.) তাফসীরু কুরআনিল আযীম, ২য় সংস্ককরন, মিশর: দারুত তায়্যিবাত লিন্-নাশর ওয়াত-তাওযী, ১৯৯৯ সাল

৫। হাফিজ ইমাদউদ্দিন ইবন কাসীর (রহ.), জামিউল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন, মিশর: মুয়াচ্ছাসাতুর রিসালাহ ২০০০ সাল।

৬। কাযী নাসির উদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবন উমর ইবন মুহাম্মদ আল-বায়যাভী (র.) তাফসীরে বায়যাভী *(আলওয়ারুত তানযীল ওয়া ইসরারুত তা'বীল)* মিশর: মাকতাবাতুত তাওফীকীয়াহ, ২০০৩ সাল।

৭। মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) *তাফসীরে মারেফুল কুরআন*, অনুবাদক: মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন, প্রথম সংস্পরণ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০ সাল।

৮। আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ জারীর তাবারী (র.) মাজমাউল বাহরাইন মাতলাউল বাদরাইন, কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৩ সাল।

৯। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-জু'ফী আল-বুখারী (র.), *আল-জামেউল মুসনাদু আস-সহীহুল মুখতাসারু মিন উম্রি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী*, *বৈরূত: দারুল আরাবিয়া*, ১৩৪৮ হিজরী

১০। আবুল হাসান মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশাইরী (র.), *আল-মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসারু বি নাকলিল আদলি আনিল আদলি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*, *বৈরুত:* লেবানন, দারুল ফিক্র, ১৯৮২ সাল।

১১। সুলাইমান ইবনে আশআছ আল আযদী আল সিজিস্তানী আবু দাউদ (র.) সুনানু আবু দাউদ, কায়রো: ১৩৬৯ হিজরী।

১২। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাহাহ (র.) সুনানু ইবনে মাযাহ, কায়রো: ১৩১৩ হিজরী।

১৩। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.), মুসনাদে আহমাদ, বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৭৩ সাল।

১৪। আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমীযী (র.) আল-জামি' আত-তিরমিযী, মিশরঃ মুস্তফা বাবী আল-হালাবী প্রেস, ১৯৭৫ সাল।

১৫। মালিক ইবন আনাস ইবন মালিক ইবন আমর আল-মাদানী (র.) *আল-মুওয়াত্তা*, আবু যাবী ইমারত, প্রথম সংস্করণ ২০০৪ সাল।

১৬। আল্লামা ওলী উদ্দিন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতীব (র.), মিশকাতুল মাসাবীহ, অনুবাদঃ মাওলানা শামসুল হক, ঢাকাঃ সোলেমানিয়া বুক হাউজ, ২০০৪ সাল।

১৭। হাফিয যাকীউদ্দীন আব্দুল আযীয আল-মুনযিরী (র.), অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মদ সাইদুল হক, আত-তারগীর ওয়াত-তারহীব, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ সাল।

১৮। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, মাকতাবাতু থানভী, ১৯৮৬ সাল।

১৯। হাফিয শামসুদ্দিন (র.), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৭ সাল।

২০। ইমাম গাযালী (র.), সৌভাগ্যের পরশমণী, অনুবাদ আব্দুল খালেক, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৩।

২১। ডেভিড হিউম, অনুবাদ, আবু তাহা হাফিজুর রহমান, মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮১।

২২। ডঃ আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৪।

২৩। মোহাম্মদ আসাদ, বাংলাদেশ ইসলামের ইতিকথা, সাজ্জাদ প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১ম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।

২৪। পূরবী বসূ, নারী সৃষ্টি ও বিজ্ঞান, নবজুগ প্রকাশনী, ঢাকাঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।

২৫। মোঃ মতিউল ইসলাম, শিশু কিশোরদের শিষ্টাচার শিক্ষা ও শিশু অধিকারের আইন কানুন, জমিন প্রকাশনা, ঢাকাঃ ২০০৬ সার।

২৬। মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, নতুন ভারতীয় সংস্করণ কলিকাতাঃ নবজাতক প্রকাশন, ১৯৮৭ সাল।

২৭। মোহাম্মদ আবদুর রহিম, হাদিস সংকলনের ইতিহাস, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭০ সাল।

২৮। ইবনে হিশাম, সিরাতুন্নবী (সা.) বঙ্গানুবাদ, সম্পাদনা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৯। ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) জীবন ও শিক্ষা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে ১৯৯৭ সাল।

৩০। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র.) আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, বৈরূত : দুরুল মা'রিফা, তা.বি।

৩১। আল্লামা ইবনে মানযুর (র.) লিসানুল আরাব, বৈরূতঃ দারু ইহয়ায়িত তুরাছ আল-আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯২ সাল।

৩২। সৈয়দ আমির আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম*, অনুবাদ, মুহাম্মদ দরবেশ আলী-আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩ সাল।

৩৩। ড. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ সাল।

৩৪। ড. আবদুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯ সাল।

৩৫। ড. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৯৪ সাল।

৩৬। ড. আবদুল করিম, মক্কা শরীফে বাঙ্গালী মাদরাসা, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরীফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৮৭ সাল।

৩৭। আবুদল হক ফরিদী, মাদরাসা শিক্ষা-বাংলাদেশ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ সাল।

৩৮। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লা, মুসলিম ও বৃটিশ যুগে উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষা, ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ সাল।

৩৯। ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, ঢাকাঃ ইসালামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৪ সাল।

৪০। ড. আব্দুল ওয়াহিদ, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, প্রকাশকঃ গিয়াস উদ্দিন খসরু, ঝিঙেফুল, ঢাকা গ্রন্থমেলা ২০০৭ সাল।

৪১। ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০৫।

৪২। মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, মে ২০০৭ সাল।

৪৩। মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, বিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৮ সাল।

৪৪। ড. মোহাম্মদ আজহার আলী ও হোসেনে আরা বেগম, মুসলিম শিক্ষা, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ সাল।

৪৫। মুহাম্মদ আলমগীর, ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ সাল।

৪৬। ডক্টর এম.এ.রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতীক ইতিহাস, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জানুয়ারি ২০১২ সাল।

৪৭। আবদুল মান্না তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ সাল ।

৪৮। আব্বাস আরী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ সাল।

৪৯। ড. মুহাম্মদ আব্দুল রহিম, ড. আবদুল মোমিন চৌধুরী, ড. এ,বি.এম. মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশে ইতিহাস, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৭ সাল।

৫০। ড. গোলাম সাকলাইন, *বাংলাদেশের সূফী সাধক*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ সাল।

৫১। মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস, ঢাকা, তা.বি.

৫২। মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজহার), *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জের লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংগঠন, ২০০৯।

## পত্র পত্রিকা, স্মরণিকা, সাংগঠনিক পুস্তিকা/ কার্যবিবরণী ও নথী নম্বরঃ

১। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপি নং- ২১১/এস-১৩, তারিখ, ২০ জানুয়ারী ১৯৭৫ সাল ।

২। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি নং ৯৪৮৫/এস-১৩, তারিখ, ২৫/৯/১৯৭৫ সাল।

৩। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি নং-১৪০৩০/এস-১৩, তারিখ, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সাল।

৪। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি নং-১৬১০৪/এস-০২, তারিখ, ১৫/১২/১৯৮১ সাল।

৫। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি নং-৫১৪২/২৬০০/এস-০২, তারিখ, ১৮/০২/১৯৮১ সাল।

৬। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের একাডেমীক কমিটির ১৮/১১/১৯৮২ইং তারিখে সভার কার্যবিবরণী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা স্মারক ১৪/১০/১৯৮২ইং তারিখের শা-১৮/৬ এস-সি/৮/৮২ ৩১৮।

৭। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ৪০তম বোর্ড সভা, অনুষ্ঠিত-১৯/১২/১৯৮৪ইং সভার কার্যবিবরণী বিবিধ- ৮নং প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত।

৮। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য সূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট, ইবতিদায়ী স্তর, ১ম খন্ড (ঢাকাঃ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড : ১৯৯৪ইং)

1) Syedur Rahman, *Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, Mallick Brothers, Dhaka, Pub : 1969,

2) T Raymont, *The Principles of Education*, Orient Longman Limited, 1994, Hyderabad
3) Emile Durlehiem, *Education Sociology*, The Free Press, New York, Pub. 1956
4) John Dewey, *Democracy and Education*, The Macmillar Company, New York, Pub. 1916
5) John Dewey, *The School and Society*, (2nd Edition), Chicago, University Press, Chicago
6) UNESCO Report, Paris, 2002.
7) J.C. Aggarwal, Education Reforms in India for the 21st Century, Shipra Publications, New Delhi, Pub, 2010
8) www.almaany.com
9) https://ar.m.wikipedia.org
10) *On Islamic Education: Islamic Education Society* (Dhaka: 1985)
11) Dr. Mohammad Ishaq: Indias Coutribution to the study of Hadith literature (Dhaka 1976) P-147 (University of Dhaka)
12) *Encyclopaedia of Islam*, Vol, 4, London 1424
13) *Minute by Warren Hestings dated the 17th April*, 1781
14) G.M.D. Sufi Al-Minhaj, Lahore, Ashraf printing press, 1981
15) *Report of the moslem Education Advisory committee*, 1934
16) Major Basu, Education in India Under E.I. Company
17) Dr. Sekandar Ali Ibrahimy, *R.On I.E. and M.E. in Bengal, vol.3.p.xiii*
18) Dr. A. K. M. Ayyub Ali, *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh*, p.38, The Course
19) Revenue consultation Dt, 27-10-1812
20) Syeed Mohammad, *History of English Education*
21) H.Hole, *English National Education,*

22) H.Hole, *English National Education*

23) Abdul Karim, *Mohammadan Education in Bengal*, Writen in 1900 for Ulamma and Education Conference.

24) Nawab Abdul Latifs reprot on Hoogly Madrasah, 1961

25) W.W. Hunter, *Our Indian Muslman*

26) Report of the moslem Education Advisory Committee, 1934.

27) Syeed Mahmud, *History of English Education*,

28) M.Fazlur Rahman, *The Bengali Muslims and English Education*

29) Syeed Mahmud, *History of English Education in India*

30) Q. Dr. A. K. M. Ayub Ali, History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983)

## ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস ক্রমধারা

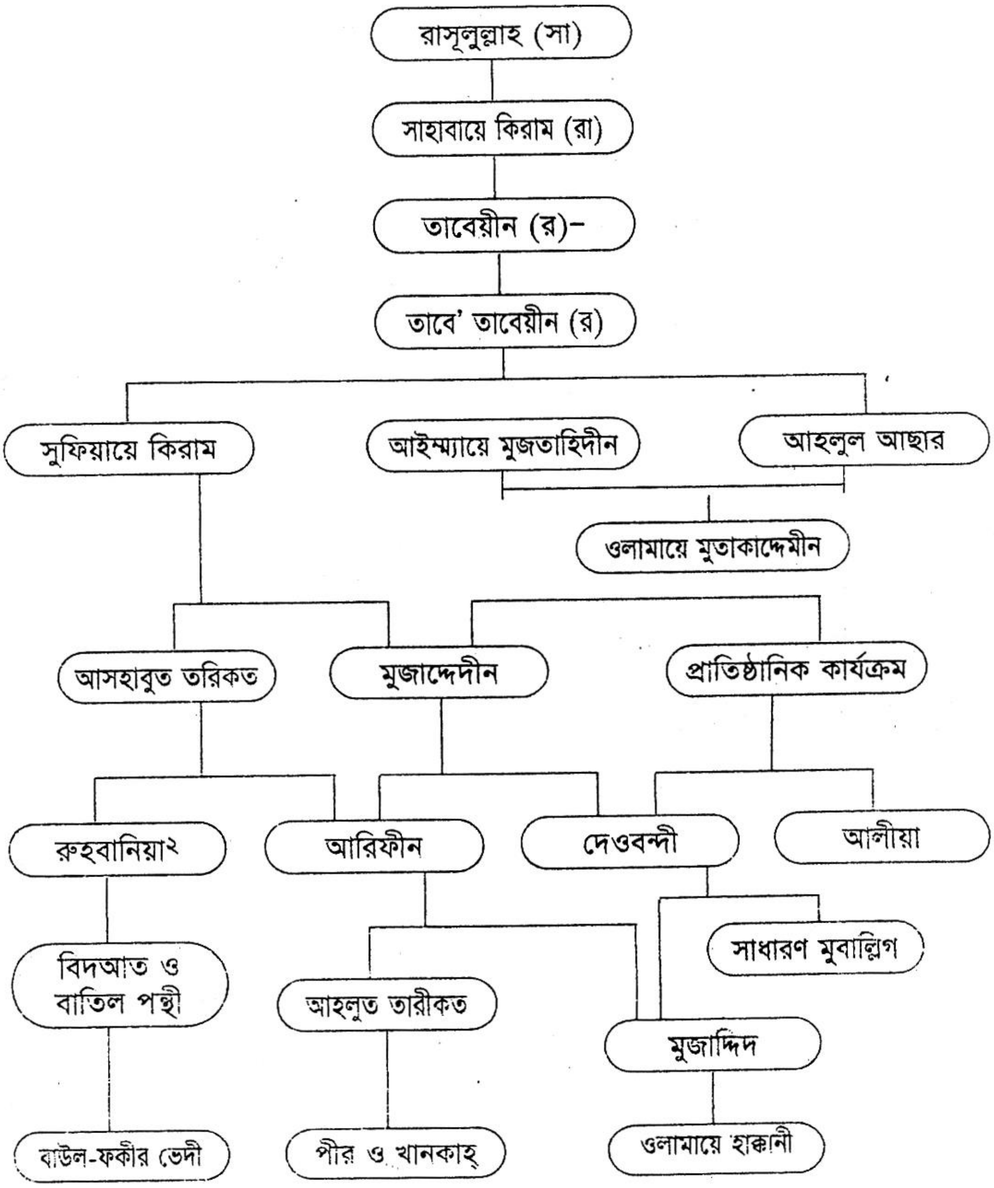


১. রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়কার 'দারুল আরকাম' থেকে ইসলামী শিক্ষা যাত্রা শুরু করে প্রায় ১৫০০বছরের ঐতিহাসিক পালাবদলে আজকের বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা বিভিন্ন স্তর এবং পর্যায়ে লালিত ও বিকশিত হয়ে চলছে।

২. রুহবানিয়া-এর এই ক্রমধারাটি আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামায়া'ত এর দৃষ্টিতে বাতিল পন্থী সম্প্রদায়।

*Dhaka University Institutional Repository*

## বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষার ধারা সমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ন

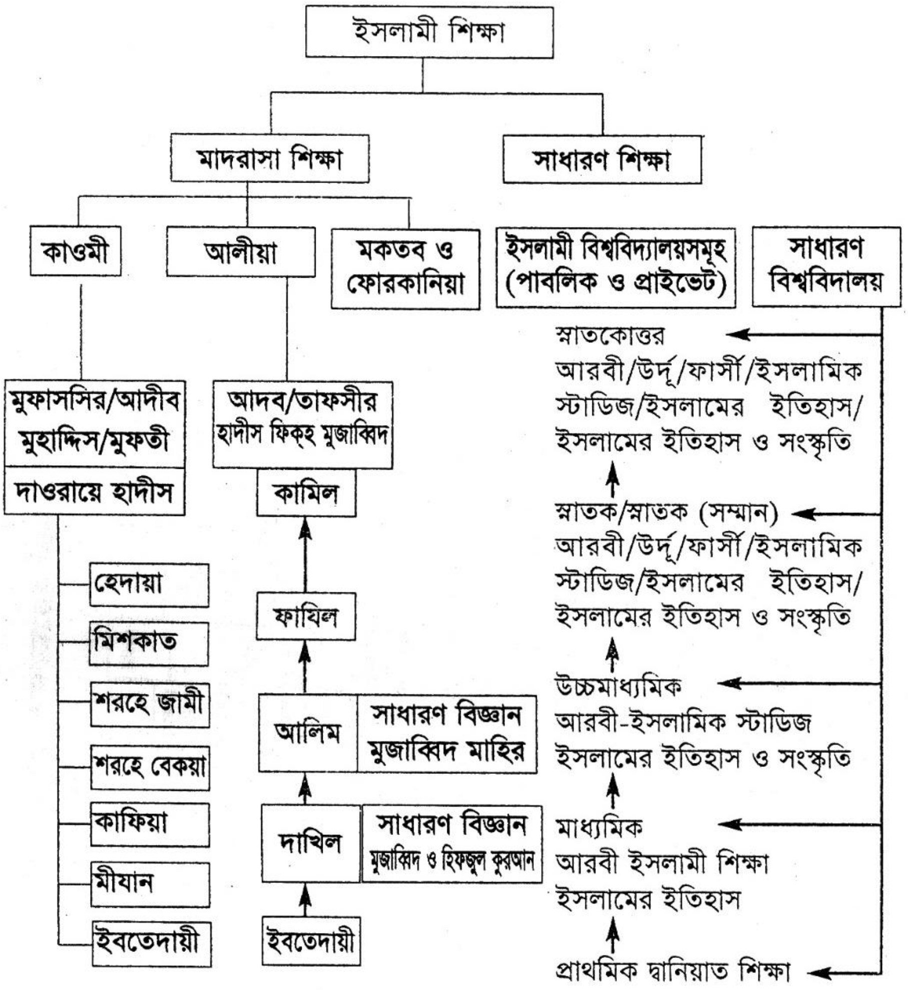


সূত্র ঃ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, কাওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং এন, সি, টি বি'র বিভিন্ন উপাত্ত থেকে গৃহিত।

# বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো

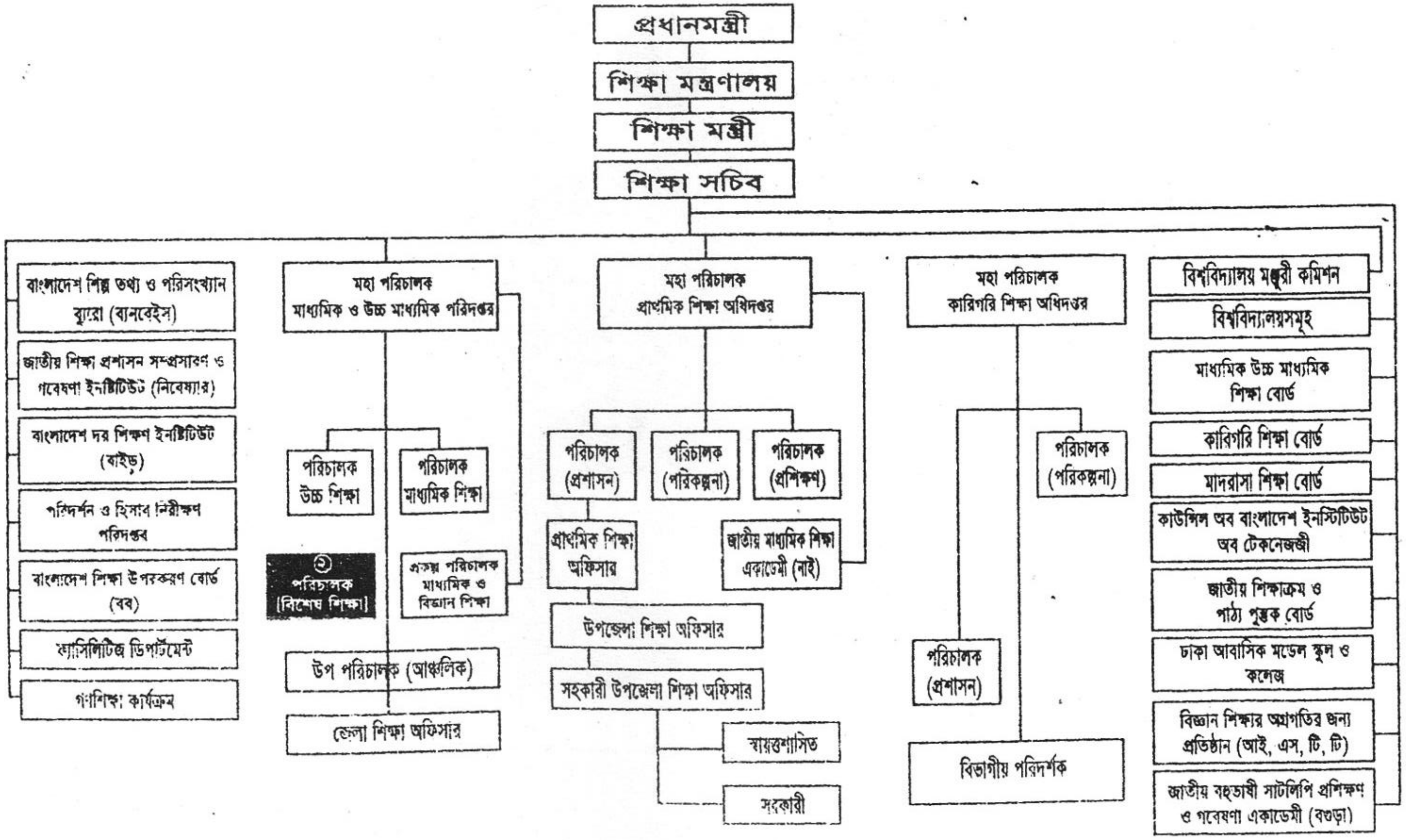

Dhaka University Institutional Repository

## বাংলাদেশের শিক্ষাস্তরের বিন্যাস[1] (শিক্ষা কাঠামো)

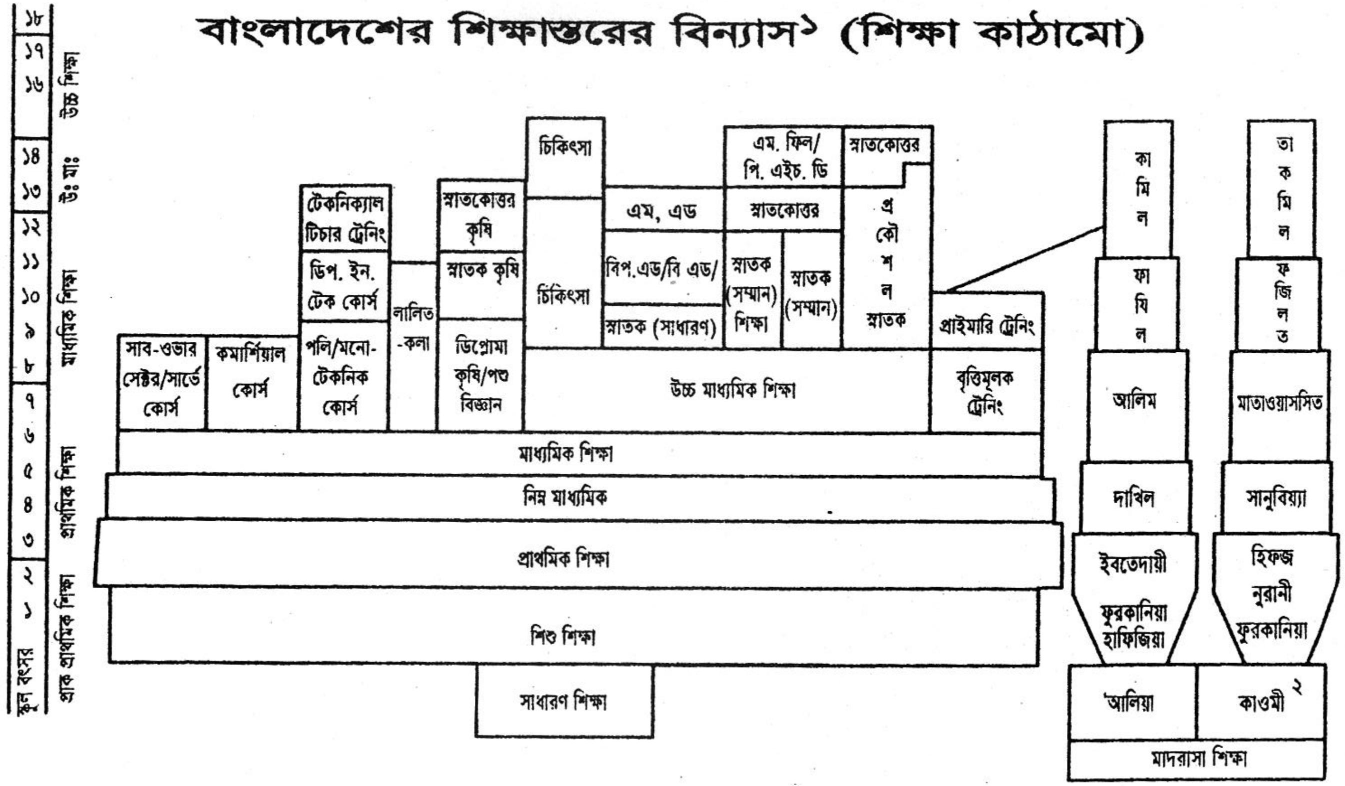


---

১. বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান বুরো বাংলাদেশ টেকিনিকাল এডুকেশন বোর্ড ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও বিফাকুল মাদারিস বাংলাদেশ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত (১৯৮৭ খৃ.) সহায়ক গ্রন্থঃ ডঃ শেখ দেলোয়ার হোসেন; শিক্ষা ও উন্নয়নঃ উন্নয়নশীল দেশের প্রতিশ্রুতি।

২. কাওমী মাদরাসাগুলোর শ্রেণী বিন্যাসে একাধিক নামের তথ্য পাওয়া যায়। কেউ কেউ কিতাবের নাম অনুসারে কেউ ফারসি ক্রমধারা অনুযায়ী নামকরণ করেন। উল্লেখিত নামে একমাত্র বেফাকের অধীনস্থ মাদরাসাগুলোকে নামকরণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

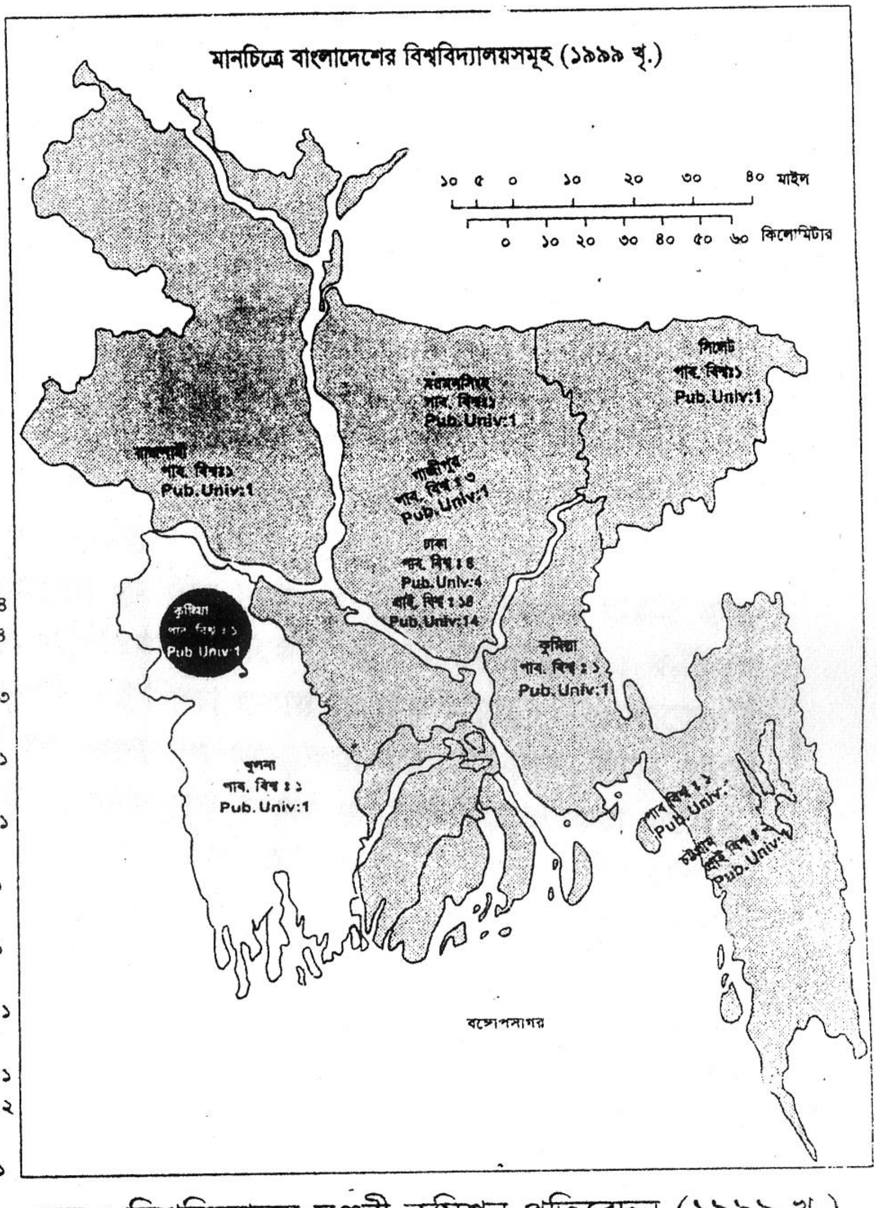


জেলাওয়ারী পরিসংখ্যান

১. ঢাকা ঃ
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় - ০৪
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় - ১৪

২. গাজীপুর ঃ
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় - ০৩

৩. ময়মনসিংহ ঃ
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় - ০১

৪. রাজশাহী ঃ
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় - ০১

৫. কুষ্টিয়া ঃ
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় -০১

৬. খুলনা ঃ
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় -০১

৭. সিলেট ঃ
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় - ০১

৮. চট্টগ্রাম ঃ
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় - ০১
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় - ০২

৯. কুমিল্লা ঃ
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় -০১

সূত্র ঃ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিবেদন (১৯৯৯ খৃ.) থেকে গৃহিত।

১. দেশের একমাত্র পাবলিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

গোলড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

Dhaka University Institutional Repository

*Dhaka University Institutional Repository*

Dhaka University Institutional Repository

আফছার আলী খান ছাত্রীনিবাস

Dhaka University Institutional Repository

আলিম মাদ্রাসা